

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম বর্ষ। (শ্রাবণ ১৩৫৭ - আষাঢ় ১৩৫৮)

রচনাসূচী

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার		শ্রীনন্দলাল বসু	
স্বরলিপি	৬৭, ২০০	রসের প্রেরণা	৮৪
শ্রীঅমলেন্দু দাসগুপ্ত		শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী	
গ্রন্থপরিচয়	৫৫	গ্রন্থপরিচয়	১২২
শ্রীঅমিয়নাথ সাত্তাল		শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	
গ্রন্থপরিচয়	১৪০	প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা	১২৫
		বিকৃতিকৃষ্ণের রচনা	১৬০
শ্রীআর্যকুমার সেন		শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী	
বিকৃতিকৃষ্ণের ছোট গল্প	১৬৮	জর্জ বার্নার্ড শ	১৭৫
শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী		শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	
স্বরলিপি	৬৩	গ্রন্থপরিচয়	২৮১
গ্রন্থপরিচয়	১২৬		
শ্রীকানাই সামন্ত		শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	
শিল্পের স্বরূপ	২৭৭	বান্দ্যকি ও কালিদাস	২৭৭
শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
মহারাষ্ট্রে ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনা	২১৭	সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা	৩০
		ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	২৬৩
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বাংলার বাউল	১৬, ২৭, ২৩০	গীতিগুচ্ছ	১
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য		'দুঃসাপমহারীর ভাষ্য'র খসড়া	৫, ৭০
তেজস্ক্রিয়াতা, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম	১১২	আহ্বান	৩২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর		স্বাক্ষর	১৫৩
স্বরলিপি	৬১, ১১৮	অরবিন্দ ঘোষ	১২
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর		'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'	১৬২
স্বরলিপি	৬৬	চিঠিপত্র	২০৭

756.3
028/2

শ্রীকান্তেশ্বৰ বসু
ভাষাৰ মূহদোষ ও বিকাৰ

শ্রীমুকুমাৰ সেন
আলোচনা

২০৭

শ্রীনাথদেব ঘোষ
স্বৰূপ

শ্রীমুৰোণ ঘোষ
ঐশ্বৰ্য্য

১০০

শ্রীশৈলজ্ঞানেন্দ্র মজুমদাৰ
স্বৰূপ

শ্রীমুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়
স্বৰূপনাথৰ লগে সন্মিলনে

৮৭

চিত্ৰশূচী

গগনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ
ঐশ্বৰ্য্য

পিকত

ভৰ্ত্ত বানার্জী

১৭৫

নন্দলাল বসু

প্ৰতিকৃতি

বাউল

শ্ৰীমদমণি দেবী

১২৫

বদন্তবাসুদেৱ

শ্ৰীমদবিনয়

১৫০

স্বৰূপনাথ ঠাকুৰ
ঐশ্বৰ্য্য চিত্ৰ

বিকৃতিমূৰণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৫

ভৰ্ত্ত বানার্জী

১৮৫-৬

P30378

বিশ্ভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-ভাষ্মিন ১৩৫৭



বিষয়সূচী

গীতিগুচ্ছ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
'দুরোগ্যজ্ঞাত' ডায়ারি'র খসড়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বাংলার বাউল	ঐকিত্তিমোহন সেন	
আফ্রান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা	ঐত্রেয়রত্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
গ্রন্থপরিচয়		
শান্তিনিকেতন ১।২। ধর্ম।		
স্বপ্ন। মাহেশ্বর ধর্ম	ঐযমলেন্দু দাশগুপ্ত	
রবীন্দ্রসংগীত-সরলিশি		
এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া	ভো্যতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬১
আমি স্বপনে রয়েছি জোর	ঐইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	৬৩
আধার এল ব'লে	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৬
চোখ বে ওপের ছুটে চলে	ঐঅনাদিকৃষ্ণার হস্তিদাস	৬৭
এখন আর সেবি নয়	ঐশৈলমহারতন মজুমদার	৬৯
গগনে গগনে ধায় ইাকি	ঐশান্তিযেব ঘোষ	

চিত্রসূচী

ভীষ	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাউল	ঐনকলাল বহু

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদনা-সমিতি

সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বণি

সদস্যবর্গ :

শ্রীচক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীপুলিনবিহারী সেন

৭ শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়— শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আষাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক মূল্য (রেজিস্ট্রী ডাকে) ৪১০। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪১০।

৭ প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হইত, তাহার প্রথম বর্ষ ও একাদশ সংখ্যা পাওয়া যায় না, বাকি নয় সংখ্যা পাওয়া যায়। এই নয় সংখ্যা একত্র ২১০।

৭ পঞ্চম বর্ষ সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে। প্রতি সেট হাতে লইলে ৪৮, রেজিস্ট্রী ডাকে ৪৮০।

৭ চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রতি সংখ্যা হাতে লইলে ১৮, রেজিস্ট্রী ডাকে ১৮০।

৭ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রতি সংখ্যা হাতে লইলে ১৮, রেজিস্ট্রী ডাকে ১৮০। তিন সংখ্যা একত্রে রেজিস্ট্রী ডাকে ৩৮০।

কর্মাদ্যক্ষ

বিশ্বভারতী পত্রিকা

৬৩ ব্যবসানাহ ঠাকুর সেন, কলিকাতা ৭

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

শ্রীকৃতিমোহন সেন

প্রাচীন ভারতে নারী

আধুনিক ভারতে নারীর অধিকারের প্রশ্ন সমাধে ও রাষ্ট্রে একটি প্রধান সমস্যা। বিবাহবন্ধনচ্ছেদের অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারীস্বাধীন থাকিবে কি না ইহা আজ বিশেষ বিতর্কের বিষয়। এই প্রশ্নে পণ্ডিত কৃতিমোহন সেনশাস্ত্রী প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার শাস্ত্র-প্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আলোচিত বিষয়ের সূচী : আদর্শ ও অধিকার, সামাজিক অবস্থা—বিবাহ, বিবাহ-অস্থান, সম্পত্তির অধিকার, নারীদের স্থান, বিবাহবন্ধন, নারীর বিতর্ক, বিবাহবন্ধনচ্ছেদনে শাস্ত্রবিধি ও রাজবিধি, স্বীকৃতি, শাস্ত্রাধিকার।

মূল্য দুই টাকা

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত

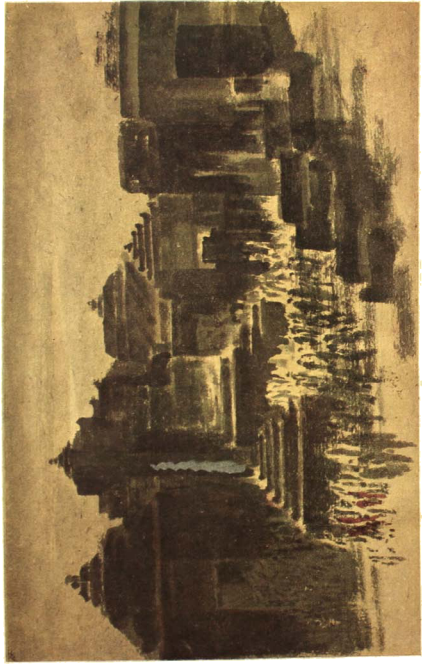
গোর্খ-বিজয়

নাথসম্প্রদায় সম্পর্কে অপরূপ গ্রন্থ। ভূমিকায় নাথসম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। অমৃত্তিত ও মৃত্তিত উপকরণ হইতে পাঠ ও পাঠান্তরসহ এক নতুন ভূমি পৃষ্ঠা ব্যাপী মূল গ্রন্থ। ছয়টি পরিশিষ্টে এতৎসম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন পাঠ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাও মধ্যে যোগীর গান শিলাইবহ অঞ্চল হইতে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত। গোর্খ-বিজয়ের এই প্রামাণিক সংকলন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিরর্থনরূপেই নয়, সর্বভারতীয় নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের আলোচনা বলিয়া সমধিক মূল্যবান।

মূল্য পাঁচ টাকা

গবেষণা গ্রন্থমালায় বিস্তৃত আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বভারতী



তীর্থ
শিল্পী গগনেজনাথ ঝাংকর

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৭

গীতিগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি প্রভাতে

পূর্ব গগনে উদিল

কল্যাণী শুকতারা ।

তরুণ অরুণরশ্মি

ভাঙে অন্ধতামসী

রঞ্জনীর কারা ॥

[চৈত্র ১৩৩৭]

২

কালো মেঘের ঘটা ঘনায় রে

আঁধার গগনে ।

ঝরে ধারা ঝরো ঝরো

গহন বনে ।

এতদিনে বাঁধন টুটে

কুঁড়ি তোনার উঠল ফুটে

বাঘল-বেলার বরিষনে ।

ওগো, এবার তুমি জাগো জাগো—

যেন এই বেলটি হারায় না গো ।

অশ্রুভরা কোন্ বাতাসে

গন্ধে যে তার ব্যথা আসে—

আর কি গো সে রয় গোপনে ॥

[১৩৩২]

৩

শ্রাবণের বারিধারা
ঝরিছে বিরামহারা —
বিজ্ঞান শূন্য-পানে
চেয়ে থাকি একাকী ।
দূর দিবসের তটে
মনের আধার-পটে
অতীতের অলিখিত
লিপিস্থানি লেখা কি ।

বিদ্যাৎ মেবে মেঘে
গোপন বহ্নিবর্ণে
বহি আনে বিস্মৃত
বেদনার রেখা কি ।

যে ফিরে মালতীবনে,
স্মরতিত সমীরণে,
অন্তসাগরতীরে
পাব তার দেখা কি ॥

উদীচী । শান্তিনিকেতন

২০ ভাদ্র ১৩৪৭

৪

পাখি, তোর হ্র জ্বলিস নে—
আমার প্রভাত হবে বৃথা
জানিস কি তা ।

অরুণ-আলোর করুণ পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাপনে তার তোরই যে হ্র লাগে—
তুই ভোরের আলোর মিতা
জানিস কি তা ।

আমার জাগরণের মাঝে
রাগিনী তোর মধুর বাজে
জানিস কি তা ।

আমার রাতের স্বপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা
জানিস কি তা ॥

উদয়ন । শাস্তিনিকেতন
১২ ডিসেম্বর ১৯৪০ । রাত্রি

৫

আজি কোন্ সূরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলায়
দীর্ঘ ধূসর অবকাশে
সঙ্গীজনবিহীন শূন্য ভবনে ।
সে কি মুক বিরহ-স্মৃতি-গুঞ্জরণে
তন্ত্রাহারা ঝিল্লিরবে ।
সে কি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষধ্বনিতে ।
সে কি অবগুষ্ঠিত প্রেমের কুণ্ঠিত বেদনায়
সমবৃত্ত দীর্ঘশ্বাসে ।
সে কি উচ্ছত অভিমানে, উচ্ছত উপেক্ষায়,
গর্বিত মঞ্জীরঝংকারে ॥

উদয়ন । শাস্তিনিকেতন
২২ চৈত্র ১৩৪৬

৬

আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে—
বাদল-দিনের আকাশ-পারে
ছায়ায় হল লীন ।

কোন করণ মুখের ছবি
পূবেন হাওয়ায় মেলে দিল
সজল ভৈরবী ।
এই গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্বাঙ্গী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন ॥

উদয়ন । শান্তিনিকেতন
ডিসেম্বর ১৯৪০

গাথা
হারিয়ে-হাওয়া দিন
আর কি বুঝে পাব তারে— অক্ষসজ্জল আকাশপারে
ছায়ায় হল লীন ।

করণ মুখচ্ছবি
বাসল-হাওয়ায় মেলে দিল বিরহী ভৈরবী ।
গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্বাঙ্গী কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন ॥

উদয়ন । শান্তিনিকেতন
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

ঐতিহাসিকের হস্ত কৃতীয় খণ্ডে কবির বে-সমস্ত অপ্রকাশিত, অথবা গ্রন্থ-অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত হইতেছে ভগ্নাংশে বোটা স্যাকটি গান (ঐতিহাসিক ছয়টি, সপ্তম রচনা 'আম সবাই মুটে আত্মক মুটে' এই সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠায়) সংকলিত হইল । 'শ্রম প্রভাতে' (১) গানটি ১৩৩৭ সালের চৈত্রে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের তৎকালীন ছাত্রী ঐনতী সাবিত্রী গোবিন্দ কর্তৃক গ্রন্থাকোশে রেকর্ডের ভ্রত গীত হয় । অল্প সময়ের রচনা রবীন্দ্রচন্দ্র-রক্ষিত কবির বিভিন্ন পাত্তালিপি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । 'পাখি তোমার স্বর ভুলিস নে' (৩) এবং 'আমার হারিয়ে-হাওয়া দিন' (৬) এই রচনা দুটির গানের পাঠ সম্পর্কে ঐশ্বর্যসিংহ ঘোষের সৌমন্ত্রে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব হইয়াছে । 'পাখি, তোমার স্বর ভুলিস নে' গানটির 'ওরে পাখি, থেকে থেকে ভুলিস কেন স্বর' এই রূপান্তর 'শব্দ লেখা'য় কৃতীয় কবিতারূপে মুদ্রিত আছে ।

‘মুরোপযাত্রীর ডায়ারি’র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ণাঙ্গ

বৃহস্পতিবার [১৬ অক্টোবর ১৮৯০]। বেল্লান। আর লোকেরকে চিঠি লিখলুম— চিঠির কাগজ লম্বা ছিলনা— কলির কাছে খাব করতে হল। লেখা শেষ করে টেবিল থেকে উঠবার সময় টেবিলের চামরে টান পড়ে সোরাতি চিঠি সমস্ত নীচে পড়ে গেল— চিঠির উপরে এবং চতুর্দিকে কালি ছিটকে পড়ল— অধির কাণ্ড। আমার মত বদার্থ clumsy লোক দুনিয়ায় নেই।

উপরে গিয়ে বেড়াইলুম একজন অষ্ট্রেলিয়ান মেয়ে আমার দল নিলে— আমি দেখেছি একমুখ বেনামেশি বেশিক্ষণ আমি লাইতে পারি নে। আর লম্বা সময় লম্বারী লম্বা দুইও কথাবার্তা করে এমন আশি এবং বিরক্তি কোণ হতে লাগল, যে, কোন ছুতোয় পালাতে পারলে ঝিটি এনি মনে হল। সৌন্দর্য বেশভূষা এবং কল্লা করতে বেশ লাগে— কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে পাচচারি করে small talk করতে আসবে ভাল লাগেনা। আমি মনে মনে বেছেবের এত ভালবাসি, কিন্তু তাদের সঙ্গে জাব করতে পারিনে— আচ্ছা— আমার আপনাপনি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কখনো বন্ধুত্ব হবেনা। আর এসের অভিনয় হয়ে গেল— আমার সেই লম্বারী বন্ধু চমৎকার অভিনয় করেছিল— তাকে ভারি লম্বার দেখাছিল। সে আমার সঙ্গে এমন একরকম করণ মমতার সঙ্গে কথা কয়— এমন একরকম পূর্ণ উচ্চ দুইতে মুখের দিকে চায় আমার বেশ লাগে— যদিও তার সঙ্গে যে বেশি মিশি তা নয়।— আচ্ছা হান্তিও আমাকে গান গাইতে হল। তার পরে নিরালায় অন্ধকারে ভাষাজের কাঠরা পরে লম্বার দিকে চেয়ে ধন গুনগুন করে একটা মিশি রাগিনী ডাঙলি— ভারি মিষ্ট লাগল— ইংরিজি গান গেয়ে জায় হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ মিশি গানে প্রাণ আতুল হয়ে গেল— বত বিন যাচ্ছে ততই আবিষ্কার করছি আমি ব্যাবিক আন্তরিক মিশি, বাবালী, ঘোরা, কুশো, লোকলে, জায়, অকুশা— এখনকার লোক অতি শ্রী আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাবে— আমি আমার জনমুত কোণে চিরকাল মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব।’ অনেক রাত হয়ে গেছে।

যে দুটো নাটক অভিনয় হয়ে গেল তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে Our Bitterest Foe— দ্বিতীয়টা Fast Friends। প্রথমটা ভালরকম দেখতে শুভে পাইনি— একজন দূর্বৃত্ত লেডিকে আমার চোঁকি ছেড়ে দিয়েছিলুম। প্রথমটা বেহাং অসম্ভবরকম Sentimental— বিশেষ কিছু নয়। দ্বিতীয়টা ভারি মজার— আর বেশ অভিনয় হয়েছিল। জবি-আঁকা Programmedলো বেশ করেছিল।

আর একজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল— সে Christianityর অনেক প্রশংসা করে বলছিল— আশ্চর্য দেখছি তোমাদের মধ্যে যদিও খ্রীষ্টানত্ব প্রচলিত নেই তবু তোমাদের নিরদেয় লোকেরাও এমন gentle এবং refined ! ইংরেজ ছোটলোকেরা আর Brute। তার থেকে আমি

Anglo-Indianদের কথা ভুলে আমার মনের সাথ মিটিয়ে কতকগুলো কথা বলে নিলুম। আমার ইচ্ছে আছে আমাদের টেবিলের সম্মুখীকে এসবকে একবার ভাল করে বলব— আগে তাকে মিস্ত্রি দিয়ে সম্পূর্ণ বশ করে আনা হাক্। কাপ তাকে এক প্যাফেট Butterscotch দিবেছি। আমি যে ভালরকম করে বেয়েদের সাহায্য করতে পারিনি— সে আমাকে অনেক অবসর দিয়েছিল।

শুক্রবার [১৭ অক্টোবর]। আজ সকালে আর একজন Anglo-Indianএর সঙ্গে কথা হল— তাকেও মনের সাপে অনেক কথা বলেছি। সে Northwestএর কোন এক অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট। সে অনেক ছুঃখ প্রকাশ করলে— সে বনে ভারতবর্ষীদের প্রতি লম্বাবহার করলে তারা ভারি বাধা হয়। আজ বিকেলে Maltaয় জাহাজ পৌঁছবে— নাও বনা মনে করছি। জাহাজে একলা বসে আরামে পড়ব। হাতে টাকা থাকলে এখান থেকে বাড়ির ভ্রম্ভে কিছু কিনে নিয়ে যেতুম। এখনো বসে পৌঁছতে দিন গননো বোলো লাগবে— একএক সময়ে মনের মধ্যে এমন হেলোমাছের মত অপর্যাপ্ত উপস্থিত হয়! আমার নিজেকে আলোচনা করলে আমার নিজের হাসি পায়।— আমার অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু আজ প্রায় সবও দিন আমার সঙ্গে আছে— আমাকে আজ পড়তে দিলেন। বিকেলের দিকে Malta দেখা দিলে— কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাযুক্তি সহর— দূর থেকে বেশে নাওতে ইচ্ছে করেনা। অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের এইখানে মেবে বাবার কথা। অনেক লোক এইখানে নাওবে। তাই ত্রিবিবশয় তোলা নিয়ে বিবন ইষ্টপোল বেধে গেছে। আমি মাটা দেখতে বাব না শুনে আমার অস্ট্রেলিয়ান বান্ধবী ভারি পীড়াপীড়ী করতে। আমার নববন্ধু Gibbsকে বলছিল— Do induce him to come on shore, then we shall meet again at the Grand Hotel— শেষকালে স্মারি হনু। Gibbsএ আনতে নিলে বেগোনো গেল। সমুদ্রের ধার থেকে জ্বরশ গথের মধ্যে দিয়ে পৌঁষ ঘাটের নত উঠেচে— সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সহরে উঠলুম। চারদিক থেকে Guideএর দল ছেঁকে ধরলে— Gibbs তাদের তাকিয়ে দিলে— একজন কিছুতেই লগ ছাড়লে না— সে বত আমাদের এটা ওটা দেখায়, লখ বাওলে সে Gibbs ততই বলতে থাকে Don't want your service— Won't pay you— সে বেশিকে ছেত বলে তার উল্টো দিকে যায়। কিন্তু তবু সে সঙ্গে লাভটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল— তারপরে বনর তাকে নিভান্ত তাকিয়ে দিলে তখন সে চলে গেল— আমার ভারি বাধা করছিল— কিন্তু আমার সঙ্গে পাউণ্ড ছাড়া কিছুই ছিলনা— Gibbs বলে আমি ওকে এক ফাফিংও দেবনা— কোন Englishman হলে প্রথমবার বয়েই চলে যেত। Gibbs বহা চোটে গেল আমার ভারি বাধা করতে লাগল— ইংরেজ বান্ধবীতে এবনি স্বাতীয় প্রভেদ। অথচ বুঝতে পারছি কেন সে চটে। আমি বেশি লোকটার আচরণ যেবনি হোক না কেন বজ্র পথীৰ এবং বড় আশা করে সঙ্গে সঙ্গে চলচে— Gibbs বদতে He must be very hard up to follow us thus but no Englishman would do it— তার আচরণ এত খারাপ লাগল যে তার দারিদ্র্য বেধে পয়া হলনা। বেশ বোকা যায় একজন ইংরেজ ভারতবর্ষে গিয়ে আমাদের ত্রিশ লোকের প্রতি ক্রমে ক্রমে কিংকম করে চটে যায়— বিলিটী নিরমাহসারে যেগুলো জটি সেইগুলো এত দিক থেকে এত চোখে পড়ে যে আমাদের ভাতিত যেগুলো বিশেষ গুণ সেগুলো তারা দেখতে পায়না— বিলিতি সোব দেখলে তারা এত আশাতি করতনা কিছু অপরিস্থিত সোব তাদের অসম্ভবোধ্য হয়।— সহরটা নতুন দকমের। পাথরে বাঁধানো লক রাস্তা—

একবার পাহাড়ের উপরে উঠে একবার নীচে নামচে— বিশ্রী গছ— গোলাবাল— কি একদকনের। একটা Roman Catholic Church-এর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলুম— প্রকাণ্ড ঘর— চারিদিকে খুঁট এবং সেটের নুড়ি— বেদীর সামনে বাতি জ্বলচে— একরকম গাঠীখারনক স্বত্কার— ঘর গম্গম্ করচে— বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বেয়ে পুতবে গুনগুন ঘরে তব পাঠ করচে। সবহুই ভূঁইয়ে মনকে যেন কি একরকম oppress করতে থাকে। এখানকার মেয়েদের শিরোভূষা অসুত রকমের— গাড়ির Hood-এর মত একরকম overhauling যোমটা।— খুব চেটে ছোট মেয়েদের বেশ বেগুতে— অলম্বল কালা চোখ— রেখে বেলিকে মনে পড়ছিল— কিন্তু একটিও ভাল বেগুতে বড় মেয়ে দেখলুম না। পথে যেতে যেতে Australian বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল— বয়ে Grand Hotel-এ এসে dinner করো তাহলে আর একবার দেখা হবে। একটা দোকানে গিয়ে পদার গম্বা এবং কপার brooch কেনা গেল। Gibbs-এর চিঠি Post করবার ছিল— তাই Post Office-এ যাওয়া গেল— একটি স্বল্পর বেগুতে ইংরেজ বেশে চিকিৎসা বিক্রি করচে— Gibbs তার সঙ্গে বানিককণ কথাবার্তা কইলে— বেরিয়ে এসে বলচে Isn't she awfully nice looking? Grand Hotel-এ এসে তার মনে পড়ল একটা পার্শেল পোষ্ট করবার আছে— মনে পড়তেই ছুঁবে বলে নাচ আরম্ভ করে দিলে (আমরা তখন নামার ঘরে) So I am going to have another chance of seeing her. কিন্তু বেচারার অর্ধে সে chance ছুটলনা— ফিরে গিয়ে দেখা গেল Post Office বন্ধ। Hotel-এ গিয়ে দেখি আমাদের জাহাজের বিস্কুন্ লোক সেখানে জুটেচে— জাহাজের তিনার টেবিলের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু অতি যাজ্জেতাই খেতে গিলে— বন্ গছ, বন্ জিনিষ, মল্ল পরিবাণ, বেশি দাম— আমি ত আর্দেক জিনিষ মুখে দিয়ে কেনে দিলুম। বন্ধুদের কাছে বিবাহ নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। Government House-এর সামনে একটা বড় বাধানো Square আছে— সেইখানে সঙ্কে সময় লোক লগায় হয়, Band বাজে। সেইখানে আমরা জুইলুম। পরিভার রাহি, কিছুবার ষ্টত নই— স্বল্পর Band বাজচে— বেশ লাগছিল— চারদিকে বাগান থাকত ত আরো ভাল হত— এ কেবল একটা প্রকাণ্ড বাধানো প্রাঙ্গণের মত— একদিকে Government House— একদিকে Grand Hotel— একদিকে রক্ষকশালা, আর একদিকে কি মনে পড়চে না। রাত বখন বশটা বাজে তখন জাহাজ অভিমুখে কেরা গেল— দুই এক জাহাণয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে— দুই এক জাহাণয় উঁহু রাত্তা দিয়ে উঠে, নীচু রাত্তা দিয়ে নেমে সমুদ্র তীরে পৌঁছে নৌকা নিয়ে জাহাজে বাওয়া গেল। পথের মধ্যে একবল পথপ্রদর্শক আমাদের টানাটানি লাগিয়ে দিয়েছিল— Gibbs ছন্দ সৈন্ড ভেঁকে তাদের ডাকিয়ে দিলে— এবং সৈন্ড ছন্দ আমাদের বরাবর পথ বেধিয়ে নিয়ে গেল। নৌকাওয়ালার বয়ে ১৮ পেনির করে যাবনা— Gibbs নাছোড়বান্দা— P & O Office-এ গিয়ে মিচ্চালা করলে কত ভাড়া তারা বলে যদি P & O Passenger হও তাহলে ৪ পেনি দিতে হবে— বলে সে নিজে এসে আমাদের নৌকায় জুন্ দিলে। Gibbs ভারি রাগান্বিত যে বিদেশী বেবে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা। কাছেই আমাদের গল্প করতে হল একজন লওন-গাড়িওয়ালার কি করে আমাদের কাছে পাঁচ শিলিং-এর জাহাণয় আঠারো শিলিং নিয়েছিল। সে সফল সে কোন উত্তর করলে না। বোধ হয় বা বিশ্বাস করেনি।

শনিবার [১৮ অক্টোবর]। আজ সমস্ত সকাল Gibbs-এর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। সে একজন

Bank-এর কর্মচারী। সে বলছিল তুমি কখন করতে পারনা young clerk'ya কি অর্থ কথাবার্তা এবং গল্প করে! বলে ইংলণ্ডে smutty talk সর্বত্র প্রচলিত। এমন কি, মেয়েদের মধ্যেও। সে যা বলে শুনে অবাক হয়ে গেলুম। সে বলে sober এবং decent fellowদের বিষয় মুখিল—সর্বসা। এমন দলে মিশে থাকতে হয় যে সে অতি ভয়ানক। সে বলে আমরা নিত্যই hypocrite ছাড়া—বাইরে ভাষি respectable—ফরাসি নভেলের নিম্নে করে থাকি—কিন্তু সর্বসা। ঘেরকম কথাবার্তা এবং আমোদপ্রমোদ চলে সে আর বলবার বিষয় নহে। আমি বেশ বুকতে শাহসুখ আমাদের গির্না বরাবর বিলেতে হার তারা কোথা থেকে বন্ কথা এবং অল্প গল্প শিখে আসে। আমাদের lunchএর পরে মেছোরা উঠে গেলে টেবিলে Bayleyর সঙ্গে Gibbs-এর লগনের City-অফিসে কি রকম কাণ্ড চলে তাই গল্প চলছিল। Bayley বলছিল I am sorry to say আমার young days-এ আমিও অনেক কাণ্ড করেছি। ইত্যাদি। Gibbs লোকটাকে বেড়ে লাগুচে—নগ বাদনা, Gamblingএ যোগ দেবো—মেয়েদের সঙ্গে সর্বসা। রহস্তালাপ করেনা, অথচ কড়া ধার্মিকতা বা গোঁড়া জিজ্ঞাসা কিছুমাত্র নেই। বেশ সচরাচর ভ্রমশ্রোকেবর স্বভাবত যেমন হওয়া উচিত সেই রকম। তার একটা আচরণ আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল—কাল Post Office-এর সেই মেয়ের সঙ্গে কেমন বেশ সহজ ভাবে কথাবার্তা কইলে—লোকেরা যেমন দোকানদার হুন্দরীদের সঙ্গে ইয়ারকি দেবার চেষ্টা করে Gibbs-এর আচরণে তার লেশমাত্র ছিলনা। সৌন্দর্যের প্রতি এইরকম দৃষ্টিমান আমনের ভাব আমার ভাষি ভাল লেগেছিল—এ লোকটার সঙ্গে আমার ঠিক মনের মিল হয়েছে। এর সঙ্গে সমস্তকণ গল্প করতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। Conolly বোধ হয় ভারতবর্ষে গিয়ে দেখতে দেখতে বদলে যাবে—এই মধ্যে সে একটা দলের মধ্যে পড়ে কেবল তাস খেলতে চুরোটা থাকে, Gamble করচে—একটা আবার্তের মধ্যে ঘুরচে। Gibbs বলছিল সকলে বিলে Conollyর মাথা থাকে।

আমি ডিনার টেবিলে Smuggling-এর গল্প হচ্ছিল—কে কখন কি কৌশলে কত Smuggle করেছিল তাই নিয়ে ভাব করছিল—Mrs Smallwood একবার ইংলণ্ডের Custom houseকে ভাষি দিয়েছিল শুনে Bayley বলছিল Don't you think that was wrong? Mrs Smallwood বলে No I am proud of it। এরকম জুয়াচুরিতে এদের conscience কিবা দস্তাঙ্গিবতায় আঘাত লাগেনা। এরা বুকতে পারেনা এক এক জাতের এক এক বিষয়ে নীতিজ্ঞানের অভূত। থাকে—কৌশলে মিথ্যাচরণপূর্বক Smuggle করা সম্বন্ধে ইংরেজদের এখনো ধর্মবুদ্ধির উত্তরক হয়নি—কিন্তু তার থেকে কেউ বদী মনে করে তবে ইংরেজরা মিথ্যাচারী এবং জোচ্ছোর তাহলেই ভুল করা হয়—আমাদের জাতের সোবগণ সম্বন্ধে যখন ইংরেজরা generalize করে তখন এইটে তারা ভুলে যায়।

Miss Hedistedকে আর সেদিনকার পাখাওয়ালা সম্বন্ধে বলেছি—সে বলে ভারতবর্ষে অনেক cads ঘাঘরা এইরকম করে—ভাষি অস্তায়—ইত্যাদি। বাহোব্ব বলে মন খোলাসা হল।—Miss Long যখন কথা কয়, হালে এমন চমৎকার দেখতে হয়—আমার দেখতে ভাষি ভাল লাগে—যেমন স্বন্দর দেখতে, তেমন intellectual মুখের ভাব।

রবিবার [১২ অক্টোবর]। আমরা ভোরে Brindisite গৌহন গেল। মূলপথে দুই পড়চে। একমল গাইয়ে বাড়িরে হার্প বেয়ালা মায়েগোলিন নিয়ে ছাতা মাথা জাহাজের সামনে বাড়িরে বাজাজে এবং একটা ছোট ছেলে গান পাড়ে— বেশ লাগচে। ইটির ভক্তে মাঝে পারলুম না। আমার ডেক চৌকি পিরানো অগিনে পড়ে আছে। আমর বিকেলে বোথ হয় চিঠি পাওয়া যাবে।— দুই খেমে গেছে। Gibbs আমাকে টানটানি করে জাহাজ নিয়ে গেল। রাস্তায় বেতে বেতে এক জাহাজ দেখলুম— একটা উচু রুমির উপর কতকগুলো ডাকা পাখরের সিঁড়ি উঠে— উপরে উঠে একটা পুরোণো গির্জা পাওয়া গেল। ভিতরে গিয়ে দেখলুম নানারকম টুকটাকি বিশেষ সামান্য— খুব গরীব রকমের ব্যাপার। বেরী এক জাহাজ থেকে একটা পর্দা উঠিয়ে দেখালে ক্রাইস্টের নোবের প্রতিমূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে— সর্বদা কতবিকৃত, রক্ত করে পড়চে— অতি ভয়ানক— এমনভর realistic কাণ্ড কখনো বেশিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে একটা উচু রাস্তা ধরে সহরের বাইরে গিয়ে পড়লুম— দুইপাশে Cactus বেড়া বেড়া শক্তকেশ এবং ফলের বাগান।— একটা ফলের বাগানে চুকে পড়া গেল। আঙুরের লতাকুড়ে খোশো খোশো আঙুর ফলে রয়েছে। একরকম গোলাপী আঙুর চমৎকার দেখতে— একরকম সবুজ সবুজ আঙুর— ইতিপূর্বে কখনো বেশিনি। আকাশ দেখাচ্ছে, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে— কেবল দুই ধারে নালার মাঝে মাঝে জল ঝড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার ধারে Fig গাছে দুটো ছোকরা কিং পেড়ে পেড়ে বাজিল— আমাদের চোঁড়িরে ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে আমরা Fig খাব কিনা— আমরা বহু না— বানিক বাবে বেশি, তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিচ্চাখা নিয়ে এসে হাতির— জিজ্ঞাসা করলে অলিচ্চা খাবে— আমরা বহু না। তার পরে ইসারায় জানিয়ে দিলে যে, পানিকটা ডানাক পেলে তারা বড় খুঁসি হয়— Gibbs তাদের বানিকটা তামাক দিলে। তার পরে বরাবর তারা আমাদের সঙ্গে চলল— প্রবল অশ্রুচকী দ্বারা উভয়পক্ষ মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগল। জনশ্রুতি রাস্তা পাহাড়ে’ জমির ও ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলচে— কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোট ছোট বাড়ি— এবং এক এক জাহাজ মাথাপথ নীচের দিকে নেবে বক্র গতিতে অদূর হয়ে গেছে। কেবল দুই একট পোরশনে চুকলুম। এসে পোর নতুন রকমের— গোয়ের উপরে এক একটা ঘরের মত— পর্দা দিয়ে রঙিন ভিনিষ দিয়ে নানারকম সামান্য— একটা বেরী উপরে অনেকগুলো সামান্যের উপর বাতি লাগানো রয়েছে এবং সাধুদের অথবা কুমারীর প্রতিমূর্তি। কোন কোন ঘরে মৃতবাস্তির প্রতিমূর্তি আছে। বোথ হয় আত্মীয়েরা এসে নানারকম করে সাজিয়ে শুকিয়ে রাখে। এক জাহাজ সিঁড়ি দিয়ে নেবে মাটির নীচকার একটা ঘরে গিয়ে দেখলুম, সুপাকারে অসংখ্য মড়ার মাথা সামান্য রয়েছে— বোথ হয় পুরোণো গোর থেকে তুলে ঐ রকম করে রেখে দিচ্ছে— কত বংশের কত সুখ-দুঃখের এই একমাত্র অবশেষ। ঐ বাক্যহীন, মুক্তিহীন, চিন্তাহীন নিশ্চল জীবন সুপের মধ্যে হতত এমন অনেক মাথা আছে জীবিত অবস্থায় দার স্পর্শাভ করলে অনেক হতভাগ্য কৃতার্থ হয়ে বেত— দৈবাৎ হতত তাদের দুটো মাথা পরস্পর পাপাপাশি স্থাপিত হয়েছে— এমন কি ঐ অন্ধকার নেত্রকোটর দিয়ে তারা পরস্পরকে চিন্তে পারচে— হাঃ, যে স্পর্শরূপ এক কালে এক দুঃখের ভক্তে বহুমূল্যবান ছিল এখন তা চিরদিনের ভক্তে নিফল। উঃ— ঐ মাথাগুলোর ভিতরে কত চিন্তা কত শ্রুতি গতি

ছিল, কত দুরাশা ওর মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করেছিল—ওদের মধ্যে থেকে যে সকল চোঁতা যে সকল কার্য উদ্ভূত হয়েছিল তারা এখনো এই পৃথিবীর কত দিকে কত আকারে প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের চিরপ্রাণিত বিচিত্রগতি কেউ বন্ধ করে দিতে পারেনা—কেবল ওহাই চিররাগ্রিমিরের মত নিম্নল নিম্নেটে নির্জীব, সৌন্দর্যলেশবিহীন। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম মহত্ত্বলোকের উপরে যেন একটা চিত্রিত পর্দা কেলে রেখেচে—আন্তে আন্তে পর্দা তুলে দেখ, ভিতরে লাগাবিহীন অস্থি কঙ্কাল, জ্যোতিঃহীন চম্বকোটর, এবং বৃষ্টিবিহীন কপালফলক। হঠাৎ যদি কোন নিষ্ঠুর শক্তি নব-সংসার থেকে এই যবনিকা উঠিয়ে কেলে—তাহলে সহসা দেখা যায় সমস্ত পৃথিবী ছুড়ে এই চূষন-মধুর আবৃত্ত অধর পন্নবের অস্ত্রশাশে ভষ্ম খেত দন্তপংক্তি কি বিকট বিরূপের হস্ত করতে! পুরোণো বিষম, পুরোণো কথা—ঐ নরকপালে অবলম্বন করে অনেক নীতিজ্ঞ পণ্ডিত অনেক বিত্তবিকা প্রচার করেচে—কিন্তু আমি যখন ঠিকিঙে দেখলুম এবং ভাল করে ভাবলুম, আম আমার এই যে মাথা ভাঙে এবং ভালবাস্তে কিছুদিন পরে সংসারের ঐ চিরবিস্তৃত অসীম স্পৃগের মত ভুঁক হতে পারে, তখন মনের মধ্যে একরকম বিধর বৈরাগ্য উদয় হল বটে কিন্তু কিছুমাত্র ভয় হল না—ভাবলুম আর হাই হোক ঐ সহস্র সহস্র মাথা অনিশ্চয় হুঁকিষ্টা হুঁকিষ্টা দুরাশা থেকে চিরদিনের মত আরোগ্য লাভ করেছে।—তার সঙ্গে এও ভাবলুম Rowlandএর ন্যাকাসার অফে পৃথিবীতে প্রতিদিন শিশি ভরে ভরে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু কোনকালে এদের তার এক চোঁটা আবৃত্তক হবে না—এবং দন্তমার্কিনওয়ালারা হুইই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করুক না কেন এই অসংখ্য অসংখ্য দন্তলোষ্ট্র তার কোন খোঁজ দেবেনা।—শেষোক্ত চিন্তাতা প্রসঙ্গের উপযোগী গভীর নয়—কিন্তু আমাদের চিন্তারাজ্যে জাতিভেদ এবং পৃথক আসনের প্রথা নেই—আমরা লেখবার সময়ে অনেক বিচার করে নির্মাচন করে লিখি কিন্তু ভাববার সময় হববল করে ভাবি। অথ্যা পরনাম্মা সম্বন্ধে তর্ক করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে অনেককণ তামাক খাওয়া হয়নি—এবং যখন পিঠের ঠিক মাঝখানটা চুমুকোচ্ছে এবং কিছুতেই নাগাল পাচ্চিনে তখন প্রেরণীর ভুবনমোহিনী মূর্তি মনে উল্লস ওয়া কিছুই আকর্ষণ নয়।

হাই হোকগে আপাততঃ আমার এই মাথার খুলিটার মধ্যে চিঠির প্রত্যাদা বিজবির করচে—যদি পাওয়া যায় তাহলে এই খুলির মধ্যে খুব খানিকটা খুলির উদয় হবে যদি না পাওয়া যায় তা হলে ঐ অস্থিগহ্বরের মধ্যে আমকের মনের মত দুঃখ নামক ভাবের লকার হবে—ঠিক মনে হবে আমি ভাবি কষ্ট পাচ্ছি। এই মাথাটায় পক্ষে গোটাঁকতক কথা-অবিত্ত গদ্যভেগের কি এমন গুরুতর আবৃত্তক কিছু বোঝবার যো নেই—আম চিঠি না পাওয়ার দরুণ সেনিনকার মহানিশ্চায় কি কিছু ব্যাখ্যাত ঘটবে? সেনিন ইচ্ছা নিরপেক্ষ যে চিরবিজ্ঞান জুইবে আম তার ছায়ামাত্র পেলে বেঁচে যাই। “যরণ হলে খুঁদে বাঁচি” কথাটার মধ্যে মানবজীবনের অনেক বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। এই Fever of Lifeএ দীর্ঘ রাগ্রিমির কেবল এগাল ওগাল করা যাকে—যুম আর আসে না—

রাগ্রি যাড়ে দলটা পর্য্যন্ত চিঠির দ্বন্দ্ব অগ্ণেকা করে অনন্তে পারদূর চিঠি পাওয়া যাবে না—চিঠি আমার পিছনেই কলকাতায় যাত্রা করবে। দুই হোকগে—অন্ত বাওয়া যাক।—যুম আসচে এমন সময় লোকেন আর সন্নির চিঠি পেলুম। টকি লেগে সন্নির চিঠির অর্ধেক পড়া গেল না—লোকেন লিখেচে ছোট বৌয়ের চিঠি পাঠিয়েছে কিন্তু পেলুমনা।

সোমবার [২০ অক্টোবর]। সমস্ত দিন seasick— অসহ্য গরখ। কিছু খাই নি।

মঙ্গল [২১ অক্টোবর]। উঠে একটু breakfast করেছি— আত্ন ভাল বোধ হচ্ছে। আমি আমার কোণে চুপ করে বসে থাকি— Miss Long হস্তবার আবার লুপ্ত নিয়ে চলে যায়, আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে যায়, আমিও হাসি; মনে হয় এর পরে উঠে গিয়ে তার সঙ্গে একটু আলাপ না করা rude হয়ে পড়তে কিস্ত কিছুতে হয়ে এঠেনা। আর সন্দের সময় পাশে দাঁড়িয়ে দু’একটা কথা বলুন— বলুন It was unkind of you Miss Long to look so aggressively well yesterday while we were all so miserable. Miss Long বলে I was awfully sorry for you [] you looked so bad. তার পরে অনেক গল্প হল। আর সন্দের সময় আবার একচোঁট নৃত্য হয়ে গেল। Miss Vivian এর সঙ্গে আমি গল্প করছিলাম— সে বলছিল It always seemed to me something weird, this dancing on board a steamer. আমি বললাম Yes, it is so out of harmony with the surroundings, with the beautiful peaceful moonlight night yonder ইত্যাদি। Miss Vivian বেশ প্রশস্ত মৃদুভাব মেয়ে— বেশ মেয়েলি স্বকন্দের পড়াভরো ভালবাসে— আমার সঙ্গে কবিতা নিয়ে অনেক কথা হল। সে ছুই একজন কবিরেজেকে জানে— It is a great gift— but poets are not a happy lot. আমি বললাম To be sure they are not. সে জানেনা আমি সেই হস্তভাগ্য gifted বলের একজন। Mrs Goodchild আমাকে বলছিল I have heard you have got a very clever sister. বোধ হয় বার্ষিক মনে করে বলছিল। Gibbs নাচতে ভালবাসেন— যদিও তার বয়স ২১ বাত— সেইজন্যে তাকে আমার আরো ভাল লাগে। আর বেশ জ্যোৎস্না রাত্তির হচ্ছেতে।

বুধ [২২ অক্টোবর]। কমেই গরম বাড়তে। আত্ন লোকেনকে চিঠি লিখলাম। নাথ একবার Miss Long এসে তার Birthday Book এ আমার নাম লিখিয়ে নিয়ে গেল। একজন লেডির প্রতি একজন লুবক দেরকম ব্যবহার করে Gibbs আমার প্রতি অনেকটা সেইরকম ব্যবহার করে। আমার দ্বারা মল ঢেলে দেয় ভিনার টেবিলে আমাকে নানাবিধ পানীয় ধোঁগায়— ছোট-পাটো নানা বিষয়ে আমার সাহায্য করে— অনেক সময়ে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। বোধ হয় আমার মধ্যে সে একরকম অকর্ণ্য অসহায় মৃদুভাব দেখতে পায় যাতে করে তার স্বাভাবিক পৌরবিক ঝেঁ উঠতে করে।

Mrs Fraser আমাকে Tea Partyতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি Browning পড়ছিলাম সেখান থেকে ভাঙ্গি আকর্ষণ হয়ে গিয়েছিল।

শিডি নিয়ে শুক্রবার সময় একজন বৃদ্ধ লোক এনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে Are you not one of the Tagores— আমি বললাম হী— সে বলে তোমার sisterকে কোন্ এক পার্টিতে বেরিয়েছিল— তোমার মুখ দেখেই তার সঙ্গে লাদুস্ত চের পেয়েছিলুম— My name is Schiller। ইত্যাদি—

সমুদ্রে চন্দ্রোদয় দেখলে মনের মধ্যে এমন একটা বৈরাগ্য, এমন একটা উদ্যাত এনে দেয়! এই অসীম সমুদ্র এই অনন্ত রাত্তির একধারে একটুখানি আলো একটুখানি বিকিমিকি। মনে হয় আমাদের জীবন এইরকমের— অসীম সংসারের মধ্যে একটুখানি বিষন্ন নিশাহারা আলোকরেখা— বাচবে কি মরবে কিছু ঠিকানা নেই। ঐ সমুদ্রের পরপারে আছে আছে নিবে যাবে— অসীম জলরাশি গভীর স্তূভার

গান গাবে— তার শব্দে আবার জীবার রাগি। মনে হয় আমাদের জীবন প্রকৃতির আভ্যন্তরিক কোন এক শক্তির কবিক চেষ্টা, কবিক উত্থান ;— থেকে থেকে অবিদ্রাঘ বাধা ভূশে উঠে, কিন্তু চারদিক থেকে অসীম তড় এবং অসীম মৃত্যু এসে তাকে আচ্ছন্ন করে নির্বাপিত করে দিচ্ছে। বহু চেষ্টাও প্রকৃতি যেমনি আপন অচিনিহিত প্রতিভাকে পুশ, আকারে বিকশিত করে তুলতে অন্নি সেখানে সেখানে মাটি তাকে টেনে ছাটি করে দিচ্ছে। ইতস্তত বিক্লিষ্ট বিন্দু বিন্দু জীবনের তুলনায় এই চিরস্থায়ী চির নীরব মৃত্যু এই সর্বব্যাপী মৃত্যুর অবিদ্রাঘ অলকা নাথাকরণ কি প্রবল ! যেমনি জীবন শ্রাব হয়ে আসে যেমনি চেষ্টা একটু শিথিল হ'য়ে আসে, অন্নি করে যেতে হয় পড়ে যেতে হয়, অন্নি হয় করে ভেসে কোথায় দিলিয়ে যেতে হয় অনন্ত ইহলগতে তার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এইরকম করে মহারাক্ষস মৃত্যু জীবন গ্রাস করে করে চিরদিন বেঁচে রয়েছে। মিছে কেন তর্ক বিতর্ক নতানত সম্বন্ধ বিচার ! এই কবিক সৃষ্ট্যালোকে আমাদের হৃৎকের হাসিগল্প মেলাবেনা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টি এবং প্রেমপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা— চন্দ্রোদয়, মূল কোটা বসন্তের ব্যাভাস, দুদিনের বোহ সন্ধান করে নেওয়া থাক— ধ্বনিকার অন্তরালে মৃত্যু প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কোন্ অশঙ্কব স্বপ্ন কোন্ দুর্লভ ভালবাসার জন্তে চিরদিন নির্বোধের মত অপেক্ষা করে বসে আছে— আমাদের কি অপেক্ষা করবার সময় আছে ! যা হাতের কাছে আসে তাই নিয়ে প্রশ্ন চিন্তে কাটিয়ে দেওয়া থাক— তাকাতাড়ি করে জীবনকে খালাস সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। তুমি বৈবরুনে আমার কাছে এসে পড়েছ— এগ— তুমি আমার ভালবাসা চাওনা— নাও— আপন পথে নাও— জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই— বিলাপ করবার অবসর নেই— স্বপ্ন দুখ হিসাব করবার আবশ্যক নেই ;— যা পাবনা প্রশ্ন চিন্তে তার মঙ্গল কামনা করে তার কাছে থেকে বিদায় নেওয়া থাক।

জাহাঙ্গীর বেগম ধরে সমুদ্রের নিকে চেয়ে এইরকম করে আপনার জীবন সমালোচনা করছিলেন— এমন সময় একজন এসে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সত্যোজ্ঞনাথ ঠাকুরের কেউ হও কি ? আমি বহু বিপদে কেউ নয় তার ভাইমাত্র। এও সিভিলিয়ান। ৮৬ সালে তার হয়ে সোলাপুরে একটু ছিল— বাবিকে জানে। Brandকে জানে— বেশ শিয়ানো বাজাতে পারে— ভারি সুখী। Mrs Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে— সে আমার সঙ্গে শিয়ানো বাজালে। Mrs Moeller বলে It is a treat to hear you sing ! Webb এসে বলে What would we do without you Tagore— there's nobody on board who sings so well। বাহোক্ জাহাঙ্গীর এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো গাইতুম কোনটাই Tenor Pitch-এ ছিল না— তাই আমার গলা খুলত না— এবারে সবত উচ্চ Pitch-এর music কিনেছি— তাই এক প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে।

কাল Miss Longকে জিজ্ঞাসা করছিলেন— এই কি তোমার প্রথম ভারতযাত্রা ? সে একটু হেসে আমার নিকে চেয়ে খুব জোর দিয়ে বলে Do you know Mr Tagore I am a born Anglo-Indian ! আমি কিনা অনেক লোকের কাছে অনেকবার Anglo-Indianদের সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করেছি বোধ হয় শুনেচে। Miss Long পুনরাবৃত্তি করে।

রাত দুটোর সময় জাহাঙ্গীর পোর্ট সৈকতে পৌঁছল, Gibbs আমাকে নাব্বার জন্তে অনেক ঈর্ষাভীড়া করলে আমি নাবলুম না। আমার ক্যাবিনের অস্ত্র দুখন নেবেছিল।

বৃহস্পতিবার [২০ অক্টোবর]। এখন অরুণ পালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমাদের ব্যাক্সর আগে এগারো দিন ব্যক্তি আছে। এগারোটা দিন আসলে কত অল্প কিন্তু কি অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

চতুর্থবার লাগচে— উজ্জল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলোতে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দুরোপমের ভাব একেবারে ধূম হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দহিত ভারতবর্ষ— আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী অপরিচিত বিস্তৃত নিকৃত ছায়ায়িত্ত নদী-কলধনিনিহন্ত বাঘলা দেশ— আমার সেই অকর্ণনা গৃহপ্রিয় বালাকাল, আমার ভালবাসা-লালায়িত্ত কল্পনা-স্রিষ্ট যৌবন, আমার নিকটে নিকটম চিত্তাঙ্গল সন্তি-ব্যথিত জীবনের স্মৃতি, এই স্মৃতিক্রমে এই তপ্তবায়ু হিম্মলে হৃদয় মরীচিকার মত আমার স্বপ্নভারনত সৃষ্টির সামনে বেগে উঠে। আমি প্রাচ্য, আমি আদিবাসী, আমি বাঘলার সন্তান, আমার কাছে দুরোপম সত্যতা সমস্ত বিখ্যে— আমাকে একটি নদীতীর, একটি সিংস্ববেষ্টিত কনক পৃথগ্ন রঙিত শত্ৰুক্ষেত্র, একটুখানি বিঘ্ননতা, খ্যাতি প্রতিপত্তিহীন প্রচণ্ড ডেটাবিহীন নির্বাহী জীবন, এবং বর্ষাধ নিৰ্জনভাগ্রিষ্য একাগ্রণতীর ভালবাসাপূর্ণ একটি জন্ম দাও— আমি রূপবিখ্যাত সত্যতার গোঁড়, উদাম জীবনের উদ্ভার আবেগ, এবং অপরাধ যৌবনের প্রবল উত্তেজনা চাইনে।

Schiller একরকম স্বর্গীয় সঙ্গীতী আমাকে বলছিল তুমি যদি তোমার গলায় রীতিমত চর্কা কর তা হলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে। You have a mine of wealth in your voice. প্রথমবারে যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন যদি এই কাম করতুম তাহলে বন্দ্য হতনা। আর কিছু নাহোক নিম্নলিখিত লোকের দৃষ্টি উপার্জনের পথ থাকত।

তবে বসে থাকিও Alphonse Daudet পড়ছিলাম— নাকে একবার উঠে দেখলাম— ছায়ে ধূসরবর্ণ বালুকাসূপ— অলসে ধারে ধারে একটু একটু বনঝড়ি এবং অর্ধচন্দ্র তৃণ উঠেচে— আমাদের হৃদয়ে সেই বালুকাসূপের মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোকাই করে নিয়ে চলেচে— প্রথম সূর্যালোক এবং ধূসর বনভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগড়ি ছবির মত দেখাচ্ছে। কেউবা বালুকাগল্লরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুবে আছে— কেউবা নম্র পড়চে— কেউবা নাসারজু ধরে অনিশ্চয় উটকে চানচানি করচে। সমস্তটা মিলে ধর-রৌদ্র আরব বনভূমির একটুখানি ছবির মত মনে হল।

আমার ঘরে একবার তলায় আটকে গিয়েছিল। অনেক হাসান করে ঠেলে বের করেচে।

শুক্রবার [২১ অক্টোবর]। Mrs Smallwoodকে আমাদের ডিনার টেবিলে বসে অনেক সময় ভাবি— যে সব মেয়ের বয়স হয়েছে— ঘরের গৌরবের দিন চলে গেছে তাদের ঘরের অবস্থা কি রকম? এই Smallwood খুব প্রথম যে— এককালে বোধ হয় অনেকের উপর অনেক পরভার পরচালনা করেছে— অনেক পুঙ্খ এর ক্রমাল কুড়িয়ে নিয়েচে, নষ্টকথা বলেচে, নেচেছে, বিবিধ উপায়ে সেবা এবং পূজা করেছে— এখন আর কেউ গল্প করবার ক্ষমতা ছুতো অধেষণ করেনা, নাচের সময় আহ্বান করেনা, আহ্বারের সময় পরিবেশন করেনা— যদিও সে নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরভ্রাত বিড়াল-শাবকের মত ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, এবং তার প্রথমতাও বড় সামান্য নয়। অবিভিন্ন বয়স অল্পে অল্পে এগোয়, এবং অনাধর ক্রমে ক্রমে সব আসে। কিন্তু তবু যে সব মেয়ে চিত্তজগৎসাহায্যে মত্ত হয়ে শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি, পৃথক্য অবস্থায় রয়েছে, তেলেদের দ্বন্দ্বীর হাতে নবর্ণ করে রাত্রির পর রাত্রি নৃত্যরূপে

কটিঘেচে, উগ্র ইষ্টেঘনায় মত্ত হয়ে জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীভূতকণ্ড হয়েছে, তবুও বহুত অবস্থা কি শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই উগ্র আনন্দে মগ্নিয়ার আশ্রয় ভাবেনা— তারা অল্পে অল্পে শ্রী থেকে যা এবং যা থেকে সিন্দা হতে আসে, পূর্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই।— একদিকে Mrs Smallwoodকে এবং অল্পদিকে Miss Low এবং Miss Hedistedকে দেখি— কি তরুণ! তারা অবিজ্ঞান পুরুষসমন্বিত কি খেলাই খেলাচ্ছে— আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন সুখ নেই— সচেতন পুস্তিকা— মন নেই আত্মা নেই— কেবল চোখেমুখে হাসি এবং কথা এবং ভীত উত্তর প্রত্যুত্তর। একই দিন সন্ধ্যাবেলা যখন সনত্ত পুরুষ আপনং চুরোট এবং তাস নিয়ে বজ্রাতি সমাজে মটলা করে— তখন Miss Hedisted কি স্নান বেকার ভাবে একপাশে গাড়িয়ে থাকে, মনে হয় যেন আপন সখসীন অবস্থায় আপনি পরম লজ্জিত। একএকদিন সেইরকম অবস্থায় আমি গিয়ে তাকে কথকিত প্রহর করে তুলি। সেদিন নাচের সময় Miss Vivianএর সঙ্গে কথা হচ্ছিল— সে বলছিল তোমরা পুরুষ Ball Roomএর একপাশে গাড়িয়ে থাকলে কিছু মনে হলনা— কিন্তু মেয়েদের Wall Flower হয়ে থাকা দুঃখের একশেষ— তারি লজ্জা এবং নৈরাশ্র উল্লয় হয়।— এই সব দেখে আমার মনে হয় আমাদের পুরুষদের জীবনে যা কিছু সুখ আছে তার স্বাদহীন এবং গভীরতর মেয়েদের চেয়ে বেশি। অবিজ্ঞিত দুঃখ এবং নিমলতাও বেশি। পুরুষদের মধ্যে যারা জীবনের সার্থকতা লাভ করেছে বয়োবৃদ্ধিক তারা ডরায় না বরং অনেকসময়ে প্রার্থনা করে। তাদের আপনায় মধ্যে আপনায় অনেক নির্ভরস্থল আছে। তাই মস্ত পুরুষের স্বভাবত হুঁড়ে।— বেশেছি এত পুরুষ আছে কিন্তু মেয়েরা নাচবার সখী পায় না। বাজনা বাজতে, স্থলজ্জিত উল্লাসিতবৎ মেয়েরা উৎসুকভাবে ইতস্তত নিরীকণ করচে— আর পুরুষের দল বেঁধে জাহাজের কাঠরা খরে অলসভাবে চুরট খাচ্ছে এবং চেয়ে আছে। Gibbsকে বহন তোনার নাচা উচিত— সে বলে My dear fellow, my dancing days are over— তার বয়স ২১। শেষকালে Miss Long চটেমটে বলে Oh, men are so lazy। বলে রাগ করে মূণ তার করে বেকিতে বসে রইল। আত্মকাল তাই নাচ বন্ধ আছে।

Browning পঙ্কতঃ The Englishman in Italy বলে কবিতার (১৫১ পৃ) দেখুন—

Oh these mountains, their infinite
movement! still moving with you ;
For ever some new head and breast of
them thrusts into view
To observe the intruder :—

আমার কবিতায় পর্বত সযত্নে ছোটো লাইন আছে তার সঙ্গে এর অনেকটা মিলচে—

“স্বির তারা নিশিদিন, তবু যেন চলে,
চলা যেন বাধা আছে অচল শিকলে।”

আমার এ ছোটো ছত্র অনেকে বুঝতে পারেনা।

শনি [২৫ অক্টোবর]। অনেকদিন থেকে গুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে গাড়িয়ে তার বিজ্ঞানবেগ এবং প্রচণ্ড শক্তি অল্পতব করবার ইচ্ছে ছিল। আমি চিরকাল কেবল বস্ত্র দেখে এবং কথা করে এসেছি,

এইজন্তে বর্ধার্য কার্যের নিকট আমার ভারি আকর্ষণ আছে। শোনা যায় একজন বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি বলেছিল, যুদ্ধে সফলতার চেয়ে যদি Grey's Elegy আমি লিখতে পারতুম তাহলে জীবন অধিক কৃতার্য মনে করতুম। এর থেকে প্রমাণ হয় প্রত্যেক মানুষেরই জীবন অসম্পূর্ণ— যে চিন্তা করে কার্যসম্পাদিত আঁপ দেবার ভগ্নে তার মনের আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, এবং যে কাজ করে চিন্তার শিবরে উঠে বচির্গগুং এবং অস্বপ্নগতের অসীমত্ব অহুত্ব করবার ভগ্নে তার গোপন ব্যাকুলতা থাকে। এইজন্তে যুগেপে যেমন অপূর্ণ আদর এমন আর কোথাও নেই। সেই নিছনের বশে আকৃষ্ট হয়ে ছুই একটি শব্দী আশ্রয় করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম— কিন্তু এই কাজের কোলাহল এবং আমোদের মস্ততার মধ্যে কি আমি ভিত্তিতে পারি? সমুদ্রের তরঙ্গ বেসতে বেস এবং তার কলধনি তন্ততে ভাল লাগে— কিন্তু যে সাতার চানেকা ডীয়ে বসে উগড়োগ করাই তার পক্ষে অসুস্থির কাজ। বেখলুম কিছুদূর অবনেকেই কাঁপ সিতে এবং মরা আনন্দে চীংকার করতে, তাই দেখে আমিও তাড়াতাড়ি কাঁপ দিয়েছিলুম— পানিকটা নাকনি-চোদনি এবং সোনা জল খেয়ে উঠে এসেছি। এখন কিছুদিন ডাকার উপরে সর্বদা বিস্তারপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করে যোগ পোহাব মনে করছি।

ডাক্তার তরী সকালাবেলা, ডাবিলান এ চলবেলা,

মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।

কিন্তু seasickness-এর কথা কে মনে করেছিল! আমার এই সত্যতার তরঙ্গের মধ্যে সেই seasickness-এর উদয় হয়েছিল। আমার এই চিরবিশ্রামশীল অন্তরাষ্ট্রা যে একটুতেই এত নাড়া খাবে এবং প্রতি নিমেষে কঠাগত হয়ে উঠবে তা কে জানত!—

আমি সকালাবেলা স্রানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার দান্দনে অপেক্ষা করে পাড়িয়ে অছি— কিয়ৎকণবাদে বিরলকেশ স্থল কলেবর বিতীথ ব্যক্তি ভোয়ালে এবং স্পর্শ হাতে উপস্থিত— স্রানের দর খালাস হবারাউই দেখি সে অন্নানবসনে চোকবার অভিপ্রায় করচে— কিছুমাত্র লজ্জা কিংবা বিধা নেই— প্রথমেই মনে হল কোনরকম করে তাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গড়ি— কিন্তু কোনরকম শারীরিক বন্ধ আমার এমন রুঢ় এবং অভ্রম মনে হয় এবং এত অনভ্যস্ত, যে কিছুতেই পারলুম না— তাকে আমার অধিকার ছেড়ে দিলুম। মনে মনে অবাক হয়ে পাড়িয়ে রইলুম— ডাবলুম বৃষ্টি মন্থতা তন্ততে খুব ভাল, কিন্তু আপাতত এই পণ পৃথিবীর পক্ষে অহুপযোগী, এবং দেখতে অনেকটা ভীকতার মত। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশী সাহসের আবশ্যক ছিল তা নহ— কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংসবহল কপিপর্ব শিরলচক্ষু রুঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ আমার একান্ত মনোচরনক বেগ হল। পৃথিবীতে বর্ধপনরতা অনেক সময়ে এইজন্তে জহলাত করে— প্রবল বলে নয়, অতিনাসগ্রহণ কৃৎসিত বলে।

খুব গরম পড়েচে। ডেকের উপরে যে ঘর আপন আপন Easychair-এর উপর পড়ে থুঁকচে।

বাংলার বাউল

শ্রীকিডিনোহম সেন

১

বেদমহিড়ার সংজ্ঞাপরিচয়

বাংলাদেশের সাধনার কথা বলিতে গেলে বাংলাদেশের বাউলদের কথা বলিতেই হইবে। বাউল-সাধকেরা বাংলাদেশের রবের কথা বলিয়াছেন। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের সত্ত্ব (সত্য) বলে। দীর্ঘকাল কাল করিয়া দেখিলাম এই সম্বন্ধে ও বাউলমতে অনেকটা একই। উভয়েরই সাধনীয় 'সংস', উভয়েরই গণ 'মধ্য-পন্থা', উভয়েরই শাস্ত্রভার হইতে মুক্ত, উভয়েরই লক্ষ্য আপনার কাহার মধ্যে, সেহেঁহে মধ্যেই তাঁহাদের বিশ্ব, জাতি ও সমাজের বন্ধন উভয়ের কাছেই অর্থহীন। তাঁহাদের সবকিছুই মানবের মধ্যে, কাজেই তাঁহাদের উভয়ের ধর্মকেই মানবধর্ম ও বলা চলে।

ভারতের ধর্মসাধনার কথা মনে হইলে প্রথমে অবশ্য শাস্ত্রাভিত্তি ধর্মসাধনার কথাই মনে আসে। তাহার রচয়িতা ও স্বাপনিতাদের মধ্যে বড় বড় অভিজ্ঞতা, বিদ্যান ও পণ্ডিত্যময়ের অভাব নাই। তাহার পরে আসে বাউল প্রকৃতিদের কথা। এই সম্বন্ধে বা বাউলিয়া মতে সব শুদ্ধ্যই প্রায় হীনবংশজাত ও নিরক্ষর। অথচ এই ধর্মের ভাব-ঐশ্বর্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্র ও লোকাত্মারের তরমুস্ক এইসব সাধকদের সাহসের তুলনা নাই।^১

এই সম্বন্ধে ও বাউলিয়ারদের মধ্যে আর-একটা ঐতিহাসিক বোণও আছে। এই উভয় মতেরই উদ্ভব বৈদিক আৰ্যকৃমির বাহিরে ভারতের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে। এই প্রদেশেই একদিন বেদবিরুদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ মতের জন্ম হইয়াছিল। হয়তো শৈব নাথ যোগ বৌদ্ধ সহজিয়া-মত ধর্ম-উপাসনা শক্তিপূজা প্রকৃতি অবৈদিক মতেরও মূখ্য স্থান ও আদি এই প্রদেশেই। বৈদিক কৃমির মধ্যে এইসব মতবাদীদের তেমন বসবাস ছিল না। পরে মধ্যযুগে কবীর প্রকৃতির মতবাদও ভারতের পূর্ব-উত্তর অবৈদিক এই দেশে দেখিয়াই উদ্ভূত হইল।

কবীরের জন্ম কাশ্মীরে, অর্থাৎ 'পুরবিয়া' হিন্দী-ভাষীদের দেশে। তাহার পর কবীরের মতামত গেল আরও পূর্ব-ভারতের দিকে। 'দনোতি' প্রকৃতি বেগব মঠে তাহার বাণী বহুদিন রক্ষিত ছিল তাহা তো একবারে পূর্বদেশ। কবীরের ধর্মদাসী শাখার স্থান দানাবেড়ায়। তাহাও পূর্বদেশ বেদিয়া উড়িষ্যা-মধ্যদেশের একশাসে।

কবীরের নামে চলিত 'আদিবঙ্গল' বাংলাদেশের 'মঙ্গলকাব্যের' কথা মনে আগার, যদিও তাহা অনেক পরে লেখা। তাহাতে বেগব বোগমত ও ধর্মমতের কথা আছে তাহাই বাউলধর্মের প্রাণবন্ত। কাজেই আৰ্যকৃমি যখন শাস্ত্রবিহিত ধর্ম লইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আৰ্যকৃমির বাহিরে এই অনাথ মগধ-বঙ্গের অজ্ঞাতি

১. সম্বন্ধে কিছু পরিচয় 'ভারতের মধ্যযুগের সাধনার গায়' গ্রন্থে (অথবা মুদ্রাণী বহুত) ইতিপূর্বে বিদ্যাহি।

কৃতিতে সস্ত্র বাউলিয়ারের এই শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মই সকল ধীনদীনদের অধ্যায়চিহ্নকে ভাগ্যত রাখিয়াছিল।

এইগণ নিরক্ষর ধীনদীনদের কথা বহুকাল ভারতের কোনো বড় পণ্ডিতজনের লেখায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। পরে এমন-একটি ব্যাণার ঘটিল যাহাতে আবারও কিছু সাহস হইল। সেই কথাই বলিতেছি।

কলিকাতার বখন ভারতীয় বর্ণনামহাসভার মহা-অধিবেশন হইতেছে তখন তাহার স্থান হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-বল্লির। একেবারে পণ্ডিতের প্রধান ঘাঁটিতে পার্শ্বিক পণ্ডিতদের বিরাট সভায় বলিয়া সভাপতিত্ব ১৯২৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ বে Philosophy of Our People নামে অভিজ্ঞাবণ পড়িলেন তাহা বাংলায় এই নিরক্ষর বাউলদেরই কথা। সেই অভিজ্ঞাবণের সব তথ্য ও আগাগোড়া বাণী বাংলার পল্লীবাসী নিরক্ষর বাউলদের বাণী হইতেই সংগৃহীত।

তাহার পরে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবরণ করিল সেখানে বিশ্বজনসভার হিরাট বক্তৃতা দিতে। অক্সফোর্ড হইল সারা জগতের অভিজাত পণ্ডিতদের একেবারে দু্যাতম কৌলীকপীঠ। সেইখানে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বে বক্তৃতা দিলেন তাহাও ভারতের কোনো শাসনসম্মত অভিজাত-বর্ণন বা বিদ্বানদের ধর্মতত্ত্ব লইয়া নহে। তাহা ভারতেরই নিরক্ষর ধীনদীন সস্ত্র-বাউলদের মানবধর্ম বা Religion of Man।

কবিগুরু জগদেব শ্রেষ্ঠ বিশ্বজনসভার আঙ্গানে দুই-তুইবারই এই নিরক্ষরদের কথা বলায় আনন্দা বিস্ত্রিত হইলাব। আমাদেরও সাহস ইহাতে বাড়িয়া গেল। তবু তাহার পর বখন ‘অখর মুগারি বক্তৃতা’র পরেও ‘পীলা-বক্তৃতামালা’র ক্ষর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতজনেরা আমাকে ডাক দিলেন তখন একটু বিস্ময় বে না হইল তাহা নহে। সস্ত্রদের লস্করনাথ-বন্ধন আছে এবং তাই কিছু মথানা আছে। যদিও কবীর প্রভৃতি তাহা চাহেন নাই। কিন্তু বাউলদের তো তাহাও নাই। তাহাদের কথা কি কেহ শুনিবেন?

আমি তো সারাক্ষর এইগণ নিরক্ষর সাধকদের বাণী লইয়াই আছি। এই পণ্ডিতজনসভায় প্রাকৃত জনগণের ধর্মের কথা বলিতে আমাকে কেন ডাক দিলেন? তবুও শুকদেবেব সাহসের কথা স্বরণ করিয়া কৃতজ্ঞভাবে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম।

সস্ত্রদের ভাষা হিন্দী, বাউলদের ভাষা বাংলা। আমি বাংলাদেশের এই ভাগে আস তাই বাংলার বাউলদের কথাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পণ্ডিতজনসভায় বাহার্য্য বস্তু করিয়া এইগণ ধীনদীনদের কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাদের প্রতি সন্তোষ নমস্কার। তাহারো কৃপা করিয়া অবহিত হউন। বিশ্বাসের কাছে অবিশ্বাস সাধকদের কথা বলিতে এখন প্রবৃত্ত হই।

বাউলদের মানবধর্ম

বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতিশংকতির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাহারো মূলগুণক, তাই সমাজের কোনো ধীন মানেন নাই। তবে সমাজ তাহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাহারো বলিয়াছেন, “আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া নাও। পাগলের তো

কোনো দাবির নাই।" বাড়িল অর্থ বায়ুপ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁহার্য বলেন, "মনে করিও যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরিয়াই গেছি।" মৃতের কাছে তো কোনো সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাড়িলের সাধনায় আর-এক অর্থ হইল 'জ্যাক্সে মরা'। শ্রুতীরের মধ্যেও এইজন্য 'দিগানা' (পাগল) নাম লইয়া একদল দাখ প্রচণ্ড মূল্যমান শাস্ত্রের দাবি এড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও 'ফিলা-কনা' বা জ্যাক্সে মরা আছে। হয় নিম্নেরের পাগল বলিয়া বা মৃত বলিয়া তাঁহার্য সমাজের সব ধাঁধন অস্বীকার করিয়াছেন।

বাড়িলের বেশের ও ভাবের মধ্যে কিছু মূল্যমান ছুই ভাবেরই মিলন আছে। তাঁহার্য সর্ব-কেশ রক্ষা করেন, কারণ কেশের বিশেষভাবে রক্ষা-না-রক্ষার দ্বারা বিশেষ সন্তোষ প্রসূত হয়। সেহকে ইহার্য নম্র রাখেন না, সত্বে নানা বস্ত্র ও জোড়াতালি দিয়া সেহকে আচ্ছাদিত করেন। সেই বেশ ও কৃতকটা মূল্যমানী ভাবের।

কত কালের এই বাড়িলনত ও বাড়িলিয়া সাধনা? এই কথায় সেধি বাড়িলের্য বলেন, "আমাদের ধর্ম প্রভিষ্ট হইল সহস্র মানব-সত্যের উপরে। কাজেই বত কাল মানব, তত কাল এই সহস্র বাড়িলিয়া নত। বেশ-পথ তো সে দিনের। তাহা তো কৃত্রিম। স্ববিধা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন। বাড়িলিয়া সহস্র নত অনাদি কালের। বেশের আদি আছে।"

তবু বেদ হইতে প্রাচীনতর শাস্ত্রবদ্ধ ধর্মধাণী তো জগতে আর নাই। সেই বেদে বাড়িলিয়া মৃতের প্রতিচ্ছবি কেন পাওয়া যাইবে? আর বেদই কেন বা তাহার্য দ্বাংগম্য ছাড়া অস্ত্র কথায় তার বহন করিবে? তবু তখনকার দিনেও যদি দ্বাংগম্যের মতামত ছাড়া মানবধর্মের সাধনাও থাকিয়া থাকে তবে বেদের মধ্যে কচিৎ ছুই-এক স্থলে সেইসব সত্যেরও আভাস মিলিতে পারে।

ভারতে এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটয়াছে, বাহ্য পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে নাই। জগতে সর্বত্র এক ধর্ম আসিয়া অস্ত্র-সব ধর্মকে উচ্ছেদ করিয়াছে। শুধু ভারতেই তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে সাধনার পর সাধনা আসিয়া পরস্পরে পাশাপাশি রহিয়াছে। কেহ কাহাকেও উচ্ছেদ করে নাই। একের সাধনার উপরে অন্তের সাধনা রক্ষিত হইয়াছে। ব-বীপে যেমন নানা স্তরে দৃঢ়তা গঠিত হয় তেমনি ভারতের ধর্ম নানা মন্ডলের সাধনার গচ্ছিয়া উঠিয়াছে। তাই ভারতের ধর্ম ভারত বা বিশ্বের নামে 'হিন্দু' বা 'ভারতীয়' নামেই অভিহিত। ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো প্রবর্তকের নামে এই হিন্দু ধর্ম নহে।

বেদসংহিতায় মানবধর্মের তত্ত্ব

এখানে আর বেদশরীরা আসিয়া দ্বাংগম্য চালাইয়াছেন। আর্বেতর সব মতবাদীরা তাঁহাদের অধিগা বৈরাগ্য তপস্চর্যা প্রকৃতিও চালাইয়াছেন। বেদশরী বা আর্বেতর্য বলিলেন, অর্ঘের জন্ত সন্ধ্যা দ্বাংগম্য কর, প্রার্থনা লইয়া দেবতাদের উপাসনা কর। আর্বেতর্য বেদবিরোধীরা বলিলেন, সন্ধ্যা দ্বাংগম্য ছাড়। স্বর্গকামনাও বিতর্কনা। প্রার্থনা লইয়া দেবতাদের দিকে চাহিয়ে না। দ্বাংগম্য নিষ্পন্ন। মানবের মধ্যেই সব সত্য নিহিত, মানবকে ছাড়িয়া অর্ঘের জন্ত ব্যস্তির কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। বিশ্বের সার সত্য এই মানব-সত্য। অনেক পরে বেদের শেষভাগে ও উপনিষদে এইসব মতবাদও ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকৃত হইল।

মানবের অন্তরের যে পুরুষ তিনি তপস্বান। অন্তরের প্রেব দিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যায়। বাহ্য

শাস্ত্রের ভাব বুঝা তবে বহন করা কেন? মানব-কাষার মধ্যেই তো ত্রাণ! ও। এই ভাওের মধ্যেই ত্রাণাওসিদ্ধি মিলিবে। এইসব কথা তো অর্ধেকের সাধনার কথা।

পর্বসাধনার প্রধান তিন পথ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেম। কর্মে বাহিরেই বেশি দাঁটে হয়, কাজেই কর্ম হইল বাহ্য বা গৌণ পথ; জ্ঞান তাহার চেয়ে অন্তরঙ্গ, তাই জ্ঞান হইল কর্ম হইতে আরও ঢালো পথ; প্রেমই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, কাজেই প্রেমই সাধনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নৃপাতন পথ। প্রেমের আদি-অন্ত এই বাহুবে। তবেই এই প্রেমসাধনায় বাহুয়ের ভুল্য নহব আর কিছুতেই নাই।

জ্ঞান ও কর্মের পথে শাস্ত্র ও লোকচার অনেকটা সহায়তা করিতে পারে। প্রেমকে পথ বেথাইবার মত শাস্ত্র বা লোকচার কই? তবে এক প্রেমিককে দেখিয়া অন্তের প্রেম জাগিতে পারে। সেই হিসাবে প্রেমের পথে গুরুদ্বা ভাহাবের জীবনের আদর্শ ও সাধনা বেথাইয়া কতকটা সহায়তা করেন। আসলে সাধকদের অন্তরের মধ্য আদর্শ মানস-গুরুই এই প্রেমসাধনার আসল গুরু। বাহিরের গুরু ও সাধুরাও এই পথে সহায়। তাই ভাহারাও নমস্ত।

বাউলরা বলেন, “সাধনার ক্ষেত্র, উপাত্ত ভগবান এবং গুরু ধন আনন্দেরই^১ অন্তরের মধ্যে তখন নিবের প্রতি স্রষ্টা থাকে। যে ভগবান আনার অন্তরে নাই তাহাকে দ্বিধা আনন্দের কি হইবে? যিনি বাহিরের ভগবন্তের ঈশ্বর তাহাকে তো কখনো দেখিই নাই। তাহাকে চিনিই না। তিনি আনার প্রেমের বস্ত্র হইবেন কেমন করিয়া? তাহাকে দ্বিধা আনন্দের কী লাভ হইবে? প্রেম দ্বিধা তাহাকে অন্তরে পাইতে হইলে অন্তরকে লগা শুদ্ধ রাখিতে হইবে। কাজেই সব মিথ্যা বিচ্ছেদ নূর করিয়া মৈত্রীতে আপনাকে নির্মল কর। তখন মনের বাহুয় দেখা দিবে, তাহাকে প্রেম করা সম্ভব হইবে।”

“বিষকায়ার সঙ্গে মানবকাষার সমতা না করিলে বিশ্বনাথ এই সংকীর্ণ কায়াতে বিহার করিবেন কেমন করিয়া? তাই আপনাকে বিশ্বের মতো অসীম ও ব্যাপ্ত করা চাই। নহিলে ত্রুষ্ণ-কোচ-সোণ হয়। সেই সাধনা করিতে গিয়া অসীম শূন্তে ধ্যানকে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। শূন্ত সমাদিই হইল প-সন সমাধি। তাহাই ‘ব-সন’, অর্থাৎ আকাশবৎ, তব ধন প্রিহতন হইয়া উঠিবে তখন তাহার মর্ম বৃত্তিতে পারিবে। তাহাই সহস্র সমাধি। আপন কাষার সহায়তায় কর্মে-জ্ঞানে-যোগে-ধ্যানে-প্রেমে ক্রমে এই নীমাহীন সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। অন্তঃকায়াকাষাগেই যার সাধনা।”

“গুরু সহায়তায় এই পথে অগ্রসর হইলে সকল বাহ্য বন্ধন আপনি ঘুচিয়া যায়, লাধক যাবীন ও মুক্ত হয়। তখন বাহ্য পূজা-অর্চনার প্রয়োজন আর থাকে না। মূর্তি প্রতিমা তীর্থ সেবালয় শাস্ত্রবিধি প্রভৃতি নানা কৃত্রিমতার দাসত্ব ঘুচিয়া যায়।”

“বাহিরের বেব বিদায় দিলেই অন্তরের বেব উন্মুক্ত হইয়া উঠে। এই অন্তর-বেব মানিলে বাহিরের শাস্ত্রের প্রয়োজন আর থাকে না। পূজা রোজা নিয়ম নেমাণ সবই ঘুচিয়া যায়। স্মৃতি বর্ষ প্রভৃতির ভেববৃত্তিরও অবলান হয়। ইহারই নাম কাষাগত সহস্র বেব। এই বেবই বিশ্বের আকাশে নানাভাবে নিরন্তর মূর্তিমন্ত ও ধনিত।”

বাউলের: বলেন, "এইসব মতই সহজ বা অন্যদি মত। বেদেরও পূর্বে ইহা ছিল। খুঁজিলেই নাকি দেখা চাইবে যে, বেদেও ইহার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। বেধা বাইবে খাগবজ ওখালা বেদপরীয়াও ক্রমেই বেবের পথে আগাইয়া আসিতেছেন।"

বেদের মধ্যে মতবীচা

এইসব শুনিয়া বেদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, দতাই তো, সেখানেও খাগবজের উপরে ক্রমশই নানা ভাবের 'মতবীচা' আসিয়া তে দীয়ে দীয়ে দেখা দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গন্ধার শোভা' রচনা দেখাইয়াছেন, যাহুব প্রকৃতির যাকো কৃত্রিম যাহা কিছু রচনা করে পরে প্রকৃতি তাহার উপরে ক্রমে দ্রাব ব্লাইয়া তাহাকে দিনে দিনে প্রাকৃত বা স্বাভাবিক করিয়া লয়।

নতন ঘাট গন্ধার তীয়ে রচিত হইল। যাহুবের কৃত্রিম স্থতির অল্পলক্ষ্য লইয়া কিছুকাল চলিতেই ইটপাথরের রচনার মধ্যে নানা স্থলে ফাটল ধরিল, প্রকৃতির সন্তু শেওলা ও আগাছা ক্রমে তাহাকে আক্রান্ত করিয়া দীয়ে দীয়ে তাহাকে ধীর করিয়া লইল। যাহা ছিল কৃত্রিম তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক সৌন্দর্য লাভ করিল।

তাই দেখা যায় কর্মকাণ্ডী খাগবজ ওখালায়াও কিংবদন্তীকণের প্রভাবে ক্রমে প্রেম ও সহজ সাধনার দিকে হুকিয়া চলিয়াছেন। আদ্যের গগবেদ তো প্রাচীনতম শাস্ত্র। তাহাতে যেখি বলিষ্ঠ আপনাকে বেবতার দৃশ্য বলিয়া নিমেষক ধর মনে করিয়াছেন। সেই সত্য অবগান হইলে বেন প্রাণ দ্বাধ মনে করিতেছেন। এই সত্য তো দরজের কাছে লাগে না—

আমি বহু বহু বহু নান্দ

এ বৎ সন্তান ইন্দ্রাব মদ্য। ১.৮৮.৩

'হে দেবতা, তোমার নৌকার ছবি আর আমি দুই বহু সাগরে চলিয়াছিলুম ভাঙ্গিয়া-ভাঙ্গিয়া। সেই সত্য সানাদের আম গেল কোথায়?'

মজোরার বিখ্যাসি মধ্যম। ৪ ১. ৮৮. ৪

৪ খানি নৌ সত্য বহু। ৪ ১. ৮৮. ৪

ভক্ত হইয়া যদি দেখিলেন, ভগবান সবারই বহু, বিহুর পরমপথে মনুর উৎস উজ্জ্বলিত—

উত্তরবত স হি বহুবিধা

দিকো: পরে পরে মন উৎস। ৪ ১. ১৪৪. ৪

বহুর এই প্রেম খাগবজের পক্ষে উপযোগী তো নহে। অথচ এই প্রেমের পথে না গিয়া যখন পুরোহিতের দল খাগবজমাত্র সন্তান করেন তখন তাঁহারা ক্রমেই প্রাণহীন হইয়া য়মান। তাই বেদেই সাবধানবাণী দেখি, 'পুরোহিতদের মত তন্ত্রাশীল হইও না।' গগবেদ সামবেদ উভয়েই এক কথা—

দোমু ক্রমে ভক্তব্রহ্ম। ৪ ১. ২২. ০০

প্রেমের চেতনাই আসল আগরণ। কর্মকাণ্ড তো গত্যাহুগতিকতা মাত্র। তাহা যুবত লোকের চেষ্টিত। গগবেদ সামবেদ এখানে বাউলের মতবীচাই বলিতে লাগিলেন।



বাউল
এটিং : ঐনামুল হক

শাশ্বত সত্যের আসল বাণী কি মানুষের কাছেই ধনিত হয়? তাহা বিশ্বাকোশে নানা রূপে উদ্ভাসিত। তাহাকে লোকে সেবিয়াও সেবে না, শুনিয়াও শোনে না। তাই প্রত্যক্ষকে অপরোক্ষের নীচে স্থান দেওয়া হয়—

উত বঃ পদ্ম ন ধবর্ষ বাচম্

উত বঃ সুনন্দ নৃপোতি এনাম্ । ৩ ১০. ১১. ৪

ইন্ড্রিয়ের দ্বারা সত্য পরিচয় হয় না। পরিচয় হইল অন্তরাস্ত্রার দ্বর্ষ। বাণীকে চক্ষে নেয়া কথাটার মর্ম কি? শাশ্বত-সত্য এই বাণীকে চক্ষেও দেখা বাইতে পারে, কিন্তু তাহার উপহৃত সাধনা চাই। তাই ‘ন ধবর্ষ বাচম্’। এই বাক্যই বিষয়েবগণের সঙ্গে সারা বিশ্ব পূর্ণ করিয়া বিরাজমান। অন্যের আশিই বিশ্বের সর্বশক্তি মূলে। ইহা শুধু কোনো-এক বিশেষ কবিকল্পার কথা নহে, ইহা সকল সাধকেরই মর্মগত সাক্ষ্য—

অহং কুন্তেতির্ব্রজিকর্যামি

অহংবাচিভোক্তত বিস্ময়েনঃ । ৩ ১০. ১২৪. ১

এই স্বষ্টিই সেবতার সেই কান-বাণী। সেই বাণীর কি মহিমা, আজ সে যদি বা জীর্ণ হইয়া নহিল কাল আবাহন সে তেমনই জীবন্ত হইয়া উঠিল—

বেবত পত্ন কাব্যঃ নহিবা

অজ্ঞা মবার ন হঃ সবার । ৩ ১০. ৪৫. ৫

সেই বাণীই কি সবটা আমরা উপলব্ধি করিতে বা দেখিতে পাই? সেই বাণীর তিন পদ বা বারো আনাই শুদ্ধাঙ্কিত। সেই শুদ্ধাঙ্কিতের তো প্রকাশ নাই। মানুষ তাহার চতুর্ধ পদই বা অল্প অংশই বাক্যে প্রকাশ করে—

তহা ত্রীণি নিখিতা সেন্দয়তি

দুরীতঃ ব্যাভো মমুতা বসতি । ৩ ১. ১৫৪. ৫৫

সেই বাণীই সারা বিশ্বে শুভ্রিত ধনিত, উবাচ্যোতিঃ সেই বিশ্ববাণীর অক্ষর-বচনা মাত্র—

বহব্বি বিজ্ঞে অক্ষরঃ পবে গোঃ । ৩ ৩. ৫৫. ১

এখানে অক্ষর অর্থে সাধারণ বসেন—

ন করতি ইতি অক্ষরম্ । অবিনাশ্যদ্বিতাপার মহং প্রকৃতঃ জ্যোতিঃ ।

তিনি শাশ্বত মহান, জ্যোতিঃকর। ইহা অক্ষর। এই জ্যোতিঃই রূপে রূপে প্রতি-রূপে প্রতি-রূপ হয়। তাহার সেই নিত্য জীবন্তরূপই বেবিবার মত—

রূপরূপঃ প্রতিরূপো বহুব

তবত রূপঃ প্রতিচক্ষণার । ৩ ৬. ৪৭. ১৮

সেই বাণীর সত্যরূপ দেখিলে অস্তরের চক্ষু পূর্ণ হইয়া যায়। তখন সকল পাপ দূত হইয়া যায়, এই বাণীই মানবের সকল মূর্তির গায়ত্রী—

অণু সত্যমুৎসিখি চক্ষু

হৃদয় অস্মদ্বিগমে বহান্ । ৩ ১০. ১০. ১১

সর্ব বন্ধন হইতে পরম মূর্তির ময়ই হইল গায়ত্রীমন্ত্র— কুর্হ্বাঃ স্বঃ । সর্ব চরাচরে এই মূর্তিময়ই ব্যাপ্ত।

স্রগংসবিতার তাহাই বরদীর্ঘ ভর্ণ, তাহাই ধ্যান করিতে হয়। আমাদের অন্তরের ধ্যানের সঙ্গে তাহার নিত্যযোগ।

ভগবদ্বিভূষণেণঃ স্তবো দেবত্ব বীৰ্য্যি
গিরো যো নঃ প্রচোষয়ৎ। ৩০. ৩২. ১০

এই গাছটী হইল জ্ঞানপথের ও জ্ঞানমার্গের সার কথা বা চিহ্ন, ভক্তির পথে তাহাই হইল নামতত্ত্ব।
নামতত্ত্বেরও যেন আভাস ও রহস্ত (mystery) রূপেই দেখে—
নাম কৃপাতি বৃণাম্। ১০. ৪৮. ৪

ধরা দিবার ক্ষতই দেবতা বজ্রী নান ধারণ করেন—
নামনি চিৎ ধ্বংয়ে বজ্রিণামি। ১. ১২. ৩

এই নাম যে কেবলো অগতের সাধারণ নাম নয় তাহা বুঝাইতে গিয়া ঋষি বলিলেন, সেই নাম হইল মহৎ,
তাহা গুহ্যহিত, করতল তাহার তত্ত্ব জানেন?—

মহৎ তত্ত্বং ভবন্। ৩. ১০. ৫৫. ২

ব্যাক্যই কি কম গুহ্যহিত? তাহাই বুঝাইতে গিয়া বাউল ও গোয়থ যোগীদের বহুবিধ হেয়ালী চলিত
আছে। তাহার অর্থ সাধারণভাবে চলে না। যেন বাউলদের গানে দেখা যায় নানা ভাবের ইঙ্গিত,
symbolism এবং হেয়ালি—

নূতন এক চীন সহরে
দেখি, কত্যা নারীর পুর যবে।

তালগাহে গোলবার
শিয়ালে করে খায়।

য'লো যেনন ক্ষর আবে
সেই জনই তো আয়কে ডাকে।

বেদেও এইরূপ বহু হেয়ালি আছে। তাহাকে 'ঋদ্ধান্তা' বলে। যজ্ঞের কাছে কোনো প্রয়োজন না
থাকিলেও রূপবেশে বহু হেয়ালি আছে। যথা 'রক্ত-জ্ঞান দিতে গিয়া পুত্রহীন পাইল কস্তার গর্ভে নাতিকে।'।
৩. ৩১. ১।

সপ্তবাহীর মায়ের গর্ভে প্রবেশ বলিতে কি বৃত্তি?
মাতরা বিসিৎ: সত্ত্ব বাঈ:। ঐ ৩. ৭. ১

অতল মহাসাগরের তলার কবির চাহিয়া দেখিলেন—
সদ্যে অস্ত্র: করয়ে বি চক্ষতে। ১০. ১৭৭. ১

চরাসরের এই চন্দ্র-তারার দ্বিনি রাখাল তাহার চক্ষে নাই নিভ্রা, তাঁর নাই বিজ্রাম। সর্ব পথে নানা
দিকে তাঁর বাতাসাত।

অপস্ত: পোপাৎ অনিশভবাবন্
আ চ পয়া পবিত্রিস্তবন্। ৩. ১০. ১৭৭. ৩

এক চক্রেরে লাভটি অল্প, একটি অশ্বেরই সপ্ত নাম—

সপ্ত হুঁমুস্তি রসবেতচক্র

একে অথো বহতি সপ্তনামা । ৩ ১. ১০৪. ২

জীবান্ধা পরনান্দা পরশ্পর প্রেমে লগা । একজন বন্ধু, অল্পটি মুক্ত । তবু এই দুই পাখি পরশ্পরের বন্ধু,
একই বৃক্ষে দুই পাখি নিবস । একজন ফল খায়, অল্পজন সর্ব বশাবাসের অতীত—

বা হুঁমুস্তি সপ্তনামা

সমানঃ বৃক্ষঃ পতি বনভাগে

তয়োবকঃ শিশুঃপক্ষঃ খাতি

অনন্ত্ অমোহতি চাক্ষুশ্চিতি । ৩ ১. ১০৪. ২*

মৃতের অঙ্গেই চলে জীব । অমর্ত্য হইল মর্ত্যের সবেদনি, অর্ধাৎ উভয়েরই মূল এক ।

জীবো মৃতস্ত চরতি বনজিহ্ব

অমর্ত্যো মর্ত্যোনি সবেদনি । ১. ১১১. ৩*

যে করিল রচনা সে তার তব বুকিল না । যে তাহাকে দেখিতে গেল তাহার কাছেই সে হইল
অদ্ব্যহিত—

য ইং চকার ন শো অত্র ক্লে

য ইং বর্ণা হিক্ ইন্ হু তম্যং । ৩ ১. ১০৪. ৩২

জিজ্ঞাসা করি, কোথায় পৃথিবীর সীমা, কোথায় তাহার জীবনকেন্দ্র ?

পৃথ্বানি বা পরমহুঃ পৃথিবাঃ

পৃথ্বানি ধ্রুত জুবন্ত নাস্তি । ৩ ১. ১০৪. ৩৪

সৃষ্টিটাই তো একটা হৈরাণী । কে ইহার মর্ম জানে ? স্বর্গবেশের দশম মণ্ডলের 'না নদাঙ্গীন্'
ময় ও সেই মুক্ত অধিতীয় অপূর্ব ময় । তাহার আগাগোড়া পড়িয়া দেখা উচিত (১০. ১২২) ।

তখন না ছিল সং না ছিল অসং, না ছিল এই লোক, না ছিল আকাশ বা তার পরে আর কিছু । তখন
কোথায় বা ছিল আলয় কাহার বা ছিল আবরণ ? গহন সাগরই কি তখন ছিল সর্ব ব্যাপিয়া ?

নানবাসীন্ নো নদাসীং ভবাবীঃ

নাসীন্ লম্বা নো বোমা পরা বং ।

কিনাবরীং কুহ কন্ত নর্দন্

অন্তঃ কিনাসীং প্ধবঃ বরীন্ । ৩ ১০. ১২২. ১

তখন না ছিল বৃদ্ধা না ছিল অল্পত—

ন বৃদ্ধাসীশুভতা ন তর্হি । ১০. ১২২. ২

কোথা হইতে আসিল এইসব ? কোথা হইতে এই সৃষ্টি ? কে-ই বা আনেন, কে-ই বা পারে বলিতে ?

কো অন্না কো ঋ ইহ এবোচ

হুত আভাতা হুত ইহা দিবকীঃ । ৩ ১০. ১২২. ৩

পন্নম বোমে যিনি ইহার ঈশ্বর হইতো তিনিই এই তব জানেন । অথবা তিনিও জানেন না ।

যো অভাভাকঃ পন্নম বোমন্

যো অমে কো অধ্যা য জে । ১০. ১২২. ৪

বেদের পুরুষ শরম পুরুষ। তবু তিনি তবমাত্র নহেন, তিনি মানবীর সত্য বা পুরুষ। মানবীয় ভাবেই তাঁকে পাই। প্রেমের তিনিই পাত্র। ঋগ্বেদের মণ্ডোৎ সেবতার উপরে পুরুষের যে মহিমা তাহাই বউলিয়ারা আপন চরিত্র বলিয়া ঘাণি করিতে পারেন। এই বিশেষ ঘাণা দূত বা ভবিষ্যৎ সবই হইলেন পুরুষ—

পুরুষ একো: সর্গ:

বহুত: বহু তথ্য। ৩ ১০. ২০. ২

• এই কথাই উপনিষদ বলিলেন—

পুণ্যাহরণ: কিঞ্চি:। কঠ ৩. ১১

এই তবই মহাভারতের ভীষ্ম বলিলেন—

ন মাত্ৰোপদে: ষ্টরক হি কিঞ্চি:। শান্তি ২৩২. ২০

ইহাই চণ্ডীদাস বলিলেন, 'শব্দর উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

ঋগ্বেদে আরও দেখি, সেই পুরুষ শুধু বিশ্বব্যাপী নহেন, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়াও তিনি তাহার চেয়ে বেশি—

স জুনি: বিশ্বতাপ্রাণ

অত্যন্তিষ্টং দৃশ্যম্। ১০. ২০. ১

এই বিরাট বিশ্ব তাঁরই মহিমা কিন্তু সেই পুরুষ তাঁহার চেয়েও বড়—

এতাবান্ অত্র মহিমা

অত্রো দ্রাঘাক পুরুষ:। ১৩. ২০. ৩

এই পুরুষকে বাহু দিলে বাগবন্ধুর কোনো অর্থ নাই। পুরুষই যজ্ঞ। পুরুষকে নিয়াই যজ্ঞ হইল। যজ্ঞ নিয়াই যজ্ঞ চলে—

যজ্ঞেন যজন্ অরজত দেবা:। ৩ ১০. ২০. ১৩

পুরুষ বা মানবীয় প্রেমকে বান বেওয়ার আসিল কর্মকাণ্ড। মরমিমা ভাবের প্রভাবে এই যজ্ঞও ক্রমে ক্রমে অতীন্দ্রিয় দূর্বোধ্য হইয়া উঠিল। সেই যজ্ঞতেও যজ্ঞমান আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেন। উপাস্তকে নিয়াই যজ্ঞ করা হয়। এই আত্মোৎসর্গতো কর্মকাণ্ডের উপরের কথা। ইহা তো মানবীর ধর্মের ও প্রেমভবের এলাকায় আদিয়া পড়িল।

কর্মকাণ্ডের যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞের ইষ্টকা সামান্যও এক অপূর্ণ ভাষা ও বাণী। সেই ভাষার মর্ম আশ্রয় আনন্ডা ভুলিয়া গিয়াছি। সবীহ্রন্য এইকল্প বহু ছুখ করিয়াছেন।

ইষ্টকা সামান্যই হৃদয়ের মত করা হইত। হৃদয় হইল বিরাট বিশ্বময়। তাহাতে এই পার্শ্বিক যজ্ঞ কোনো অপর্যায় লোকের শরীমে উড়িয়া গাইত। এইসব মরমী সংকেতের (mystic message) অর্থ আনন্ডা আশ্রয় ভুলিয়াছি। বউলিয়ারা বলিতে পারেন এইসব কাণ্ড খটিতে পারিয়াছে তখনকার দিনের মরমীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাইতে। দেখা যায়, কর্মমিমা ও ধর্মমিমাও ক্রমে মরমিমা হইয়া উঠিতেছেন।

এইসব যজ্ঞবাহু মরমিমা ভাব যদি অবৈদিক কোনো মণ্ডলী হইতে না আসিয়া চারিদিকের প্রভাবে বৈদিক আর্থের মনের মধ্যেই উদ্ভিত হইয়া থাকে তবে তাহাতেও কিছু আসে যায় না। বউলিয়ারা তো

যত্ন সহকারী গাথি করেন না ; তাহার বলেন, “আমাদের ভাবগায়কই সহস্র ও সহস্রদিন। তাহার ডেবে সনাতন আর কিছুই নাই।” এইজন্য এইসব ভাব বেদের মধ্যে দেখান হইতেই আব্দ না কেন, তাহাতে বাউল ভাবেরই প্রাচীনতা সূচিত হয়।

এইসব ভাব কেবল ধর্ম নহে, তখনকার সংস্কৃতিতেও পড়িয়াছিল। তাই পরে পুরাতন সংস্কৃতিবীতি লইয়া একদল রহিলেন, নতুন প্রাকৃত সংস্কৃতি লইয়া আর-এক দল উঠিলেন। দুই দলে বেদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সে কথা আধিকার বিষয় নহে। ঋগ্বেদের গানে ও সামবেদের গানের বিরোধের মধ্যে তাহার কিছু ইংগিত মেলে।

ঋগ্বেদই প্রাচীনতম, সেখানেই যদি ধীরে ধীরে এইসব মতবাদ আদিতে প্যারিয়া থাকে তবে আর পরবর্তী সব বেদে আসিবে না কেন? সামবেদে তো অনেক অংশই ঋগ্বেদের, যজুর্বেদেও তাই। তাই সামবেদ ও যজুর্বেদের কথা যত্ন করিয়া বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নাই। বিশেষ ভাবে বলিবার প্রয়োজন হইবে অথর্ববেদের কথার। অথর্ববেদকে তো বাউলগা নিতেনেই প্রাচীনতম বাণী বলেন।

তবু সামবেদের একটি কথা মনে হইতেছে। যখন দেবতাদের নামে দেবতাদের মহকে কবচ করিয়া লোকে আশ্বস্তকা করিতেছে তখন কথি বলিলেন, ব্রহ্মই আমার অশ্বস্তহিত কবচ, সকলের কল্যাণই আমার অশ্বস্তের দুর্ভেদ্য কবচ—

তম বর্ষ মনান্তর

বর্ষ বর্ষ মনান্তর। উক্ত আর্চিক ২১, ২৮

আজ জগদ্বাপী অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে এই কল্যাণময়টি অতিপর অস্বপ্নীয়।

পুরুষহত্য়াক্রমি ঋগ্বেদেও আছে (১০.২০), যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতাতেও (৩১.১২) আছে, অথর্ববেদেও আছে (১২.৩)।

পুরুষহত্য় হইল বাউলদের মূলবস্তু। ঋগ্বেদের প্রগুণে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, এমন বাজসনেয়ি সংহিতার কথায় তাহা বলা গাউক। বাউলদের মতে “আমার সর্ব চরায় আসিল আমার ‘আমি’ হইতে, আমার মনের মাহুদ বা পুরুষ হইতে।” তাই বাউল হাসন রাস্তা গাহিয়াছেন—

মম আমি হইতে পাল্য আসমান ব্রহ্মী ১০

আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাস্তা ১১।

ঋগ্বেদেও পুরুষহত্য় বলিলেন, পুরুষের মন হইতেই জন্মিল চন্দ্রমা, চক্ হইতে হইল সূর্য, মৃগ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু। তাহার নানি হইতে হইল অন্তরীক, মাথা হইতে ছাত্তাক, পদ হইতে ভূমি, শ্রোত্র হইতে দেবগণল এবং সর্বলোক—

চন্দ্রমা মনসো জাতকক্যাঃ সূর্যো অজ্যমতঃ।

মৃগাভিজ্ঞান্দিগ্ধ প্রাণাব বায়ুঃপ্রায়তঃ।

বাত্যাঃ আদীতব্রহ্মিকঃ শ্রীকৈঃ ভৌঃ সমবর্ততঃ।

পশ্চ্যাঃ ভূমিঃ, বিপাঃ শ্রোত্রাং তথা লোকান্ অবব্রজতঃ। ঋ ১০. ২০, ১২-১৪

এই পুরুষকেই যজ্ঞ পরিণত করা হইল এবং তাহা হইতেই স্বক্ শাম ও চন্দ্রসকল ও যজুর্বেদ হইল—

তন্মাত্রা যজ্ঞাং সর্বতঃ কচঃ সাধাবিরাজিবঃ।

চন্দ্রাসি রজিরে তন্মাত্রা যজুঃপ্রায়মায়তঃ। ঐ ১০, ২০. ২

ঐশ্বর্য শাস্ত্র নহে, সর্ব জীবনের ও প্রাণের মূলে সেই আদি পুরুষ। সর্ব পুত্র সর্ব মানব ও জাতি সেই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইল (ঐ ১০. ২০. ১০-১২)।

বাউলিরা মতের গোরাখানাবী ধাধা যজুর্বেদেও বিস্তার আছে, কিশোর মধ্যে পুরুষ প্রবেশ করিলেন ? পুরুষের মধ্যেই বা কিশর রাধা হইল ?—

কেষরঃ পুরুষ আকির্বন

কাশ্যপঃ পুরুষে আশিতানি । কাশ্যপেনরি ২৩. ৪১

যজুর্বেদে এইখানে হইতে বহু গোরাখ-ধাধা আছে যাহা একেবারে বাউলিরা।

তাহার পর যজুর্বেদের বিখ্যাত মন্ত্র শিবলংকল্প । তাহা তো যজ্ঞের পক্ষে কোনোমতেই উপযোগী নয় । তাহার একটুখানি বলা ঘাউক ।

মাহুষের অন্তরে একটি দিবা চৈতন্তময় মন আছে । কি-বা আগিরা থাকিলে কি-বা ঘুমানিলে কোথায় মন তাহা দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায় । আমার সেই অসুরচারী মনই সর্ব জ্যোতিঃের সেরা জ্যোতিঃ । সেই আমার মন কল্যাণলংকল্প হউক—

বজ্রাশ্রতো ঘুরমুদৈরি সৈবঃ

তত্ত্ব হুত্তত্ত্ব তপৈবেতি ।

দুঃসমনঃ জ্যোতিষ্যঃ জ্যোতিঃরেকঃ

তমে বনঃ শিবলংকল্পঃ । ঐ ৩৪. ১

মানবীয় সেই মনই আমাদের প্রজ্ঞান চেতনা ও ধৃতি, তাহাই সকলের অন্তরে অমৃত জ্যোতিঃ—

বৎ প্রজ্ঞানদত্ত চেতো ধৃতিশ্চ

যজ্ঞোত্তিরত্তত্ত্বতঃ প্রজাহ । ঐ ৩৪. ৩

মানবীয় ও অমৃতময় সেই মন হইতেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবকিছু পরিস্ফুট—

যেনেবঃ ভূতঃ ভূতনঃ কথিতঃ

পরিস্ফুটমস্তুতেন সর্বম্ । ঐ ৩৪. ৪

আমার সেই মনের মধ্যেই ঋগ্, সাম যজুঃ প্রতিক্রিতি ।

যজিন্ বচঃ সায যজুঃ যি বচিন্ । ঐ ৩৪. ৫

যজুর্বেদও ভগবানকে বিধাতা, পিতা ও বন্ধু বলিয়া বুকিরছেন । এই প্রেমের দৃষ্টি তো ফিরাকাণ্ডের নয়—
স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা । ঐ ৩২. ১০

ভগবান যদি বন্ধু হন তবে সর্বদা সর্বদা সর্বদা চাইই আমাদের বন্ধু হইয়া থাকায় । তবে সর্বকৃতকে মিত্রভাবেই দেখিতে হইবে এবং তাহা হইলে সর্বকৃতও আমাদের মিত্রভাবে দেখিবে—

মিত্রঃ মা চক্ষুর্মা সর্গানি কৃতানি সর্গীকৃতান্ ।

মিত্রত্বাঃ চক্ষুর্মা সর্গানি কৃতানি সর্গীকৃতান্ । কাশ্যপেনরি ৩৬. ১০

এমন করিয়াই সবকিছু ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয় । ইহাই ঈশাবাস্ত উপনিষৎ । ইহাই বাজসনেয়ি সংহিতায় চরম অংশ ও সমাপ্তিবাক্য—

ঈশাবাস্তিনঃ সর্গঃ ৭৭ কিক জনত্যাঃ ৭৭৭ ।

তেন তজ্জেন ভূতীণা মা পুং কত্ব মিত্রন । ঐ ৪০. ১

এইবার আসা হাউক অর্থবৎসরে। ইহাতেই বাউলিরা মতের অল্প পার্থক্য মূল উৎস ও ভাণ্ডারের পরিচয় পাই। স্বর্গের প্রতি লোভ করিয়া অর্থবৎসর পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করেন নাই। স্বর্গ পৃথিবীকে মাতা বলিয়া আত্মবরণ করি শ্রব করিয়াছেন। তুমি আমার জননী, আমি যে পৃথিবীমাতার পুত্র—

মাতা ভূমি: পুত্রো নহ: পৃথিব্যা:। অর্থ ১২, ১০, ১২

এই পৃথিবী ছালোক হইতেও স্রেষ্ঠ। কারণ ছালোক বিদ্যুত রহিয়াছে স্বর্গের দ্বারা, আর পৃথিবী বিদ্যুত রহিয়াছে মতের দ্বারা।

মত্যোনারজিতা ভূমি: স্বর্গোনারজিতা ভৌ:। অর্থ ১০, ১০, ১

বিদ্যাতাই শুধু স্রষ্টা নছেন। তাঁহার স্রষ্টব্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষকেও নিবিড়তর চিত্রায় সৃষ্টি করিতে হইবে। এই বিশ্বক্লায়ের মধ্যে মানুষকে আর-একটি মানবীয় প্রেমের উজ্জ্বলিত নিবিড়তর ক্লায়ে রচনা করিতে হইবে—

ক্লায়েমি ক্লায়: কোশে ভোপ: সম্বৃতিত:। ঐ ১০, ৩, ২০

বাউলদের মতে জন্ম ও মীমা আমাদের এখনও শেষ হয় নাই। নিতাই নানা জন্ম ও মীমা চলিয়াছে। অর্থবৎসর বলেন—

নামো নমো করি মায়ামান:। ঐ ১০, ২, ২০

অর্থবৎসরেও কর্মকাণ্ডী পৌরোহিত্য-সর্বস্বদের বলা হইয়াছে 'তস্ত্রহু' বা ঘুমন্ত (sleepy)। ব্রাহ্মণের মত তস্ত্রহু কেন না হও—

বো হু তস্ত্রহু তস্ত্রহু:। ২০, ৩, ০

এই পৃথিবীই তো বর্ষা স্বর্গ, যদি আমাদের অস্তরে প্রেম ও লগ্ন থাকে। তাই স্বর্গের দ্বারা অর্থবৎসর স্বর্গের স্থলে সাংঘনত অর্থাৎ পরম্পরের সঙ্গমরতা, অবিচ্ছেদ্য ও মৈত্রী চাহিয়াছেন—

সঙ্গম: সাক্ষতসংকিঞ্চ: কুণোমি য:। ৩, ৩০, ১

কেহ যদি কাহাকেও বন্ধনা না করে তবেই এই লগ্ন্য নষ্ট হয় না। তাই অমরলে সবারই সমান অধিকার হওয়া চাই। আবার শ্রম সাধনা এবং দায়িত্বও সবারকার সমান হউক—

সমাবী এলা সহ বোহিভাস:।

সমানে বোলে, সহ বো দুহু:দি। ৩, ৩০, ৩

আজও অগতের সবার্জর্থে ও ধর্মগত ব্যবস্থার মধ্যে এইগন মতের মূল্য আছে। তবেই মানবের মধ্যে লগ্ন্য ও লংহতি জাগিবে। মানবের সংহতিগ জন্ম অগতে একটি নৈতিক সঙ্গ (moral order) অবধ তাবিয়াছেন। তাহার দেবতা হইলেন বরণ। এইকর অর্থবৎসর বরণ-স্বভটি (৪. ১৩) আগাগোড়া ঘেঁষিতে বলি।

বিশ্বপুঙ্খবের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের বোণ ঘান দিয়া। তাহাই গায়ত্রীর মন্ত্র। তাহার ধ্যানই বিশ্বজগতের নানা বৈচিত্র্যবহী সৃষ্টি। কাজেই বিশ্বের বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের ধ্যানের বোণ। তাই এই বিশ্ববৈচিত্র্য আমি বুঝি এবং তাহাতে আনন্দ পাই—

বিশ্বলগ্ন্য: বিদু:। অর্থ ২০, ৩০, ১০

এই লম্বাই আবার বাউল হাসন রবার গান একটু ভালো করিয়া উদ্ভূত কবি, পূর্বে দুই-এক গ-ক্তি মাত্র বলা হইয়াছে—

মন খাঁচি হৈতে গঙ্গা আসমান জবীব ।
কর্ণ হৈতে শৈলা হৈছে সুন্দরানী দিন ।
আর গঙ্গা করিল যে গুনিবারে বত ।
শব্দ শব্দ আরাম ইত্যাদি যে কত ।
দরীয়ে করিল পলা পলা আর বরষ ।
আর গঙ্গা করিয়াছে গীতা আর গরম ।
নাক করিয়াছে দুসবার আর জল ।
আমি হৈতে সব উপ্তি হাঙ্গন রজা কর ।

পৃথিবী ও জগৎ হইল 'হান'। 'হান' এবং 'কাল' লইয়াই বিখ্যাত স্রষ্টি। কাল বিষয়েও অথর্বের (১২. ৪৪) সব মন্ত্র দেখিতে বলি। স্রষ্টির কথা বলিতে গিয়া অথর্ব বলেন, একটি-একটি নক্ষত্রখচিত স্রষ্টি যেন ব্রহ্মখচিত পাত্রে মত উপুড় করিয়া আবারের জন্ত সুস্থির শাস্তির নিম্ন অন্তর্ভুক্তি দিতেছে—

জ্যোতি স্রষ্টি চক্ষো ন দিষ্টাঃ । ১২. ৪২. ৮

স্রষ্টির ব্রহ্ম ও অশ্রুপ সৌন্দর্যের বিষয়েও অথর্ববৈদের মন্ত্রগুলি অতুলনীয়। স্রষ্টি-ব্রহ্ম ব্রহ্মিতে হইলে অথর্ববৈদের ত্রয়োদশ কাণ্ডের প্রথম স্রষ্টি প্রাধান্য দেখা উচিত। এই পৃথিবী যেন আমার কাছে আনন্দনরী হয়, কখনও তাহা যেন রসহীন হইল না হয় তাই প্রার্থনা—

পৃথিবী নঃ স্তোবা । ১০. ১. ১৭

বৈদ্য ও প্রেমেই এই সরসতা থাকে—

ইহব জ্ঞান সখো নো জ্ঞান । ১০. ১. ১৮

অন্ত সব বেদ স্তব করে দেবতাদের, অথর্ব স্তব করিলেন মানবের (১০. ২, ১১, ৮) ইত্যাদি।

সর্গের বললে অথর্ব স্তব করিলেন মহীর অর্থাৎ পৃথিবীর (১৩, ১)। জোরের সহিত আখণ্ড ভবি বলিলেন, পৃথিবী আমার মাতা, আমি তাহার পুত্র—

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অকঃ পৃথিবাঃ । ১২. ১. ১২

স্রষ্টির স্বস্ত অর্থাৎ কাঠামোর বিঘের অথর্বের অপূর্ব সব মন্ত্র (১০, ৭)। প্রাণ (১১, ৪) এবং ব্রহ্মচারী (১১, ৪) বিষয়ে অথর্বের মন্ত্রগুলি দেখিতে বলি। ত্রয়োদশ কাণ্ড হইল যোহিত স্রষ্টি, ইহাতে স্রষ্টির আদিরহস্ত উদ্ভাসিত। অথর্বের বিরাট মন্ত্রগুলি (৭, ২+১০ স্বক) তুলনা হয় না।

ব্রহ্মচারীর কথা বলিতে গিয়া অথর্ব যে ধাপধাপের চেয়ে তপস্বীকে বড় বলিলেন তাহাতে এক নৃতন যুগের অভ্যাস ঘটিল। ব্রহ্মচারী শিল্পই শুক্ল চিত্তে নৃতন জীবন গলায় করেন—

ভূতে বর্তমকঃ । ১১. ৭. ৩

ব্রহ্মচারী শিল্প হইয়াও শুক্লকে পূর্ণ করেন—

স আচারঃ তপস্যাপিগতিঃ । ১১. ৭. ১

সর্গলোককেও তিনি পূর্ণ করেন—

সোমাস্থিপিগতিঃ । ১১. ৭. ৪

পৃথিবীকে আধৰ্ণণ জ্বি বলিতেছেন—তোমাকে বাহু ধুইতে বেগি শুধু শিলা মাটি ঝাঁকর ধূলা—
তোমার মেহনত সোনার বরন কোলখানিকে করি নমন্যর।—তাহা তো কেহ বেগিতে পার না।

শিলা হুঁসিরাগাং:-

জঁতে হিলাবকসে পৃথিব্য অক্ষ: নয়। ঐ ১২. ১. ১৬

যে হাতা পৃথিবী, আমাকে পচাং বা সমুদ্র বা উর্ন বা নির হইতে তৈলিয়া দিতে বা তুলিয়া
ধরিতে চাহিয়ে না। তোমার কল্যাণের মেহ-কোলে আমাকে ধর এই চাই—

না না পচাং পুরান

হুপিঙা মোতরাংগাং

পত্তি কুমে মো জব। ঐ ১২. ১. ৩২

বাউলদের মত অধৰ্ণণ বলিলেন, এই বাহুরেখা মধ্যেই ব্রহ্মকে যে দেখিল সে-ই তাহাকে পরম সত্যে
প্রতিষ্ঠিত দেখিল—

যে পুরুষ ব্রহ্ম বিদ্যতে বিদ্য: পরমহীনম্। ঐ ১০. ৭. ১৭

এই বাহুর হইতেই ঋক্ যজু: সাম অধৰ্ণ এই চারি বেদ নিঃসৃত হইল—

ব্রহ্মাণ্ডো অশাক্তক্ণ বহুর্ভাবশাক্তক্ণ।

সামানি বস সোমানি অধৰ্ণদ্বিরসো বৃণ্। ঐ ১০. ৭. ২০

অন্ত ও মৃত্যু এই বাহুরেখাই যথো। তাহার নাড়ীতে নাড়ীতে মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত ও
স্পন্দিত—

ব্রহ্মবৃত্ত: চ বৃত্তাক্ত পুরুষেই সমাহিত।

সমুদ্রো বস নাভ্য: পুরুষেই সমাহিতা:। ১০. ৭

কৰ্মকাণ্ডী ধর্মহীন লহর মাছুবই ভ্রাতা। অধৰ্ণবেরে পকরণকাণ্ডের আগাগোড়া সেই লহর মাছুবের
বা ভ্রাতার মহিনা অধৰ্ণবেরে বর্ণিত।

এই মানবমেহ-দুবনের মধ্যেই মহান্ সেবতা প্রতিষ্ঠিত। চিরের বিন্দুসেবতা এই মানবমেহেই
বিরাগিত—

মহৎ কক্ণ জুবন্ত যথা। ১০. ৭. ৩৮

মানবচিত্তও তাই সারা পৃথিবীময় আপনাকে হুঁসিয়া বেড়ায়। তাই বাহুর মতোই আমাদের মনও
সদাই চঞ্চল, কোথায় যে তাহার শান্তি ও সোয়াস্তি তাহা কে জানে?—

কণ: বাতো নেলান্তি কণ: ন রবতে মন:। ১০. ৭. ৩৭

প্রত্যেককে অবজ্ঞা করিয়া অগ্রত্যেকের পিছনে বুধা দাইয়া লাভ নাই। বাহা আমার সমুখে প্রত্যেক
তাহার ব্রহ্মেরও সীমা নাই। তাহার বসও অপরিমেয়—

আদি: সন্তিহিত: ওহা। ১০. ৮. ৫

যে-কোনো বস ব্রহ্মকণ সমুদ্রে আছে ততক্ষণ কেহই তাহার মর্ম বৃত্তিতে পারিবে না। হারাইলেই
তবন বৃত্তি তার মর্ম। অতি নিকটে আছে বলিয়াই তাহার মর্মের আশ্রয় বৃত্তিতে পারি না।

অতি সত্য: ন ব্রহ্মতি অতি সত্য: ন পত্ততি। ১০. ৮. ৩২



প্রবেশনের দ্বারা অতিরিক্ত তাহাই 'উচ্ছিন্ন'। এই উচ্ছিন্ন হইতেই মাহুদের সকল চিদ্রসম্পদ উদ্ভূত। কত গতা তপস্বী রাত্রি শ্রম ধর্ম কর্তৃক সবই এই উচ্ছিন্নের প্রদানে।

ধর্ম: নতন: ভাষা: হিন্দু: প্রবেশ: ধর্ম: কর্তৃক। ১১. ২. ১৭

যাহা সনাতন তাহাই নানা রূপে আমাদের মনকে মুগ্ধ করে—

সনাতনমেন্দ্রিয়ভাষ্য ভাষ্য পূর্ণতা। ১০. ৮. ২০

পূর্ণতা হইতেই পূর্ণতা আসে। পূর্ণতা দিয়াই পূর্ণতা পরিবর্তিত—

পূর্ণতা পূর্ণতাতেই পূর্ণ: পূর্ণতা পূর্ণতাতে। ১০. ৮. ২০

ইহা: কল্যাণী অর্থ: বর্ত্তন অর্থ: পূর্ণতা। ১০. ৮. ২০

এই কল্যাণী পরমরমণীয় শোভা অর্থ: অর্থ:। মর্ত্ত্যমন্দিরেই ইহা বিরাজমান।

মাহুদই হইল ত্রৈলোক্যের পূর্ণ অর্থ: মন্দির। তাই তাহার নাম পূর্ণতা—

পূর্ণ: পূর্ণতা অর্থ:

ধর্ম: পূর্ণতা উচ্ছিন্ন। ১০. ২. ২৮

এই সোনার পুতী মানবমন্দিরেই ত্রৈলোক্য বাস করিলেন। এই মন্দির সর্বত্র অপরাধিত—

পূর্ণ: হিন্দু: অর্থ:

আবিশেষাশ্রয়িতা। ১০. ২. ৩০

তাই মাহুদকে বিশ্বাসের ত্রৈলোক্য বলেন—

তদ্ব্যবস্থা বৈ বিশ্ব: পূর্ণতা:

ত্রৈলোক্য মন্দির। ১১. ১০. ৩২

ঠিক বাড়ির মত অর্থ: অর্থ: বলিলেন, এই অপরাধের মানবমন্দিরের মধ্যে অষ্ট চক্র এবং নব ধর্ম। এই মানবমন্দিরেই জ্যোতির্লোকগামী জ্যোতিষের দ্বারা আবৃত হিরণ্য কোণ—

অষ্টাঙ্গ: নবধর্ম: সোনার: পূর্ণতা:

তদ্ব্যবস্থা: কোণ: অর্থ: জ্যোতিষ:। ১০. ২. ৩১

বাউলের কথা, 'বা আছে ভাও তাহাই ত্রৈলোক্য'; অর্থ: অর্থ: সেই একই কথা। এই মানব-সেই দিনে-দিনে কমলের মত সূচিগা চলিচ্ছে—

জলকল চলছে সে কুটে কত হুং ধরি।

অর্থ: নানা স্থানে নানা প্রদেশে অর্থ: অর্থ: কথার আছে—

অর্থ: পূর্ণতা। ১০. ২. ২

বাউলেরা বলেন—এই সেই সোনার নাও, তার বীধনও সোনার, সেখানে অর্থ: পূর্ণতা;

সোনার নাও সোনার বীধন

অর্থ: পূর্ণতা কোটে।

যৌগিকের গান—সোনার নাও, পবনের বৈঠা, আকাশে তালে। অর্থ: বলেন—

হিরণ্য: নৌকা: জল: পূর্ণতা:

অর্থ: পূর্ণতা। ১০. ২. ১

অর্থ: একটি মণির বর্ণনা দেখি, বহুবিধ্যেতে রচিত মণি—

বিদ্যতা: পূর্ণতা। ১০. ২. ১

বিদ্যা ও বস্ত্র-পুষ্পের কথা ক্রমে দেহতরে আসিয়া নৃতন রূপ লইল। যোগীরা বলেন—

যেথরে সুইটা যায়

যন্ত্রকমল দেখি যদি আর।

নারায়ণ উপনিষদে আছে, এই দেহপুত্রই পুণ্ডরীক—

তমিল: পু: পুণ্ডরীক। *

ছানোগো আছে—

বহু: পুণ্ডরীক: বৈশ। ১. ১. ১

অর্থও বলেন, বিশ্বনামিলের সেই পয়ের কথা জিজ্ঞাসা করি বাহা অপূর্ণ রহিতে সেখানে ভাসিতেছে।

অগা: বা পুশ: পুশ্বাদি কন তনু মাহ্য হিতম্। ১০. ৮. ৩৪

কোন মায়ায় এই দেহকমল ফুটিল তাহার রহস্ত কি বিনা সাধনায় বুঝা যাইবে? এই দেহই সেই পথ। এই পুণ্ডরীক-দেহের নবদ্বার। তিনওণে ইহা আবৃত। ইহাতে বিরাটরূপে আশ্রয় দেবতাকে তখনই হইল আশ্রয়িত হওয়া—

পুণ্ডরীক: নবদ্বারম্ দ্বিভিত্তপেত্তিরাবৃতম্।

তন্নিদ্র বহুনাশ্রয়ং তথৈব ব্রহ্মদিশো বিহু:। ১০. ৮. ৪০

জীবাত্ম-হংসের কথা আরও পূর্বেই সংহিতাতে দেখা যায়।

এই বেদের পরে উপনিষদ, জৈন বৌদ্ধ মত, পুরাণ প্রভৃতি নানা দৃকমেব গ্রন্থ আছে। শৈব নাথ যোগী ও বৌদ্ধ সহস্র মত ও তত্ত্বের নামও এই সঙ্গে মনে করা উচিত। কিন্তু অর্থবোধে দেহস্থ কন্যার কথা বলিতে বলিতে এখনই তত্ত্বের কথা মনে আসিয়া পড়িল। কালপতভাবে এখনই তত্ত্বের উল্লেখ করার কথা না থাকিলেও এখানেই প্রেরণবশে তত্ত্বের নাম করা বাউক।

তত্ত্ব সাধারণত ছুইচক্রেই কথা। ছয় চক্র হইতে বেশিও সাধনা-শাস্ত্রে আছে। ইচ্ছা-পিঙ্গলাচক্রে চন্দ্র-সূর্য গঙ্গা-যমুনা বলা হয়। সূর্য্যার মধ্য দিয়া তাহাদের বৃত্ত ঘোরে উৎসর্গকারী করিমা যে সাধন: তাহাতে বাউল ও তত্ত্বমতে কিছু ভেদ আছে। তবু মিল বাহা তাহা বেশিলেও বিম্বিত হইতে হয়। তান্ত্রিকেরা যদিও তাহাদের তত্ত্বকে বেদের পরবর্তী মানিতে চাহেন না, তবে তাহা তো সাধারণ পণ্ডিতজনেরা স্বীকার করিবেন না। বাহা হউক, আমি সময়েই কোনো গাি বা গািগািই প্রসঙ্গবশে এইখানে তত্ত্বের কাহালাদের কথা বলিয়া রাখি। তত্ত্বের ছুইচক্র হইল মূলধার, আধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিভক্ত ও আত্মচক্র। ছুইচক্র বিষয়ে চমৎকার গ্রন্থ পূর্ণানন্দেবর ছুইচক্র-নিরূপণ। কালীচরণকৃত। অমলা টীকাও তাহার আছে।

এই বিষয়ে আরও বহু তত্ত্বাক্ত গ্রন্থ আছে। কিন্তু তাহা বলা এখানে বাহা। বাউল-মতবাদের বিষয়ে সেসবের বিশেষ প্রয়োজন সকলে বোধ করিবেন না। তবে মহানির্বাণ, কুলার্ণব, কল্পবামল, প্রমত্তগার প্রভৃতি তত্ত্ব পড়িলে বাউলমতের সঙ্গে কাহাবোগগত বহু কথাই সকলে পাইবেন। মিল অমিল ছুইই আছে। তান্ত্রিকদের সঙ্গে বাউলদের কাহাবোধ এবং কাহাবোগেরই মিল দেখা যায়। অহরাগতব কিন্তু বাউলদের বিশেষত্ব। তাহার কিছু তত্ত্বে মেলে না। বেদাচার এবং লোকাচারের বিরুদ্ধে বাউল ও তত্ত্ব সমান বিরোধী।

পূর্ণানন্দের সম্পূর্ণ গ্রন্থের নাম শ্রীভট্টচিন্তামণি। যট্টজ-নিরুপণ হইল তাহার অঙ্গ বা প্রকরণ মাত্র।
পূর্ণানন্দের তাহার প্রথম ভিত্তি অতুলনীয়। তাহার প্রথম রোকেটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিবার দেখাই—

যেরোষাক্ষরেনে বনিত্বিহিরসি সর্বদকে নিবদে
যোবা নাড়ী হুংগা ত্রিতমলমরী চতুঃপাতিরপা।
যুঃকমেরশুশ্যমবিতহমলুঃ কলমখাতিরহা
যজ্ঞাখা যেট সেপাখিরসি পরিবতা যজ্ঞে প্রামলয়ী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'পৌল-বক্তা'রূপে অভিহিত।

আহ্বান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ সবাই ছুটে আসুক ছুটে
যে যেখানে থাকে—
এবার যার খুশি সে বীধন কাটুক,
আমরা বীধব মাকে।
আমরা পরান দিয়ে আপন ক'রে
বীধব তাঁরে সত্যভোরে,
সন্তানেরই বাহুপাশে
বীধব লক্ষ পাকে।
আজ ধনী গরিব সবাই সমান—
আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান—
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্,
আয় রে লাখে লাখে।
আজ দাও গো সবার ছয়ার খুলে,
বাও গো সকল ভাবনা ভুলে—
সকল ডাকের উপরে আজ
মা আমাদের ডাকে ॥

কলিকাতা

২৪ আশ্বিন [১৩১২]

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কেবলমাত্র গ্রন্থ-রচনাতেই নয়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও বঙ্গমহিলারা দীর্ঘে দীর্ঘে কম কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই। বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে সশেষ সর্বত্র ক্রমশঃ শ্রীশিক্ষা প্রসার পাইতে থাকে। মহিলাকুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের চেষ্টাও বটে,^১ শ্রীশাঠ্য-বিষয়-সম্বলিত পত্র-পত্রিকাও ক্রমশঃ সেবা বিতে লাগিল। এগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাখানাথ শিকদার-সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (আগষ্ট ১৮৫৭),^২ মজিলপুর-নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগষ্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলাবাহুব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।^৩ অস্তঃপূর্ববাসিনীদের জ্ঞানার্জন-সূত্রা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; ক্রমশঃ তাঁহারা নিজেদের অবিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন; নেশে মহিলা-সম্পাদিত সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইল।

আমরা গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত যে সকল বাংলা পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাইয়াছি, অগ্রে সেগুলির কথা আলোচনা করিব।

বঙ্গমহিলা। মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র—'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খ্রিস্টপূর্ব-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। গুনিয়াছি, ইনি ডবলিউ. সি. বোনার্জীর ডগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। 'বঙ্গমহিলা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৭০২ শক) লেখেন—

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত ব্যালায় বৃত্তি হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল স্ত্রী স্রীলোকদিগের সুসংগঠন হইবে। স্রীলোকদিগের বহু প্রভুত্বের সম্বন্ধে কথা ইহার উদ্দেশ্য। স্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই মূল্য প্রকাশিত হইল। আবার কলকাতার সহিত ইহার গোপকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কলকাতা সংবাদ পত্রিকাতো যেমন স্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর একজন পাইতেছে, তিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অল্পকিট বিদ্যাতীর্ণ অল্পকিট বাক্য না হইত তাহা হইলে আশা করি বাক্যের কল্যাণ হইত। ও সমুচিত থাকিত। ইহা করিয়া একজন সকল একটুকু করেন, এখানি তদ্রূপেই অত্যন্ত আশা করি হইবে।"

সচনায় নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা'র প্রকাশিত "স্বাধীনতা" নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"অকৃত স্বাধীনতা কি? যোগ্য করি, এ কথা বলা সম্ভবের অনেক দুঃখের না, ওঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা মনে

১ এই স্ত্রীর আরও কয়েকখানি সাময়িক-পত্র: ডে.এস. সি. বোম-সম্পাদিত 'স্রোতির্মহা' (মাসিক), জুলাই ১৮৬২। চাকা হইতে প্রকাশিত 'মাসী-শিক্ষা পত্রিকা' (মাসিক), অক্টোবর ১৮৭০। বরিশাদ হইতে প্রকাশিত 'বাল্যশিক্ষা' (মাসিক), এপ্রিল ১৮৭৩। 'স্বদেশতা' (পাক্ষিক), অক্টোবর ১৮৭০। ডাঃ ভুবনমোহন সরকার-সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা' (মাসিক), এপ্রিল ১৮৭৫। কবি এতাদৃশ বহুলসংখ্যক 'পত্রিকা' (মাসিক), মে ১৮৭৮।

করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলায় বৎসর বাবীনতা জোপ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাবীনতা জ্ঞান করিয়া গ্রীষ্মান্তিকে বাবীনতা এলাক করা উচিত বলিয়া যে নক্ষত্র হুঁকি অবর্ণন করেন, তাহার তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীসেবকের বেলা বাবীনতা আছে, বর্ষীয় গ্রীষ্মোৎসবকে ঠিক সেইরূপ বাবীনতা বিতে এসেই কতকগুলি সোজের বড় ইচ্ছা হয়। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান গ্রীষ্মান্তির বেলা বাবীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা বেঙ্কাচারিতা বলিয়া থাকি। গ্রীষ্মোৎসব বনে করিলেই যে খোড়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছানুসারে পুরুষের সহিত হাতকোঁকর অথবা দুত্যাগি করে, সম্মানীয়ের জ্ঞান পুরুষের সঙ্গে গান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া বসন্তাধা বেড়াইগ বেড়াই, এমন গ্রীষ্মোৎসবকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে বেয়ে যগিতে তো আমাদের শাসন ফুলায় না। নতুবা এক সম্মানীয়তাই গ্রীষ্মোৎসবের প্রধান ভূমি। যে সকল গ্রী সম্মানীয়তা পূর্ণক নতুনতাকে ঘুরে নিশ্চয় করিয়া বীরবলে দেশ বিদেশে অসংখ্যে জন জগত তাহার। কি গ্রী? না বীর? নাইন্নাতিং এই সকল কথা কি ভ্রান্তচিত? না সত্যোচিত? অথবা তা বাবীনতার কল? একজন বাবীনতা যে বঙ্গপ্রাণী প্রতিনিধিত্ব, দেশীয় উন্নয়ন ইত্যদ্যই তাহার প্রমাণমান। ওঁহারা ইউরোপীয় কামিনীসেবকের জ্ঞান বাবীনতা লাভে সোমুগ হয়। তবে বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিফলিতরূপে এ পর্যন্ত ও সমাকল্পে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ওঁহাদের যুগতিনি ও সমাকল্পে অবলোকন করিলেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষমান হয়, যেন ওঁহারা উন্নয়ন বাবীনতালাভেও বৎসর প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন।

“ঐক্য বেঙ্কাচারিতারূপে বাবীনতার বঙ্গমহিলাদের কাল নাই। ওঁহাদের যে বাবীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত বাবীনতা। কে বলে যে বঙ্গমহিলায় শিশুরাও পত্নীর জ্ঞান পুরুষের কাছাকাছে আছে? ওঁহারা কি আশা আশা ইচ্ছাযত বর্ণ-কর্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অর্থ যখন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয়স্বদের বাটীতে কি গন্যমান্য করিতে পারেন না? ওঁহাদের যেন কি বাবীনতা নহে? তবে ওঁহারা পরাবীনতা-সুখের বর্ষীয়ণ্য অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি একবারে সম্ভবপর হইতে পারে?”

“বঙ্গমহিলাদের অনেক অজ্ঞতা আছে, একটা আমর পূর্বেইবিই শীকার করিয়া আসিতেছি, আর সেই সকল অজ্ঞতা যে রূপে রূপে সোচন হইবে এখন তাহার আকার-প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাক্ষেত্র একেই গ্রীষ্মোৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ হইল, কিন্তু অল্প বয়সবাস্যদের মধ্যে সেই শীকার খার নৃত্ত হইয়াছে। ওঁহাদের বর্তমান পোষাক পরিবর্তন হটক, উন্নতর শিক্ষা লাভ হটক, তখন দেখা গাইবে যে ওঁহাদের জ্ঞান বৎসর সভা, তন্ত্র ও বাবীনতার গ্রী মনস্তত্ত্ব আর কোথায়ও নাই। (সংকৃত প্রকাশের) অনেক ঘুরে ভারতীয় নারীমহিলাকে গ্রীষ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া বিদ্যেছেন।) তখনই দেখি যে বঙ্গপ্রাণী রহবিলেই হইয়াছেন।”

অনাবিলী। ইহাই মহিলা-পত্রিকার প্রথম মাসিক পত্রিকা; সম্পাদিকা—শ্রীমতী দেবী; প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেজেট’ (২২ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন—

“অনাবিলী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। আদিত্যের বিবিসিমেই প্রথম প্রকাশিত। এই আশা যখন হইতে ইহার কাগজ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রীষ্মোৎসবের সময় সম্পাদিত মাসিকপত্র এ দেশে এই আশা এখন দেখিলাম। পত্রিকাখানি গ্রীষ্মোৎসবের বর্ষীয়ণ্যের জন্য আশ্রয়ের কাল হইবে।”

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভূদেবমোহন মুখোপাধ্যায়ের জামাতা কঁটালপাড়া-নিবাসী অম্বুদাস

২ ‘অনাবিলী’ একাদশ ইহার তিন মাস পূর্বে, বঙ্গপ্রাণী হইতে ভূদেবমোহন দেবী-সম্পাদিত ‘বিশ্বভারতী’ একাদিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা-পত্রিকাভিত্তিক এবং মাসিক পত্রিকার সৌম্য দিগা থাকেন। প্রকৃতপক্ষে “ভূদেবমোহন দেবী”—এই নামের আশ্রয়ে ‘ভূদেবমোহন দেবী’ পত্রিকা ‘ব’ কবি মনোজ মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। প্রত্যাঃ ইহাকে মহিলা-পত্রিকাভিত্তিক মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।

চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লুলিয়ান হইতে ‘অনাবিনী’ প্রকাশ করেন। থাকমবি দেবী সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা হইবেন। ‘বাহুব’ (ভাগ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন—“ওনিয়াছি, সম্পাদিকা মম্ব বয়সের বালিকা।”

হিন্দুললনা। বঙ্গবহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ (কেতাবারি ১৮৭৮) মাসে ব্যাভাকপুরের নবাবগড় হইতে প্রকাশিত হয়। ‘হিন্দুললনা’র সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেজেট’ (১৮ ফাল্গুন) লিখিয়াছিলেন—

“হিন্দুললনা—এতদ্রাশী একাদি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা। আমরা আশংক্য হইয়াছি। এযদি পাক্ষিক পত্রিকা, এক কোম হিন্দুললনা কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ছবিয়ার সিদিয়ায়েন : ‘বাহুলা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষার বঙ্গবহিলা নামে একাদি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। তদা বঙ্গবহিলায় বঙ্গবহিলায় একই হিন্দুললনা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে গ্রীষ্মক ঋতু সংবাদপত্র প্রচারের সুযোগ তিনি করিয়া দেন। তাহার ঠিকার সম্বন্ধে অসম্মত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গবহিলা পত্রিকাখানি ২১১- মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর-’ হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারের পক্ষেতা ও নতি হিন্দু সমাজের পৌরষের বিবর্ত, তাহার সম্বন্ধ নাই। ব্যাভাকপুর নবাবগড় হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। দ্বা অত্রিয়ারিকি ছিল ঢাকা।”

ভারতী। ‘ভারতী’র নাম সাহিত্য-সংসারে সুবিদিত। ইহা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে জিজ্ঞেসনাথ ঠাকুরের সম্পাদনার প্রথম প্রকাশিত হয়। জ্যোতিবিশ্বনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গদ্বারী দেবী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার সহস্রাধিক শরণ্যকারী চৌধুরানী—সকলেই সম্পাদকীয় চক্রে যথো ছিলেন। বিবেচনা ১২২০ সাল পর্যন্ত, সাত বৎসর, সহৃদাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিবিশ্বনাথের পত্নী, সাহিত্যসুযোগিণী কাশ্মীরী দেবীর অশ্রুত্বার (৮ বৈশাখ ১২২১) সঙ্গে সঙ্গে ‘ভারতী’র সেবকের উহার প্রচার রহিত করাই লাবান্ত করেন। জিজ্ঞেসনাথ ‘তত্ত্ববেদিনি পত্রিকা’র বোধা করেন—“ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।” কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহস্রাধিক শরণ্যকারী চৌধুরানী ঋণার্থে লিখিয়াছেন—

“সুন্দর ভোক্তার কুলজনিই সবাই দেখিতে পায়, যে ধীরে ধীরে থাকে, তাহার অধিকতর কেহ ভাবিতে পারে না। স্বর্গদ্বারী দেবীর পুত্রস্বামী জিজ্ঞেসনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই ধীরে। ধীরেই ছিল,—ভারতীর সেবকের আর কুল জেনেন না, ভারতী ব্যাধি মিলি। এই দুইদিনে শ্রবণী স্বর্গদ্বারী দেবী তাঁহার পালন-পত্রিকার পরিচয় দিলেন।”

অতঃপর ‘ভারতী’র পালন-পালনের ভার প্রধানতঃ স্বর্গদ্বারী দেবী ও তাঁহার দুই কন্যার হস্তে স্তত ছিল। ইহাদের কার্যকাল এইরূপ—

১৮-১২ বর্ষ :	১২২১—১২২২ সাল	‘ভারতী’	স্বর্গদ্বারী দেবী
১০-১১ বর্ষ :	১২২০—১২২১ সাল	‘ভারতী ও বাসক’	ঐ
১৭-১৮ বর্ষ :	১০০১—১০০২ সাল	‘ভারতী’	ঐ
১৯-২১ বর্ষ :	১০০২—১০০৪ সাল	‘ভারতী’	হিন্দু দেবী ও সল্লা দেবী
২৩-২৫ বর্ষ :	১০০৪—১০০৬ সাল	‘ভারতী’	সল্লা দেবী
২৭-২৯ বর্ষ :	১০০৬—১০০৮ সাল	‘ভারতী’	স্বর্গদ্বারী দেবী
৩১-৩৩ বর্ষ :	১০০৮—১০১০ সাল	‘ভারতী’	সল্লা দেবী

‘ভারতী’র ব্যাতি ও গৌরবের কৃতিত্ব প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিবিশ্বনাথ, জিজ্ঞেসনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের

হইলেও সম্পাদিকাদের হস্তে ইহার পৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া নাই। সম্পাদিকাগণের বহু স্থিতিবিত ঘটনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

পরিচায়িকা। ১২৮৪ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (৬ মে ১৮৭৮) এই নামের একখানি ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিক। প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কেশবচন্দ্রের চৌবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বৎসর পরে 'পরিচায়িকা'র পালনের ভার পড়ে আর্থনায়ীসমাজের উপর; এই সমাজের পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশ্রী পূর্ববধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তিনি বিদূষী ও হুলেখিকা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'হলত সমাচার ও কুশল' ২২ জুলাই ১৮৮৭ (১৪ আষাঢ় ১২২৪) তারিখে যে নথবা করেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"আমরা শুনিয়া হবী হইলাম, 'পরিচায়িকা' কাগজখানি পূর্ববার বামাগণের পরিচর্যা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় তিনি ইহার অধিকাংশ লেখা লিখিতেন তিনি এক্ষণে সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুই বারের মনুনা বাহা লেখা গেল তাহা আশান্বিত। ত্রীলোকের পত্রিকা ত্রীলোক বাহা প্রচারিত হয় ইহা অপেক্ষা আত্মার বিস্তার আর কি আর? বামাকৃত্যহিতৈষী মহাশয়েরা এক্ষণে হুচিসম্পন্ন জাতীয় সভ্যদের পক্ষপাতী আর্থগণবিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ইহা একান্ত আশীষ্য।"

মোহিনী দেবীর মৃত্যুর (৬ মে ১৮৯৪) পর মদ্রবডঙের মহারানী হুচাক দেবী* কিছু দিন 'পরিচায়িকা' পরিচালন করিয়াছিলেন।

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কৃতবিহারের রাণী নিকুপমা দেবী সচিব আকারে 'পরিচায়িকা'র নব পর্ধ্যায় প্রকাশ করেন; ইহার প্রথম সংখ্যায় "পূর্ববক্তা"র উল্লেখ আছে, উহা এইরূপ—

"নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিচায়িকার প্রথম প্রকাশ। প্রচুর বর্ষীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্তক এবং তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।—

"কিন্তু কাল পরে ইহা আর্থনায়ীসমাজের দ্বারা পত্রিকাভূষণে ব্যতির হয়। তখন ইহার সম্পাদকের ভার ত্র্যম্বক কেশবচন্দ্র দেবের স্ত্রীশ্রী পূর্ববধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবীর উপর পড়ে। তিনি বিদূষী ও হুলেখিকা ছিলেন; কয়েক বৎসর তাহা হইয়া গেল। পরে তিনি মৃত্যু লাভ করেন, ওহার অতি সময়ে পরিচায়িকাও তখন কলিকাতার তরঙ্গী ভায়ে কিছু কাল ভাসিয়া কোঁচালা কালসাগরে ডুবিয়া গেল।

"প্রথম বারের পালা শেষ হইবার পর আর্থনায়ীসমাজের স্ত্রীশ্রী পরিচায়িকার পুনঃ প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠা হয়। শেষে ইহার পরিচালনার ভার আর্থনায়ীসমাজের তরঙ্গ হইতে মদ্রবডঙের মহারানী শ্রীমতী হুচাক দেবীর উপর অর্পিত হয়। তিনি স্বভাবের সহিত পত্রিকা সম্পাদকের কথা নির্বাহ করেন। তাহার পর বাক্য কার্যে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তবীয়া চন্দ্র মহোদয় শ্রীমতী বর্ণিকা দেবী গ্রহণ করেন। অষ্টবিংশতি বর্ষ জীবন ব্যাপ্ত করিয়া অবশেষে বাক্য কার্যে কামরানি বহু হইয়া যায়।"

মুদ্রিত মহিলা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৭ সালের মাঘ (মার্চ) ১৮৮১) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কুমারী কামিনী শিল। ইহাতে মহিলাদের রচিত লহরীবোধ গল্প-গল্প রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'একুশেন্দ্র পেন্সেট' (২২ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন—

"মুদ্রিত মহিলা—বাসিকপত্র—কুমারী কামিনী শিল কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে

* বেঙ্গল লাইব্রেরি তালিকার হুচাক সেন-সম্পাদিত 'পরিচায়িকা'র "২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা" প্রকাশকাল—৩০ এপ্রিল ১৮৯৬ (ইংলণ্ড ১০০৩) পাণ্ডুরা দায়িত্বে।

সকল গ্রীষ্মকালে ইহাতে অবস্থান লেখেন, অবস্থানগুলি প্যারি বিলম্বন অতীতি হয় যে, তাহার প্রতিকৃতি। এক একটা পত্র প্রথম অতি দ্রুত দেখা হয়।”

বঙ্গবাসিনী। ইহাই বঙ্গবহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৮০ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ১২ আশ্বিন ১২২০ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮০) তারিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেজেট’ে ‘বঙ্গবাসিনী’র এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়—

“বঙ্গবাসিনী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা।—চাকর্যহল দপ্তর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দ্বয় ১১- টাকা, বৎসরে ২১-। আকার দুই কন্যা, চিহ্নই এক পিঠ, উত্তম ভাষা, উত্তম কাগজ! প্রতি বঙ্গবাসীর প্রান্তে প্রকাশিত হইবে, নগর মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

“সেবিকাগণ।—গ্রীষ্মকালে যোগদানকারী রায়, সেরাধিনী গুপ্ত, বিদ্যাবিনী দেবী, শিবদেবী দে, কৃষ্ণকামিনী ব্রহ্ম, বাকরমি বোম, সৌম্যদিনী গুপ্ত, আমোদিনী বোম, অমূল্য দেবী, সুব্রতকামিনী বসোপাধ্যায়, বিনোদন্য দেবী, তরঙ্গিনী বোম।

“এই সকল বঙ্গবহিলাগণ কর্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আপ্যায়ী আশ্বিন [কার্তিক :] মাস হইতে সাধারণের নৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সেপ্তিক বাস্তবতা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিদেশী ভাষা ভাষা সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও সংবাদ সাধারণ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত কথা হইবে। বঙ্গবাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অধিকৃত লোক শিক্ষার প্রদান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন প্রতিকৃতি রচনী লিখিবেন, নানা কাক্স বসন্ত, তাসসের নাম প্রকাশ করা হইল না। প্রিয়ব্রজলাল দাস বোম। বঙ্গবাসিনী কার্যাবল্য। কলিকাতা বর্ষ প্রকাশের টালা, ২ নং বঙ্গবাসিনী কার্যালয়।”

পরবর্তী ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩০ নবেম্বর) তারিখে ‘বঙ্গবাসিনী’র ১ম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেজেট’ এইরূপ লেখেন—

“বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা, গ্রীষ্মকাল কর্তৃক বঙ্গবাসিনীপত্রের বিস্তারিত সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি বঙ্গবাসীর প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীষ্মকালের দেখা বিনাম ইহার ভাষাবিশেষ কোন ভাষা নাই; বরং সকল বিংগেই উত্তর হইয়াছে।”

সোহাগিনী। মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২২১ (এপ্রিল ১৮৮৪)। কৃষ্ণরত্নিনী বসু ও ভ্রাম্যদিনী দে ‘সোহাগিনী’ সম্পাদন করিতেন। ইহা ১ নং গরানহাটা স্ট্রীট হইতে জব্বললাল ঈল কর্তৃক প্রকাশিত হইত।

বালক। ১২২২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতা জ্ঞানবাহিনী দেবীর সম্পাদনায় ‘বালক’ নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ব্রজেননাথ ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখিয়াছেন—

“বালকের প্যারি একটি সচিত্র কালর ব্যতির কথার ভাষা সেরাধিনী দেবীর বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শিত। তাহার ইচ্ছা ছিল, নৃষ্টিপথে প্রবর্তিত আবারের ব্যতির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন মনো প্রকাশ করে। কিন্তু গুরুতর তাহাঙ্গের দেখায় চলিতে পারে না ভাবিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আবারও চলিতে আরম্ভ করিত করেন।”

এক বৎসর সর্বোত্তম চলিবার পর ‘বালক’ ‘ভারতী’র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

বিশ্ববিনী। মাসিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কার্তিক ১২২৫ (অক্টোবর ১৮৮৮)। ইহা সম্পাদন করিতেন ব্রজলাল দেবী। পত্রিকার অধিকারী বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৭, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি লেন, কলিকাতা। ইহা প্রধানতঃ গল্পের কাগজ ছিল।

পুণ্য। ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৮২৭) মহবি দেবেন্দ্রনাথের পৌরী, হেমেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের কল্প প্রজাহৃদয়ী দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য, দর্শনীয় অদ্ভুত নানাবিধক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিলে। এতদ্বিধ ইচ্ছাতে পুস্তকের এবং মানবজাতিরই সর্বপ্রধান অবগতির বাহ্যিকের বিঘ্ন প্রতি বাসেই থাকিলে। ইচ্ছাতে পর্য্যাপ্ত ধর্মের অমূল্য নিম্নবিদ্যা অদ্ভুতের অস্তিত্ব হ্রাস করিবার সাধনত প্রেরণ করা যাইবে।”

প্রজাহৃদয়ী ৩য় বর্ষ (১৩০৭-৮) পর্য্যন্ত 'পুণ্য' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অমৃতপুর। এই নামের একখানি মাসিকপত্রিকা ১৩০৪ সালের মাঘ (আহুয়ারি ১৮২৮) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদিকা—সেবাত্রস্ত শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। ‘অমৃতপুর’ “কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত”। প্রথম সংখ্যায় “প্রস্তাবনা”র সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

“মাসিক মাসিকপত্রিকার অভাব নাই, রমণীদের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা দৃশ্যরূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সমুদয়তা করিতেছে। আশ্রয় ও আশ্রয় প্রাপ্তি লইয়া রমণীদের ও তাহাদের স্বকীয়রূপিত বাস্তব মাসিকপত্রিকার দ্রষ্টব্য একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অভ্যন্তর ব্যাপনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আবশ্যিকের উদ্দেশ্য নয়, সেজন্য দুলাইল নাই। কেবল বহু রমণীদিগের উন্নতিকল্পে আপনাদের বংশোদ্ভূত পত্রি নিঃসারণ করিয়া যত্ন হইবে এই আশা।”

‘অমৃতপুর’ দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সচিত্র মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। বনলতা দেবীর মৃত্যু হইলে গাহার।

এই পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম ও কাণ্ডিকাল—

১৩০৭ মাঘ (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)—১৩০১ বৈশাখ (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)	হেমন্তকুমারী চৌধুরী
১৩১১ জ্যৈষ্ঠ (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)—১৩১১ জ্যৈষ্ঠ (৭ম বর্ষ, ৪ম সংখ্যা)	কুমুদিনী দত্ত
১৩১২ আশ্বিন (৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)—১৩১২ মাঘ (৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)	লীলাবতী দত্ত
১৩১১ ফাল্গুন, চৈত্র (৭ম বর্ষ, ১১ম ১২ম সংখ্যা)	দ্বন্দ্বভার্য্য দত্ত
১৩১২ বৈশাখ (৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)	ঐ

১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯১৪) বিরাজমোহিনী দ্বারা সম্ভবতঃ “নব পর্য্যায়ের” ‘অমৃতপুর’ প্রকাশ করেন।

ইহাই হইল উনবিংশ শতাব্দীতে মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার তালিকা। সংখ্যায় এগুলি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া অনেকটা বিস্ময়ভাবে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল। প্রধানতঃ পুস্তক-পরিচালিত পত্রিকাগুলির আদর্শে গঠিত হইলেও নারীকণ্ঠে নারীসমাজের অভাব-অভিযোগ ও কর্তব্যের কথা এগুলিতে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাগুলিকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী কালে বঙ্গমহিলাসমাজের বক্তব্য পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

২

বিংশ শতাব্দীর গোড়া (ইং ১৯০১) হইতে আরম্ভ পর্য্যন্ত পুস্তক-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সম্বন্ধে মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত পত্র-পত্রিকায় তেমন সংখ্যাবাহ্য ছিল না। এই সময়কার পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি—

সুসুসু। ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসিনীর নীতি বিভাগের

উদ্দেশ্যে ‘মুকুল’ নামে বালক-বালিকাদের উপযোগী একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী। ষষ্ঠ বর্ষের (১৩০৭ সাল) ‘মুকুল’ সম্পাদন করেন শাস্ত্রীমহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবী। চব্বিশ বৎসর চলিয়া ‘মুকুল’ের প্রচার রহিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪ (প্রকাশকাল—মে ১৯১৮) হইতে ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৬ (প্রকাশকাল—জুলাই ১৯১৯) পর্যন্ত সম্পাদিকা-বিসাবে লালাবাগ্রভা সরকারের নাম পাওয়া গাইতেছে। ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসে ইহার নব পর্য্যায় প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা—পদ্মশলা দেবী। ৩৭ বর্ষ হইতে বাসন্তী চক্রবর্তী সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; তিনি ১৩৪৮ সাল পর্য্যন্ত ‘মুকুল’ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ভারত-মহিলা। ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহপাঠিনী সরস্বলা দত্তের সম্পাদনায় ‘ভারত-মহিলা’ নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন—

“এ দেশের নারী জাতির কল্যাণকর উপবিভাগিত একখানি মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাজনীতিই হউক, আর শ্রমবিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পাখে নারী পঢ়াশ্রমের না হইলে, পুরুষ-পক্ষি কখনও সমাজে বিকশিত হইতে পারে না। ভগবান্ ঈশ্বার বসন্ত ঋতিমারে পুরুষের সহিত নারীকে সম্বন্ধে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিধাতার বিধান ব্যর্থ করা ঈশ্বার সাধ্যাত্তর নহে। তাই দ্বি-পক্ষ বিহীনীর সঙ্গে একত্রে প্রতি বিবেকের ভাষা, এদেশের পুরুষেরাও সমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া কার্য-প্রদায় হইতেছেন। নারীকে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া ঔষাদিকক অগ্রসর হইতে হইবে। এই লক্ষ্যে হৃদয় কর্তৃক কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য ‘ভারত-মহিলা’র জন্ম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ‘ভারত-মহিলা’ এতদ গুণবিশেষ চিত্তবিনোদন পুস্তক ও ভবিষ্যৎ নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক চিন্তার কল বর্ষীয় পার্শ্বক পাঠ্যকাগণের নিকট উপস্থিত করিবে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানেন উন্নতিসাধকে অস্বস্তি বিম্বও ইহাতে আয়োজিত হইবে।”

‘ভারত-মহিলা’ প্রথম কয়েক বৎসর সগৌরবেই চলিয়াছিল। ইহা ১৩ বৎসর জীবিত ছিল।

জাহ্নবী। ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসে নসিরীনরতন গুপ্তিভের সম্পাদনায় ‘জাহ্নবী’ নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার ৩য় বর্ষ—১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন ‘অক্ষকণা’-রচয়িত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন—

“জাহ্নবীর উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, যেটাছুটি সাহিত্য্যোল্লাসই বলিতে হয়। কিন্তু জাহ্নবীর মনে এই বহু চক্ৰকৌণিত মুগ্ধভাভে সত্যায়ের শিক্ষা লীকা যে নূতন পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর, তাহা নূতন করিয়া না বলিলেও চল। এই পল্লিম প্রসিয়ার মনে যে একপ্রাণতা, বন্ধন-বৃত্তান্ত আবদ্ধক, জাহ্নবী তাহারই প্রাণিনী। মুখ্যতঃ নির্দিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের লক্ষ্যে ও বর্গায়েল্লাসই জাহ্নবীর জীবন-উত্ত।”

সুহৃৎভাবে তিন বৎসর (১৩১৪-১৬) পত্রিকা পরিচালনার পর গিরীন্দ্রমোহিনী অবসর গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে ‘জাহ্নবী’ও লুপ্ত হয়।

সুপ্রভাত। ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে ‘সুপ্রভাত’ পত্রের উদয়। এই সচিত্র মাসিক-পত্রিকার সম্পাদিকা—কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা হুম্মিনী মিত্র (পরে ‘বহু’)। ‘সুপ্রভাতে’র কঠে এই কবিতাটি শোভা পাইত—

“সত্য সেবা ত্রুতে নিখিলান্ত কর

নরপতি লব্ধ দুর্জয়,

একতা নব্বয় বঙ্গল ডোরে

তস্তা অলসতা ছুটবে।”

মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রগুলির মধ্যে ‘সুপ্রভাতে’র স্থান অতি উচ্চে; নব বৎসর যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইবার পর ইহা সুপ্ত হয়।

গৃহলক্ষ্মী। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে শান্তিময়ী সেনের সম্পাদনায় এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষেই বোধ হয় ইহা সুপ্ত হয়।

ভারত-লক্ষ্মী। ১৩১৭ সালের চৈত্র মাসে এই নামের একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা বোগমারা মাতারী উপস্থানীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

মাহিষ্ঠ-মহিলা। ইহা একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা; ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে উদয়পুর শান্তিনিকেতন (নবীরা) হইতে কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ‘মাহিষ্ঠ সমাজের অগাধ বেহে শক্তি সঞ্চার করিবার নিবৃত্তিই’ ইহার আধির্ভাব। ইহাতে ‘রমণীগণের কর্তব্য, শিক্ষা-নীতি, ঐতিহ্য-নীতি, আচার-ব্যবহার, পাতিব্রত্যাধর্ম, সন্তান-প্রতিপালন, গুরুজনের প্রতি ব্যবহার, রত্ন-প্রণালী, মুক্তিযোগ, মহাত্ম্যরত্ন নীতিকথা, প্রভৃতি ব্যবহার্য গ্রীষ্ম সংগৃহীত হইয়া বিপদভাবে আলোচিত’ হইত। ‘মাহিষ্ঠ-মহিলা’ অনির্দিষ্ট ভাবে চার-পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল।

প্রেম ও জীবন। মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; সম্পাদিকা—হেমলতা দেবী। ১২ নং ক্রমের মিল লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা। এই “সঙ্গীত বিষয়ী মাসিক পত্রিকা” ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর সম্পাদক্যে প্রকাশিত হয়। ইহাদের যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাখানি আট বৎসর—১৩২৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—

“আমাদের দেশ হইতে বিত্তম্ভ আর্থ সঙ্গীতের গৌরব ভরণ; লোপ পাইতে বসিয়াছে। বহিঃ সঙ্গীতের উন্নতিক্রমে দুই একটি সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কিন্তু সেগুলির দ্বারা সঙ্গীতের পিকার রূপ বিশেষভাবে কোনও উজ্জ্বল হয় নাই। আমরা দেশ হইতে সেই অভাব মোচন করিবার জন্য ‘সঙ্গীত সঙ্গ’ নামে একটি শিক্ষণীয় স্থাপন করিয়াছি। বাহ্যতে সঙ্গীত ও বঙ্গাধি বাসনে বালক বালিকাপক্ষে ধর্মাত্মিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভক্তদের বিভিন্ন আদেশের ভূমি সঙ্গীতরচনাদের একই সুব্যবস্থা করিয়া আর্থ সঙ্গীতের শিক্ষাপ্রণালী বাহ্যতে বঙ্গাধি সম্পন্ন হয় তাহার জন্য এই বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতের অনেক তথ্য ও অনেক বঙ্গাধি লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এমন সব-কাল পড়িতেছে যে মনে হয় সুখ বা অর্থ শতাব্দী যবে আধুনিক ও আধ্যাত্মিক লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিশেষ সঙ্গীত ও বাসনায় স্থান অধিকার করিয়া বসিবে।”

“সহজে গান শিক্ষা হইবার অভিপ্রায়ে একটি সঙ্গীত-পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইহার নাম “আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা” রাখা হইল। এই পত্রিকা বাহির করিবার যুগ উদয় এই বহুদিন শিক্ষা করিয়া গানগুলিকে সহজে শিখার আরম্ভে আনা। এখন অনেক নানা প্রণালীতে শিখার হিম্মত বহুদিন বাহির করিয়া গানগুলি শিখিত করিতেছেন। আমাদের দেশের গানগুলি কত রকমে লোপ হইয়া গিয়াছে উপলব্ধ হইতছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এক বাহ্যতে একটি স্থানীয় হয়

ভবিষ্যে সকলে চোঁটী করিতেছেন ইহা বুঝ দূরের বিষয়। গাণিত্যে গানের শব্দ অসংখ্য গান গাইতে পারা যায় না। ঘর তাল করে শব্দওমি হুত্ব ইহা কঠিনের বাহির হওয়া চাই। একটি কথা আদি বলিতে চাই। নানা অশালীতে সঙ্গীত নির্দিষ্ট করিবার উপায় বাহির না করিয়া সহস্র সাত্তিকিক ভিৎসের যাত্রা সহস্র সাত্তিকিক বাহ্যতে বোধনো হয় এখন উপায় এক। যেটি বহু বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি আনবের যত্ন অবলম্বন করা উচিত। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামে একটি সঙ্গীত পত্রিকা অনেক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে নানা দেশের গান আবার পুস্তকাগার শ্রীকৃষ্ণ চোড়রিপ্রকাশ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যমিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এত দিন নির্দিষ্ট হইয়া চলিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ চোড়রিপ্রকাশ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক বহু বৎসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁঁচি বাস করায় এক আশাও অজ্ঞাত কারণে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বড় ভ্রমের বিষয় যে এত বড় কার্যের ক্ষতি কেহ মহামুখি বোঝা নাই, কত উল্লস বতাবাস মহামুখ বহু ইংরাজী মহাশয় আছেন তাঁহারা অন্যান্যে কর্তব্য সাধনা করিয়া এটি রক্ষা করিতে পারিতেন। আদি এক শ্রীমতী ইলিঙ্গ দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার হার হইয়া যদি কিছু করিতে পারি সেই চোঁটী করিতে উক্ত হইয়াছি। সকলে অসুগ্রহ করিয়া ইহা চোঁটী করিয়া শিক্ষা করিয়া দেখিবেন কত সহস্র উপায়ে এই পত্রিকা অসুগ্রহে গান শিক্ষা করা যায়। সঙ্গীত নামে গত গান হিন্দুস্থানী ও ব্রজগীত ইত্যাদি ছাত্র ও ছাত্রীসকলে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। এক অজ্ঞাত সঙ্গীতও প্রকাশিত হইবে।

"সঙ্গীত যে কাহারও বস্তু তাহার উপভোগিতা বুঝ সাক্ষ্যে বসিয়া মহাশয় গান শিক্ষার পদ্ধতি অশালী এই পত্রিকাতে দেখাইয়া দেওয়া হইবে।" যে অশালীতে যে পত্রিকা পদ্ধতি অসুগ্রহে সঙ্গীত-প্রকাশিকা এত দিন প্রকাশিত হইয়াছিল আবার গান ও সেতারের গতির হয় নির্দিষ্ট পাঠকরিতের শিক্ষার ক্ষতি সেই অশালীতে পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইহার এখন মূল্যপাত্রে মোটামুটি বহানত বিবেচনা ঠাকুর 'ভববাগিনী'তে বাহির করিয়াছিলেন ইহা আর ১০ বৎসরের কথা। ইহার সহস্র সাত্তিক একবার নির্দিষ্ট লইলে গান শিক্ষা অনেক সহস্র বোধ হইবে।"

বর্তমান সভাপতির তৃতীয় বঙ্গ হইতে অসংখ্য বঙ্গীয় পত্রিকার আবির্ভাবে আনন্দা জর্জরিত হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেশের নারী-সমাজও পিছাইয়া থাকেন নাই। পশ্চিম হইতে প্রগতিস বঙ্গা আশির্বাদে, পুস্তকবের সঙ্গে তাহারও প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। তাহারও তাহাদের কথা নিজের ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং প্রগতিমূলক বিবিধ পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করিতে তাহার প্রয়াস পাইয়াছেন। শিশুদের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে আবার ছাত্রছাত্রী তাহার নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা-বিষয়ক প্রচার চাহিয়াছেন, সে সম্পর্কেও নানা পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছে। মূল্যমান মহিলা সমাজেও নব জাগরণ আশির্বাদে, তাহারও বঙ্গাশাখা এই উদ্ভবে বোধ বিধাছেন, নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও মেয়েরা পক্ষাংশ থাকিতে চাহেন নাই। রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সাধারণ ও মূলগত পত্রিকাও তাহার বাহির করিয়াছেন। অধিকাংশই স্থায়ী হয় নাই। নাম পাইয়াছি কিন্তু পত্রিকা সংগ্রহ করা যায় নাই; আনবের সাধারণত সন্ধান করিয়া বিলুপ্তি গর্ত হইতে যে-কয়টিকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি সে-কয়টির উল্লেখ করিলাম; পরবর্তী অসুগ্রহণকারীর আশা করি আবার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান হইবেন। তবে মনে হয় দীর্ঘস্থায়ী অথবা উৎকর্ষের দিক দিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার বোধ্য পত্রিকাগুলি বোধ হয় বাস পড়ে নাই।"

১. বেতারের মূল-কলমে হইতে সাময়িকভাবে পত্র-পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে। কৃত্তান্তর সীতা দেবী-সম্পাদিত মাসিক 'দীপিকা' (প্রাথমিক শিক্ষা, কলকাতা ১৯২৭), প্রবর্তিত ৩২-সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'দীপিকা' (গোলা বাসিকা বিভাগ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৯২৭), দুই বঙ্গাশাখার-সম্পাদিত 'দীপিকা' (শিবপুর ভবানী বাসিকা বিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৯২৭) পত্রিকার উল্লেখ

পরিচায়িকা (নব পর্ধ্যায়)। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাদিকা—কুচবিহারের রানী নিকুপমা দেবী; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১৩২৩। পত্রিকার কণ্ঠে 'তে প্রাপ্ত বৃত্তি মাদেব সর্বভূতহিতে সত্য' এই শ্লোকটি শোভা পাইতে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদিকা শিবিয়াছিলেন—

"পরিচায়িকার নব পর্ধ্যায় বাহির হইল। সে অনেক দিনের কথা—যেহ হুঃ বৎসরের কথা, যখন বাঙ্গালা দেশে পরিচায়িকার প্রথম আবির্ভাব হয়। তখনকার সবার ও এখনকার সময়ে অনেক প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য তিনিষ্ট। যোগ্য নর নর্য্যে ও সর্ব কালে বিরূপ একটা ধাতবের উপর ধাতা হইয়া থাকিতে চায়, সুতরাং তখনকার দিনে যুগ ভাবে বাহ্য প্রকাশকার মত প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনকার দিনে পরিবর্তনের বহু দিন ঐক্য যদি সে সেই উদ্দেশ্যেই আবার আনিয়া থাকে, তবে তাহার লগাটে যোগ্য হইয়া যাক্‌র হাপ পড়িবে না।"

রানী নিকুপমার সম্পাদনায় নব পর্ধ্যায়ের 'পরিচায়িকা' আট বৎসর (১৩২৩-৩১) হইতাবে চলিয়াছিল।

আয়েশা। ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে, বেগম সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; নারীকল্যাণই ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। 'আয়েশা' মোহম্মদ আবদুর রসিদ সিদ্দিকী কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিচালিত হইতে।

বাল্মার কথা। ১৩২৮ সালের ১৪ই আশ্বিন, শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় 'বাল্মার নবযুগের সাপ্তাহিক নৃপনয়' 'বাল্মার কথা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় 'বাল্মার কথা' প্রগতিশীল সম্পাদক বাহা শিবিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব জাগ্রত জাতিবিশেষ প্রতি দৃষ্টি রাখিবার, আমাদের ইতিহাসের যথাক্রমে উপলব্ধি করিবার ও সত্যিকারি রাখিবার আমাদের দেশের সকল বিদ্যেবর্ধন অথবা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বাভাবিক-সমস্ত অশুচি সামাজিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারণিত করিতে হইবে।

"আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রার্থনা নিম্নে এই যে, বাল্মার কথা যেন অতিবে বাঙ্গালীর কার্যে পণ্ডিত হয়। সমস্তে চেষ্টা চাই, সকলের উত্তম চাই, বাঙ্গালীর পার্থক্য চাই। এই যে জীবন-সম্মত, ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র-প্রাণে আয়ত্ত করিতে হইবে। সকল বিদ্যে, সকল বার্য ইহাতে আৱত্তি বিতে হইবে। ইহাতে বর্ণবর্ণবিশিষ্টেই সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্তব্যের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অবিকার আলি আধার দাবী করিতেছি, তাহা মুক্তি-সম্মত, প্রাচীন-সম্মত, আমাদের স্বাভাবিক-সমস্ত, মানুষের স্বাভাবিক অবিকার-সম্মত, আমাদের বর্ণ-সম্মত, প্রবর্তের বর্ণ-সম্মত। এই অবিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।..."

চিত্তরঞ্জন কান্দাবরণ করিলে তৎপত্নী বাসন্তী দেবী ১২শ সংখ্যা (২৩এ ডিসেম্বর ১৯২১) হইতে 'বাল্মার কথা'র সম্পাদিকা হন। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহাতে শরৎচন্দ্রের অনেক স্থলিখিত প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। 'দুঃশ্রমব্রহ্মণ' 'নিষ্কার বিরোধ', "স্বয়ং সাধনায় নারী", "গতা ও বিধা", "মহাস্বামী" প্রভৃতির উল্লেখ করা বাইতে পারে।

নব্যভারত। এই স্থপতিচিত্র মাসিক পত্রখানি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯২০ সালের

করা বাইতে পারে। 'কিপোর্ট' (প্রথম দেবী-সম্পাদিত, আশ্বিন ১৩৩০), 'জগৎবাণী' (জাহান-আরা চৌধুরী, পৌষ ১৩৩২); গয়-বৎসর হইতে 'বর্ষাব্যয়' নামে, 'সোনার কাঠ' (রাধাকান্তী দেবী, আশ্বিন ১৩৩৪), 'উৎসব' (শোভা দেবী-সম্পাদিত, বাণ ১৩৪২) প্রভৃতির মত বার্ষিক সম্মেলনও প্রকাশিত হইয়াছে। আবার এই মাসিক-পত্রের বিধব সম্মেলন করিবার চেষ্টা করি নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রভাতকুমার রাথ চৌধুরী 'নব্যভারতে'র প্রচার অব্যাহত রাখেন। সপ্তমসংখ্যায় তাঁহার মৃত্যু হইলে (১২ ভাদ্র ১৩২৮) ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কাষ্ঠিক যুদ্ধ-সংখ্যা হইতে তৎপত্নী সুনন্দিনী রাথ চৌধুরী 'নব্যভারতে'র সম্পাদিকা হন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৩৩২ সাল (৪০তম বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত ছিল।

শ্রেয়সী। ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসে কিতিনোহন সেন শাস্ত্রীর পত্নী কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় শান্তিনিকেতন হইতে এই দাশিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কণ্ঠে দ্বিচ্ছিন্ননাথ ঠাকুরের অমৃত্যবাহু লহ কণ্ঠোপনিষদের এই স্লোকটি মুদ্রিত হইত—

"শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ নমুঃশ্রেয়ঃ—

শ্রৌ নন্দরীত্য বিবিন্ধ কীনাঃ

তয়োঃ জেহ আনবানন্ত সাধুর্ভবতি।

ইদমতৎসংখ্যং ৮ ষ্ট শ্রেয়ঃসিইতে।"

"জেতঃ জেহ লবাইকে শায়।

লোবং বেছে' ভ্রায্ বে শৌচা চায়।

বে ভ্রায, শ্রেয়ঃ—সে শায় কুল।

বে ভ্রায, শ্রেয়ঃ—গোষ্ঠায় কুল।" —কর্ত্তাশ্বিনিসং, ১ম অধ্যায়, ২য় বর্গী, ২য় প্রাচক

প্রধানতঃ শান্তিনিকেতনবাসিনী মহিলাদের রচনা 'শ্রেয়সী'তে স্থান পাইত। স্বাধীনতাযুদ্ধের অনেক রচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। এক বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানি 'শান্তিনিকেতন' পত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত পত্রের "নারী-বিভাগ"রূপে কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় ১৩৩০ সালের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্যন্ত 'শ্রেয়সী' জীবিত ছিল।

সেবা ও সাধনা। ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাসের সম্পাদনায় এই দাশিকপত্র প্রকাশিত হয়। বিত্তীয় বর্ধের পত্রিকা একা ইন্দুনিভা দাসই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাক্ত-মন্দির। ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসে এই সচিত্র দাশিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে অন্ততঃ সম্পাদক অক্ষয়কুমার মল্লী প্রথম বর্ষের শেষে লেখেন—

"সেয়েদের দ্বারা সাধারণ রকম কিছু কিছু উপদেশ দেওয়াই এই উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের ইন্দুমিত্র মুক্তোত্তরী ওগার্কসের বিজ্ঞাপন-গ্রন্থ—এ ব্যবসায়বৃদ্ধিহীণ ও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। ছুই তিন সংখ্যা বেশ হবার পর বোকা বেশ, 'হুগ সেবা আর কলা বেচা' একসঙ্গে করতে গেলে রকম-বর্ণন সার্থক হয় না, আগের নিবেদন ঠাঁহুয়ের কাজ পোঁতে না। আমরা অকস্মৎ ইহাকে মহিলাদের পক্ষে সর্বতোভাবে উপযোগী একখানি আবর্ণ দাশিক পত্রিকায় পরিণত করতে চেষ্টা পেরেছি।" (চৈত্র, ১৩৩০)

প্রথম পাঁচ বর্ষ (১৩৩০-৩৩) সুরবালা দত্ত এবং পরবর্ত্তী পঞ্চম ও ষষ্ঠম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত হুন্সী মল্লী 'মাক্ত-মন্দির'র যুদ্ধ-সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর পত্রিকাখানির প্রচার বহিত হয়।

বঙ্গনারী। ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহ হইতে এই দাশিকপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদিকা—চিন্নরী দেবী।

শ্রমিক। সত্যোদকুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় এই নামের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরা হিতৈষী। ১০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে গুরুনগলে সিংহের সম্পাদনায় কুমিল্লা হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কমনীয়কুমার সিংহ শিষ্টপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি জীবিত রাখেন। ১০৩১ (?) সালে কমনীয়কুমারের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা—উষ্মিলা সিংহ অনেক দিন ‘ত্রিপুরা হিতৈষী’ পরিচালন করিয়াছিলেন।*

বঙ্গলক্ষ্মী। ১০৩২ সালের অগ্রহায়ণ (১২২৫, নবেম্বর) মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীবঙ্গল সমিতির মুখপত্ররূপ ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়—

“বাংলা দেশের নব্বয় নগরে, গ্রামে গ্রামে, পরীতে পরীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া ভাষাকার নারীগণের শিক্ষা, পোষা, শিল্প, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য ‘সরোজনলিনী দত্ত নারীবঙ্গল সমিতি’ নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহাই মুখপত্ররূপ ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ বাংলা নারীসমাজের সেবার জন্য প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাংলার মহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা, নারীশিক্ষার অবস্থা এবং নারীজাতির উন্নতিবিষয়ক অবস্থাাদি প্রকাশিত হইবে।

“সম্মতভাবে কাঁধে না করিলে এ যুগে কোন কাঁধে সকল ইহার সম্ভাবনা নাই। নারীগণও তাহাদের উন্নতিসাধন নিমিত্ত-ভাবে করিলে ভাষা সহজসাধ্য হইবে। দৃঢ়তা প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পরীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া নারীগণ বাহ্যতে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সেই মহত্ব সুরম্য সত্যটি নারীসমাজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্মৃতি করিয়া দেওয়াই ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ প্রধান উদ্দেশ্য।”

‘বঙ্গলক্ষ্মী’ আগাগোড়াই মহিলা-হস্তে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সম্পাদিকাগণের কার্যকাল এইরূপ—

১০৩২ অগ্রহায়ণ—১০৩৩ চৈত্র	হুম্মিশী বর, বি. এ.
১০৩৪ বৈশাখ—কার্তিক	লজিকা বর, বি. জিউ (অমল)
১০৩৪ অগ্রহায়ণ—১০৩৫ কার্তিক	হেমলতা দেবী (গৌড়)
১০৩৫ জ্যৈষ্ঠ	হেমলতা দেবী, শান্তা দেবী ও আশুতি বর

পাণ্ডিত্য। ঢাকা হইতে বিভাবতী সেনের সম্পাদনায় ‘পাণ্ডিত্য’ নামে ছোট্টদের একখানি সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—১০৩৪ সালের বৈশাখ-অষাঢ় মাসে। পর-বৎসর ইহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় এবং “১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা” প্রকাশিত হয় ১০৩৫ সালের আশ্বিন মাসে।

অর্ঘ্য। ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ফাল্গুন, ১০৩৪; সম্পাদক প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর।

তত্ত্বগণ শক্তি। মানকুমার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের বঙ্গিগণ ও আশ্রমের মুখপত্ররূপ এই পত্রিকাখানি জন্মগ্রহণ করে; পুষ্টিলাভ হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ১০৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা রামনৈতিক অপরোধে কারাবরণ করিলে ‘তত্ত্বগণ শক্তি’র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন রামবালা দেবী।*

আলোক। আলোক-সম্বন্ধে মুখপত্ররূপ এই মাসিকপত্রখানি প্রস্তাবতরুণ বিদ্যালয় ও আশ্রিত

দেবীর সম্পাদনায় ১০০৬ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে ১ম সংখ্যার প্রকাশ—“মহিলাতো একটি বিশিষ্ট পথিকে লেখক সমাধে ও পাঠক সমাধে হৃদয়প্রতিষ্ঠিত করা তোলাই হচ্ছে এর কাজ।”

মুক্ত। সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; পরিচালিকা—তরুণালা সেন; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, শনিবার।

জয়ন্তী। ১০০৬ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র সাপ্তাহিকপত্র প্রথমে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। নীলাবতী নাগ (পরে ‘রায়’) ইহার সম্পাদিকা। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য—“বর্তমান যুগের বেগেবেগ চিন্তা ও কর্মের গতি নির্দেশ এবং ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন কার্যে স্থান গ্রহণের সহায়তা করা।”

‘জয়ন্তী’র ভাগ্যে একাদিক বার সহকারী লাহেনা ঘটগাছে, ফলে মাসে মাসে পত্রিকাখানির অবর্ণন ঘটগাছে। প্রথম বারে প্রায় বেড় বৎসর বন্ধ থাকিয়া, ১০৪৪ সালের আষাঢ় মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানির প্রচার ছয় বৎসর বন্ধ থাকে। ১০৪৬ সালের ফাল্গুন মাস (১১শ বর্ষ) হইতে ‘জয়ন্তী’ পুনরায় প্রচারিত হইতেছে; এই সংখ্যার সূচনাও সম্পাদিকা লিখিয়াছেন—

“দীর্ঘ ছয় বৎসর পর জয়ন্তী আবার উপস্থিত করছে তার বক্তব্য দেশের কাছে।”

‘জয়ন্তী’র বক্তব্যের কথা কি? সার্বজনীন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়ন্তী করে চলছে আশোবহীন সংগ্রাম। কিন্তু কেবলমাত্র পরাধীনতা বৃদ্ধি করার খ্যাতি নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে না। নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দিক নিয়ে, তার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ নিয়ে জয়ন্তীর লক্ষ্য ও পরিচালনা কখনো তার পাতায় প্রকাশ পাবে।

“রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘জয়ন্তী’ সমাজতত্ত্ববাহী। তবে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে সে বীকার করে না। সংস্কৃতি ও সমাজকে জড়বাহী ব্যাখ্যার পরিবর্তে বহুবাহী ব্যাখ্যার সে বিচারী। বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন মধ্য দিয়ে সে তার বক্তব্যকে উপস্থিত করতে চেষ্টা করে।”

‘জয়ন্তী’ মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা; বিভিন্ন সময়ে বাহার্য ইহার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল—

১ম বর্ষ, বৈশাখ-১০০৮	১০০৮	নীলাবতী নাগ
২য় বর্ষ, ১০০৯	১০০৯	লক্ষ্মীলা দেবী
৩য় বর্ষ, ১০১০	১০১০	ঐ. গীর্জাশ্রী রায়, এম. এ. (লেখক)
৪র্থ বর্ষ, ১০১১	১০১১	উদারাসী রায়
৫ম বর্ষ, ১০১২	১০১২	ঐ
৬ষ্ঠ বর্ষ, এপ্রিল বন্ধ ছিল		
৭ম বর্ষ, আষাঢ় '৪০ - ফোর্ব '৪০		নীলাবতী নাগ
৮ম বর্ষ, আষাঢ় '৪০ - ফোর্ব '৪১		নীলাবতী রায়
৯ম বর্ষ, আষাঢ় '৪১ - ফোর্ব '৪১		নীলা রায়
১০ম বর্ষ, আষাঢ় '৪১ - ফোর্ব '৪১		ঐ
১১ম-১৩ম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪২ - বৈশাখ ১৩৪৩		ঐ

অজুৰ। ইহা ছোটবের মাসিকপত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৮ (আগষ্ট ১৯৩১)। সম্পাদক রে: অরেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথম সংখ্যায় লেখেন—

‘তোমানের মানব ও শিক্ষা বিষার অভিজ্ঞতার উন্মেষ্ট ইহা হইছে।—আমি সং উদ্দেশ্যে দেশের মানব মানিকদের কল্যাণার্থে পর দুলা ইহা প্রকাশ করিলাম। এই কাগজখানি ভারতবিখ্যাত *Treasure Chest* নামক ইংরাজী কাগজের সঙ্গে সঙ্গিষ্ট। উক্ত কাগজখানি যে ভাল ও বিবর কাহারাও অবস্থিত নহে, দূতরাঃ উক্ত কাগজের অনেকাংশ বাছালায় তর্জমা হইবে এবং যে সকল মানব মানিক ইংরাজী জানে না তাহারাও তাহা পড়িবার সুযোগ পাইবে।’

চতুর্দশ বর্ষ (আগষ্ট ১৯৪৭) হইতে ‘অজুৰ’ লাবণ্যপ্রভা মল্লিক, বি. এ., বি. টি-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

মহিলা বাজব। মহিলাদের এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন মিশনরী মহিলারা। অবশ্য বোলপুর হইতে প্রকাশিত ১৯৩২ সনের পত্রিকা (৪৮শ ভাগ) দেখিয়াছি; উহা মিসেস্ এল. কে. বণল-সম্পাদিত।

বুলবুল। এই পত্রিকাখানি বৎসরে তিন বার প্রকাশিত হইত। ময়মন হবিবুল্লা ও শামসুন নাহার ইহা সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪০। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকে পরিণত হয়। ‘বুলবুল’ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে লুপ্ত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।

আগন্তুক। পরিমল মিত্রের পরিচালনায় এই মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে।

ঐক্যকেন্দ্রন গেজেট। ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসে অজুতপা দেবী (কুমারদেবী মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে) এই সাম্প্রতিক বার্তাবাহুর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

অদ্বুতব ও সাহিত্য। এই নামের একখানি মাসিকপত্র স্রোতঃপ্রাহাঙ্গি সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়।

গৃহ-লক্ষ্মী। ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি (শারদীয়া সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা—কনকপ্রভা দেব “নিবেদনে” লেখেন—

‘দেশের এই বহা দুর্দিনে নারী এসবিত পতি ও একতিকে হানিরহিত করিবার তাহাণের চিন্তা ও কর্তব্য সমাজের কল্যাণ ও নবজের পক্ষে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন অস্বীকৃত হইতেছে। এই উদ্দেশ্য লাভ করিতে সংবাদপত্রের সাহায্য নিত্য প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ঐহট, তথা সমগ্র আসামে বাস্তবজীবিত উন্নতিবিধায়ক নারী পরিচালিত কোন সংবাদপত্র নাই। সেই অভাব ধরাগোচর হুই করিবার বালা ও আশাবের নারীজাতিকে জনগণেরো করিবার তুলিবার দত্ত আমার জুর পতি হারা এই ‘গৃহ-লক্ষ্মী’ নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালনার হৃদকেন্দ্র করিলাম। আমি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম,—আমি আমার এই হৃদিত দেশে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে বাণী বিড়ম্বনা মাত্র। এ পথ কষ্টকালীণ—পথে পথে লাহনা ইহার পুংকরা। তবুও ইহা বাধ্য পাঠিকা লইয়াছি। তরুণ—রা, তরুণী ও কনকমাসিকদের সাহায্য ও সহায়হৃদিত আমার এ কুর প্রচেষ্টাকে সাফল্যবশিত করিবার তুলিবে। আমার এ অসংখ্যতার তিতর বিদ্যাও যদি নারীজাতির কল্যাণ উন্নতি সাধিত হয় তবে মৌল সাধক মনে করি।’

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের প্রায় এক বৎসর পরে “ভাব ১৩৪৫” সংখ্যা প্রকাশিত হয়; এই সংখ্যাটিকে “প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা” বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয়

সংখ্যা—“শারদীয়া সংখ্যা”; ইহাতে ২২-২-৩৬ তারিখে টেনে লিখিত “রাষ্ট্রপতি হুজুবেস্ত বহুৎ বাণী” মুদ্রিত হইয়াছে। ‘গৃহ-লক্ষ্মী’র ১ম বর্ষ, ৩ষ্ঠ সংখ্যা—মাঘ ১৩৪৫ হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয়—‘জাগৃহি’ “আমাদের মহিলা-পরিচালিত একমাত্র বাংলা মাসিক”। এই সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যো বলা হইয়াছে—

“‘গৃহলক্ষ্মী’ নাম ‘জাগৃহি’ নাম রাখা করিয়া পার্শ্বকণ্ঠিকার দিকট উপস্থিত হইয়াছে। এক বিবেচনায় আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক লেখিকাদের তাগিদ অপর বিবেচনায় নারী আন্দোলনের নৃশংসরূপে ‘গৃহলক্ষ্মী’র নাম পরিস্রবন অস্বাভাবিক তাই আম ‘জাগৃহি’ নারী জাগরণের বার্তা যখন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা আমাদের আশ্রয় ও কর্তব্যের দৃষ্টেই দৃঢ় করিয়াছি। নারীজাতির মুক্ত্যের সন্ধিতে যেনার অবলাই আমাদের আশ্রয়।”

আমরা ‘জাগৃহি’র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাইয়াছি; তাহার পর আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না।

মন্দিরা। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ—

“পত্রিকার নাম ‘মন্দিরা’ কেন হল সে সম্বন্ধে কিছু বলা বরকার। আপা করি ‘মন্দিরা’ নিজেই নিজের পরিচয় দেবে এবং সেটাই হবে সব চেয়ে ভালো পরিচয়। শুধু উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে কিছু বলা বরকার।

“জাতির জীবনে আম চোরা পতিবনে এসেছে। জাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—সর্ববিধেই আজ নৃষ্টি-অভিযান দৃষ্ক হচ্ছে। এই নৃষ্টি-অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় ‘মন্দিরা’।”

প্রথম দশ বৎসর ‘মন্দিরা’র সম্পাদন-ভার মহিলা-হস্তেই স্তৃত ছিল। তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল এইরূপ—

১৩৪৫ বৈশাখ - ১৩৪৬ চৈত্র	কমলা চট্টোপাধ্যায়
১৩৪৭ বৈশাখ - ১৩৪৮ শ্রাবণ	কমলা দাসতত্তা
১৩৪৯ ভাদ্র - ১৩৫০ অগ্রহায়ণ	শ্রেয়লতা সেন
১৩৫০ পৌষ - ১৩৫১ চৈত্র	কমলা দাসতত্তা

বিজয়িনী। শিলচর হইতে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশকাল—আশ্বিন ১৩৭৭; সম্পাদিকা—অরুণ চন্দ্রের সহধর্মিণী স্যোংরা চন্দ্র, বি. এ.। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে সম্পাদিকা এইরূপ লেখেন—

“মহিলা সমাজের বিষয় একটি নৃশংসের অস্বাভাবিকতা অস্বত্ব করিলেও এখনকালে মাসিক পত্রিকা পরিচালনের পৌনঃপৌনিক বার্ষিক্যের কথা ভাবা করিয়া বহু ভাব ভাবনার মধ্যে অবশেষে স্থায়ী ‘নারীকল্যাণ সমিতি’র উদ্যোগে ও সাহায্যে নারী সমাজের সেবাকারে ‘বিজয়িনী’ নামক মাসিক পত্র লইয়া আশ্বিনের সাপ্তাহে উপস্থিত হইলাম। • • • আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ব্যারোমিটার কবিতার ব্রীজনাথ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করিয়া সময়েই ইহার নামকরণ করিয়াছেন। • • • আমাদের মহিলাসমাজে হুঃ সহায় সম্বলহীনতার সংখ্যা অসংখ্য। বিজয়িনী একজন দ্বারা আর্থিক কোন লাভ হইলে তাহা হুঃ সমাজের কল্যাণার্থে ব্যয় করিবার এক পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি।”

আমরা প্রথম বর্ষের ‘বিজয়িনী’র সংখ্যাগুলির সন্ধান পাইয়াছি। তাহার পর বোধ হয় ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

শিক্ষা। এই মাসিকপত্রখানির প্রথম প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ

সম্পাদিকা—অধ্যাপক

প্রিয়বর্তন সেনের সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা সেন। পত্রিকার কঠে এই লোক্যাংশ মুদ্রিত আছে—“ন হি কলাপকং কশিৎ দুর্গতিঃ তাত গচ্ছতি”। “শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নহে।” প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত “আমাদের কথা”র প্রকাশ—

“সবস্ত্র হরণ এখন রণকোলাহলে পকারমান, আমাদের অস্ত্রিত্ব এখন গোলাঘরান, আমরা সেই সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করিলাম; কারণ দশ দিন বাঁচিয়া নাহি তত দিন অস্ত্রাত্র অয়োজনীয় কাজ বধি করিতে পারি তবে ইহাই বা কেন পারিব না? শিক্ষার পত্রিকাও, তাহার আলোচনা ও বিচার, শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপার, সাময়িক উত্তেজনার কল নহে। আমাদের দেশে যাহারা এ বিষয়ে কথিত্যছেন ও কারিত্যছেন তাহাদের সাধনার কল আমরা কিছু পরিমাণে পাইতে পারিব, এবং তাহাতে আমাদের চিন্তাও পরিষ্কার লাভ করিবে, এই আশায় ‘শিক্ষা’ পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করা গেল।”

‘শিক্ষা’ এখনও চলিতেছে। কেবল মধ্যে এক বৎসর চারি মাস ইহার প্রচার বন্ধ ছিল; দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ৮ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪২) পর্যন্ত চলিবার পর তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৩৪৩, অগ্রহায়ণ হইতে।

আশ্রমী। কেশবলাল বসু ও কমলবাসিনী দেবীর সম্পাদনায় রংপুর হরিশভা হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাবানি প্রকাশিত হয়—১৯৪১ সনের ১লা আশ্বিন।

মেয়েদের কথা। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে এই মাসিক পত্রিকাবানি প্রকাশিত হয়। কল্যাণী সেন, এম. এ. ইহার সম্পাদিকা। “বন্দ্যাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালী মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগস্বাপন ও পরস্পরের সহায়তার আদর্শ ও কল্পনার উন্নতি” ইহার উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্গত ছিল।

‘মেয়েদের কথা’ নানা কারণে নিষিদ্ধভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; হারে হারে অবদর্শনও ঘটয়াছে। ১৩৫০ সালে চতুর্থ বর্ষের পত্রিকা প্রচারিত হইবার পর ইহার বিলুপ্তি ঘটে।

জাগরণ। ত্রৈমাসিক পত্র, বাঁকুড়া তঞ্চী সম্বন্ধে হইতে তুলতানা বেগমের সম্পাদনায় ১৩৪৮ সালের আষাঢ় (১৯৪১, জুলাই) মাসে প্রকাশিত। ইহা ছয় সংখ্যা প্রকাশের পর অদৃষ্ট হইয়াছিল।

অবান। অরুণকুমারী রায়ের সম্পাদনায় এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসে বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত হয়।

প্রজাতা। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাবানিও বাঁকুড়া হইতে স্থা ঘোষের সম্পাদনায় ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২।

অর্জুন। ১৩১০ সালের কান্তন মাসে জানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ‘অর্জুন’র প্রথম আবির্ভাব। এই মাসিকপত্রের ৪০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) হইতে চিত্রিতা দেবী অগ্রস্তর সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

মাতৃভূমি। এই মাসিক পত্রিকার ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৫২) হইতে অমিতা দত্ত-হজুমহার, এম. এ. সম্পাদনায় গ্রহণ করেন।

পত্রিকোত্তর। এই শুক্ল-সংকলনের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—গ্রীষ্ম ১৩৫৩। সম্পাদিকা—কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। চারিটি সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা বিলুপ্ত হয়।

মহিলা। বীণা গুহ, এম. এ.-র সম্পাদনায় “মহিলাদের একমাত্র মূখপত্র” ‘মহিলা’ প্রথম প্রকাশিত হয়—১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসে। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে প্রথম সংখ্যার প্রকাশ—

“মহিলাকে সমসাময়িকতার পরিবেশন করিতে পর উপভোগ করিতা রমণ্যবৃত্তি ও অব্যাহতি, যেমন সব কাগজে থাকে, তেমনি

১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর শতীক্ষনাত্মক শোচনীয় ভাবে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী অংগুরাণী মিত্র পঞ্চম সংখ্যা (আখিনি ১৩৫৪) হইতে 'সংগঠন' পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা হইতে 'সংগঠন' মাসিকপত্রে উপস্থাপিত হইয়াছে।

বেগম। নূরজাহান বেগম ও হুজিরা কামালের সম্পাদনায় "মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক" 'বেগম' প্রকাশিত হয়—৩রা জানুয়ারী ১৩৪৪ (২০ জুলাই ১৯৪৭)। ইহা মুসলিম নারীদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত। "নারীর সর্বাত্মক উন্নতি ও মঙ্গল তথা দেশের ও বৈদেশিক উন্নতি ও মঙ্গল সাধন এই সাপ্তাহিকের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" প্রথম বর্ষের ১২৭ সংখ্যা (২রা নবেম্বর) হইতে নূরজাহান বেগম একক প্রতিকাধানি পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

শতাব্দী। মাসিক পত্র, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আখিনি ১৩৫৪; সম্পাদক—মুরারি দে ও হুজাতা ঘটক। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় বিবৃতিতে প্রকাশ—

"বাংলায় এক দুর্ভাগ্যের সঙ্কটমুহুর্তে 'শতাব্দী' আত্মপ্রকাশ করল। বাংলায় আকাশ বাতাস আত্ম দুঃস্বপ্নের দ্বারা শাসিত—এই আত্ম বাতাসকে আলস্য দান করত পাত্তে না আত্ম বাতাস বিদ্রোহ-বাধার বিষয়। আশাবাদের ছায়ায় ঘোঁষনে এক মহাপরিব্রাজকের মূখে বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে বিস্তৃত হতে হয়েছে।"

"নূতন জাতি, নূতন বেশ পর্দা করার মহান্ন ত্রুটি আশা সর্বাধিক আশ্বাস করি! আশা বাস্তবের কাছে অনেক এতদূর। নেহা—আমরা বুঝা সমস্ত কেশপা করবো না, এতদূর দুর্ভাগ্যের জাতিপর্দাগুলক কণ্ঠে নিবৃত্ত করবো, হারদীতির সূচিবর্তে নিজেদের বনকে পুষ্টি করে তুলবো না, জাতির কল্যাণে বনকে সব সময় নিয়োজিত করবো। আশা আশাবাদের একটি বাত ত্রুটি, সে ত্রুটি হচ্ছে দেশকে পড়ে তোলা।"

"সাংবাদিক প্রতিভাশালি পত্রের ক্ষমতা করে, তাইই উপর আশাবাদের ঐক্যবদ্ধ অস্ত্রের আদর্শ সমাপত্তর সঠিক পর্দার মহান্ন ত্রুটি নিয়ে আশা সর্বাধিক বুঝে সংহতির সাধনার নিয়োজিত হয়ে পড়ি সফল করতে হবে— দুইই বন ও শিল্পের পালনের দাবির নিয়ে যে সমস্ত কার্যে ত্রুটি হয়েছে তাকে বৈতিক সাহায্য দিয়ে পুষ্টি করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি আত্ম বিশুদ্ধ—'শতাব্দী'র ত্রুটি হচ্ছে সেই সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'শতাব্দী' জনকপক্ষে সচেতন করে তুলবে। তাই 'শতাব্দী' আশা তরঙ্গ সমাধের কাছে আসেন জানাচ্ছে : তাদের সকল পত্রি দিয়ে—'শতাব্দী'র ত্রুটিকে সার্থক করে তুলুন।"

'শতাব্দী'র আর একটি বাত সংখ্যা ১৩৫৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা—"শতাব্দীর বিশেষ শিশু ও মহিলা সংখ্যা।"

জলিতা। সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—অরুণা বসু। ১৯৪৭ সনের সেবার্ঘে ইহার একটি বাত সংখ্যা বউবাজার, মার্চাট আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

ভক্তগোষ্ঠের শ্রদ্ধা। ১৯৪৮ সনের ২৩এ জানুয়ারি (নেতাজীর মরণতিথি) এই সচিত্র সাপ্তাহিকের প্রথম আবির্ভাব। ইহার সম্পাদিকা—মালবিকা দত্ত। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে প্রথম সংখ্যার প্রকাশ—

"সাপ্তাহিকটির নাম দিয়েছি আমরা 'ভক্তগোষ্ঠের শ্রদ্ধা'। এ থেকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই যোগ্য দায় যে পত্রিকাটি হতে চলেছে ভক্তগোষ্ঠ সমাজের স্মরণ—সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি; সব কিছু মিলিয়ে ভক্তগোষ্ঠ যেন বিভিন্ন চিত্তাধারায় যে সম্মতিত ভ্রম, দ্বন্দ্বের দ্বারা ভক্তগোষ্ঠের বসন্তের উন্নতিরকে যে বসন্তের স্রষ্টা করেন বলে বলে তাইই বহিঃসংসার থেকে যাবে 'ভক্তগোষ্ঠের শ্রদ্ধা'র পাঠ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা প্রকাশিত করছি এ সাপ্তাহিকটি।"

'ভক্তগোষ্ঠের শ্রদ্ধা' এখনও চলিতেছে।

উজ্জ্বল ভারত। মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—বামী পুত্ৰবোত্তরামল অবতৃত (বরিশালের শরৎসুন্দার ঘোষ), সহ-সম্পাদক—রেণু মিত্র, এম. এ. ; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—মার্চ ১৯৪১। "উজ্জ্বল ভারত কতকগুলি পদ্যসংগ্রহবিভিন্ন রচনার সমন্বিত সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যক্তি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে, এবং সে সবের মধ্যে একটি organic জীবনের সবগ্রভার বোঝ পাওয়া যাবে।" প্রথম সংখ্যার সূচনায় "মানবের কথা" মুদ্রিত হইয়াছে ; ইহাতে প্রকাশ—

"ভারতবর্ষ আর ট্রিউনকবদ্বৃত। এই দুই ভারতের বসিত করিঃ একটি উজ্জ্বল ভারত এবং তাহার অমুন্মেষায় একটি 'এক জগৎ' (One World) গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সবাতন আরা শাস্ত্রের প্রগতিশীল ও তেমনি বাৎসল্যবাহিনী। স্বর্গ এবং তাহারই তিরিচুখিত বাগবের বেশ, সর্ববিধ সংগঠনক্ষেত্রে তাহার কর্মসূচি ছাড়া ও আদ্যোপ-কোণের সবাত আবাদন করাই এই উজ্জ্বলভারত পত্রের প্রথম প্রয়োজন।"

'উজ্জ্বল ভারত' এখনও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ছেলেমেয়ে। অনেক থায়া ভালোবাসেন তাঁদের মস্তে। সম্পাদিকা—বামী হালবর ও বেলা ভট্টাচার্য। 'ছেলেমেয়ে' একখানি স্থপরিচালিত সচিত্র পত্রিকা, কিন্তু ইহা মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক, কোন পদ্য্যয়েই পড়ে না। এ বাৎস ইহার তিনটি মাস্ত্র বও প্রকাশিত হইয়াছে—

১ম বও	জান ১৯৪২ (১৫ই আগস্ট ১৯৪১)
২য় বও	মার্চ ১৯৪২
৩য় বও	আগস্ট ১৯৪৩

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম বওর প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"গাষ্ট্র, সমাজ, গৃহ পিতৃ পালনের আবাহন যে পত পত অবাতৃত পিতৃ কণ্ঠ, অসহায়—বিকলগ্রন্থ হতে ব্যক্তিক পশু ক'র তোলে, তার অবসান হইক। 'পিতৃ ভারী জাতির পিতা, জাতির মেন্তরও'—এই উপলব্ধি গুহু মূগের কথায় পর্যবসিত বা হয়ে তাকে কবর ক'রে তোলায় প্রভান সে বাগবে ভ্রপাশিত হয়ে ওঠে। গাষ্ট্র-বাবুয়ার, সমাজ-বাবুয়ার গৃহে জাতির সম্পদ হেনকেনেহের পিতা ও লালনের দ্বর্ষহার পূর্ণ আয়োজন হোষ্ট।"

ঘরে বাইরে। ইহা মহিলা আয়রকা সমিতির মাসিক মুখপত্র ; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আগস্ট ১৯৪২ ; সম্পাদিকা—অধ্যাপক শ্রীকির্তীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মনুশ্রী দেবী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন—

"'ঘরে বাইরে' কি লিখবে, কি বলবে, কতের স্বধাকে কুলে ধরবে লালনে—গ্রন্থ লালনে পাঠক পাঠিকাদের তরব খেতে। বাৎসল্যে মহিলা আয়রকা সমিতির সম্বন্ধে বাহ্যে পরিচিত, তাহার কাছে এর উত্তরও খুব সজ্ঞানো না। আয়রকা সমিতি সেই মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠান,—বায়া সমাজে, কল্যানে, অর্থনীতি আর রাজনীতি ক্ষেত্রে আয়রকা সমিতির পাথ না কোনদিন ; বলিত হয় সকল রকম অধিকার থেকেই। এই মেয়েদের সমস্ত অধিকারের দাবী মিঃই আয়রকা সমিতির আবেদন। যে সমায় একা পালনবাধ্যা বায়ীর পত্রিক করে অশক্ত, বলিত করে তাকে বাহুদের অধিকার থেকে—সে ব্যবহারকে 'বাসন' বা স্থিচ্যায় ফলে কোন যে বি আয়রকা সমিতি, নেবেও না কোনদিন। এই বলিত বাহুদের কথাকেই 'ঘরে বাইরে' পোষ্ট্র সেবে করে ধরে। এবেই বলিত জীবনের লালিত ক্রোধকে কথায়-কাকীতে হুটুয়ে কুলেবে 'ঘরে বাইরে'।

"এক কালি জীবির অজানে যে কলক-বহু পাঠ-হুই কল্যায়বানি উৎসরে বেশ, হাড়জায়া বাটুনির বিনিবদ্যত যে ক্ষমত কেটেই নিগর হুই এক কোটা হুই মিতে পারেনা না, কেকার আয়র কল্যানে যে মেটেই বায়ী-সম্বন্ধের উপলবে হুইতে না সেবে কল্যায় বড়ি মিল—তাদের কবর কলকলপে হাব পাথ না। অকল এই কো আয়রকা সেবার বাৎসর করে কলা। 'ঘরে

বাইরে'র পাতায় পাতায় আসন সেবেন এইসেই; আর আসন সেবেন ঠাঙ্গ—ধাঁঙ্গা মূগ হুমে হরণকে সেবেন না নিজে প্রতিবাদ আর প্রতিরাগের পথে পা দিয়েছেন, অপরূপ হাত খেঁক মাথুণ ও মনুতরক ধাঁধাবার আকাঙ্ক্ষার পত্রের সুখেসুখি ঠাড়াতে গুত পান নি ধারা।

"এই তো সেল দরতের কথা। 'ঘরে বাইরে'র বরষা খোলা থাকবে সেগবিসেবের বোনতের দস্তগ সাম্রহ, সমাবসে। সবভার ও সংশ্রমে ঘাসের মিল আছে, সমাবাসের পথে দারা অমস্ট, জৌগোলিক স'মাজেরা টেনে নান তাগের বিসেপে হুসেও, বুতের মাথুণ নয় তার। এমনি আসন হসের দিকে বহুতর হাত বাড়তে পড়েত করবে না 'ঘরে বাইরে'।"

"মেয়েদের মূগপে ওধুতি নীরল, কটোর, একতরে বহিত ঠাংবের ঘানঘানানি দিরে থাকবে ঠাঙ্গ। আর ঠাই হবে না সরল মূগুর গর-কবিগা-হুসাহি-চাঙ্গ। হুসাহিতোর সাজা বিচে আলোচনা না তুলেও মূগপত্রের তরক থেকে এর সহজ জবাব হোঙ্গ—"নিগুই হবে"। ওধু দরত সাপতে অহুসেগ—বিজদেপ গাঙ্গা 'ঘরে বাইরে'র নয়। হুসাতের বকনা, মূগুতের চরম অবমাননা, মারিগের সীমাহীন লাঙ্গনা থেকে যে মেয়েরা মাগা তুলে উঠে ঠাড়াতে চাইছে—হুসাহিতা তাদের মনে আসবে আপা, বুত সেবে ভরসা—নিজীর কাজে সাধারণ মানুষের রাবী তো এই-ই।"

"সেবিকার নিগবেন আর পাটিকারাই পড়বে—এখন পর্দানশির মেয়ানা মল্ল বেটেই নয় কিন্তু 'ঘরে বাইরে'। এ বাপারে সমাব অধিকার যোগ্য থাকলে উভোক্তাদের তরক থেকে।"

চার-পাঁচ সংখ্যার পর 'ঘরে বাইরে' প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হন।

একাল। সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—শিপ্রা গুহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—মহাদেৱ ১৩৫৫। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা লিখিয়াছেন—

"আমাদের দিনে মানুষের বিরূপক সভাবোধ ও সভ্যপ্রকাশই একতরে পাবেত। সেই বিরূপক সভাবোধই 'একালে'র অকৃত সভ্য উল্লেখ করবে। 'একালে'র বর্ণনা নির্ধারিত হবে মানুষের মূহুরধর্মী মনের দারা। 'একাল' ওধু সভ্যবিশের বর্ণনায়ের অসমকতা, হাংগার, হুত্রিক, মহামারী ও মহাযুদ্ধের অসহায় আর্জন্য নয়, 'একাল' সেই আগামী কালের মূগপত্র, সেই দিনের পথপ্রদর্শক, যেখানে মানুষের হুসেবের পাতি, সভ্যতার কল্যাণী রূপ। 'একালে'র কথা ওধু সর্ববাসের কথা নয়; সে কথা—অভিজ্ঞতির কথা, অসীকারের কথা।

"এই ব্যতিক্রম সভ্যতাজিহ্নি মানুষের মনে যে সবাতন সভ্য আর্জন্য করছে তাকেই মুক্ত করার কাজ 'একালে'র। সেই সভ্যই মানুষক মূগ হুগ ধরে একিও নিজে চলেছে বা বিরূপক, অত্যাক। 'একাল' সেই মানব সভ্যতার জয়জয় সভ্যতার পুজারী হুত চলেছে। তার অকৃত পরিচয় মানুষের গুত বুদ্ধির বিরূপক সভ্য নির্ণয়ে।

"আমি সেই সাধারণ লোক সভ্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—বাসের মাধ্যম আছে নতুন চিন্তাধারা, ক্ষমদে আছে গোর কিন্তু একালের ক্ষেত্রে অভাবে তা লোকচকুর অগ্রগালে অবহেলিত। এ ছাড়া 'একাল' পত্রিকা একালের অত কোন উদ্দেশ্য সেই।"

ইহার মধ্যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয় বা শেষ সংখ্যার তারিখ—২৬ কার্তিক ১৩৫৫।

শ্রীমতী। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় কর্তা মীরা চৌধুরীর সম্পাদনায় এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব—১৩৫৫ সালের কার্তিক মাসে। প্রথম সংখ্যার পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিপিত হইয়াছে—

"আমাদের দেশ ও দারা পৃথিবীতে নানান কটন সমস্তা সেগ বিচেছে; কিন্তু সমস্তা রুজহ, একপা গোর কলার এচার করলেই সমস্তার সমাবন হয় না। আমাদের বরকার এখানে সমস্তাওমি ভাল করে তলিরে বোকাবার; আমেরা মেয়ে, মেবাসে কি করত পাতি, কোন পথ ধরতে পাতি, ঐ কি ডাইবে কোন খোড় নিতে পাতি, এ সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনার কথই কেহ আছে বলে মনে করি।—আমাদের আপা আছে, সমস্তার আসে যেমন দুজিরে দুজিরে

চারিদিকে কোথায় প্রথম পথ, কোথায় খানা-ভোবা, কোথায় পথচলা সরু বাঁকা পথ, কোথায় তারা বেহুঁর নির্দেশ দেয়, তেমনই এখানেও ; কোথায় আঁখরা, রাস্তা, ও কোন রাস্তা ধরে কত দূর যেতে পারি, তার থেকে একটা আশায় অস্বস্তি আঁখরা সেই সব আশোনার দৃষ্টি দিয়ে পাই। অন্ধকারে, বিচারহীনভাবে আসে কিছু একটা করার প্রাণের ঝাপিয়ে পড়ার চেয়ে পথচলি জেনে অগ্রসর হওয়া ভাল নয় কি ?

“আর একটা দূর বড় অথচ সহর সত্তা আছে, বোটা আমরা তুলে ঘাই বা যাব কণ্ঠে বর্ষালি দিই না। আমরা তুলে ঘাই যে দেশের শাসনতন্ত্রের যে পরিমর্দনই আদিক না কেন, আমাদের ব্যাধিকরক মৌখিক ও হৃদয়বর্তিত করবার, আমাদের জ্ঞানোন্মেষের দৃষ্টি, শিক্তিত ও বধ্যবতভাবে গড়ে তোলাবার, আমাদের পারিবারিক জীবনকে স্বীকৃতি ও স্বেচ্ছার চিত্তিতে স্থাপন করার, ভক্তি ও কল্যাণ অর্থনৈশন করার, পুত্রানো-কুলজ্ঞার থেকে বৃদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা কখনও থাকে না। এদের দাবী কখনো না বার: বাক্যের। সাম্প্রতিক বা অর্থনৈতিক কেন্দ্রে দত্ত এগিয়ে ঘাই-ই না কেন, আমাদের পারিবারিক জীবন যদি অস্থির, অস্থির ও হৃদয়পূর্ণ হয়, তাহলে অস্ত্র সব উচিত্তি প্রাপ্তি হয়ে না ; তাহলে দলের দত্ত ভেঙ্গে পড়বে। এ সবকিছু শুধু সমার নয়, আমাদের সক্রিয় হইতে হবে। এই পত্রিকা যদি সাময়িকভাবেও সের্বিক সাহায্য করতে পারে, তবে তার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। সবকিছু কটাকা সকলতা যে বিপর্যাস্ত করবে, তা’ নির্ভর করে পাঠক-পাঠিকাদের সহযোগিতায় ও নির্ভর সমালোচনায়। আমরা তা সবের গ্রহণ করব—ও সেই ভাবে পত্রিকাবাদিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করব।”

‘শ্রীমতী’ এখনও হুইভাবে পরিচালিত হইতেছে।

জন্ম। ভূতপূর্ব ‘ঘরে বাইরে’-সম্পাদিকা মঞ্জুরী দেবী ১৩৪৬ সালের ফ্রাষ্ট মাসে এই মাসিক পত্রিকাবাদি প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সরকার ইহার প্রচার রহিত করেন।

শ্রীমাতৃকক্ষ। এই “ভাগবতীকথা পত্রিকা” মাসিক আকারে ১৩৪৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কিরণচন্দ্র দে চৌধুরী সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নবম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৬) হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন—অমৃতলা দেবী।

স্বল্পভাষা। “পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম মহিলা সাপ্তাহিক।” প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৭ আশ্ব্যারি ১৩৪২। সম্পাদিকা—বেগম হুসিলা কামাল ও আহাম্মদা আবুদু। বাংলায় মহিলা-সমাজের উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়া এই সচিব সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘকালী হইতে পারে নাই ; ইহার শেষ সংখ্যার তারিখ—২২এপ্রিল।

নওবাহার। এই মাসিক পত্রিকাবাদির প্রথম প্রকাশকাল—ভাদ্র ১৩৪৬ ; সম্পাদিকা—মাহুদুসা খাতুন, কবি গোলাম মোস্তাকার পত্নী। ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে প্রথম সংখ্যার প্রকাশ—

“নওবাহার” কোন দলীয় প্রচার-পত্র নয়। এ বিহক একমুখি সাহিত্য-পত্র। ইহাতে থাকিবে সত্য হৃদয় ও বরসেল প্রকাশ। হাতের সাম্প্রতিক কোন আন্দোলন ইহাতে থাকিবে না, তবে সাম্প্রতিক চিন্তা ও ধর্ম—যাহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—তাহার আলোচনার বাণ্য নাই।

“পাকিস্তান-বিদ্রোহী কোন বিদ্রোহের ‘নওবাহারে’ স্থান পাইবে না ; তবে প্রয়োজন যখন কোন কোন বিষয়ে হয় ধর্ম-মূলক সমালোচনা ও ইঙ্গিত দ্বারা বর্ণনাকৈ এবং দেশবাসীকে আমরা সাহায্য করি।”

“নারী-প্রতি ‘নওবাহারের’ অস্ত্রতম সাধনা হইবে। তবে নারী-প্রগতির আধুনিক বিকৃত আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব না। নারীর সত্যিকার জাগরণই আমরা কামনা করিব। ইসলাম নারীস্বাধিকার যে অধিকার ও স্বাধীনতা নিষেধ, তাহাকে সমাজে আমরা প্রচারিত করিত চেষ্টা করিব। পাকিস্তানের নারীরা বাহাতে পাকিস্তানবন্দা: হইয়া উঠিব ; পুং, পরিবার,

সবার, বাঙা ও মুসলিম সাহাবের প্রতি ইশাহার কর্তব্য ও হাতির বেগ হাযতে তাঁক হয়, এক: সর্বোপরি বিশ্ব-সত্য হাযতে বেগের মুসলিম নাকী ইশাহার গোরবকর আদম লাভ করিতে পান, তখন "মওহাযার" সর্বস্বই ইশাহার দিব্যতে হাতির হাযতে।"

এই ইতিহাস হতে স্পষ্ট নয়। ক্রম ধাবমান কালের সহিত তাল রাখিবার নারীরাও চলিতে চাহিয়াছেন, নতুন যুগের নতুন কথা বলিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কর্মস্থর হইয়াছে। বর্ষান্ত্রে নবাবুয়ের মত নব নব পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ করিতেছে, আবার কালের স্রোতে তাহাদের বিলম্বও ঘটয়াছে, আবার কাল পর্যন্ত তাহাদের প্রভাব পৌছায় নাই। উপযুক্ত কর্মী সম্বানের কারণে হস্তক্ষেপ করিলে আবার বিশ্বাস আছে, বাঙ্গালী মেয়েদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস এক মিনি উন্মোচিত হইবে। সে কালের ভার ডবিরাজ ঐতিহাসিকদের দিবা আনন্দের এই প্রশংসা শেষ করিয়ায়।

গ্রন্থপরিচয়

শান্তিনিকেতন ১২। ধর্ম। সঞ্চয়। দাম্বুশের ধর্ম। দ্বীপ্তনাথ ঠাকুর। বিপদান্তরী। দ্বীপ্ত
ব্যাক্রমে ৪২। ৪৩, ১৫০, ১৫০ ও ১৫০

বিভিন্ন নাম সত্ত্বেও এই কবিতা গ্রন্থকে একটি হুয়ে গ্রন্থিত করিয়া লইয়া নাম দেওয়া চলে—
'উপনিষদের ভাষ্য'। 'শান্তিনিকেতন' বিশেষভাবে এবং একান্তভাবেই উপনিষদের ভাষ্য, 'ধর্ম' এবং
'সঞ্চয়' নামক পুস্তকদ্বয়ের প্রবন্ধ কবিতা এই দ্বীপ্ত-ভাষ্যেরই অন্তর্গত এবং 'দাম্বুশের ধর্ম' এই ভাষ্যের কৃত্রিম।

উপনিষদ বলিতে আমরা বোঝাকেই বুঝিয়া থাকি। 'বেদের অন্ত' এই অর্থেই বোঝা যায় প্রচলিত।
উপনিষদকে কেন বোঝা নাম দেওয়া হইল, এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন। বৈদিক
সাহিত্যের শেষ অংশ বা চরম ভাগ, এই কারণে উপনিষদকে বোঝা বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বেদের
যে চরম জ্ঞান, পরম বিদ্যা, চরম শিক্ষা তাহাই উপনিষদে নিবদ্ধ রহিয়াছে, এই কারণেও উপনিষদকে
বোঝা বলা হয়।

উপনিষদে পরমগুরু ব্রহ্মবিদ্যা কবিত হইয়াছে। উপনিষদসমূহে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা সত্ত্বেও বহু বর্ষের
বহু ও বিভিন্ন মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বহু ও বিভিন্ন ব্রহ্মব্রহ্মসমূহকে বৈবচিনাগুরুত্ব স্বতঃ বৈবচ্যাস
'ব্রহ্মব্রহ্ম' নামক গ্রন্থে একটি সুসংহত ও সুসংহত দার্শনিক রূপ প্রদান করিয়াছেন। 'ব্রহ্মব্রহ্ম'র প্রথম
সূত্রটিই হইল, 'অথাতো ব্রহ্মবিজ্ঞান।' উপনিষদের ভিত্তিতেই এই বিজ্ঞানের তিনি উত্তর দিয়াছেন।
ব্রহ্মই বোঝার মূখ্য প্রতিপাদ্য, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ নানারূপ প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া সেইসব
বিজ্ঞানসারও উত্তর 'ব্রহ্মব্রহ্ম' গ্রন্থে বৈবচ্যাস দিয়াছেন। এই কারণে 'বোঝা' বলিতে শুধু 'উপনিষদ' সমূহই
নহে, ব্রহ্মব্রহ্মকেও বুঝিয়া থাকে। সুতরাং 'উপনিষদ' এবং 'ব্রহ্মব্রহ্ম' একত্রিত ভাবে 'বোঝা'—এই
অর্থই পণ্ডিত ও সাধক-সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

বোঝার ভিত্তিতেই অধৈতবাস, বৈতবাস, বিশিষ্টাধৈতবাস, শুদ্ধাধৈতবাস, ভেদভেদবাস, অচিন্ত্য-
ভেদভেদবাস নানা বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। একই উপনিষদ ও ব্রহ্মব্রহ্মকে ভিত্তি করিয়া
প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এমশে হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই
নিরূপ ভিত্তি প্রচলিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে বোঝার প্রধানতঃ তিন সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রাধান্য ও স্বীকৃতি লাভ
করিয়াছে—অধৈত, বিশিষ্টাধৈত ও বৈত। আচার্য শংকর, আচার্য রামানুজ ও আচার্য আনন্দতীর্থ বা
মধ্ব ব্যাক্রমে এই তিনটি মতবাদের প্রবর্তক এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদ-অনুগামী ব্রহ্মব্রহ্মের
ভিত্তি করিয়াছেন। উপনিষদের ভিত্তিকার বলিতে প্রধানতঃ এই তিনজনকেই বুঝিয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ
উল্লেখ থাকে যে, রামানুজ উপনিষদের কোনো ভিত্তি রচনা করেন নাই, তিনি 'ব্রহ্মব্রহ্ম'র ভিত্তিতেই স্বমতের
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভিত্তিকারদের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য মতভেদ বর্তমান।

বোঝার কয়েকটি বিচার্য বিষয় গ্রন্থেই ভিত্তিকারদের মধ্যে মতবিরোধ কোন্ পর্বাধে উপনীত
হইয়াছে, তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে। পাঁচটি প্রধান বিচার্য বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে, যে,
১. জগৎ সত্য না মিথ্যা? বাস্তবিক না কাল্পনিক? ২. জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন না ভিন্ন?

৩. ত্রস্ত্রের স্বরূপ কি? নির্বিশেষ-নির্গুণ, না সগুণ? তাহার সাধন? সগুণ না নির্গুণ কোন্ ভাবে হওয়া উচিত? ৪. ত্রস্ত্রপ্রাপ্তির উপায় কি? কর্ম, না জ্ঞান, না ধ্যান, না তপ্তি? ৫. ত্রস্ত্র-প্রাপ্তির ফল কি? প্রত্যেকটি বিচার বিষয়ের উত্তরে ভাষ্যকার আচার্যদের মধ্যে এমন বিরোধ বর্তমান যে, তাহাকে আলো-অন্ধকারের বিরোধই আখ্যা দেওয়া যায়। স্রগং সত্য না মিথ্যা—এই প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে আচার্য শংকর ও আচার্য রামানুজ বাহা বলিয়াছেন, তাহার একটু ইঙ্গিত মিলেই বিরোধের রূপটি স্পষ্ট হইতে কিছুটা আলোয় করা যাইবে। শংকর বলেন, ত্রস্ত্র সত্য, স্রগং মিথ্যা, মায়ায় বিভ্রান্ত যাত্র, সর্গ-রক্ষা দৃষ্টান্ত। পঞ্চানন্দে রামানুজ বলেন, স্রগং সত্য, ত্রস্ত্র পরতন্ত্র, প্রকৃতির পরিণামে গঠিত, স্রগতের প্রকৃত সত্তা আছে। প্রায় সবস্ত্র বিষয়েই এইরূপ নির্যাক্ষণ মতভেদ ভাষ্যকারদের মধ্যে বর্তমান। কেহবা নির্গুণ-ব্রহ্মবাদী, কেহবা সগুণ-ব্রহ্মবাদী; কেহ বলেন, জীব ও ত্রস্ত্র অভেদ, কেহবা বলেন, জীব ও ত্রস্ত্রে ভেদ বর্তমান, আবার অপর বলেন, জীব ও ত্রস্ত্রে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার সম্বন্ধই বর্তমান ইত্যাদি।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-ভাষ্য ইহাদের কোনটির অন্তর্গত? রবীন্দ্রনাথ বৈতবাদী, না বিশিষ্টবৈতবাদী অথবা অবৈতবাদী—এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক বলিয়া নিম্ন বিবেচিত হইবে।

প্রশ্নটির উত্তরে অপর-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে—উপনিষদের কবি বা বাদী? একই কবির দুইমতে, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই মতে বৈত, অবৈত, বিশিষ্টবৈত ইত্যাদির সমর্থক পরস্পর-বিকল্প কথা শ্রুত হইয়া থাকে। এমন ক্ষেত্রে কবিরের কি বাদী বলা যাইবে? শাস্ত্র হইয়া অসুখাবন করিলে সেখা যাইবে যে, কবিগণ বৈত-অবৈত-বিশিষ্টবৈত ইত্যাদি কোনো বাদীই নহেন। তাহাদের একমাত্র পরিচয় তাহারা ব্রহ্মবাদী।

রবীন্দ্রনাথও তেমনি কেবল ব্রহ্মবাদী। তিনি দার্শনিক নহেন, তিনি তাহারও অধিক, তিনি ষ্ট্রা। ষ্ট্রা ও দার্শনিক যে-পার্থক্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য ও অপর্যাপ্ত ভাষ্য সেই পার্থক্যই বিস্তারিত। প্রাচীন তপোবনে কবিগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও পিপাসু বিজ্ঞের যে-ভাবে যে-উপদেশ দিতেন, তাহা একত্রিত ও নিপিবদ্ধ করিলে তাহা আমরা পাইতাম, রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের ভাষ্য তাহারই আধুনিক অসুখাব ও সংকল্প। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'কবিকবি' এবং বর্তমান যুগে উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার বশিষ্ঠা পরিচিত ও পূজিত।

'শাস্ত্রনিকেতন' মতবাদ সন্দেহ কিছু আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'অবৈতবাদ ও বৈতবাদ নিয়ে ধন্য আমরা বিবাদ করি, তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়।' তিনি আরও যত্নবান করিয়াছেন, 'মাছুবের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।' মতবাদকে তিনি সত্যজ্ঞানের 'মতদেহ' আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন, 'আজ্ঞা যে-পর্যায়কে আশ্রয় করে, সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়, কারণ আজ্ঞা শরীরের চেয়ে বড়।' আজ্ঞা ও পরীরের যে-সম্পর্ক, সত্যজ্ঞান ('গতা' নহে) ও মতবাদের মধ্যে সেই ধরনের একটি সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহার অধিক তিনি মতবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি আরও বলেন, 'ধর্মতত্ত্ব-নির্ধিত গুণায়াম্। সেইজন্য আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে।'।

ত্রস্ত্র সম্বন্ধে কোনোরূপ তর্কেরও রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন।

দার্শনিক ও তাহাদের মতবাদের ত্রৈণীবিভাগ চলিতে পড়েন, কিন্তু ঙ্গঠার কোনো ত্রৈণীবিভাগ হয় না। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের বা মতবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া দেবার চেষ্টা তুল ও নওগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ কবি-কবি, ইহাই তাহার সত্য পরিচয় এবং তাহার ভাষ্য সফলও এই একই দৃষ্টি প্রয়োজ্য।

ভগবান বেদব্যাস উপনিষদকে বলিয়াছেন ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’। ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে পারেন এবং তিনিই কবি। কবি বলিয়াছেন,

বেদাহমেনতং পুরুষং মহান্তঃ

আদিভাবৰ্ণং তমসঃ পরস্তাং ।

রবীন্দ্রনাথের মুখে ও এই ঘোষণা আদরা বহবার শুনিয়াছি। বলা—

‘ধন বসন হয়েছে, হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে—সেই ভেগের উঠে একদিন ব্যাঘ্রাঘাত পাড়িয়ে ছিলুম।’ যেমনি হঠাৎ আবির্ভাব হল পাছের অন্তরাল থেকে অননি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, সত্যকে বৃত্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মাহুকের অন্তরায়াকে দেখলুম। সেই ক্ষণেই ‘আনন্দরূপমবৃত্তঃ সর্ববিজ্ঞাতি’ উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে ব্যর্থব্যর্থ ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থল নয়, বিশ্ব এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে স্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন। স্থল আবরণের দ্বারা আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে-সত্তা তার দ্বারা নেই। দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বাঙ্গভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা; নানা প্রাণের বিভিন্ন লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অগুণীলীলা। এককাল নিভের জীবনে স্থপ-স্থপের সেসব অস্থকৃতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম ঙ্গঠারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে পাড়িয়ে।’ বহু কবিতাতেও কবিকবির এই আত্মঘোষণা শোনা যায়, একটি উদ্ধৃত হইতেছে—

ধূলির আসনে বসি কুয়ারে দেখেছি ধ্যানচোখে

আলোকের অতীত আলোকে।

অগু হতে অগীর্ষান মহৎ হইতে মহীয়ান,

ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।

কণে কণে দেখিয়াছি সেহের চেদিয়া ধ্বনিকা

অনিবার্য দীপ্তিময়ী শিখা।

উদ্ধৃত অংশ ও কবিতাটিতে কবিকবি বাহ্যকে বলিয়াছেন পরমুগ্ধতা, নিত্যসাক্ষী ও কৃপা, তাহাকেই ব্রহ্ম, অক্ষর, বিশ্ব-সেবতা, মহানপুরুষ, মহাস্বা, বিভূ, আত্মা, ঈশান, অমৃত, বিশ্বকর্মা, সাকী, চেতা, জ্যোতির্বা-জ্যোতি ইত্যাদি বহু ও অসংখ্য নামে উপনিষদে অভিহিত করা হইয়াছে। ‘মাহুকের ধর্ম’ রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন ‘জীবনসেবতা’ এবং ‘মনের মাহুত’। ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ নিবৃত্তি করিবার আদিকার রবীন্দ্রনাথের যে আশ্রিত ছিল, তাহার আত্মঘোষণা হইতেই সে সফল সম্ভবাতীত প্রমাণ পাওয়া যায়। উপনিষদের রবীন্দ্র-ভাষ্য কায়েই দার্শনিকের কৃত ভাষ্য নহে, বর্তমানকালের ব্রহ্মজ্ঞ কবিরই কৃত সেই ভাষ্য।

‘মাহুকের ধর্ম’ গ্রন্থখানিকে উপনিষদের রবীন্দ্র-ভাষ্যের ভূমিকারূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ভূমিকাতে

মূল গ্রন্থের পরিচয় ও বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং ভূমিকাপাঠে অনেকসময়ে মূলগ্রন্থ-পাঠের কাজ চলিয়া যায়। রবীন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহক ‘মাহুঘের ধর্ম’ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম পুস্তক। পুস্তকখানি একটু বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে আরও একটি বিষয় জানা যাইবে যে, ইহা ভাষ্যের ভূমিকার চেয়েও অধিক, আসলে ইহা নিজেই একটি সংক্ষিপ্ত ভাস্কর-গ্রন্থ। সমগ্র উপনিষদ যেমন ‘ঋকসূক্ত’ে প্রতিষ্ঠিত, সমগ্র রবীন্দ্র-দর্শন, রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রকব্যও তেমনি এই গ্রন্থে পৃথাক্যারে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ও রবীন্দ্র-দর্শনের সূত্রগ্রন্থরূপে ‘মাহুঘের ধর্ম’ গ্রন্থখানির মূল্য বস্তুতঃই অপরিমীয়।

‘মাহুঘের ধর্ম’র মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে এবং ইহা হইতেই উপনিষদের রবীন্দ্র-ভাস্কর সম্বন্ধে একটা দিগ্‌দর্শন সম্বন্ধী পাঠক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে বলিয়াছেন—

‘বার্ষ আমাদের দেশ প্রয়াসের দিকে ঠেলিয়া নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা সেবি জীব-প্রকৃতিতে; যা আমাদের ভাষ্যের দিকে ভ্রমস্তর দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মাহুঘ, মাহুঘের ধর্ম। কোন্‌ মাহুঘের ধর্ম, এতে করে পরিচয় পাই। এ তো সাধারণ মাহুঘের ধর্ম নয়, তাহলে এর মন্ত্র সাধনা করতে হুত না। আমাদের অন্তরে এমন কে আছে যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে ‘সবা মনান্য ছবরে সন্নিবিষ্ট’। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মাহুঘের উপলব্ধিতেই মাহুঘ আপন জীব-সীমা অতিক্রম করে মানব-সীমার উত্তীর্ণ হয়। সেই মানবকেই মাহুঘ নানা নামে পূজা করেছে, তাকেই বলেছে— ‘এব দেব বিশ্বকর্মী মহাক্ষা’।’

‘সেই দেবতা য একা, যিনি এক, তাঁর কথাই’ রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ-পাঠখানিতে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাই ত্রুটিবিজ্ঞান ও ত্রুটিবিজ্ঞান, ইহাই উপনিষদের স্তম্ভতম পরমব্রহ্ম এবং ইহাই উপনিষদের রবীন্দ্র-ভাস্কর।

‘শান্তিনিকেতন’ সম্বন্ধে প্রথমে একটি কথা বলা আবশ্যক। এই আধ্যাত্মিক-গ্রন্থকে শুধু সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখিলেও ইহার মূল্য অপরিমীয় বলিয়া বীকৃত হইবে। চিন্তা ও ভাবগাথিকে সাহিত্যের স্তম্ভ উৎকর্ষের উন্নীত করা সম্ভবপর, ‘শান্তিনিকেতন’ সাহিত্য-শক্তির সেই শ্রেষ্ঠতম নির্বাহই রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্যে ‘শান্তিনিকেতন’ের বহু প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে অক্ষর আসন ও মর্যাদা অধিকার করিবে। ‘ধর্ম’ গ্রন্থের ‘বিন ও রাজি’ নামক প্রবন্ধটি বস্তুতঃই ভাষা ও ভাবে বিশ্বস্বয়নকভাবে ঐশ্বর্যবহুল। নিছক সাহিত্য-রসপিপাসু পাঠকদের নিকটও গ্রন্থ কথখানি পরম সম্পদ বলিয়া সমাদৃত হইবে, ইহার মন্ত্র ত্রুটিবিজ্ঞান বা ত্রুটিবিজ্ঞানসার আলৌ আবশ্যক নাই।

‘শান্তিনিকেতন’ একান্তভাবেই উপনিষদের ভাস্কর এবং আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বা চেতনার উপনিষদ বাসপ্রয়াসের স্তম্ভ কত সহস্র ও আত্মবিক হইয়া গিয়াছে, ‘শান্তিনিকেতন’ তাহার প্রমাণ। নবীন কালের বাঙালী প্রাচীন কালের সঙ্গে এমনই ভাবে সম্পর্ক ছেদ করিয়াছে যে, নিত্যকালের অন্তর ও অভয় কবি-সম্পদকে পর্যন্ত এক কোণে সরাইয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ও ভাস্কর বাঙালীর কচি বা আকর্ষণ আল হস্ততো নাই। ইহার দ্বায়ন না হইয়াও এই সম্পর্কে সে অনায়াসে আত্মস্বা করিয়া লইতে পারে। সমস্ত উপনিষদকে মোহন করিয়া বাঙালীর উপভোগ্য রূপ ও আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথ এই ‘শান্তিনিকেতন’ে দিয়াছেন। ভাস্করের বিভিন্ন ভাষাতে বহি ইহা অনুদিত হয়, তবে

অশ্রুপাশর প্রবেশও বহু উপকৃত হইবে এবং এক অপরিণোধ্য গুণে তাহার বাৎসর্য সবে আবদ্ধ থাকিবে।

ঐশ্বর্য পরিচয় দিতে গিয়া উপনিষদ বলেন— তিনি সর্বাঙ্গ-সর্বব্যাপী-সর্বশক্তিমান; তিনি অক্ষর-নিত্য-সংস্করণ-প্রজ্ঞানবন-আনন্দময়; তিনি শাস্তা-মন্ত্রানী-স্রীবেদ কৰ্ম্মফলদাতা; তিনিই জগৎব্যাপী—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিবান; জগতের নিমিত্ত ও উপাধান দুইই তিনি। ইহাতে ঐশ্বর্যের নিত্ব ও সন্তোষ, নির্বিশেষ ও সবিশেষ উভয় প্রকার পরিচয় ব্যক্ত। আচার্য শংকর নির্বিশেষে ব্রহ্মবাদী, তিনি ঐশ্বর্যের উটর ও বহুশ-লক্ষণ দুইটি ভাগ করিয়া সপ্তম ঋণটি বাহ্যিক বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যায় ঋষিই বহুখ্যাত 'মাদা' নামক ব্যাপারটির তিনি আশ্রয় লইয়াছেন। হুতরাং মাদাব্যয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিন্নভটি জানা অবশ্যত ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

‘শান্তিনিকেতনে’ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

‘মাদাব্যয়! তখনই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিথ্যা কি নেই? নিভের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানিনি?—এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনন্তকে প্রকাশও করছে, একদিকে মাস্কহও করছে। যে-দিকে আচ্ছন্ন করছে সেদিকে তাকে কি বলব? তাকে মাদা বলব না কি? মিথ্যা বলব না কি? তবে মিথ্যা শব্দটার স্থান কোথায়?—বুদ্ধির মূলে বে-জ্ঞান থাকতে আমি নিরপেক্ষে কুল জানছি, সেই ভয়েই কি সমস্ত জগৎ সম্বন্ধেও আমাদের ডোলাচ্ছে না? সেই ভয়েই কি আবার জগতের কেন্দ্রস্থলে আবার ‘আমি’টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না?’

মাদাকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে অবীকার করেন নাই, এখানে দেখা দাঁটতেছে।

দৈত ও অদৈত ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উক্ত হইতেছে, তাহাতে ‘ব্রহ্ম’ সম্পর্কে তাহার নিজস্ব মতটি স্পষ্ট হইবে। তিনি বলেন—

‘তর্কের ক্ষেত্রে দৈত অদৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী; হা যেমন না’কে কাটে, না যেমন হা’কে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী।’ তাহাশর রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘তিনি এককে নিয়ে হুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, হুই যেমন সত্য একও তেমনি সত্য। এই অতুত ব্যাপারটাকেও তো হুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না।’ উহার পরেই তিনি বলিয়াছেন—

‘উপনিষদে ঐশ্বর্যের সম্বন্ধে এই ভ্রম কেবলই বিরুদ্ধ কথা দেখতে পাই। য একোঅব্যর্থ্যে বহুশক্তি-যোগ্য বর্ণনেনেকাগ্রহিতার্থো ধ্যতি। তিনি এক এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই, অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জ্ঞতিহীন এক, অনেক জ্ঞতির গভীর প্রয়োজন সকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান?’

ইহার পরে রবীন্দ্র-ভাক্তে পাই—

‘স পদ্যগাং স্কন্ধ, আবার তিনিই ব্যাধ্যং শাস্ত্রীভাঃ সমাভাঃ— অর্থাৎ অনন্ত দেশে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।’ দৈত ও অদৈতের এই তর্ক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রবীন্দ্রনাথ স্রম অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন— ‘ভগবানও স্রষ্টিতে এই যে আনন্দের দ্বন্দ্ব, এই যে স্রেষের বেলা ক্ষেবেছেন, এতে তিনি

নিষেধক দিয়ে নিষেধকেই লাভ কৰে। এই মেওয়া-শাওয়াকে একেবাৰে এক কৰে মেওয়াকেই বলে প্ৰেম। এই প্ৰেমকেই একটা কোটি সন্তান, আৰু একটা কোটি নিষ্ঠুৰ। তাৰ একমিক বলে 'আমি আছি' আৰু একমিক বলে 'আমি নহে'।

সন্তান ও নিষ্ঠুৰ সম্বন্ধে রবীন্দ্ৰ-ভাষ্যে যে অভিনব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে— 'ভগবান সন্তান কি নিষ্ঠুৰ সে-সমস্ত তৰ্কের কথা কেবল তৰ্কের ক্ষেত্ৰেই চলে; সে তৰ্ক তাঁকে স্পৰ্শও কৰতে পাৰে না।' অতঃপৰ রবীন্দ্ৰনাথ উপনিষদের 'হতোবাচো নিবৰ্ত্তন্তে অগ্ৰাণ্য মনসাসহ। আনন্দ-ব্ৰহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি হৃতজন।'—হয়টি উদ্ধৃত কৰিয়া বলিয়াছেন—'এখন অদ্ভুত বিৰুদ্ধ কথা একই য়োক্ত্যের দুই চরণের মধ্যে তো এখন অস্পষ্ট কৰে কোথাও শোনা যায় নি। শুধু বাক্য ফেৰে না, মনও তাঁকে না পেয়ে কিয়ে আসে, একেবাৰে লাফ জবাব। অথচ সেই ব্ৰহ্মের আনন্দকে যিনি ধেনেছেন তিনি আৰু কিছু খেঁকে ভয় পান না। তবেই তো ঠাণ্ডে একেবাৰেই জানা যায় না তাঁকে এনি জানা যায় যে আৰু কিছু খেঁকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্ৰেমের জানা।'।

রবীন্দ্ৰনাথকে ব্ৰহ্মবাদী বা আনন্দবাদী আখ্যাই মেওয়া চলে, ব্ৰহ্মৰ এই আনন্দ-ধৰণটিই তিনি বিশেষ ভাবে গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। তিনি নিষেধ বলিয়াছেন—'সেই সত্তাই 'আনন্দরূপময়তঃ স্ববিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আবার মুখে বারম্বাৰ ধ্বনিত হয়েছে।' রবীন্দ্ৰনাথ প্ৰাৰ কৰিয়াছেন—'সেই ব্ৰহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব? তাকে জানব কোন্‌দ্বাৰে?' রবীন্দ্ৰনাথ নিজেই উত্তৰ দিয়াছেন—'অন্তৰ্ভাষ্যাকে জানো, তাহলেই অন্তৰ্ভুক্ত জানবে, তাহলেই পৰমকে জানবে।' তিনি বলেন—'নিষ্ঠুত অন্তৰ্ভুক্ত গুহাৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰে দেখো— দেখতে পাবে আত্মাৰ মধ্যে পৰমাত্মাৰ অনন্ত নিশিধিৰ আবিৰ্ভূত হয়ে রয়েছে, এক মুহূৰ্ত্ত তাৰ বিদ্যমান নহে। পৰমাত্মা এই জীবাশ্মাৰ আনন্দিত। আত্মাৰ ব্ৰহ্মের আনন্দ আবিৰ্ভূত। আত্মাকে ধাৰা সত্যৰূপে জানেন, তাঁৰা ব্ৰহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্ৰহ্মের আনন্দকে ধাৰা জানেন তাঁৰা 'ন বিভেতি কৰ্ম্মাচন'। পৰমে ব্ৰহ্মৰি যোজিতচিন্তা নশ্বতি নশ্বতি নশ্বতোব। পৰমব্ৰহ্মের মধ্যে ধাৰা আপনাকে যুক্ত কৰে দেখেছেন তাঁৰা নশ্বিত হন, নশ্বিত হন, নশ্বিতই হন।'।

এই নশ্বিত অবস্থাৰ উপনীত পুৰুষের অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্ৰনাথ এইৰূপ বৰ্ণনা দিয়াছেন— 'তখন ভিতৰ বাহিৰের সমস্ত ধ্বংস হু হু হয়ে গেল। তখন অস্ব নহে, তখন আনন্দ; তখন সংগ্ৰাম নহে, তখন লীলা; তখন ভেদ নহে, তখন মিলন; তখন আমি নহে, তখন সব; তখন বাহিৰও নহে, ভিতৰও নহে, তখন ব্ৰহ্ম; তদ্ভূতঃ স্ৰোতিষ্ঠাৎ স্ৰোতিষ্ঠি। তখন আত্মা পৰমাত্মাৰ মিলনে বিশ্বৰূপে সন্নিবিষ্ট। তখন বাৰ্খবিহীন কৰুণা, উদ্ভত্যবিহীন কৰ্ম্ম, অহংকাৰবিহীন প্ৰেম; তখন জ্ঞান ভক্তি কৰ্মে বিচ্ছিন্নবিহীন গৱিৰ্ভূতা।'।

উপনিষদের রবীন্দ্ৰ-ভাষ্য সম্বন্ধে বিদ্বত আলোচনা এই প্ৰবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, পাঠকদের দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাই এই প্ৰবন্ধের মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্ৰ-ভাষ্য সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিতই মাত্ৰ তাই এখানে প্ৰদত্ত হইল।

শ্ৰীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি

এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়ী

স্বরলিপি : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গা মা II পা সী সী সী । নর্সনা -ধনা বপা -১ । ১ ধা ধা
এ কি ন এ কি মা • • ঘা এ কি

I পৃথপা মা গা -১ । গা গা গা মা । গমপা মা গা -রা । সা গা মা II
প্র • • ম রা এ কি প্র ম রা • • র ছা ঘা কি"

সা সা II সা -পা পা পা । পা পা পা । পা পা পা । পৃথপা -মা পা ধা I
আ হা কে গো তু নি ম লি ন ব নে • • আ দ

I বা ধবা -সী বা । বা -ধবধা পা ধা । পমা -গমপা মা মা । গা গা গা I
নি ঘী • লি ত ন লি ন • ম হ নে বে

I গা গা গা । গা -রগা মা পা । পৃথপা -মপা মা মা । গা
আ প না বি ছ দ হ • • ল ব নে

I রা গা গা -রগা । মা পা মপা -মা । গা -রা । সা -১ { পা পা I
আ প নি ব রে ছ • লী ন ভো মা

পা না -না না । না -ধনা সী সী । সী -নর্স সী না । সী -১ পর্স সী I
ত বে ম বে ব রে ছে চা হি ঘা ভো • না

I সী -১ সী নর্স । সর্স -সী না না । না -ধপা পনা ধা । না -১ } ধপা পা I
লা লি পি • ক • উ টি ছে গা • হি ঘা ভি • থা

I পা পা পা। পা পা পা। পা পা। পা
 বি স মী র কা ন ন বা হি যা

I পা সী বসী -বা। বা -বধা বধা পা। মা -১ -১ -গমপা। -বগা -১ গা মা II
 কি বি তে• ছে মা• বা দি ন “এ কি”

{ সা সা II সা -পা পা পা। পা -১ পা পা। পা পা পা। পধপা -মা পা বা I
 বে ন ম র তে য বে ঘ খা নি তে সে •• টা বে

I পা -ধবসী পা বধা। বা -ধপা পা বা। পমা -গমপা মা মা। গা -১ } গা গা I
 ব স ডা• তে ধা ডা রে• ছ এ সে এ খ

I গা গা গা। গমগা -রগা মা পা। পধপা -মপা মা মা। গা -১ -১ -মগা I
 নি মি লা বে•• চা ন হা•• •• সি হে সে

I রা গা গা -রগা। মা গমপা মপমা -১। গা -রা। সা -১ I
 কা দি যা প ডি•• বে•• ক বি

I { পা না না। না -১ না না। সী -নসরী সী সী। সী -১ সী সী I
 ডা গি তে পূ ব্ বি মা পূ •• ব্ নী লা ম্ ব বে

I সী সী সী। সী -নসী রী সী। না নাঃ পা। পনা -ধনসী না না } I
 কা ন নে চা যে লি ফ্ টে খ বে•• •• খ বে

I বপা পা পা -১। পা পা -১। পা পা পা -১। পা পা পা -ধা I
 হা সি টি ক খ ন্ ফ্ টি বে অ খ রে

I পা সী বসী -বা। বা পা বা -পা। পমা -১ -১ -গমপা। বগা -১ গা মা II II
 ব বে ছি• তি যা ব খ বি • “এ কি”

অমৃতমে মাহার বেলায় ষরলিপি-সংকলনে দুটি গান বাধ পড়িয়াছে; একটি (আদ্রি আখি
 জুড়ালো হেরিয়ে) ষরলিপি-গীতিমালায় আছে, অত্র গানটি এই স্থলে মুদ্রিত হইল।

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর
স্বরলিপি : শ্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

সা সা II { রা মা মা আ মি ব প নে	পা পমা পা I গদা -১ -পদবা র রে • ছি তো • • বু	দা পা -দপা I স দী
I মা পা পপা আ না রে •	দা পমা পা I (বজ্রা জা গা • যো না	-১) } I
I বজ্রা -১ -রজ্রা না	-মা -পা -দপা I -মপমা -জ্রা	রা সা আ মি
I রা মা মা ব প নে	পা পমা পা I গদা -পদবা র রে • ছি তো	-পা
I গদা দা আ মা	সাঁ বি	সাঁ সঁসাঁ -বা I বা রে •
I সাঁ সাঁ জঁ ন ব নে	জঁ সাঁ সঁসঁসাঁ I গা সাঁ ন ব নে • • রা বি	পা বি
I পা দা জঁ ব প নে	সাঁ সাঁ জঁসাঁ I গা -সাঁ -পা ব রে ছি • তো বু	দা পা -দপা I আ মা • বু
I মা পা -পা ব প বু	দা পমা পা I মজ্রা -১ -রজ্রা ডা ঙা • তো না •	-পা -দপা I
I -মপমা -জ্রা -১	রা সা আ মি	মা বা প নে
I গদা -১ -পদবা ডো	-পা দা -১ I { দা দা দা ব বা ল্ হু টি বে	দা দা -পা I ব বি বু

সাঁ	সাঁ -ঋ'সাঁ	-বা	I	সাঁ	সাঁ	জাঁ	জাঁ	সাঁ	সঁজাঁ	I
সি	কা	ল্		ছ	টি	বে		তি	বি	ব

সাঁ		-ৱ	I	পা	দা	জাঁ	সাঁ	সাঁ	-ঋ'সাঁ	I
সি		ল্		আ	সি	বে	আ	মা	ব্	

সাঁ -বা	দা	পা	I	পা	পা	দা	পা	পদা	-মা	I
সি	দী	বে		ব	সি	বে	আ	মা •	ব্	

সা	সা	I	রা	মা	রা	মা	মা	-গমপা	I
দী	রে		গা	হি	বে	হু	থে	• • ব্	

I পা	পা	পা	I	পা	দা	দা	পা	পদা	-মা	I
গা	দী	রে		ভা	কি	বে	আ	মা •	ব্	

I পা	-ৱ	পা	পদা	I	দা	দা	-ঋ'ৱ	সাঁ	সাঁ	ঋ'সাঁ	I
মা	ল্	দী	বে •		ব	হা	ল্	তু	লি	হা •	

I বা	সাঁ	দা	পা	পদা	I	পা	পা	পদা	দা	পদা	-মা	I
ন	জা	খু	লি	দা •		হা	সি	বে •	হ	বে •	ব্	

I পা		-সা	I {	সা	রা	-মা	মা	গমা	-পা	I
হা		ল্		আ	হা	ব্	ক	গো •	ল্	

I পা	পা	-ৱ	I	পদা	দা	-ৱ	দা	দা		
ভ	বে			সি	সি	ব্	ণ	ড়ি		

I পা	পা	-ৱ	I	পা	দা	জাঁ	সাঁ	সাঁ	-ঋ'সাঁ	I
হ	বে			ব	হ	নে	তে	হ	• ল্	

অধিষ্ঠান এল ব'লে

অবলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I I রা -১ -পা । -মা -পা -ধা I ৱপা -১ -১ । -১ -১ -ধা I মা -১ -পা । ধা ৱপা
 ধা ধা ঝ এ ল ব

-১ । -গা -১ -মা I রা -পা পা । মা মা -১ I ৱগা -১ -১ । রা সা
 তা ই তো ঘ বে উ ঠ ল আ

I রা -১ -গা । মা পা
 লো ম লে

-১ II গা গা -১ । গা গা -জা I জা পা
 ব্ ব্ লে ছি লে ম্ তি নে

-১ I পর্সী সী -১ । সী সী -১ I
 রা . তে নি লে ম্

I সর্সী সর্সী -১ । -পা -১ I সী বা -১ । ধা বা -১ I ধা বা -১ । ধা পা -১ I
 চি . নে ছে নে ছি তা ব্ লী লা আ মা ব্

I জা -১ পা । পধা ৱপা -ধপা I জা পা -১ । -রা জা -১ I পা
 ব . ক্ষো লো . লা . ব্ সো লে সো লে

-১ II সা -১ সা । সা সা -রা I রা রা
 ব্ ব্ ম্ হা রা মো ব্ ব নে

-১ -১ I রা সা -গা । গা গা
 বি হ্ ঙ্ গ গা

I গা -১ গা । গা গা -জা I জা পা -মা । গা গা -জা I জা পা -১ I
 জা গ্ ল ক বে ক বে ক বে ক বে

I গা গা -১ । গা গা -জা I জা -১ পা । -১ -১ -১ I পর্সী সী -১ । সী সী -১ I
 ঘ ব্ ম্ স ক ল্ ল ব্ ব্ হ . বে ছে নি ম্

I সর্গ - সর্গা সর্গা । -১ -পা -১ I সর্গা বা -১ । ধা বা -১ I ধা বা -১ । ধা পা
ত ব্, ধ .

I ক্ষা -১ পা । ধা ষপা -১ I ক্ষা পা -১ । -রা ক্ষা -১ I ক্ষা পা
প ল্ ল ব ক ল্ লো লে ক ল্ লো লে

হিনেজনাথ -কৃত ত্রিশটি ববীজসংগীতের স্বরলিপি শ্রীমতী ত্রয়োদশপণ্ড বরবিতানরূপে প্রকাশিত
হইবে ; এই স্বরলিপিগুলি ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই ।

চোখ যে ওদের ছুটে চলে

স্বরলিপি : শ্রীঅনাদিকুমার দত্তিদার

II পা -সর্গা বা । ধা পা
চো ব্, যে ও বে

II
-১ I গা গা -মা । পা ধা -গা I
ব্ ছ টে চ লে

I পধা -পা -সর্গা । সর্গা -১ -ধা I পা -সর্গা বা । ধা পা
গো . চো ব্, যে ও বে

ব্

I না না -১ । না না -১ I না সর্গা -১ । না সর্গা -পা I ধা ধা -সর্গা । সর্গা ধা
ধ বে ব্ বা টে মা বে ব্ বা টে . ক পে ব্ ধা টে

I -১ । -পমা -গা -১ I গা পা -মা । পা ধা -পা I পধা -পা -সর্গা । সর্গা -১ -ধা II
ধ লে ধ লে . গো . . .

II { মা -ধা ধা । ধা ধা -না I না সর্গ -১ । সর্গ-সর্গ-১ I সর্গ
 তে খ্ বে ব লে ক বে ছে • • প

I সর্গ -সর্গ সর্গ । সর্গ সর্গ -১ I গা গা -মা । পা -১-ধা I পধা -১ -১ । -১-১ (-পমা) I -১ I
 বে খ্ বে কা বে জা নে না • ম • • ন

I গা গা -মা । গা গা -মা I পা ধা -১ । না সর্গ -১ I না -১ না । না সর্গ
 গ্রে মে ব্ দে খা বে বে ধ ব ন্ চো খ্ ডে সে যা

I না সর্গ -নর্গ । সর্গ পা -ধা I পধা -পা -সর্গ । সর্গ -১ -ধা II
 চো খে • ব্ ক লে গো • •

II { সা সা -১ । রা রা -গা I মা পা -ধা । মগা মা -১ I মা মা -পা । পা পা
 মা মা ব্ তো রা জা কি • ন্ না • রে আ মি • যা ব

I পা পা -ধা । পা -১-ধা I পধা -১ -১ । -পমা -গা -১ I গা মা -ধা । পমা মা -গা I
 বে ধা ব্ ধা • টে • অ জ প ব লে ব্

I সা রা -গা । গা মা -১ } I { না না -১ । না না -১ I না সর্গ -১ । না সর্গ
 পা রা বা বে উ ধা ন্ হাও যা লা গে পা লে

I না না -১ । না সর্গ -১ I নার্স-পর্গ । পা ধা -১ } I সর্গ -সর্গ সর্গ । সর্গ সর্গ
 পা বে ব্ পা নে ধা ধা • • ব্ ক লে চো ব্ ছ চো বে

I সা সা সা । রা রা -গা I মা পা -ধা । পমা মগা -১ I মা মা -ধা । পা ধা -ধা I
 ছু বি রে ধা ব অ ক ন্ ব ধা • সা গ ব্ ড লে

I পধা -পা -সর্গ । সর্গ
 গো • •

এখন আর দেরি নয়

বরলিপি : ঐশৈলজারজন মজুমদার

{ পা পা II পা -সাঁ সাঁ সঁনা । না -১ -ধা I ধা -না না নধা । বধা -১ -পা
এ খন্ আ ব্ সে রি • ন ঘ্ খ ব্ ধো তো • রা

I পক্ষা -ধা ধা -পা । পা -জ্ঞা জ্ঞা -পা I গা -১ পা
হা • তে হা তে ধ ব্ গো

I সা রা -১ । গা -১ জ্ঞা -১ I পা -১ ধা সাঁ
আ প ন্ প থে কি ব্ তে সে

I সাঁ -১ -গাঁ গঁরা । রাঁ -১ রাঁ -না I নরাঁ -১ সাঁ -১ } সাঁ সাঁ I
সাঁ হ্ নে • নি ল ন্ ধ • ব্ গ ৩ দে

I সঁরা -১ গাঁ গঁরা । রঁরা -১ -১: -র: I রাঁ -গাঁ গাঁ গঁরা । -১ -সাঁ
৬ ট উ টে • ছে • • • ল ধ বে •

I সাঁ -গাঁ গাঁ গঁরা । গঁরা -১ -১ -সাঁ I সঁনা -রাঁ সাঁ না । ধা -পা
খ ল্ ল ছ • যা ব্ ন্ দি বে বে

I পা -না না নধা । বধা -১ -পা -১ I পক্ষা -ধা পা জ্ঞা । গা
ল গ্ ম ব • বে ধা • ঘ্ পা ছে ভা

I সা রা -১ । গা -১ জ্ঞা -১ I জ্ঞা -পা পা সা সা
কো থা ঘ্ পু জা ব্ য ব্ ধা থন্

রা গা । গা -১ গা রা I সা -রা গা
যা কি ছ্ আ ছে য বে

I গা -পা পা -১। পা পা -১ I পাঃ -ক্ষঃ -১ -১ -১ -পা I
পূঁ আ বু ধা লা বু ন

I পা ধা না। না -১ -১ -ধা I ধা -না না নধা। নধা -১ -পা
আ স্ব দা নে • বু উ ং ন ধা• রা ঘ্

I পা -১ -ক্ষা নধা। নধা -১ ধা -ক্ষা I ক্ষা -ধা পা পা -১ I
ন ড্ গ• ল ঘ ট্ বু গো আ ঙ্

I পা ধা -১। ধপা -১ পর্সী -১ I -১ পা -১ I
নি তে ও হ• বে• আ ঙ্

I পা ধা -১। ধপা -১ পর্সী -১ I -১
নি তে ও হ• বে•

I সী -না নর্গী রর্গী। না -১ -১ -ধা I ধা -না না -ধা। ধা -পা পা
হে রি• কে• ন • ক রি দ্ ত বে

I পা -ক্ষনা না নধা। ধা -পা পা -১ I পক্ষা -ধা পা -ক্ষা। গা
গা • চ্ তে ঘ• দি ঘ্ বে• চে নে

I সী -নর্গী গী -১। র্গী -১ র্গী -না I নর্গী -১ সী -১। -১ -১ পা পা II II
ন বু তে হ বু তো ম• বু গো • "এ বন"

এই গানটি ভাণ্ডার মাসিকপত্রের ১৩১২ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে যে স্বর দেন তাহা কেহ কেহ শিখিলেও ইহার বহুল প্রচার বা স্বরলিপি-রচনা হইয়া উঠে নাই। সঙ্গীত শাস্ত্রনিকেরদের প্রাক্তনকারী শ্রীমতী রমা গুপ্তের সহায়তায় গানটির স্বরলিপি রচিত ও মুদ্রিত হইল।

গগনে গগনে ধায় হাঁকি

ক্ষুভ হয়ে গেল

অবলিপি : ঐশ্বর্যদেব বোষ

II { না সী সী । সী সী না I ধা -সী না । ধপা -১ -১ I (পা -না না । না না পা I
গ গ নে গ গ নে ধা হ্ হা কি বি • হা ত

I পা -না না । না না পা I মা -পমা পা । বগা -১ -১ I গা -মা -পা । -ধা -না -সী I
ব হ্ হা বা হি নী বৈ • • না নী

I -ধা -সী না । ধপা -১ -১ I I না -সী সী । সী সী -১ I সী -না রী । সী রীসী -না I
হ্ হা কি • • হ্ হা বে গে হ্ হা ন্ ন্ হা গা • হ্

I না না -সী । সী সী -না I না না ধপা । -১ -১ I গা -মা -পা । -ধা -না -সী I
ব ন হ্ প তি হ্ না বা তে • •

-ধা -সী না । পা
হ্ হা কি

[I নীর্জা জী । জী জী -১ I রী রী -১ I জী রী -সী I সী -জী জী । রী
হ্ • হ্ ম দে হ্ নে না হ্ মা তা হ্ ধা হ্ পা বি

I সী -নীর্জা রী । সীনা -১ I না না -সী । সী সী -১ I সী রী । সী রীসী -না I
ধা • হ্ পা বি • • অ ল হ্ প বে হ্ হ্ দ উ হা • হ্

I না -১ রী । সী সী -না I ধনা না ধপা । -১ I গা -মা -পা । -ধা -না -সী I
হ্ ক উ বে গে হ্ পা • বা তে • •

I -ধা -সী না । ধপা -১ -১ II
হ্ হা কি •

II { গা -মা মা । পা পা পা I পা -ধা না । না না না I ধা -মর্সী -ধনা । ধপা I
 ঞ ন্ ত র ত ল ম ন্ ধ ন ক রে ছ • ন্ দে•

I পা পা -না । দা দা -পা I মা -পদা -মপা । ধগা -১ -১ I গা মা মা । মা মা মা I
 দা দা কা লো ন্ ধ • ন্ ধে ক হু ডা লো ক হু

I মা -১ -পা । পা -ধা -না I পা ধা না । না না মর্সী I ধনা না ধপা । -১ -১ I
 য ন্ দে ক হু লো দা ক হু ধী • কা তে•

I { মর্সী -১ জাঁ । জাঁ জাঁ জাঁ I রী জাঁ জাঁ । -১ জাঁ রী I সী সী -মর্সী । রী
 ছ • ন্ দ না টি ল হো ম ব ন্ হি ব ত ব • হ্ গে

I -সী -রী -সী । -না -সী -না } I না -সী সী । সী সী -১ I না -১ মর্সী । সী মর্সী -না I
 ন্ ক তি ব গে ন্ ধো ধ্ ধ বী বে• ন্

I না না -সী । না -১ -১ I -পা -ধা -না । -পা -ধা -না I -নধা -পা -১ । -১ -১ -ধপমা I
 জ ত হ্ গে

I মা পা । মা -পধা পা I মগা -১ I গা -মা মা । মা মা মা I
 ছ ম ছু টি ল • ছ ন্ দ ছু টি ল

I মা মপা পা । পা পা পা I পা -দা দা । দা দা মপা I দবা গদা পা ।
 প্র ল • ব প পে ব ক জ ব খে ব • চা • কা তে

I গা -মা -পা । -ধা -না -সী I -ধা -সী না । ধপা
 ধা ষ্ হী কি

'গগনে গগনে ধাব হাঁকি' তাদের মেসের অক্লান্ত গান । সম্পূর্ণ নাটকটি সমুদয় গানের
 স্বরলিপি -সহ শিখাই প্রকাশিত হইতেছে ।



বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭

‘মুরোপযাত্রীর ডায়ারি’র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্বাহ্নয়তি

রবিবার [২৬ অক্টোবর ১৮৯০]। সকাল থেকে একটু কোড়ো বকম হয়ে আছে। সকলেই আকেশ করচে তাহাঙ্গের রবিবার অত্যন্ত dull—সময় কাটে না। মেয়েদের মধ্যে একটা খুব excitement, চিত্রচিত্র বনেট মাথাধ দিয়ে রাবিবারিক বেশ পরিধান।—ইংরেজ মেয়েদের বনেটের উপর ভারি রোঁক—বনেটে পরস্পরকে হারিয়ে বেওয়া একটা জীবনের লক্ষ্য। Miss Mull, Miss Oswald সকলেই বনেট বনেট করে অস্থির—কিন্তু আবার চোখে অধিকাংশ বনেট অত্যন্ত সুসজ্জিত এবং বর্ষস বলে দেখে। আর এক গণ্ডা। নিশিদিন উল্টে পাল্টে কেবল বলকাতার ছবি মনে করি।

আহাঙ্গের দিন :—সকালে ভেক্ দুয়ে দিয়ে গেছে—এখনো জিহে রুগছে—হুইংয়ের ডেকচেয়ার বিবুলভাবে রাশিকৃত ;—গালি পায়ে রাতকানির পরা পুরুষগণ কেউবা বহুসরে কেউবা একলা মধ্যগ দিয়ে হুহ করে বেড়াচ্ছে—ক্রমে ধন আটটা বাজল এবং একটা আপটি করে বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান। রানের ঘরের লম্বা তয়ানক ভিড—তিনটি মাত্র রানের ঘর, আখরা জন চার্লসেক লোক—সকলেই হাতে একটি তোয়ালে এবং ম্পা নিয়ে ঘরমোচনের অপেক্ষা আছে—এশ মিনিটের বেশি রানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই। রান এবং বেশভূষা লম্বাণনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণা প্রভাতবাহুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের লম্বাগম হচ্ছে—ধনধন টুপি উল্কাটনপূর্বক মহিলাদের এবং পরিচিত বহুবাহুসেবীর সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন-পূর্বক স্ত্রী-পুরুষের ভারতবাসী লম্বা পদচারণার মতামত ব্যক্ত করা গেল। কথেক বাবে নটার সময় ঘট, বেলে উইল—Breakfast প্রস্তুত, বহুস নরনারীগণ সোপান পথ দিয়ে নিরুদ্ধক ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে—ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট হইল না, কেবল গ্যারি গ্যারি লুভরয় জৌকি উর্দ্ধমুখে প্রবুদ্ধের অন্তে অপেক্ষা করে হইল। ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর—মাঝে দুইগার লম্বা টেবিল, এবং তার দুই পাশে বগ বগ ছোট ছোট টেবিল—আখরা দক্ষিণপার্শ্বের একটি ছোট টেবিল অবলম্বন করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার স্নান নিবৃত্তি করে থাকি। মাংস, কটি, কলমুল মিটার হরিরা এবং হাতকৌতুক গল্পগল্পে এই অনতিউচ্চ স্প্রশপ ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। আহাঙ্গের পর উপরে গিয়ে যে ঘর নিজ-নিজ জৌকি অবেশন এবং বধ্যবাসে স্থাপনে ব্যস্ত। জৌকি দুই পাণ্ডা দাস—ডেক ধোবার

শব্দ কত চৌকি কোন্‌খানে টেনে নিয়ে রেখেচে তার ঠিক নেই— তার পরে চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনায় সাহায্যটুকু শুছিয়ে বেওয়া বিধম দাঘ— যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু নৌহের ভেদ্য কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলে হুঁলে টেনে টেনে পাশ কাটিয়ে গথ করে আপনায় চৌকিটি রাখতে পারলে তার পরে সমস্ত যিনের মত নিশ্চিন্ত। তার পরে বেধা ঘাঘ কোন চৌকিহারা জানমুখী রমণী কান্ডরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করচে, কিম্বা কোন বিপদগ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে আপনায় চৌকিটি বিস্মিষ্ট করে অভিজ্ঞতায় স্থানে স্থাপন করতে পারচে না, তখন আমহা পুরুষগণ নারী-সহায়ত্বে চৌকি-উদ্ধারকাণ্ডে নিযুক্ত হয়ে হুমিষ্ট ধস্তাবাদ উপার্জন করে থাকি। তার পরে মে-বার চৌকি-অধিকার করে বসে ঘাওলা ঘাঘ — ধুস্তসেবীগণ হয় ধুবককে নয় ভেকের পচাচ্যাগে সমবেত হয়ে পরিতুষ্ট মনে ধূমপান করচে। মেয়েরা অর্ধনিদ্রান অবস্থায় কেউবা নড়লে পড়চে, কেউবা সেলাই করচে— নাকে নাকে দুই একজন ধুবক ক্ষণেকের ভ্রম্তে পাশে বসে মধুকরের মত কানের কাছে সহাত্ত গুনগুন করে আবার চলে যাচে। আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্রই Quoit খেলা আরম্ভ হল। দুটি বাস্তি পরস্পর থেকে হাত-মশেক দূরে স্থাপিত হল— দুইয়ুটি স্ত্রীপুরুষ বিরোধীপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয় স্থান থেকে কতকগুলি ঝঙ্চর বিপরীত বাস্তিতির মধ্যে নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করচে লাগল— যে পক্ষ সর্ব্বোপে একুশ করতে পারবে তারি জিৎ। কেউবা ধাড়িয়ে দেখতে লাগল, কেউবা গণনা করতে লাগল, কেউবা হোপ মিলে, কেউবা আপন আপন গড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে রইল। একটার সময় muchএর ঘণ্টা বাজল। আবার একচোট আহার। তার পরে উপরে গিয়ে দুই স্তর বাস্তের ডারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তানে আলস্ত অভ্যস্ত হনীকৃত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রপাত, আকাশ হনীল মেঘমুক্ত, ঘন ঘন বাতাস দিচ্ছে, কোমরায় হেলানু গিয়ে নীরবে নড়লে পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নির্যবেণ হয়ে আসচে : কেবল দুই একজন পান্যপানি বসে দাবা, backgammon কিম্বা draft খেলচে, এবং দুই একজন অস্ত্রাস্ত্র অধ্যবসায়ী ধুবক সমস্তদিন Quoit খেলচে— কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলর নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিগচে এবং কোন শিষ্টকুললা কৌতুকপ্রিয়্য ধুবতী নিমিত্ত সহবাত্তীর ছবি আঁকবার চেষ্টা করচে। ক্রমে নৌহের প্রথরতা হ্রাস হয়ে এল, তখন তাপব্রিষ্ট স্নাত্তকারণগণ নীচে নেবে এসে কটিমাখন নিঃস্রায় সংযোগে চান্দপান করে শরীরের অচুতা পরিহারপূর্ব্বক পুনর্বার ভেঁকে উপস্থিত। পুনর্বার ধুস্তলম্বিত্তির সোমসাহ পমচারণা এবং হাতালাপ আরম্ভ হল। কেবল দুচাষজন পাটিকা উপস্তানের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারচে না, দিবাবগানের কীপালোকে একান্ত নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নারিকার পরিণাম অন্বেষণ করচে। দক্ষিণে জলস্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্ত মেল, এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েছে— আহা! থেকে পূর্ব্বদিশস্ত পণ্যস্ত বহাবর জ্যোৎস্নারোহা কিং কিং করচে— পূর্ব্ববার সন্ধ্যা যেন নীল সমুদ্রের উপর আপনায় স্তম্ভ অবলুি স্থাপন করে আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব্বভারতবর্ষের গথ নির্দেশ করে দিচ্ছে। জ্যোৎস্নার ভেকের উপর এবং কক্ষে কক্ষে বিভ্রাঙ্গীণ জলে উঠল। দুটার সময়ে ভিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজল— বেশপরিসর্ব্বতনের ভ্রম্তে স্বয় ক্যাবিনে প্রবেশ করলে— তার পরে আধঘণ্টা বাজে তখন বিতীর ঘণ্টা বাজল— ভোজনসমূহে প্রবেশ করা গেল— সারিগারি নরনারী বসে গেছে, কারো বা কারো কাপড়, কারো বা হস্তীন্ কাপড়, কারো বা স্তম্ভবক অর্ধ অনাকৃত, বাহার উপরে শ্রৌণবস্ত্র বিভ্রাং আলোক জলচে, গুনগুন আলোপের

সঙ্গে সঙ্গে কাটাচামচের স্বনব্ব চুটাই, শব্দ উঠে— এবং বিচিত্র পাঞ্জের পর্যায় পরিচায়কদের হাতে হাতে ঘ্রোতের মত বাতাসাত করচে। আহাযের পর ডেকে গিয়ে পীতল বায়ু সেবন— কোথাওবা যুবকযুবতী অঙ্ককার একটি কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গুন্‌গুন্‌ করচে, কোথাওবা ছুঁয়ে জাহাজের ব্যারান্স ধরে হুঁকে পড়ে রহস্যলিপে নিব্ব, কোন কোন যুগল সহাত্ত গল্প করতে করতে আলোক এবং অঙ্ককারের মধ্যে দিয়ে দ্রুতপদে চলে বেড়াচ্ছে— কোথাওবা একদায়ে পাঁচসাতজন স্ত্রীপুরুষ ভটলা করে উচ্ছ্বাস্ত এবং বিবিধ প্রানোদকরোশ উজ্জ্বলিত করে তুলেচে,— অলস পুরুষরা কেউবা বসে কেউবা ঝড়িয়ে কেউবা অর্ধসন্ধান অবস্থার চুট খাচ্ছে— কেউবা Smoking saloonএ কেউবা নীচে গাভার দপে Whisky soda পাশে নিয়ে চার চার জনে দল বেঁধে Whist খেলচে। এদিকে Music saloonএ গম্বীতগ্রন্থ ছুঁচরনের সমাবেশ হয়েছে— গানবান্ধনা এবং মধ্যে মধ্যে করতালি শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নৃত্যের আয়োজন হয়— কিন্তু পুরুষনরুকদের স্বভাবসিদ্ধ আলস্ত এবং অনন্যোযোগিতাবশতঃ কিছুদিন থেকে নাচ তেমন করতে না। জমে লাড়ে দশটা বাজে, মেয়েরা নোঁবে যায়— ডেকের উপরের আলো! হঠাৎ নিবে যায়— তেঁক নিশেধ নির্জন অঙ্ককার হয়ে আসে— এবং চারিবিকে নিশ্চৈবে নিস্তব্ধতা, চম্ভ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের চিরকলধনি পরিচ্ছূট হয়ে ওঠে।

সোমবার [২৭ অক্টোবর]। Red Sea'র গরম জন্মই বেড়ে উঠেচে। ডেকের উপরে মেয়েরা সমস্ত দিন তুষাতুর হরিঙ্গীর মত pant করচে, রৌহদ্র কুলের মত তাদের তাপক্লিষ্ট স্নানমুখ দেখে দুঃখ হয়। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে শাখা নাড়চে, খেলিঃ সট চুঁকচে— এবং যুবকেরা ধবন পাশে এসে কল্মষের কুল জিজ্ঞাসা করচে তখন নির্দীলিতপ্রায় বেত্রপল্লব অলসভাবে ঈগ্‌ উট্টালন করে স্নান সমান্তে গ্রীবাভবীষ্যাবা ইন্নিতে আপন দুরবস্থা ব্যক্ত করচে; কিন্তু ততই Lemon Squash এবং পরিপূর্ণ করে lunch খাচ্ছে ততই জড়ৎ এবং ক্লান্তি বাড়চে, ততই নেত্র নিস্ত্রালস এবং সর্কশরীর শিথিল হয়ে আসচে। আমাকে কেউ কেউ ঈগ্‌ ক্রোণের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করচে— I suppose you like this weather। আমি বিনীত দুঃখিত কাতরভাবে নতশিরে সসম্বোচে অপর্যাপ্ত স্বীকার করে নিচ্ছি।

লোকনকে চিঠি লেখা গেল— আজকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন খবর না থাকাতে উপরোক্ত প্যারেগ্রাফ্‌ লোকনের চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে রাখা গেল। কাল একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম লিখতে লিখতে ডিনারের ঘটা বেজে গেল আর ক্যাবিনে পড়ে পড়ে সেটা শেষ করলাম। একটা সামান্য কবিতা লিখতে ঘনটাকে কি রকম করে নিড়ে বেগ করতে হয়, হাতা পড়ে তারা বোপ হয় তার কিছুই বুঝতে পারেনা, তারা কেবল ডলেমন্‌ সমালোচনা করে মাত্র। কাল সকালে এডেনে পৌছব— তার পরে যবে— তার পরে কলকাতা।

বুধবার [২৮ অক্টোবর]। আজ সকালে Turbull আবার কাছে বম্বাতির উপবে খুব আক্রোশ প্রকাশ করছিল। 'বদ্বছিল Selfish stuck up stiff, no manner in them. বদ্বছিল স্নায়োজ একদিন বসেছিলাম একজন মেয়ে পাশে ঝড়িয়েছিল আমি ভতঃ করে তাকে চৌকি ছেড়ে দিলাম, সে একটি ঘটা ধরে আবার চৌকি জুড়ে বসে গেল, উঠে হাবার সময় একটি thank নিয়ে গেলনা। Gibb গল্প করছিল 'Crowded' Busএ আমি ভতঃ করে একজন মেয়েকে যেমনি রাখা ছেড়ে দিলাম অরনি আলানবদনে তিন চারজন মেয়ে এসে আবার সমস্ত ভাঙমা জুড়ে বসল। তারা মনে করে তাদের

এটা অধিকার— কিছুমাত্র ভয়ভার সহ্যেচ নেই। Turnbull বস্‌ছিল একবিন Picture Galleryতে Lady Friend নিয়ে গিয়েছিল— প্রান্ত হয়ে এক কারাগার বলে ছিল— পাশে একজন মেয়েকে ধাঁড়াতে দেখে তাকে আঁগা ছেড়ে দিচ্ছিল, অমনি তার সহচরী কোর্দা ধরে টেনে বসিয়ে দিলে বলে 'Don't be a fool, you are not on the Continent!' অর্থাৎ এখানকার লোকেরা ত ভয়ভার বঁধ্যাধা বোঝে না।

এতদে পৌছন গেছে। একরাশ আরব এসে ভয়ানক গোল বাধিয়ে দিয়েছে। মনে মনে একটুখানি চিঠির আশা ছিল। Steward একটা চিঠি এনে দিলে জ্যোতির্দাদার হাতের অক্ষরে "S. Tagore Esq. Passenger P & O Mail Steamer, Aden" তার থেকে বোঝা যাচ্ছে— যে চিঠিতে আমি এতদে উত্তর লিখতে অহুরোধ করেছিলাম সেটা বাবির্য পেয়েছে। যাহোক আমার অদৃষ্টে কিছু নেই। তিনটি রবিবার রাত একটার সময় জাহাজ যথেষ্ট বন্দরে পৌছবে তাহলে তার পরদিন সমস্ত দিন গাড়ির ভ্রম্ভে অপেক্ষা করতে হবে। এমন বিশ্রী লাগচে! একটা Messagerie জাহাজ এতদেনের কাছে জলে ডুবে রহেছে দেখলাম— Messagerie শাইনের আর একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল।

বিকেলটা কাটাবার ভ্রম্ভে বলে বলে একটা কবিতা লেখা গেল। এক এক সময়ে কবিতা লিখে ননটা বেশ প্রবৃত্ত হয়ে ওঠে— এক এক সময়ে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার ব্রহ্মবৈরাগ্য রেখে দিয়ে যায়— এবং সেইখানটা বরাবর বাধ্য করতে থাকে।— সমস্ত দিন কোনক্রমে কেটে যায়— কিন্তু দীর্ঘ সন্ধ্যাবেলা জারি ছটফটানি ধরে। সাড়ে ছটার সময় ভিনার, তার পরে কতকগুলি চুপচাপ করে বলে থাকি— Gibbs Hurricane deckএ বেড়াতে নিজে দাবার ভ্রম্ভে টানাটানি করে, তখন জারি বিরক্ত ধরে— এই সকল নানা কারণে আমার মত moody লোকের পক্ষে বহুত ভাবি দুঃসাহ্য।

বুধবার [২০ অক্টোবর]। দালাল বলে একজন পার্সি আমাদের জাহাজে আছে। তাকে প্রায় অবিকল বোগেশের মত দেখতে— সেইরকম মুখের বেড়, সেইরকম দাড়ির ছাঁট, সেইরকম জু এবং কপাল— কেবল এগ চোখ দুটো খুব বড়। অল্প বয়স। নমাস ঘুরাশে বেড়িয়ে বিলিতি শোবাক এবং চলচলন ধরেচে— বলে India-like করেনা— বলে তার ঘুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশ মেয়ে) কাছ থেকে ইতিমধ্যে ভিনশো চিঠি পেয়েছে— কিন্তু "আমি কারো সঙ্গে বহুত করতে চাইনে, বরন আমার আলাপীরা মনে করে আমি তাদের বহুত— তখন সে কুল জারিয়ে দিতে আমি বিলব করিনে।— There's no fun keeping friends— only lot of troubles। তার পরে বলে I don't care for flirting. There's no fun in it. I have flirted with great Italian German French English girls—I am tired of it. You tell lot of lies to a girl, and she hits you with her fan—not much fun in it—I don't like the Englishmen who come from India.—Therefore I don't speak to the people in this boardship—ofcourse if they come to me and speak to me I speak to them. I speak to some twelve thirteen people in this steamer—I speak for about two hours to a gentleman every morning. (ভাল ইংরিষি বলেনা এবং ঈশং নতুন বক্শের উচ্চারণ— speakকে spick বলে) বাবালীদেব বাব বলে— আমাকে বলে You speak very good English— where did

you learn it? বলে With my European dress people take me for an Italian or a French. I am not dark enough for an Indian. (লোকটা আমারি মত dark) লোকটা খুব লম্বা লম্বা কথা বলে— ভারি অদ্ভুত, ভারি stupid। বলে আমি Scientific বই ভালবাসি— আমি বহুত আমারকে ছুই একটা ধার নিতে পার— বলে স্তোরমের নীচে আছে, বের করা শক্ত।

খুবসার। একটা ইংরিজি কাগজ পড়ছিলুম তাতে আমাদের বিশি মেডেবের দ্রব্যসম্পদে খুব কাতরভাবে লিখেছে। আমাদের বিশি মেডেবের ঠিক অর্থ ইংরেজদের পক্ষে বোকা ভারি শক্ত। আমার ত মনে হয় আমাদের মেডেবা ইংরেজ মেডেবের চেয়ে বেশি স্থপী। ভালবাসতেই বেয়েনেপ জীবনের প্রকৃত সজলতা— তার থেকে আমাদের মেডেবা বঞ্চিত নয়— নিষেধ ছেলেমেয়ে, নিষেধ স্বামী, এবং বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাদের ক্রমবর্ধমান সমস্ত প্রতিষ্ঠিত চরিতার্থতা লাভ করে— ভালবাসার সমস্ত শাখাশাখা চতুর্দিকে আপনাকে প্রসারিত করার স্থান পায়; আর যাই হোক কাঁধেভাবে তাদের জ্বর কঠিন ও শুষ্ক হবার অবদান পায় না। একজন ইংরেজ Old maidএর জ্বর কি মৃত কি সর্বাঙ্গ এবং নীরস হয়ে আছে। আমাদের বালবিশ্বাস্য প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ Old maidএর সমতুল্য— কিন্তু বৃহৎ পরিবারের মধ্যে শিশুসহ ওকালতি লিখিত প্রবাহে তাদের নারীস্বত্বকে সর্বদা কোমল ও সরল করে রাখে— লড়া কিংবা কুতূহলকে ধরা সমস্ত শক্ত জীবনকে ব্যাপ্ত রাখার আবশ্যক হয় না। আমার মনে হয় সভ্যতার আকর্ষণে ইয়ুরোপীয় মেডেবা এতদূর বেরিয়ে এসেছে যে তাদের ক্ষেত্র থেকে ছিন্ন হয়ে কক্ষের বাহির হয়ে পড়েছে। তারা প্রবোধের পক্ষেই দুর্ভাগ্য হোক, কিংবা কাঁধেতে পুরুষদের সঙ্গে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হোক, কিংবা বিমানে কৌদার্য বা বৈবাহ্য বাপন করুক তাদের স্ত্রীপ্রকৃতির মধ্যে শান্তি নেই— হয় তারা প্রমোদে উন্মত্ত, নয় তারা আন্তরিক অসন্তোষে আক্রান্ত। আর যাই হোক, আমাদের ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক উন্নতির পক্ষে বড়ই ব্যাঘাতজনক হোক, আমাদের বৃহৎ পরিবার মেডেবের পক্ষে একান্ত উপযোগী। কারণ ভালবাসাইন মৃত স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি উদ্বাসন— মক্কুনির স্বাধীনতা গৃহপ্রিয় লোকের পক্ষে যেমন নিদারুণ শূন্য। আমরা যাকে বন্ধন মনে করি মেডেবের পক্ষে তা বন্ধন নয়। অবিভক্ত স্বত্বদ্বং পুরুষদের মত মেডেবের জীবনেও আছে— পুরুষদের অগত্যালাজ যেমন কঠিন, ভালবাসার কর্তব্যও তেমনি সকল সময়ে লঘু নয়— ভালবাসারও অনেক ধর্য অনেক বালাই আছে। কিন্তু ভালবাসার ত্যাগবীকার অনেক সহজ— আমার পক্ষে বহুত নিমগ্ন রক্ষা না করে চাপকান পরে আগিলে বাণীয়া বৃত্ত কঠিন, মাথের পক্ষে সন্তানের অস্থিরোপে নিমগ্ন অগ্রাহ করা ভদ্র কঠিন নয়। এইমত্রে মেডেবের জীবন পুরুষের চক্ষে বৃত্ত কঠিন মেক বেডেবের পক্ষে ভদ্রতা নয়। তাদের নিভৃত স্থপ্তির মধ্যে থেকে উৎপাটন করে তাদের বাইরে এনে দাও তারা কখনই স্থবী হবে না। আমাদের মেডেবা যে ইংরেজ মেডেবের চেয়ে অস্থবী বা নির্কোণ বা অনিশ্চিত তা নয়— আপন সীমানার বাইরে তারা নির্কোণ শক্তিত সচ্ছচিত— বাইরে নিয়ে গেলে তারা জানেনা কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে— কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্যে তারা সজ্জয় প্রতিভাশালিনী। তারা আমাদের সেবা করে, আমাদের সকলের খাওয়া হয়ে গেলে তবে খায় তার থেকে যদি কেউ মনে করে আমাদের মেডেবের আমরা অনাধর ও পীড়িত করি তবে সে মহা ভুল। অস্তঃপুরে তারা কতী, আমরা তাদের অতিথি— তাই আমাদের এক আদর— আমরা কর্তা বলে নয়। এমন কথা কে কবে বলেছে আমাদের

উপাধীনকার্যে ঘেরেরা সাহায্য করেনা অতএব তারা স্বার্থপর ও হুমহুহীন—কর্মক্ষেত্রে আমরা স্বার্থ—
সেবানকার সমস্ত কষ্ট আমরা বহন করে ঘেরদের তার থেকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। (উপর এবং
অন্যত্রাঙ্কের Fable)

আমাদের ঘেরেরা খুব বেশি লেখাপড়া শেখেনি তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে
ইংরাজি শিক্ষার কি ফল কে জানে। না হু হুয়ের মধ্যে একটা মিনি শিক্ষার দুর্গ রইল তাতে স্মৃতি কি ?
বালাকাল থেকে বিদেশী ভাষা শিক্ষার আমাদের মস্তিষ্ক অবসর এবং চিন্তাসক্তি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।
আমরা পুস্তকরা ত ইংরাজি শিক্ষার তা' লেগেলেগে অতি দীর্ঘ অকালে শেখি হাড্ডি— আমাদের অন্তঃপুরে
না হু অন্তর থেকে বাহ্যলী রসাকর্ষণ করে অল্পে অল্পে স্বাভাবিক পরিণতির একটা পরীক্ষাফল থাকে।
ইংরাজি শিক্ষা বাকলার মধ্যে দিয়ে তাদের নাড়ির মধ্যে প্রবেশ করুক এবং বর্তমান অবস্থাবিশিষ্টদের
সঙ্গে অল্পে অল্পে তাদের সামঞ্জস্যপাথন হোক। এই যে বইগুলো লিখি এবং ছাপাচ্ছি এবং বঙ্গবাসীতে
বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, নিম্নে ঘেরেরা পড়ুক, না পড়ে ত কিছুক।

ইংরেজরা একটা বৃত্তে পারেনা— যে, ইংরেজ শ্রীপুরুষ এবং মিনি শ্রীপুরুষের মধ্যে বৈলক্ষ্য্য প্রায়
সমান। ইংরাজ শ্রীপুরুষের মধ্যে যদি শিক্ষা স্বাধীনতার নামা থাকিত, তাহলে Millএর বই লেখবার
এবং বর্তমান বিন্দুগীতলীর বিদ্রোহ করবার কোন কারণ থাকত না। আমরা মাটি কামড়ে
কোনমতে ঘরের প্রাচীরটিতে পড়ে থাকি আমাদের ঘেরেরা সেই ঘরের অন্তঃপুরে বিরাগ করে— তোমরা
পুঙ্-আফাদনে সমস্ত সংসার ঘোলা করে বেড়াও, তোমাদের ঘেরেরা তোমাদের অস্ববস্তী। কিন্তু
এখনও তোমরা পুরুষবাই প্রধান, তোমরাই প্রভু— তোমাদের স্ত্রীরা অস্বগত ছায়া। তোমাদের তুলনায়
তোমাদের স্ত্রীরা অশিক্ষিত।

বিধবা বিবাহ না থাকাতে আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের অভ্যস্ত কষ্ট ? তোমাদের দেশে স্ত্রীরা বিবাহ
বন্ধ হয়ে সমাজে দত্ত অনাথা স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হয়েছে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে তত
হলনি। সমাজের মঙ্গলের প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায় তবে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ অসম্ভব,
তোমাদের দেশে অবস্থাবিশেষে বিধবা বিবাহ আবশ্যক। সকল সমাজনিয়মই আপেক্ষিক। আমাদের
সমাজ তোমরা কিছুমাত্র জাননা— এইজন্য আমাদের সমাজ-গৃহে তোমরা কিছুই বুঝতে পারনা।

যেমন শোকভেদে ভেদনি স্নাত্তভেদে স্বহৃৎখ বিভিন্ন। আমি যখন গাঙ্গিপুত্রে থাকতুম, তখন
ইংরেজরা মনে করত, আমায় প্রবেশ বেলী ও লক্ষ অভাবে আমি বৃষ্টি ভারি হিম্মান হয়ে আছি—
তাই আমাকে ক্রমাগত নিম্নগণ করত এবং ক্রান্তের মেঘর হবার ভয়ে অস্বয়োধ করত। আমি যে আমার
ঘরের কোণে গুচ্ছবেলা আলোটি জ্বলে আমার আপনায় লোক নিয়ে কত স্বখে থাকতুম তা তারা
বুঝতে পারত না। একজন Lady Dufferin-ঘেরে-ভাঙ্কার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন
সেবে অপরিষ্কার ছোট ঘর, ছোট আনলা, মহলা বিছানা, মাটি প্রদীপ, দড়িবাগা মশারি, আটাইউড়িয়ার
রং-লেশা ছবি— তখন সে মনে করে কি সর্বনাশ— কি ভয়ানক কষ্টের জীবন— এদের পুরুষরা কি
স্বার্থপর— স্ত্রীলোকদের সন্তর হত করে রেখেছে। জানেনা আমাদের পশাই এই। আমরা মিল পড়ি,
বস্ত্রিন পড়ি, স্পেলার পড়ি, কেরাণ্ডিগিরি করি, ববরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, তাই মাটির প্রদীপ
জালি, ঐ বাড়রে বসি, অবস্থা স্বচ্ছল হলেই স্ত্রী গমনা পড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাগা মোটা মশারি

মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী, এবং দায়বাসনে একটি কচি খোকা নিয়ে ভালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি। ওগো, তবু আমরা ক্ষম নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেনারা নেই কিন্তু তবুও আমাদের বহামাখা ভালবাসা আছে। তক্তপোষের উপর তাকিয়া ঠেসান নিয়ে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও অনেকটা বৃষ্টি পানি এবং জ্বল পাই, তাক। প্রবীণে খোলা গারে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে তবুও আমাদের ছেলেরা তোমাদের মত agnostic হয়ে আসচে।—আমরা আবার তোমাদের ভাব বৃষ্টিতে পরিণে। তোমাদের স্বপ্ন স্বচ্ছন্দতা আর এক বকনের। কৌচ কেনারা তোমরা এক ভালবাস যে স্ত্রীপুত্র না হলেও চলে। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে তোমাদের ভালবাসা—আমাদের ভালবাসা নিভান্ধই আবস্তক, তার পরে আরাম থাক বা না থাক।

কিন্তু তোমরা খুব সভ্য জাতি, তোমরা অনেক মহৎ কাণ্ড করেছ, অতএব তোমাদের সমস্ত প্রথাকেই মানবের উন্নতির স্বকূল বলে মনে নিতে হবে। কিন্তু আমরাও এককালে উন্নত জাতি ছিলাম, এই বিপুল স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আমাদের পতন হয়েছে—এবং কে বলতে পারে ঐ উত্তরোত্তর বর্ধনশীল স্ত্রীপুত্র আরাবের মধ্যেই তোমাদের সভ্যতার সন্ধানি হবেনা। ভারতবর্ষে পরিবারিক প্রথা ক্রমে এত বিপুল এবং জটিল হয়ে গড়েছিল যে সভ্যতার সমস্ত শক্তি পরিবার রক্ষার মধ্যেই পর্যাবসিত হয়েছিল—সংসৃত পরিবারের চাপে ব্যক্তিগত মহত্বের ক্ষুদ্রি বদ্ধ হয়ে সমস্ত একাকার হয়ে এসেছিল। তোমাদের আরাম ক্রমেই এত বেড়ে উঠেছে, যে স্বাধীন গতিবিধির পথ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তোমাদের পরিবার প্রতিষ্ঠার শক্তি বদ্ধ হয়ে আসচে—পতিভগ্ন জাতি ভাবে ময়গা দিচ্ছে, এবং socialism মধ্যে মধ্যে নগরধ্ব বিকাশের উপক্রম করছে।

মাসের থেকে মেয়েদের আর মেয়ে থাকবার যো নেই তাদের পুঙ্খ হওয়া বিশেষ আবস্তক হয়েছে। ইউরোপ ক্রমে বৃহ নষ্ট হয়ে হোটেল বুদ্ধি হচ্ছে—যে ঘর নিজে নিজে উপার্জন করছে, এবং আপন-এ ঘরটি, Easychairটি, ফুফুটি, মোড়টি, চুরটের পাইপটি এবং একটি ক্রাব নিয়ে নির্দিষ্ট আয়ামের চেয়ার প্রবুর আছে। স্বতরাং মেয়েদের মোচাক ভেঙ্গে যাচ্ছে। পূর্বে সেবকমক্ষিকারা মধু অধবেগ করে চাকে লজব করত এবং রাজসীমক্ষিকারা কর্তব্য করত—এখন চাক বাধা বদ্ধ করে যে ঘর আপনায় একটি কক্ষ ভাড়া করে সকালে মধু উপার্জন করে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। স্বতরাং রাজসীমক্ষিকাদের এখন বেয়োতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধু পান এবং মধু পান করবার সময় আর নাই। স্ত্রীপুঙ্খের এই স্বাভাবিক অবস্থাবিপর্ধ্যায়ের জন্য ইউরোপীয় সমাজের কি কোন কতি হবেনা? একবার ভাল করে ভেবে দেখ আমাদের স্ত্রীরা অস্বী, না তোমাদের স্ত্রীরা অস্বী। আমাদের স্ত্রীরা গাড়ি চড়ে হাওরা বাঘনা, কিন্তু তাদের কোমল মেহশীল জনর সর্জনসাই পরিপূর্ণ—কোন অবস্থাতেই তার। গৃহহীন নয়।

কেউ মনে না মনে করে মেয়েদের গাড়ি চড়ে হাওরা খাওয়াকে আমি দৃষ্টিগত জ্ঞান করি। আমার বলবার অভিপ্রায় এই, গাড়ি চড়ে হাওরা না খেয়েও তারা একরকম স্বখে আছে, হাওরা মেয়ে তারা আরো স্ববী হব আরো ভাল। অতঃপূর্বের লক্ষীণ সীমার মধ্যে থেকেও তাদের হৃদয়ের অভাব নেই—জ্ঞান ও স্বাধীনতা বুদ্ধির সঙ্গে তাদের হৃদয়ের প্রসারতা আরো বাড়ছে ত আরো ভাল। আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে আমাদের মধ্যে মন যেমন আছে তেমনি ভালও আছে—তোমরা বড়টা বিতীবিকা

সেই ভক্তটা কিছু নয়। আমার ধর্ম যে মানে না সে চিরনরকে বড় হবে এ যেমন গোড়া খুটানী, আমাদের নত বাদের প্রমাণ নয় তারা অস্বীকারী এও স্তম্ভনি গোড়া বৈশাখ্যনতা।

৩১শে বার [৩১ অক্টোবর]। কিছু সময়ের পরিবর্তন হয়ে আসছে। এখন আমাদের বাইরে বিকল্প হবার সময়— কেবলমাত্র পরিবার-প্রতিপালন আমাদের একমাত্র কাজ বলে ধরে নিলে চলবে না। ইংরেজের সংসর্গে এসে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা; আনান্দে একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। চিরদিন অশমানিত এবং বিজ্ঞ হতে আর জীবনধারণ করা চলে না। শিক্ষা করতে এবং শিক্ষা দিতে হবে, আশনার শক্তি দেশে বিদেশে পরিচালিত করতে হবে— পৃথিবীতে আপনার উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে। স্বতন্ত্রা মেয়েদের অবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক। এখন কেবল তাদের গৃহের সামগ্রী করলে চলবে না। তাদেরও জাগ্রত হয়ে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। তাদের মধ্যেও এই নবজীবনের উদ্বোধন আবশ্যক।

আজ সন্দের সময় Hamilton-এর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। সে বলছিল— তোমরা আর বাই কর, ঘুরোপের নকল কোরোনা— Then you are nowhere, you are lost! তোমাদের ধর্ম, তোমাদের সভ্যতা সহস্র সহস্র বৎসর টিকে আছে। কিন্তু চারশো বৎসর আগে আমরা কি ছিলাম? চারশো বৎসর পরে আমরা কি থাকব? আনাদের বড় বড় নগরের মধ্যে কি ভয়ানক পরিলভা প্রবেশ করেছে ডেবে দেখলে আশা থাকে না।

পরিবার [১ নবম্বর]। Dillon সন্ধ্যায় ঘরান। বয়ে পর্যন্ত পৌছবে কিনা সন্দেহবল। বড় আনাদের সঙ্গে এক আহারে ঘুরোপে গিয়েছিল। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন গানবাখানা নাচে হচ্ছিল, এবং আজ সকালে যখন বেলা চাঁৎকার হাসি চলছিল, তখন চতুর্দিকের এই জীবনের কলরব তার কানে প্রবেশ করে কিরকম লাগছিল। আজ সন্দের সকালবেলা, ঠাণ্ডা বাতাস বহে, সমুদ্র সন্দের তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জল রোদ্দে উঠেছে, কেউবা Quoit খেলছে, কেউবা নবল পড়ছে, কেউ গল্প করছে, Music Saloon-এ গান চলছে, Smoking Saloon-এ তাম্বল চলছে, Dining Saloon-এ lunch খাবার আয়োজন হচ্ছে— আর Dillon ঘরচে।

আজ সন্ধ্যা আটটার সময় Dillon-এর সন্ধ্যা হল। আজ সন্দের সময় একটা অভিনয় হবার কথা ছিল, হলনা।

Gibbs আজ আবার তাদের বেয়েদের কথা বলছিল। বলছিল যেহেতু ক্রমে ভারি নির্লক্ষ হয়ে এসেছে— তারা অগ্নিবরনে প্রকাশ্যে উল্লসপ্রায় পুরুষদের ব্যায়ামকৌড়া ও Swimming match দেখতে যায়— এবং Picture Saloon-এর কথা বলে। আমার কিন্তু এগুলো ততটা খায়াশ লাগেনা— এই উল্লস সন্দের মধ্যে একটা বেশ অসচ্ছন্দ Healthiness আছে— আর্দ্রক ঢাকাঢাকি এবং Suggestivenessই ফুটিত— যেমন Ball-room-এ মেয়েদের দুখখোলা কাশড়, এবং নাচ। Waltz নাচ সবচেয়ে Gibbs বেরকম করে বলছিল সে আমি লিখতে পারিনে— সে শুনে আমার ভারি লজ্জা এবং কষ্ট হচ্ছিল। Youngman-এ সবচেয়ে বেরকমভাবে কথা কয় মেয়েদের লোনা উচিত— ইতিপূর্বে একদিন আশ্র এবং লোকের কাছে এ বিষয়ে অনেক কথা শুনেছিলাম।

ভিন্নার টেবিলে Third Officer গল্প করছিল— Hurricane জেকের উপর তাদের ঘরের পাশে

আজকাল সন্ধ্যেলার অন্ধকারে অনেক চুপনের শব্দ শোনা যাচ্ছে— অজানা গম্বাঘনের নিকটবর্তী হয়েছে, বিদ্যায়ের সময় এসেছে, তারি আচোজন। তবে Miss Hedistedt লক্ষ্যে লাল হয়ে উঠল। 3' Off. গল্প করলে— আর একবার সমুদ্রযাত্রার সে চীনদেশ থেকে কাপড়ের পাড় কিনে নিয়ে বাড়িল তাই বেধাবার ক্ষেত্রে একজন বা এবং বেধে বাড়ীকে তার কাঁধে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পাড় নেবা চলে গেলে বা এগিয়ে গেল বেধে একটু শিঙিয়ে রইল। Officer তার কারণ অহুসস্থান করতে নাওয়াতে মেয়ে তাকে বিজ্ঞাসা করলে— ‘Won't you kiss me?’—Off. No. Why? বেধে—But other officers always kiss me when they take me to their cabin তবে আমার এবং মেয়ের সবাই অপ্রস্তুত। পোকটার মুখে কিছুই বাসেন।

রবি [২ নবেম্বর]। আর সকাল আটটার সময় ডিলনের অস্ত্রোপেক্ষিতা হয়ে গেল। আমি বেধেতে গেলুম। একটা টেবিলের উপরে কবিন পড়ে আছে। Hamilton, Connolly, একরল পটু গীত তুতা, এবং হুভিনরন ক্যাপলিক মেয়ে হাটু গেড়ে কবিন্ বিবে রোমান ক্যাপলিক Burial Service পড়ছে। আর সকলে কালো কাপড় পরে টুপি হুলে চারিদিকে নীরবে ঝড়িয়ে। প্রার্থনা হয়ে গেলে পরে কবিন্ সদস্যের মনে কেলে দিলে। তার পরে সাহায্য আবার চলতে লাগল। এই অস্ত্রোপেক্ষিকারের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন আগত হল।

আজ রাত্রির সাহায্য বধে পৌছবে। স্পেশল ট্রেনে আমাদের বেতে বেবে কিনা কে জানে—তানা হলে মেজদারাবের চিঠি একদিন আগে দিয়ে পৌছবে—আবার হঠাৎ গিয়ে পড়বার কল্পনা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। কুলে এসে তরী তোবা একই বলে।

আর ডায়ারি বন্ধ করা যাক।—

২ মাস এগারো দিন কেটে গেল। মনে হচ্ছে কত যুগ। রাত দুপুরের সময় বধে পৌছন গেল। স্পেশল ট্রেন ধরতে পারলুম না— তাই ভারতবর্ষে পৌছেও মন তারি বিগড়ে আছে— হঠাৎ গিয়ে পড়ব বলে কত কি কল্পনা করেছিলুম একদিনের ক্ষেত্রে সমস্ত ফক্স গেল। বাড়ি ততই কাছে আসছে মন ততই বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। Gravitation-এর নিয়মাত্মকতার তার পৃথিবীর ততই নিকটবর্তী হয় তার বেশ ততই বাড়ছে— মনেরও সেই নিয়ম দেখছি। কাল সমস্ত রাত এক দুহুর্গ ঘুমাইনি। আর সকালে তাড়াতাড়ি Watson Hotel-এ বেরিয়ে পড়লুম। এখানে এসে দেখি আমার টাকার ব্যাগটি জাহাজে কেলে এসেছি— সাধ্যম দেন বজ্রাঘাত হল— তার মধ্যে আমার Return Ticket এবং টাকা— তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আবার সেই জাহাজে চল্লুম— সেই পুরোপো কাঁধেবের Peg-এ ব্যাগটি কুলে— খড়ে প্রাণ এল— এরকম ফিরে গেলে হারিয়ে অধ আছে— ব্যাগটি কাঁধের উপর স্থলিবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দময় বোধ হল। আমার মত লোকের ঘর ছেড়ে এক পা বেরোনো উচিত নয়। এখন আমার Biography বেরোবে তখন এই সমস্ত অস্ত্রমবস্ত্রতার দৃষ্টান্তগুলো পাঠকদের কাছে তারি আনন্দজনক এবং কবির উপযুক্ত শোনাবে— কিন্তু আগাতত তারি অস্থিরিখে। এই ব্যাগ কুলে থাকার সম্ভাবনা কাল সন্ধ্যেলার একবার মনে উদয় হয়েছিল— তার পরে মনকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলুম ব্যাগটা যেন না ভোলা হয়— মন বলে, স্পেশেল, টাকার ব্যাগ আমি ভুলি। আর সকালে তাকে আচ্ছা একটোট গাল দিয়ে ঝিয়েছি— সে নিকন্তর হয়ে রইল— তার পরে এখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন

আবার তার গিটে হাত বুলাতে বুলাতে হোটেলের কক্ষে এসে স্থান করে বড় আশ্রয় বোধ হইল। ভ্রমণ কবি আজ সন্ধ্যাবেলায় আবার ক্লান্ত নাই। আজ সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত শুষ্কিবে গাছিরে নিয়ে যখন গাড়িতে চড়ে বসে তখন মনটা একবার নৃত্য করে উঠে— তার পরে যগুলির কাছাকাছি গিয়ে যখন দাঁড়াইবে— তখন—। ঐ Breakfastএর খণ্ডা ব্যঙ্গ— খেবে আসি, কক্ষে গেয়েছে।

গাড়ির ক্ষেত্রে একটা বালিশ কিনেছিলুম— সেটা হোটেলের কক্ষে এসেছি।

আমাদের Good morning প্রভৃতি কোমলকম greeting নেই বলে Gibbs আমাদের বেহাং মনোভা মনে করেছে।

Truth কান্ড থেকে একটা গাণনা উদ্ধৃত করে রাখি।

The expression of a fashionably-dressed woman is now emphatically one of nakedness. Her sleeveless bodice, cut halfway to her waist, betrays much and suggests more. Her large white arms, her uncovered shoulders crossed with an airy line, her bust displayed to the last inch permitted by the law which protects morality and forbids obscenity, her back bared in a wedge-shaped track to her band, the colour of her gown scarce distinguishable from her skin, and the "fit" one which moulds the figure and makes no pretence at disguise—in this indecent nudity she offers herself to public admiration; and the bold looks of the men are the caresses which make her purr with pride and pleasure. Her dress is her note of invitation; and if but few honestly confess, no one is deceived.

Orientalদের dishonesty সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রায় আলোচনা করে থাকে— তাই নিম্নের খবরটা টুকে রাখা গেল। Truth, Oct. 16, 1890.

The writer was yesterday in a city restaurant, when, in an adjoining box he overheard scraps of conversation which, at first, were meaningless to him; but, in the light of something he had heard earlier in the day, he was able to piece out one of those stories of trickery and fraud in connection with the Stock-Exchange which, as a rule, the public only hear of after the victims are ruined. The party were very jubilant, and the copious champagne that they indulged in made them possibly more reckless than in their sober moments they would have been. Briefly, what was overheard made it clear that the party were members of a ring which had for its purpose the breaking down of the credit of some wellknown South African shares, and some important information was alluded to that was being kept in the background until the right moment—that is, when an immediate rise was to follow.

The writer encloses his private card, and, in confidence, would be happy to answer any inquiries.—

Editor remarks :— My correspondent, who is highly respectable, and is unconnected with financial jobbery etc.—

আসল কথা হচ্ছে পূর্বের ভাঙ লব্ধে আমরা যেটা দেখি এবং শুনি সেইটাই আমাদের কাছে নত হয়ে গেছে— তার লব্ধটাই আমরা তদন্ত করতে পারিনে। এইকালে তাড়াতাড়ি generalize করে একটা মত বাড়া করি।

[সমাপ্ত]

রসের প্রেরণা

শ্রীমন্তলাল বসু

চিত্রশিল্প আমাদের বড় প্রিয় জিনিস ; সেইজন্য শিল্পী মাত্রকেই আমি ভালোবাসি, তাদের ছবি দেখতে গেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি ও বড় আনন্দ পাই। আমি ছবির সমালোচক নই, আমিও তাদের মতো ছবি আঁকি মনের আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য। স্বপ্ন ও দুঃখের সাগর মগন করে যে আনন্দরূপ অন্তর ওঠে তার অর্থা নিবেদন করাই শিল্পীদের কাজ।

নবীন শিল্পী-ভাইদের সাহায্য হবে বলে স্বয়ংকট। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা বলব।

সব শিল্প-সৃষ্টিই খেলার ছলে মনের খেয়াল স্থগী থেকেই আরম্ভ। কিন্তু, অসংযত, অহংকারী, স্বার্থান্ধ ও সংকীর্ণ মনের আর সন্দর্শন, সন্ধানন্দ, যশে ও ছন্দে ভরপুর দরদী শিল্পীর সংযত ও উদার মনের তফাত লক্ষ্য করবার বিষয়। অর্বাচীন নবীন শিল্পী প্রকৃতি থেকে সহজ উদ্বোধনিকার-স্বভে যে নবীন অহুবাগের অধিকারী হন তা খুবই প্রাণবান ও প্রশংসনীয় ; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং পৃথিবীর মৈনমিন ঘাত-প্রতিঘাতে ও হুমিয়ার হুমিয়ারির সংঘর্ষে এসে, মনের ঝটিলতা কাঠিন্য ও সন্ধিভতা বেড়েই চলে। সেই মনকে আবার সরল ও নবীন করে তুলতে হবে, সন্ধিভ ও ভীত মনকে নির্ভীক করে তুলতে হবে, কঠিন মনকে সরল ও আনন্দের ছন্দে ছন্দোবহ করে তুলতে হবে। এই হল আমাদের লক্ষ্যনার পথ। ঐশ্বর্য দরদী ও রসিক শিল্পীর প্রতি, তাঁদের সৃষ্টির প্রতি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখতে হবে। গুণী ও নামজাদা শিল্পীদের সৃষ্টি শিল্পের সঙ্গে নিজের শিল্পসৃষ্টির তুলনা করে এগোতে হবে। কেবল তাঁদের বাস্তবিক অহুত্বরণ করা নয়। চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রেখে, তাঁদের ভাবে ভাবুক, গুণে গুণী ও মহানু হতে হবে।

শিল্প-সৃষ্টির মূলমন্ত্র ও টেকনিক-শিক্ষার গুহ্য কথা হল প্রকৃতির রূপ ও গুণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ও অহুতুক আকর্ষণ ও তার সহিত একান্তবোধ। এ হলে সৃষ্টি করা ও টেকনিক শিক্ষার কাজ অতি সহজ হয়ে যায়। কখনো টিক শিল্প-সৃষ্টি হয় মানতেও পারা যাবে না। পক্ষান্তরে, কেবল দস্ত ক'রে, বড় শিল্পী হবার লোভ রেখে, প্রচুর পরিচর্য করেও সব শিক্ষা বার্থ হয়ে যাবে। শেষে ভগ্নমনোরহ হতে হবে। শিল্পীসমাজে নামও হবে না ; উপরন্তু টিক রসের অহুত্বকৃতি না পেয়ে অন্তর কঠিন হয়ে যাবে ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। একল ওকুল দু কুল যাবে। শুধু ফাঁকি দিয়ে, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, নাম ফুড়োনোতে কী দীনতা— তা ভেবে সেঁববার জিনিস।

স্বাধীনতা ও মৌলিকতা অর্জন করতে হলে অহংকেন্দ্রিক চকল মনের অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব থেকে আমাদের ক্রমশ মুক্তি পেতে হবে। টেকনিকের দাসত্ব হতে হবে। তদুপরি আবেগ প্রীতি ও ভাবের সোলা চাই, সেই তো আমাদের সৃষ্টির মূল আধার। ভাবাবেগকে চালনা করার উপযোগী মনস্তত্ত্ব নীতি ও টেকনিকের সাহায্যে সৃষ্টি করার নিয়মকানুন কৌশল, আয়ত্ত করে নিতে হবে। আবেগকে ও টেকনিককে চালনা করবার কর্তা শিল্পী ; আবেগ বা টেকনিক শিল্পীকে চালনা করলে কাজ পণ্ড হয়ে।

আর একটা কথা। এ যুগে, কেবল টেকনিক ও মানাচরণ কৌশলের পরীক্ষণে ও প্রদর্শনে শিল্পের সার্থকতা এই মত কোথাও কোথাও প্রচারিত হচ্ছে—শিল্পী রসের প্রেরণায়, আবেগে যখন মনের কথা প্রকাশ করবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তখনই ওইরকম পরীক্ষার সার্থকতা। কিছু বলবার নেই, প্রেরণা নেই, শুধু পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা করণ ও কষ্টবোধ। টেকনিক তো চাই-ই। দেহ ও প্রাণের যে সমস্ত টেকনিক ও রসের প্রেরণাতেও সেই সমস্ত। প্রাণ ছাড়া দেহ কিছু না; দেহ বিনা প্রাণের প্রকাশ অসম্ভব। (প্রেরণা বলতে—কোনো বস্তু ও জগতের প্রতি অহৈতুক আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ থেকে যখন শিল্পীর মনে একটা অকৃতপূর্ব বেদনার আবির্ভাব হয় ও সেই বেদনা কোনো-একটা রূপ-অবলম্বনে, কোনো একটা রসের ভিতর দিয়ে আনন্দে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে শিল্প-সৃষ্টি বলব।) দাবদাম! শুধু আনন্দের দ্বন্দ্ব ও হাতের কৌশলের ভোগবাখি ও ভাবেণ ঘরে চুরি করে নিছক ইয়োগি সৃষ্টি—এ সব থেকে শিল্প বহু দূরে। এ সব লাভারণের মনে কৌতূহল আগ্রহ এবং চমক লাগায় মাত্র—কিন্তু রসিকের কাছে তা আদরের হয় না।

চীনদেশীয়রা বলেছেন টেকনিক-ই সব, আবার প্রেরণাই সব। কেউ যদি বলে টেকনিকের আদৌ দরকার নেই, ও কিছু না; আবার কেউ যদি বলে রসের ইনস্পিরেশনের দরকার নেই, ও কিছু না—দু'দিকেই ভুল হবে। সার্থক সৃষ্টিতে আনন্দ ও প্রেরণা অবিচ্ছিন্ন এক হয়ে উঠেছে। আনন্দ থেকেও নেই।

আমাদের আহ্বান ছিল তার চেয়ে ঢের বড়। একদিন পরে বেরিয়েও আমাদের আহ্বান যেদিন আর বে সময়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছাবার কথা, সেইদিন প্রায় ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর সকাল ৭টা টায় দিকে 'বাইফর' জাহাজও সিঙ্গাপুরে পৌঁছবে। সুতরাং সিঙ্গাপুরে এসেই ধরতে আমাদের কষ্ট হবে না।

শনিবার, ১লা অক্টোবর ১৯২৭। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা জো বাস্কা ক'বলুম। অস্তাবস্তায় বন্ধুদের মধ্যে বব্বীপীষ অধ্যাপক ডাক্তার হুগেন্স জরদিনিওরায় আর আমাদের প্রিয় Kopferberg বা ডাক্তার ডিগেন্স। আমরা কদিন গ'রে একটু দফলের মধ্যে ছিলুম ব'লে, আহাজে কাণ্ডিনে বিছানায় শুয়ে বড় শ্রান্ত বোধ করতে লাগলুম— সায়মান সেয়ে নিয়ে সকাল সকাল উঠে গেলুম।

রবিবার, ২রা অক্টোবর ১৯২৭। আজ সকালে বেলা ১২টার আমাদের জাহাজ Banka বাস্কাপীণেং Muutok মুতোক বন্দরে ডিক্ল। ডেক-বাত্তীদের কেউ কেউ নামূল। একটা জাপানী মেথেকে দেখলুম মালাই পোষাকে, তার বব্বীপীষ বামীর সঙ্গে নামূল। এদের চেনে এমন একজন সিদ্ধী সহবাসীদ কাছে থবর পেলুম যে মেয়েটি জাপানী। তাহ'লে মুসলমান বব্বীপীষের সঙ্গে বৌদ্ধ বা শিন্তো জাপানীদের বিয়ে-পা হয়। মেয়েটিকে মালাই পোষাকে দেখাছিল চমৎকার।

আহাজে সহবাসীদের সঙ্গে বখারীতি তার জমালুম। শ্রীমুক Overbeck ওকরবেক নামে একটা জার্মান ভ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ইনি সিঙ্গাপুরে আর অন্তর জার্মান কল্লারুপে ২৩ বছর এ অঞ্চলে কাটিয়েছেন; মালাই সাহিত্যের উপর বই লিখেছেন। বলিবীণের সঘর্ষে এর সঙ্গে কথা হ'ল— ইনি তো মানতেই চান না যে বলিবীণের হিন্দুবা কোন গভীর দার্শনিক বিষয়ে মালাপ করতে পারে— তারের সে শক্তিও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। এর মতে, মালাই আস্তের লোকেরা বোকে কেবল magic অর্থাৎ বাহু আর ভোম্বিতা। ভ্রলোকের কথার ধরণে এদের প্রতি একটু অবজ্ঞার ভাব দেখলুম— বললুম, ম্যাজিকের কথা ব'লছেন? তা আপনাদের ইউরোপের লোকেরাও কম বাধ না। এই বলে, ইটালিতে আর ইউরোপের অন্তর লোকের অভ্যবাসের কতকগুলি কথা যা আমার অভিজ্ঞতারাত তা গনিছে দিলুম— ইটালির রোমান ক্যাথলিক চার্চ। বিশ্বাস করে (আর তার পাহরিরা এই বিশ্বাসের সম্বর্নও করে) যে গির্জাবিনেবে মান-দেয়ার দ্বিতর চোখ থেকে জল পড়ে, হুক থেকে রক্ত বেরোয়। আর এ ছাড়া সাধারণ ইউরোপীয় শিক্ষিত লোকের charm আর mascot-এ বিশ্বাস সর্বত্র বিস্তার। ভ্রলোক তখন স্বীকার করলেন যে magic-এ বিশ্বাস খালি এশিয়ায় বাছবেরই একচেটে নয়। সেকেন্ডারের বাস্তবদের সঙ্গে আর আলাপ করবার প্রবৃত্তি হ'ল না। মোটা মোটা সব মেয়ে হাটু পব্বর ফুলের স্বক পরা, গুর্জবের মডন পেন্সবহল বালি পা, পুখবালি চলন, মাখার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, মুখে সিগারেট— দূর থেকে দেখেই, গ'রে পড়তে ইচ্ছা করে। একটি ডাচ সরকারী ডাকুয়ে বাছো— তার বব্বীপীষ স্ত্রী, দেখে গোষাকে, আর এদের একটা ছোট মেয়ে, এদের বেশ লাগূল। ডাচেনের মধ্যে এখনও ফিরিসি বা লুদর জাতির প্রতি সেভাবের স্তম্ভা নেই, যেমনটা ইংরেজ সমাজে আছে; তাই দেখতুম, এই বব্বীপীষ মহিলাটিকে অন্ত ডাচ জাতীর। একথরের' বা কোণ্ডাগা করে নি।

ডেক-বাত্তীদের মধ্যে দুটি সিদ্ধীকে দেখলুম হুরাবাঃ থেকে ক'লকাতায় বাছো; একটা হুডা আরব, এক কোণে তার একখানা কোরাণ নিয়ে বলে আছে। ডেকে একবল হুজবাত্তী বব্বীপীষ মেয়ে; এই আরবটী এসেই গলের 'মুআদ্দিম' বা পাণ্ডা হয়ে। একটা ভ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম বললেন

Mr Alsagoff আলসাগফ, বাঙালি নৃত্যের বন্দর মেলায়, সিংগাপুর থেকে কাঠ বহানী করেন আরবদেশে হেঁজোকে— ধর্ম বা অর্থ কিছু পরিচয় দিলেন না। তবে মনে হ'ল ইহুদী আর সম্ভবতঃ জার্মান ইহুদী। সীনা ডেক-বাত্রী অনেক ছিল, তবে তারা উপরের খোলা ডেকে বেশী থাকে না— তারা নীচের বন্ধ ডেকেই ডেকচোরায়ে ব'লে আর মেজের ভয়ে সময় কাটায়।

আর সন্ধ্যাটা ডেকচোরায়ে উপরে শুয়ে আকাশে বর্ষার টাপ বেখে ধানিকটা। সময় কাটানো পেল— সন্দের পাণ্ডি থেকে আগেই ভনেকুম যে আজ শায়রীয়া বয়ী।

সোমবার, ৩রা অক্টোবর ১৯২৭। সকাল সাড়ে-সাতটায় আহাযের আহায সিংগাপুরে পৌঁছল। কবিকে নিয়ে 'মাইয়র' জাহাজ একটু আগেই সিংগাপুরে এসে নিচ্ছে, কিন্তু ছোট জাহাজ বলে তার বধ্যাণো ক'র, তাকে মাক-ধরিয়া লম্বা ক'রতে হ'য়েছে। লকে ক'রে বাজীরের জাহাজ-বাটায় আনা হ'য়েছে। কবি একদিন বেশী সময়ের মধ্যে একটু নিরিবিলাতে কাটাতে পারবেন ব'লে ছোট জাহাজের ক'ট খাঁকার ক'রেও আমাদের একদিন আগে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এর একটা চিরস্মৃতি স্থল হয়েছিল— সেটা হচ্ছে ১লা অক্টোবর তারিখে মাইয়র জাহাজে ব'লে ব'লে দেখা বলিষী সম্মেলন তাঁর অপূর্ণ স্বপ্নের কবিতাটি, বার আরম্ভ এই—

সাগরজলে সিনান কবি' সজল এলোচুলে

বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

কবিতাটি প্রবলী পত্রিকায় প্রথম 'সাগরিকা'-শীর্ষকে প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ আকারে; পরে একটা অংশ বাদ দিয়ে এটিকে 'পূর্বী'-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (এই পরিভাষ্য অংশ সম্বন্ধে আমি একাধিক স্থানে আলোচনা করেছি^১) কবিতাটি বসন্তসময়ের এলিককার রচনার মধ্যে তাঁর বৌবনকালের রচনার হাওয়া বেন কিরিয়ে এনেছে। এর ছন্দ 'মননভঙ্গের পূর্বে' ও 'মননভঙ্গের পরে' কবিতা-দুটির ছন্দভঙ্গার মরণ করিয়ে দেয়, যে ভঙ্গাভঙ্গ বেশ গিয়ে পৌঁছয় জন্মের গীতগোবিন্দের

বদলি বদলি কিকিণি গুহুগুহুগুহু

হয়তি পরতিমিরমতিযোরম্।

গানটীতে। বিষয়বস্তুর বিচার ক'রলে এই কবিতাটিকে কে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবিতার সনদধারের ব'লেতে কারো দ্বিধা হবেনা। বলিষী আর বীপময় ভারতের অপূর্ণ স্বপ্নের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রাত্তরকারী 'মত গৌরবশালিনী তবী বলিষীপকুমারী আর ভারত থেকে আগত রাহুকুমারকে লক্ষ্য ক'রে কবি বেন আবার তাঁর বৌবনকালে আবাহন করা জীবনদেবতার স্পর্শ আর একবার নোতুন ক'রে পয়েছিলেন— যে জীবনদেবতা সিংগাপুরে গুহামন্দিরের মধ্যে কবিকে বরণ করেছিলেন, আর যিনি কবিকে নিয়ে নীল সাগরের উপর দিয়ে নিকশেন বাহ্য করেছিলেন, তিনিই বেন বীপাভয়ের সেনে সাগরবেষ্টিত বীপের মধ্যে কবির মূব চেয়ে আর একবার তাঁর অবগুঠন উন্মোচন করেছিলেন। — চকিতনেত্রে সেই মূবে দৃষ্টপাক ক'রেই কবি বেন তাঁর নিকের বৌবনের দৃষ্টভঙ্গী আবার ফিরে গান। আর তার কলে হয় বলিষীপের সৌন্দর্যের এই অভিনব প্রকাশ তাঁর 'সাগরিকা' কবিতাটীতে।

^১ বীপময় ভারত, পৃ. ২২৪; 'সকলিতা, ব্রহ্মগিরি'

আহাম থেকে আমরা ভাস্কর নামলুম, কবি আর হরেনবাবুও এসে গেলেন। সিঙ্গাপুরের বন্ধুরা আমাদের নিতে এসেছিলেন— নামাঙ্কী সাহেব এবারও আমাদের ঠাণ্ডা Siglap সিঙ্গাপুর-এর বাড়ীতে অতিথি করতেন। আমরা রাগপত্রের ব্যবস্থা ক'রে ঠিক করলুম, আহাম পাওতা গেল সিঙ্গাপুরে আর অপেক্ষা না ক'রে ঐ দিনই পিনাং গাড়া ক'রব। আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানির শ্রীমুখ দিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন, বিকালে ৩-৩০ মিনিটে Straits Steam Navigation Company-র ২২০০ টনের এক জুনে আহাম Kinta 'কিন্টা'-য় ক'রে আমরা চাড়া করলুম। প্রথম জেইতে কবি এক ছিলেন, আর ঘাড়ের আসার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ইংরেজ আহাম কোম্পানির লোকেরা দুটো টিকিটের ভাড়া কবির রক্ত আহার ক'রলে এই ব'লে হুমকি দেখিয়ে যে তাদের ইচ্ছামতো তারা রক্ত প্রথম জেইর ঘাড়কে দুই বারওমালা কবির কানরাতে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এই ব্যবহারে মনটা গোড়াতেই পাশাপ হয়ে গেল, কিন্তু গরজ বড় বালাই। ভাঙ, ভরাসী, আপানী প্রভৃতি বিশেষ কোম্পানির জাহাজওয়ালদের সৌজন্য, কবিকে নিয়ে যেতে পারলে তাদের যেন কৃতার্থ হয়ে যাবার ভাব, তার সঙ্গে এই ছোট ইংরেজ কোম্পানির কবির সম্বন্ধে অজ্ঞতা আর অসৌজন্য বিশেষ পীড়া দিয়েছিল। শ্রীমুখ নামাঙ্কী সপরিবারে স্ত্রীমার পর্বত কবির প্রভুত্বদমন করলেন, শ্রীমুখ জ্বাভাইও এসেছিলেন।

হরেনবাবু, হীরেনবাবু আর আমি সেকেও ক্লাসেই চড়লুম। এই স্ত্রীমারের সেকেও ক্লাসের অবস্থা অতি পারাপ, তবে এতে রাগ করবার কিছু নেই, এগুলি Coastal Steamer অর্থাৎ একই দেশের সাগরপারের কাছাকাছি বললে পাড়ি দেয়। পল্লীগ্রামের কেয়াকি ঘোড়ার মতন— মহাসাগরগামী বিরাট লাইনারের আরাম এখানে কোথায়।

কদিন পরে উপরের খোলা ডেকে বসে কবির সঙ্গে আমরা অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলুম। প্রাকৃতিক দৃশ্য শান্তিপূর্ণ মনোরম, আমরা উত্তরমুখো মালভা প্রবালী দিয়ে যাক্, বায়ে দুএকটা হীপে অন্ধকারে কালো পাথরের গুপ, তার মাথায় বাতিঘরের আলো ঘুরে ঘুরে জলছে, আকাশ আর সাগরকে মনে এক রূপালি ধূলর রঙের পোঁছ দিয়ে মিলিয়ে কেউ একাকার ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু এই শান্তিময় আবহাওয়াতেও বেশের তুচ্ছ সাহিত্যিক গঁয়ে ঘোঁড়ের বন্ধবায় যেন আমাদের উপরে চাপ দিচ্ছিল। কবির কোন্ লেখার উপর মূল হস্তাংশেণ করেছেন এক সাহিত্যমিগুপ্ত, কবির অমুগুত এক লেখক তার জবাবও বিশেষছেন— বাঙলা পত্রিকার গোছা গেছে কবি একই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির এই সান্নাধ্যালীন কোমল স্পর্শে তাঁর মনের উত্তেজ দূর হতে বেশী হ'ল না।

আম শারদীয় গুপ্তী— কবি আর আমরা তিনজন বাঙালী বলে আমাদের মনে বার বার এ কথাটা উঠছিল।

বহলবার, ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৭। আম মহাষ্টমী— আমাদের মনে এই কথা বার বার উদিত হচ্ছিল— তাহাড়া সাগরের মধ্যে এই দিনের কোন লক্ষ্যার্থী বৈশিষ্ট্য চোখে লাগছিল না। সকালটী আমরা পক্ষে কটিল চমৎকারভাবে। উপরের ডেকে বাহাজের মুখের দিকে একেবারে যেন আহাজের নাকের উপর পরডের দ্বিষ্ট রোদ্দুরের মধ্যে চমৎকার হাওয়ার বসে কবির সঙ্গে ফটো-দুই ধরে সাহিত্য আর idealism বা আদর্শবাদের নিয়ে আলোচনা হ'ল। কবি idealism কথার বাংলা প্রস্তাব করলেন 'ভাবনিষ্ঠতা'। কবি তাঁর প্রকাশমান উপস্থান 'ভিন্ন পুষ্ক'—এর নতুন নামকরণ করবেন ঠিক করলেন— এই নোড়ুন

নাম দ্রিক হ'ল 'যোগাযোগ' আজ কবিকে বেশ প্রাচুর্য বলে বোধ হ'ল। বীণময় ভারত ঘুরে তিনি বুঝে গুণী।

১২ টার রাত্রিতে Port Swettenham-এ এসে পৌঁছল। কিছু মাস সাহায্য থেকে নামলে, কিছু নোড়ুন হাতীও-এল। একটা ত্রিমূল বড় দুইকট্ট লাগল। একদল চীনে ডেকহাটী তুল ক'রে উপরের প্রথম স্টেজের ডেক এগে গড়েছিল। সাহায্যের চীনা স্টয়ার্ড বা প্রদান খানসামা এদের একজনকে খ'রে লাগি দারত লাগল, তখন সব ভয়ে হুড়হাড় ক'রে নীচে গালিয়ে গেল। চীনেরা স্বাধীন জাতি—আমরা তখনও স্বাধীন হই নি, তাই কিসেইর চাকরের হাতে বদেষ্টারের এভাবে অপমান আমাদের চোখে আন্দব লাগল। Port Swettenham থেকে আমরা বিকাল ৫ টার যাত্রা করলুম।

বলিচীপের উপর লেখা ঠাণ্ডে কবিতাটা কবি আমার গড়তে মিলেন। বলিচীপের সৌন্দর্যময় বাতাবরণের মধ্যে প্রচুর মত কটা দিন কাটিয়ে, বলিচীপের ভ্রমণও যখন আমরা প্রায় শেষ করেছি, তখন আমার মনে হ'ল, কবি তো বলিচীপের উপরে আর বসবাসের উপরে এমন দুটা হৃদয় কবিতা লিখলেন, কিন্তু আমি জানি বলিচীপ তাঁর মনে কতটা গভীর রেখাপাত করেছে, সেই বলিচীপ সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকবেন? আমি রোজ তাঁকে নির্বন্ধ ক'রে বলা আরম্ভ করলুম—বলিচীপ সম্বন্ধে কিছু আপনাকে লিখতেই হবে! উত্তরে-তিনি হাসতে হাসতে বলতেন—বলিচীপ, সে অল্প ব্যাপার হে। ঠিকমত ভাব না এলে কি এমন হৃদয় একটা জিনিসের সম্বন্ধে কিছু লেখা যায়? রোজকার এই দৃষ্টোপলক্ষে একটু বলে ছেবে লিখবার সময় কোথায়? আমি তাঁকে রোজ তাগালা দিতুম, তিনি উত্তরে ব'লতেন, হবে হে হবে, বলিচীপের উপরে লিখবো, তোমার কথা দিচ্ছি, এমন কবিতা লিখবো যে তুমি খুশী হয়ে যাবে।

কবি তাঁর কথা রেখেছিলেন, আর এই কবিতাজীতে কেবল আমাকে নয় সমগ্র বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে এখনকার আর অনাগতকালের সকলকেই তিনি খুশী ক'রে দিয়েছেন আর খুশী করবেন। আমি তাঁকে খালি বললুম যে আপনি বলিচীপের যোব্যাক্তিক দিকটা সৌন্দর্যের দিকটা বেশী করেই লিখেছেন, কিন্তু আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন, নিজের কানে শুনেছেন যে বলিচীপের জীবনে একটা গভীরতা, একটা অদ্ভুতমিতা আছে; তার একটু বলক আপনায় এই কবিতাতে রেখাবেন না? কবি উত্তরে বললেন যে কবিতাটা তিনি আমার ভাল ক'রে সংশোধন করবেন আর তখন তাতে আমার প্রস্তাবমত নোড়ুন সংযোজনও করবেন।

কবি 'নামাক্তর' ব'লে 'যোগাযোগ' উপস্থাপনের নোড়ুন নামকরণ সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখে শেষ করলেন। আজ সন্ধ্যায় বলিচীপে সংস্কৃত প্রচুর আর ভারতবর্ষের সঙ্গে নোড়ুন ক'রে যোগ সংস্থাপনের কাজ কিভাবে হতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। কবির বিশ্বাস, বিষভারতীর কর্তব্য হবে নোড়ুন ক'রে বৃহত্তর ভারতের নানা দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বাড়ীর যোগ আছে তাকে আবার পুনঃস্থাপিত করা। আমরা মন্থর গতিতে স্টীমারে ক'রে বাছি। কবির মনে খেয়াল হ'ল ভ্রামনায়। শেষ ক'রে আমরা রেবুন্ অবধি স্টীমারে না গিয়ে যদি মৌলভেনে নামি আর সেইখান থেকে রেলে যদি রেবুন্ যাই, কিংবা উত্তর ভ্রাম থেকে যদি মোটরের পথ থাকে তাহ'লে সেই পথে-যদি মৌলভেনে হয়ে কিয়ি, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু আমাদের সঙ্গে মাল আছে অনেক, সেগুলো নিয়েই হল চিচা।

কবি দ্বয়ীণে বহুবুদ্র দেখেছেন, গ্রাফানান্ দেখেছেন। ত্রানে গেলে ভারতীয় স্থাপত্যের আর জাঙ্ঘের অবিনশ্বর কীর্তি আশ্রয়ও তাঁকে দেখতেই হবে। আখান এ নির্বন্ধ কবি উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার করলেন।

বুধবার, ৬ই অক্টোবর ১৯২৭। আজ মহানবমীর দিন। আনরা পরন্ত দিন শিবাপুর ছাড়বার সময়ে শিনাং-এর বন্ধুদের তার ক'রে মিই— তাই আজ সকালে আটটাখ ভাঙ্জ বসনে পৌঁছতেই দেখি, নাথিয়ার-রা দুই ভাই আর কতকগুলি তমিল আর পঠাবী ডহলোক এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে শহরের বাইরে Tanjong Bungah তাঙ-বুঙা-এর বাঃলাটাতে, যেখানে আনরা গন্তব্য এসেছিলাম, সেখানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে আমাদের অবসরও বেতে হ'ল। আনরা বাঃসায় গুছিয়ে নিয়ে অবগ্রকর্তব্য কাজ কতকগুলো ছিল তা করবার জন্য শহরে এসে— আমাদের কনসালের সঙ্গে দেখা, B.I.S.N. ব্রাহ্মণ কোম্পানির আগিলে, জাপানী কোটোর সোকানে। নাথিয়ারদের গাড়ী সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিল। আমাদের পুরাতন চীনা বন্ধু শিনাং-এর হাক লিম, আর তমিল বন্ধু কুঙ্কনামী দুপুরে আমাদের বাসার এসেন। আমাদের সঙ্গে তাঙ-বুঙা-তেই মধ্যাহ্নাহার সারলেন। বিকালে আর সন্ধ্যা শিনাং-এর এই কেরল, তমিল আর চীনা বন্ধুদের সাহচর্যে কাটল। বাঃলাটী জাঙ্ঘার নিঃ-ও জন্য হ'লেন। আজ ছিল প্রায় সারা দিন মুহলবারে রুটী। রাতে শহরনবান্ আর আদি আমাদের সঙ্গে আমাদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলুম।

বুধস্পতিবার, ৬ই অক্টোবর ১৯২৭। আজ বিজয়া দশমী। সারা দিন ক'রে আচও খুব রুটী চ'লল— একেবারে 'Tropical rains', মুহলবারে। সঙ্গে জোর হাওয়াও আছে, বজ ব'ললেই হয়। রুটির মধ্যে বেরিয়ে শহরে গিয়ে নানা কাজ ছিল চুকাতে হ'ল— টাকা ভাঙনো, তার করা নানা জাঙ্ঘায়, চিঠি পাঠানো। দুপুরে হঠাৎ আমাদের চীনা বন্ধু আর দৌডাবী শ্রীযুক্ত কাও চিং-কেও, রুটির মধ্যে এসে হাজির— তিনি এখানে এক চীনা কাগজের সম্পাদক হ'য়ে আছেন। তার কাগজের সঙ্গে কবির ছবি তুললে।

বিকালে স্থানীয় ভারতীয়দের দ্বাৰে এক চা পান সভার কবিকে যেতে হ'ল, যদেশীয়দের উৎসাহে তার বেশা বিতে হ'ল, সংক্ষেপে তার শ্রামরমণ লক্ষ্যে দু কথা তাঁকে ব'লতেও হ'ল।

রাতে ঝড়টির মধ্যে Ellis ব'লে এক আমেরিকান সাংবাদিক এসে হাজির— ডহলোক ব্যাংকে প্রকাশিত আমেরিকানদের এক ইংরেজী কাগজের সম্পাদক। তিনি কাল আমাদের সঙ্গে ব্যাংকে ফিরবেন। ছোঙ্করা বরসের, দু ব প্রভিত, আর মিণ্ডক দিলখোলা বাহুব। আমরা এর সঙ্গে কথা ক'রে খুশী হ'লাম। কবির কাছে তার কাগজের সঙ্গে এক 'বাণী' চাইলে। বিশ্বভারতীর আদর্শ লক্ষ্যে কবি সংক্ষেপে ব'ললেন, লিখে নিলে।

আমরা কাল জ্ঞান বাজা ক'রবো, এই দুইদিনে সব ব্যবস্থা ঠিক হ'য়েছে।

গুহবার, ৭ই অক্টোবর ১৯২৭। সকালে মালপত্র পাঠিয়ে দিলুম। কুঙ্কনামী আর নাথিয়ারদের সঙ্গে আমরা সকাল আটটাখ বাজা করলাম, মুহলবারে রুটী প'ড়ছে তখন। শিনাং হ'চ্ছে একটা ছোট বীণ, ওপাশে মালময়নের ভূবাগের অংশে Wellesley জয়েন্টলি শহরে স্টীমারে ক'রে পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে উঠতে হবে— শিবাপুর থেকে যাত্রার পর্যন্ত এই লাইন চ'লছে। আমরা শিনাং-এর স্টীমার-ঘাট Victoria Pier-এ এসুম— সেখানে ভারতীয় বন্ধুরা রুটী থেকে আমাদের বাড়িরে বিদ্রোহের সঙ্গে দলমালা-

ঢালা নিয়ে গাড়িতে আছেন, কবির প্রতি জ্ঞান অসীম এঁদের। নাথিয়ার আর অস্ত ভারতীয়দের চৌহা
Harbour Master-এর খাল লক্, আমাদের ওপারে নিয়ে বাবার জন্ত ঠিক হ'য়েছিল। তাতে ক'রে
আমরা ওপারে Prai প্রাই স্টেশনে ন-টার গিবে পৌঁছলুম।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাঙ্কেন ভ্রামের ভারতীয় অধিবাসী আর ক্রান্তনকারের আনন্দে। তাঁর জন্ত সেলুন গাড়ীর
ব্যবস্থা হ'য়েছে। জুয়েনবাবু আর আমি তাঁর সেলুনের লাগেয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে আছি।

ট্রেন তৈরী ছিল— সপ্তাহে দু'দিন ক'রে দায়, International Mail 'আন্তর্জাতিক ডাকসাঁড়ী' এর
নাম, সোজা ব্যাঙ্ক অববি দায়। প্রাইতে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী আর নাথিয়র, আর
দীরেনবাবু। দীরেনবাবু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন— তিনি কৃষ্ণস্বামীর কাছে দু দিন থাকবেন,
তাঁর সাহায্য নিলেই তিনি ক'লকাতা যাত্রা করবেন।

ট্রেনের সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান সাংবাদিক এলিস, আর সিঙ্গাপুরের স্ত্রী কনসাল-
জেনেরাল ক্রা প্রবন্ধ দু'বাল (দু'পাল), তাঁর স্ত্রী, শিশুপুত্র।

বন্ধুদের বিদায় গ্রহণ হ'য়ে গিয়েছে। যাত্রাকালে কুষ্টি খেমেছে। আমাদের ভ্রমযাত্রা শুরু হ'ল।

মালয়দেশ আর ভ্রামের সংযোগস্থল এই রেল লাইনটা আমাদের দেশের অগাধের বা তিরহট-আওধ
লাইনের মত লক্ লাইন। ভারতবর্ষ থেকে ইতিমধ্যে ঠিকানার কুলী নিয়ে এই লাইন তৈরী ক'রেছে।
রেল বিভাগের কর্মচারী কি মালয়দেশে কি ভ্রামে বেশীর ভাগই ভারতীয়। গাড়ীগুলি ছোট হ'লেও
ব্যবস্থা ভাল।

আমরা যাত্রা করলুম— পথে মাঝে মাঝে বেশ কুষ্টি। Alor Star আলোর স্তার বলে একটা বড়
স্টেশনে, রবীন্দ্র-দর্শনেজু বিস্তর ভারতীয়ের সন্ধান। সংখ্যা ৪০৬০ জন হবে— মালয়দেশের একটা
ছোট নগরের পক্ষে এটা বেশ বড় সংখ্যা বলতে হবে। বেশীর ভাগ হচ্ছে তমিল, দু-চার জন শিখ
আর পাঠান; প্রায় সবলেই রেলো কাম করে। রেলই উপজীব্য— কর্মচারী, মিস্ত্রী, কেহানী, কুলি,
ট্রিকেনার। তমিলদের তরক থেকে স্থানীয় ভারতীয়দের হয়ে কবিকে মালাচন্দন (সাধা হুলের গ'ড়ে মালা,
বাটীতে গোলা চন্দন) নারকল কলা রায়তান প্রকৃতি ফল দেওয়া হ'ল। এই সব ভারতবাসী ধনী লোক
নন— কিছু ভারতীয় আদর্শের প্রচারের জন্ত ভারতীয় বিজ্ঞা বিবেশাগত শিক্ষিতকামদের সেবার জন্ত
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীয় জন্ত টাকা চাই, তাই এ'রা যথাসক্তি টাকা দিয়ে কিছু টাকা তুলেছেন।
Kedah কেডা, প্রাচীন কটাং-দেশ, এই অঞ্চলটির নাম। Kedah Indian Association থেকে
তাঁর প্রতিনিধিত্বের গাড়ীতে উঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেবা ক'রলেন শ্রীমুখ Muthukarppan
Chettiyar মূখকর্ণ চেক্টিয়ার, স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী, আর শ্রীমুখ এন্. নাগলিঙ্গম, P.W.D-র কেহানী,
সিংহলের জাকনা-বাসী তমিল ইনি।

ট্রেন চলেছে সবুজের বানের মধ্য দিয়ে। স্থপত্যাপ কুষ্টি আছে। বারিকটা পথ জুড়ে ট্রেনের লাইনের
দ্বারে কেবল অতি ছোট আকারের বাগের বাড়— সেখতে জারী চমৎকার। তাঁর পরে আমরা Padang
Besar প্যাডাং বেসার স্টেশনে এসে পৌঁছলুম, বিকালের দিকে।

এটা ব্রিটিশ মালায়া আর স্ত্রামদেশের সীমা। আমাদের স্ত্রামরায়েই প্রবেশ হ'ল। গাড়ী এখানে
দাঁড়াল' অনেক কণ থ'য়ে। ইংরেজ এলাকা ছেড়ে রেললাইন আর গাড়ী এল স্ত্রামী এলাকা। ইংরেজের

চাকর রেলের ডাবং কর্ণচাষী নেনে পেল—চালক, কায়ারমেন, গার্ড, সকলেই। তাদের খান নিলে স্ত্রীসমবেশ কর্ণচাষী—এরাও কিন্তু ভারতীয়। স্ত্রীসমবেশ পুলিশ এল, পালগেট বেথে পেল আবারে, স্ত্রীসমবেশ প্রবেশের অস্থায়িত্ব ছাপ ঠিক আছে কি না। পাড়াং বেসারের কবির দেলুনের সামনে বেশ বড় পেছের ভীড়। এখানেও কবিকে মালা আর চন্দন দিলে।

পাড়াং বেসার থেকে গাড়ী ছাড়া ক'ইল। আমরা গাড়ীর পেছেরা-কারে গিয়ে খেয়ে নিজেছি। ব্যবস্থা ভারতের রেলেরই মত। বাবুর্চী খানসাহা ভারতীয় মুসলমান। স্ত্রীসমবেশ প্রবেশ করলেও, স্ত্রীসমবেশের দেখা প্রথমটায় পেলুম না। আমরা K. R. অফিসের কাছে চলেছি। তার স্ত্রীসমবেশ অংশের বেশির ভাগে মালাই জাতির লোক বাস করে। পরে বেশ পানিকটা উত্তর গিয়ে স্ত্রীসমবেশের গ্রাম নজরে প'ড়ল। স্ত্রীসমবেশের পুত্রকার্যে রক্ত ত্রৈন থেকে দেখা যাচ্ছে—কাছা সেওয়া কাছুর বা নুর্নী পুত্রকার্যেরই মত পোষাক, বৃকে একটা কাপড় জড়ানো, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পান পেয়ে মেয়ে দাঁতগুলি কালো। চেহারায়ে স্ত্রীসমবেশ আর আকর্ষণবিহীন করবার স্ত্রীসমবেশ মেয়েদের বেন কোমর বেখে ভৈরী।

আমরা স্ত্রীসমবেশে জানলা দিয়ে দেখ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। আর পালা করে কবির বোম্বা নিজি, তাঁর কোনও কষ্ট না হয়। কবির গাড়ী, আর তাঁর দেলু আবারে গাড়ীর পাশেই। পাড়াং বেসার ছেড়ে পানিকটা এগিয়ে যাবার পরে, আবারে গাড়ীতে একটা স্ত্রীসমবেশ এসে অভিযান করে পাড়ালেন। বেটেরাটা মাছেরী, মাথার বাঙালীর মত চেহারা, তবে মুখখান মোঙ্গালীর দাঁতের। পোষাকটা অসুত লাগল—পরবে নীল রঙের কাছুর অর্ধাং মালকোটা মেয়ে পরা নুর্নী, হাটু পর্যন্ত সেই কাছুর নেমেছে; গারে মালা জ্বানের গলা-জ্বাটা কোট, মাথার এক মোলা-টুপি, পায়ে মালা হুতির মোলা হাটু পর্যন্ত, আর তাঁর নীচে ইংরিজি ফিতা-বাঁধা জুতা। পরে দেখলুম, এইটাই স্ত্রীসমবেশের official dress বা সরকারী চাকরদের পোষাক বা উদ্দী। জ্বালোক চেং ইংরিজিতে স্ত্রীসমবেশ বললেন—বাক করবেন, আমি স্ত্রীসমবেশের রেলের লোক, এই ট্রেনের সঙ্গে যাচ্ছি, আমায় বিশেষ করে সরকারের তরফ থেকে পঠিনো হয়েছ কবির ঘাতে কোনও কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তা দেখতে। আমার পক্ষ থেকে কোনও সেবার সরকার আছে কি?—আমরা তাঁকে বসতে বললুম, তাঁর সঙ্গে আসাপ জ্বালুম। তিনি তাঁর পরিচয় বললেন। একমিকে স্ত্রীসমবেশ অফিসের সেবা, স্ত্রীসমবেশের অফিসে, ইংরিজিতে। স্ত্রীসমবেশ বর্ণমালা ভারতবর্ষীয় (দক্ষিণভারতের) লিপি থেকে হয়েছে—আসলে এই বর্ণমালা হচ্ছে কথোজের, কথোজের লোকদের কাছ থেকে স্ত্রীসমবেশ শিখে একটু বদলে নিয়েছে। অ আ, ক খ—এইভাবে আবারে নাগরী আর বাঙালার পণ্যের লিপি। ইংরিজি ভাগে সেবা—Phra Rathacharn-prachaks Mr. K. L. Indaransi, District Traffic Superintendent, R. S. Ry. কার্ডের ওমিকের স্ত্রীসমবেশ অফিসের এই ইংরিজি লেখার সাহায্যে কিছুটা স্ত্রীসমবেশ পারলুম। দ্রলুম—“কথোজের প্রচাক”, যার স্ত্রীসমবেশ উভারণ হচ্ছে “কথোজের প্রচাক” সেটা হচ্ছে জ্বালোকের পদবিচার, ইংরিজি Traffic Superintendent-এর স্ত্রীসমবেশ অফিসের এইভাবে করা হয়েছে। তাহ'লে স্ত্রীসমবেশ এখন এইভাবে সংস্কৃতের বর্ণমালা সেওয়া হয়। সরকারী পর বা পদবীর অফিসের স্ত্রীসমবেশ স্ত্রীসমবেশ সংস্কৃতেরই ব্যবহার হয়। স্ত্রীসমবেশ Indaransi ইংরিজি(?)-কে জিজ্ঞাসা করতে তিনি

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বললেন, “হী, ও তো আশানার সংস্কৃতই কথা— আমরা যে আমাদের ভাষায় এত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে থাকি।” মনে মনে একটা আনন্দ হল, আমার এ প্রগতি হল— সংস্কৃতের এই স্বার্থা তো প্রাচীন ধারা অহুসারে; স্বামী জাতীয়তাবোধ স্বদেশীত্বের আর স্বভাবাঙ্গীতির দিকে বেশী বেশী দিকে সংস্কৃতের এ স্থান বেশী দিন থাকি আর সম্ভবপর হবে না। পরে প্রায়শঃ সংস্কৃতের উপস্থিত অবস্থা বা দেখছি তা বলবো। R. S. Ry. অর্থাৎ Royal Siamese Railway।

ঐশ্বর্য ইত্যাদি অতি সম্ভব— কবির সঙ্গে আমরা এর পরিচয় করিয়ে দিলাম। সঙ্কল্পের পরে আমাদের কামরাই এসে আলাপ করলেন। সমস্ত এশিয়া মহাদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে, ভারতের সম্বন্ধে, ইন্দোচীনে ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে বেশ আলাপ করলেন। খবরাখবর রাখেন, ভারতের প্রতি প্রজ্ঞা পোষণ করেন। তাঁকে বিজ্ঞাপন করে জানলাম, তার সরকারী পোষাকে আমাদের খুস্তির বদলে কুচা দেওয়া যে সুদী (বাগে ‘কাচুম’ বলে) তিনি গ’রে ছিলেন তার নীল রঙের সরকারী কর্মচারীদের কাপড়ের সম্বন্ধে যে বিধি প্রচলিত আছে তার অহুসারে নির্ধারিত হ’য়েছে। কথাটা হ’চ্ছে এই— এখন যিনি আমাদের রাজা, তাঁর আগে ছিলেন তাঁর এক বড় (বৈমাত্রেয়) ভাই ‘বজ্রাবুধ’ (সংস্কৃত বজ্রাবুধের পালি রূপ) রাজা, বজ্রাবুধ বা বজ্রাবুধের মৃত্যুর পরদিন রাজা হন। বজ্রাবুধের জন্মদিন ছিল শনিবার— শনি তার অসিষ্টতা গ্রহ, শনির প্রিয় রঙ হ’চ্ছে নীল, সেইজন্য রাজা বজ্রাবুধ মির করে নেন, সরকারী কর্মচারীদের ‘কাচুম’-এর রঙ হবে নীল।

সন্ধ্যার দিকে একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী থামতে স্টার্টফর্মে কতকগুলি পাঠানকে দেখলাম। তাদের ভেঁকে হিন্দিতে আলাপ করতে তারা বড় মুখী হ’ল। তাদের বাড়ী হামরা বেলাহ— গীমাত প্রদেশে। আমাদের ঐ অঞ্চলে তারা রঙীন ছিটের কাপড় বিক্রী করে বেড়ার বেঘন কাবলীওয়ালা বাঙালিদের গায়ে পরান কাপড় বিক্রী করে থাকে।

রাজ্যে স্বেচ্ছাসেবায় কাজে তিনটি চুক্তি, স্বেচ্ছা আমেরিকান সহযোগী ঐশ্বর্য এলিঙ্গের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্বীত্ব আর বসিরাপ রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা হ’ল।

ঐশ্বর্য Woodall বলে এক স্নাকনার ডমিল ঐষ্টান ভবনলোক আর তাঁর স্বামী স্ত্রী, এঁরা ব্যাংকের বিশিষ্ট ব্যক্তি, মাসে কি-একটা মাস স্টেশনে নিজেদের গাড়ী করে এসে কবির সঙ্গে দেখা করে আলাপ করে গেলেন।

রাজ্যে আমরা ঘুরোবার জন্য ব্যবস্থা করে গিয়েছি, বেশ ঘুরিয়েও পড়েছি। মাঝে কি একটা স্টেশনে গাড়ী থাড়েয়েছে। বোধ হয় রাত তখন দুটো আড়াইটে হবে। গাড়ী থাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না আমার ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার ধারে আমার নীচেকার বার্ষ, পাশের কাহরা থেকে কবির পলায় আগ্রহ্য গেলুম। ধড়মড়িয়ে উঠে ব’সে জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখি কবি তাঁর সেলুনের বিছানার জেগে ব’সে আছেন, খোলা জানালা দিয়ে তিনি কথা কইছেন হিন্দিতে কতকগুলি পুলিশের চৌকিদার প্রেঁষির লোকের সঙ্গে, এরা প্রায় ৮১০ জন তাঁর সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের কথায় বুঝলাম, এরা শ্রাম সরকারের বেতনভোগী রেলওয়ে পুলিশের বা অস্বত্ব-কাজের লোক, সব কয়টাই ভোক্তাপুরী হিন্দু, স্বাধীনতা দাবী করে ওনে তাঁর দর্পনের আশায় এরা দাঁড়িয়ে আছে। কবি তখন জেগে ছিলেন, খোলা জানালা দিয়ে কবিকে দেখে এঁরা তাঁকে বিনীতভাবে প্রণাম করে। তাতে কবি

এদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে গেল। এরা কি কাম করে, বেশ বনের হুখে আছে কি না, তা মিথ্যাসা করেন। এরা পক্ষযুগে ভ্রাম্যদেশের রাজা আর প্রজা দুইয়েরই প্রশংসা করলে। আমিও শুনেতে লাগলুম, কবিকে আর বিরক্ত করলুম না—এরা বলছে, “রী হা মকারা, হমলোগ ইস মূলুকে বড়া ব্রধ চেন বেঁ হৈ, বেশ জ্ঞা হৈ, রাজা ভী জ্ঞা হৈ, দেশকে লোগ ভী আচ্ছা হৈ—রাজা হিনু হৈ, বোধ গর্গ হৈ, আবহ নেক হৈ, হিন্দুহানকে লোককো দে লোগ পসন্ করতে হৈ। বেলকে স্বামী অক্ষর লোগ হমকো বোলা কি তুমহায়ে মূলু ক। এক বড়া ভারী বিদ্বান আদমী জা রয়ে হৈ।” এইভাবে এরা অনেকক্ষণ ধরে কবির সঙ্গে কথা ক’য়ে খুব খুশি হ’ল। এরা ট্রেন ছাড়বার পরে ‘বন্দে মাতরম্’ আর ‘জয় রামদ্বী’ ক’রে স্বাগত করলে।

সারা বিকাল আর সন্ধ্যাবেলা গাড়ীর বাইরে বেশ দেখতে দেখতে অনেক চ’জিল, বেশে বেশ নতুন নেট—মাইলের পর মাইল ধ’রে কত শত মাইল পরিচার চাষের উপযুক্ত সবতল জমি বেশ খালি পড়ে ব’য়েছে।

শনিবার, ৮ই অক্টোবর ১৯২৭। সকালে Hua Hin হ্যা-হিন ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছল। এটি মনুসের দায়ের একটি জনপ্রিয় স্থান, ভ্রাম্যদেশের বিশেষতঃ ধনীলোকদের বিনোদস্থান। শিকাপুরের কঙ্গাল জেনেরাল এখানেই নেমে গেলেন—ভ্রলোকটী বিনয়ী, তবে বেশী কথা বলেন না, হ্যা-হিনেই তাঁর বাড়ী। বন্ধুর অরিয়ম আমাদের আগবাড়া হ’লে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাক্ষকে খেঁচে এখানে—এলছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিললেন। ব্যাক্ষকে আরবা প্রাচ ন’ সিন থাকবে, তার প্রত্যেক দিনের কার্যক্রমের একটা পঞ্জী তিনি ক’রে এনেছেন। আমাদের অনেক কিছু দেখতে হবে, অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। ব্যাক্ষকে একটি রামপ্রাসাদকে প্রথম দেখীর একটি হোটেলের রূপান্তরিত করা হ’য়েছে, হোটেলের স্বত্বাধিকারী হ’চ্ছে ভ্রাম্যের সরকার—এটির নাম Phya Thai Palace Hotel কা থাই প্যালেস হোটেল। এখানেই আমাদের অধিষ্ঠান হবে—ব্যাক্ষকে ভারতীয়েরা আর ভাগ গভর্নমেন্ট দুইয়ে নিলে এই ব্যবস্থা করেছেন।

বিকালে সন্ধ্যার দিকে আমরা ব্যাক্ষকের Central Station প্রধান ষ্টেশনে পৌঁছলুম। কবি-সম্বর্নাবী ভারতবাসীদের ভীষণ ভীড়। বেশীর ভাগ বিহারী আর সংযুক্তপ্রদেশের লোক, জোমপুরী, আর কিছু গুজরাটী আর পঞ্জাবী। টেলেটেলি দাক্ষাত্তিক খুব—নিয়মহুবর্তিতার অভাব ক্রমী দর্শনার্থীও কিছু ছিল। ভারতবাসীদের ভীড় টেলে কোনও রকমে কবিকে ষ্টেশন থেকে উদ্ধার ক’রে এনে মোটরে চড়িয়ে বাসস্থানে আনা গেল। সেখানে অনেকগুলি ভারতীয় নিম্ন নিম্ন কারে আমাদের সঙ্গেই এলেন, অনেকে আগে থাকতেই অপেক্ষা ক’রছিলেন।

ফা-বাই-প্রাসাদটী একটি রাজোচিত প্রাসাদ বটে। বিরাট এক বাগানের মধ্যে। ইউরোপীয় কান্দার বাড়ীটী, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারী ভাবও আছে। বাগানের মধ্যে একটী বীধা পুষ্করের সতন, তার পাশে ভারী শিল্পরীতি অহুগারে তৈরী অতি সুন্দর স্রোতের বৃতি, রঙাঘাস বরফের পাঁধ বাজাচ্ছেন প্রশস্ত হাতা, বরগুলি বড় বড়, ইউরোপীয় প্রাসাদের চালে আসবাব দিয়ে সাজানো।

ব্যাক্ষকের ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রধান ব্যক্তি গুহাধেন অলী গাহের (এখন ইনি পরলোকগত) পুত্র আর ভ্রাতৃপুত্র সঙ্গে এসেছেন। মত বাঙালী ভ্রলোক কতকগুলি অপেক্ষা ক’রছেন—ভক্তাব, ইতিনিধার, বড় কেরাণী—ইংরেজ কোম্পানির আসিমে।

একটা দিকে আমাদের হোটেলের জন্ত কতকগুলি ঘর ঠিক করা ছিল, কবিকে তাঁর ঘরে বিশ্রামের
 জন্ত তাঁকে ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে আরিয়ন্ট, স্ম্যেনবাবু আর আমি আমাদের ঘর ঠিক করে নিলাম।
 এগনেরকার রাজবংশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত আর বিজ্ঞানসাহী Prince Damrong
 Rajanubhab রাজকুমার দায়রজ রাজাহুড্রাব তাঁর এক লেক্চচারিকে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী লেক্চচারির
 কাক্সের জন্ত, সব সময়ে হায়েমাল থেকে আমাদের সাহায্য করবার জন্ত স্থির ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন।
 এর নাম স্রী রাজবর্নিনিবেশ (বেয়টখর্মনিথেং)। এর হাতেই আমাদের ঘের সঁপে দেওয়া হ'ল।
 উপস্থিত ভারতীয় সম্মানের বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা হল, আমাদের মহলে আমরা ভিনায় বেলুম। কবি
 তাঁর বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে কবিতাটির অল্লাদ শোনালেন। স্ত্রী ভাষায় সেটা অল্লাবের অকাল্লা প্রকাশ
 করলেন স্রীরাধর্মনিবেশ। এইভাবে আমরা কিঞ্চিৎ আলাপ আলোচনা করে, পথপ্রান্ত ছিন্দু বলে
 শুদ্ধিবে নিয়ে সকাল সকাল বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রলুম। [ক্রমশঃ

বাংলার বাউল

ঐক্যিতিমোহন সেন

২

সাহিত্যের পরে মানা ক্ষেত্রে বাউলিরা-তত্ত্ব

বৈদিক সাহিত্যের পর আসিল কর্মকাণ্ড লইয়া বিচার ও আচারের যুগ। এই যুগের শাস্তকে 'ব্রাহ্মণ' বলে। এই 'ব্রাহ্মণের' মধ্যে তো বাউলিয়া মতের কোনো প্রভাবই থাকিবার কথা নয়। ইহাতে শুধু প্রাচীনপন্থী কর্মকাণ্ডই থাকার কথা।

তবু ব্রাহ্মণলিখিত মতো কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অধ্যাত্মবাদ আসিয়া যে প্রবেশ করিতেছিল ততো বেশিলে বিস্তৃত হইতে হয়। বেদব যোগব্রহ্ম পূর্বে জীবহিংসায় ভরা ছিল তাহা ক্রমে অহিংস হইতে লাগিল। যোগব্রহ্মের মধ্যেও আচারে বিচারে ক্রমে গভীর অধ্যাত্ম মতের ইঙ্গিত (symbolism) দেখা দিতে লাগিল। ক্রমে সম্পূর্ণ যোগব্রহ্মটা একটা আত্মসমর্পণের প্রতীক হইয়া উঠিল।

এই বিষয়ে শ্রদ্ধার পরলোকগত রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয় যে কাল করিয়াছেন তাহার মহত্বের ভুলনা হয় না। যোগব্রহ্মের ক্রমবিকাশ বিষয়ে কিছু বুঝিতে হইলে তাহার 'ব্রহ্মকথা' পুস্তকখানি ভালো করিয়া পড়িয়া দেখা দরকার। যোগব্রহ্মটি অতি বিপুল সাহিত্য মণ্ডন করিয়া তিনি তাহার অন্ততময় নির্গম জিজ্ঞাস্বদের দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, যোগব্রহ্মের মধ্যেও মরমীদের মর্মকথা বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যেও নানাভাবে আপনাদের প্রকাশ করিতেছে। ক্রমে ব্রহ্মও একটা মরমী (mystic) ব্যাপার হইয়া পড়াইল। বাহ্যতর কর্মকাণ্ড হইলেও ইহা ক্রমে অন্তর্নিহিত ভাবেরই বিগ্রহ (symbol) হইয়া পড়াইল। ব্রহ্মকথার আলোচনা আর এখানে করিতে চাহি না। ষা হাজার ভানিতে চাহেন তাহার ব্রহ্মকথা গ্রন্থখানি যেন পড়িয়া দেখেন।

ব্রাহ্মণযুগেও এক-একবার এক-একটি স্থান আমাদের বিস্তৃত করিয়া দেয়।

ঐনদের উপহাস করা হইত যে নিম্নত উন্নয়নই নাকি তাহানের স্বর্ণ। এমনকর Sublimation ও Evolutionএর যুগে, অর্থাৎ নিম্নত উন্নতির দ্বারা আব্দ্যসার্থকতার যুগে, এই কথা লইয়া উপহাস কিছুতেই খাটে না। বরং নিরন্তর উন্নয়নটা যে ভারতে কোনো সম্ভাব্য স্বর্ণ বলিয়া মানিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে নিজেদের ধন্য মনে করি।

ঐনদের কথা এখানে আলোচ্য নয়। এখন কর্মকাণ্ডীদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির কথা বলিবার অবসর।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণটি এক অপূর্ণ গ্রন্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে অনেক উপহাস করেন এই বলিয়া যে ইহাও নিম্নত অঙ্গের হইয়া চলাকেই পরমপূর্বার্থ মনে করেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' এই কথাটা আসিল কেমন করিয়া তাহা বলা ঘাউক।

তখন ব্রহ্মকথা ছিল শিক্ষার ক্ষেত্র। এক ব্রহ্মবি আপন ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে ব্রহ্মকথায় শিক্ষা দিলেন। কিন্তু আপন নৃত্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে উপেক্ষা করিলেন। প্রত্যাখ্যাত নৃত্যর পুত্র আপন

মাতাকে এই দুঃখ ভানাইলে মাতা বলিলেন, “বাছা, আমি শূন্যকণ্ঠ। কালোই মাতা-পৃথিবীর আমি সন্তান (children of the soil)। আমি আপন মাতাকে স্মরণ করি।” পৃথিবী আসিয়া ঐ পুস্তকে ঘানশবৎসর বলাভলে বসিয়া শিক্ষা দিলেন। তিনি শিকা পাইয়া শূন্যর পুত্র বলিয়া ঐতরেয় নামে এবং মহীয় শিল্প বলিয়া মহৌষাধ আত্মপরিচয় দিতা কণ্ঠবেদের অপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ লিখিলেন। তাহাতে পর পত্র পাঁচটি বহু (৭.১৫.১-৪)—

নানা প্রাক্তায় ঐতিহি ইতি হোহিত তত্ৰস।

পাশো নৃবৎ নরো জনঃ ইজ ইজরতাঃ নবা।

চৈরবেতি চৈরবেতি।

‘শ্রেষ্ঠ হইলেও বে জন বসিয়া থাকে সে পাণ্ডী হইয়া যায়। বে চলিতে চলিতে অগ্রসর হইতে হইতে শ্রান্ত, তাহার নানা শ্রী। সেবতাও অগ্রগামী চলন্তদের সখা অর্থাৎ সহচর। অতএব আগে চল আগে চল।’

শুশ্রিণ্যা চরতা জলে কুহুমায়া কল্লগ্রহিঃ।

গেরেত সর্বে পাশুমানঃ প্রমোদে নপথে বৃত্তাঃ।

চৈরবেতি চৈরবেতি।

‘নিম্নত চলিতেই বেদের ও আত্মার মহাবের ক্রমবিকাশ। চলন্ত লোকের সহ পাশ ও হীনতা মুক্তপথে (open road) আগনিই পড়ে গুইয়া। অতএব আগে চল আগে চল।’

আত্রে ভগ আসীনত উর্জিততি তিত্ততঃ।

যেতে নিশ্চয়মানন্ত চহতি চরতাঃ স্বঃ।

চৈরবেতি চৈরবেতি।

‘বে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্যও রহে বসিয়া। বে উদ্রিয়া পাড়াহ তাহার ভাগ্যও উদ্রিয়া পাড়াহ। যে গুইয়া পড়ে তাহার ভাগ্যও পড়ে গুইয়া। অতএব আগে চল আগে চল।’

কলিঃ পরানো ভবতি সন্নিহাবিত্ত বাশচঃ।

উজ্জিঃ ত্রেতা ভবতি কৃতঃ সশঙ্কতে চন্।

চৈরবেতি চৈরবেতি।

‘গুইয়া থাকাই কলিকাল, আগিয়া ওঠাই বাশচ, উদ্রিয়া পাড়ানোই ত্রেতা যুগ, অগ্রসর হইয়া চলাই সত্যযুগ। অতএব চল চল।’

চন্ বৈ যু বিম্বতি চন্ বাহুযুগমন্।

স্বর্গত পতঃ প্রোবাঃ যো ন তত্ৰজতে চন্।

চৈরবেতি চৈরবেতি।

‘চলাটাই যু, চলাটাই বাহু যুগ অর্থাৎ চলাটাই চলার অন্ততমর যুগ। চাহিয়া সেপ স্বর্গের অতুলিত আলোকসম্পদ, স্বর্গের আদি হইতে চলিতে চলিতে যে একদিনও হয় নাই ক্ষান্ত। অতএব আগে চল আগে চল।’

এসব তো হজের কথা নয়। আরও অপর সব কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। হজের কথা বলিতে দিতা ঐতরেয় বলিলেন, বাহুর বাহা শিল্প তাহাতেই তাহার সাধনা। মাহুৎ তাহার আপন শিল্প দিহাই সেবশিল্পের স্ববগান করে। মাহুৎশিল্প তো সেবশিল্পেরই স্বত্বকরণ।

শিল্পের এই মর্ম জানিলেই শিল্পের বার্থ্য্য মহত্ব বুঝা যায় : এই শিল্পবজের কলে আর কোনো পুণ্য বা স্বর্গ বা পার্থিব কোনো শুভ ফল লাভ না করিলেও ইহাতে আত্মসংস্কৃতি লাভ হয়। ইহার দ্বারা যজ্ঞমান আপনাকে বিশ্বচ্ছন্দে ছন্দোময় করিয়া তোলেন।

ঐ শিপানি পুসতি দেবদ্বিধাবি। এতেনাঃ যৈ শিবানামমুতুতীর্থ শিবম্ অমিনমাতৈঃ -। শিবঃ হ্যামিন্ অমিনমাতৈঃ বঃ একঃ যৈঃ কথৈব শিবানী*। আত্মসংস্কৃতির্থ্যাব শিবানি হ্রস্বাঙ্গাঃ বা। এতৈর্ব্যমবান অজ্ঞানঃ সঃস্কৃততে। ইত্যন্তেয় ব্রাহ্মণ ৩.১.১

আর পর্যন্ত শিল্পের বার্থ্য্য মহত্ব স্মরণে এর চেয়ে বড় কথা আর কোথাও ঘোষিত হয় নাই। এইখানে বাউল মননের একটা গান তুলনীয়।

মনন ছিলেন মুগলমান। বাউল মনন গানই গাহিতেন। গায়ত্রীপদ্য মুগলমানেবা বাউল বননের গান গাহিবার নিম্না করিলে মনন গাইলেন—

যদি কতই যানো ওতো বহু রাতি এখন সাগে নাই।

আমার নামান আমার পুণা গানে গানে চলতে চাই।

কোনো কুলের নামান কবাহারে

করও পথে নামান অন্ধকারে

আবার বীণার বাজান তাকে-তায়ে

আমার নামান কণ্ঠে গাই।

নিতে অগ্রসর হইবার যে ভাগিণ চট্টবেত্তি মস্তে পাই তাহারই প্রতিফলি দেখ। যার পরবর্তী কবীরের অগ্রসর-বাণীর মধ্যে। কবীর বলেন—

বহতা পানী নির্মল বহা কুখিয়া হোর।

‘যে মল বহিয়া চলে তাহা নির্মল থাকে। বহু মল উঠে পচিয়া।’

তাই কবীর বলেন—

সাক্ষ চানতা জো দিই

জাকো মনে ন কোব।

‘পথে চলিতে গিয়া যদি পড়িয়াও যাও তবু তাহাতে দোষ নাই।’

এই ক্ষুদ্র কবীর-সাধুদের মূখে শুনি—

করন নহী মন বিদারী।

মন রাখো তব দুলাধারী।

‘মন অবসর হইও না, যতক্ষণ জাগিয়া থাক ততক্ষণ নিজেকে হারী মনে করিবে।’

ব্রাহ্মণমুণ্ডের পর আসিল উপনিষদের যুগ। অধ্যাত্ম সাধনাই উপনিষদের পায় তব, বাগবজ্ঞ নহে। শুক্রব কাছে বসিয়া লোকালয় হইতে দূরে এই অধ্যাত্ম বিভা লাভ করিতে হয়। শুক্রব কাছে বসিয়া এই নিগূঢ় তব শুনিতে হয় বলিরাই এই বিস্তার নাম উপনিষৎ।

উপনিষদে দেখা যায় বিশ্বের সব সত্যের মধ্যে পুরুষই সব শ্রেষ্ঠ। তাহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। ইন্দ্ৰিয় হইতে অরন্ত করিয়া পর পর এক-এক সত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা। ক্রমে আসিল মহৎ তব। মহৎ হইতে অব্যক্ত বড়, অব্যক্ত হইতে পুরুষ বড়। পুরুষ হইতে বড় আর কিছুই নাই। তাহাই পরাক্রান্ত, তাহাই পরাগতি।

মহত: পদ্মবাঈবাক্যং পুস্তকং পঠ:।

পুস্তকায় পঠ: কিস্কিং সা কাঠা সা পঠা গতি:। কঠ ১-৩, ১১

এই পুস্তক বিষবাপী সত্য এবং তাহা সৰ্বলোকের অতীত। ইহাকে পাইলেই জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

..পুস্তকো ব্যাপকোহসিৎ এষ চ।

য: জায়া মৃগাতে মন্তমমৃতত্ব: চ সম্ভতি। কঠ ২.৬.৮

মানবের ক্ষমতে একশত এক বাড়ী। তাহার মধ্য হইতে একটি নিঃসৃত হইয়া মুক্তির পিষাছে। তাহাতে উদ্দেশ্য উঠিলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

পত: চৈকা চ লক্ষত্ব নাজান্

জালা: মুখ্যবসিতিনিস্তৈতকা।

তচোক্ষ্যমাত্তরমৃতত্বমসিৎ কঠ ২.৬.১০

এই তো। পূৰ্বাপুরি কামারোগের কথা। বাড়িলদের সঙ্গে উপনিষদের এখানে কোনো পার্থক্য নাই।

পূৰ্বেই বলা হইয়াছে বাস্তবনেরি সংহিতার চরম স্থানে পাওয়া গিয়াছে উপনিষদের সার উপোপনিষৎ—

ইশাবাক্রমিল: সর্ব: যৎ কিক্ কলগা: জগৎ।

সেই সত্যই সমস্ত উপনিষদে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। উপনিষৎ সাহিত্যটা আগাগোড়াই mystic বা মরমী—

যন্ত সর্বানি কৃতানি আত্মনোবাহস্মতি:।

সর্বকৃতেন্ চাভ্যাস: ন ভক্তো বিদুঃপুণ্ডিত:। ইশা ৬

আপনাকে সর্বকৃত এবং সর্বকৃতকে আপনার মধ্যে দেখাই তো বাড়িলের সার সাধন।

উপনিষৎ হইতে মরমীবাদ দেখাইতে হইলে সবই উদ্ধৃত করিতে হয়। কাজেই সারা উপনিষদের অংশব্য বাণী হইতে ছুই-একটা মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা বাউক। সমস্ত উপনিষদে তাহাদেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

উপনিষৎ বলিলেন, বাহিরে সর্বত্র ঐহাকে দেখিতেছ অস্তরের মধ্যেও তিনিই অস্তরময় পুস্তক।

যদ্যত্রমস্মিন্ আকাশে তেহোমসোঃপুস্তকম: পুস্তক:

তিনিই তোমার ফুৎকাশে অধ্যাত্ম (বৃহ. আ. ২.৪.৩০.)।

বাহিরে ঐহাকে উপাসনা করিতেছ তিনি তো সেই পরমপুস্তক নহেন—

যেন: বহিঃপুণ্ডিত:। কঠ ১.৪-৮

জীব ও ব্রহ্ম দুইই পরম বস্তু, গ্রেবে মাঝামাঝি।

যা সমুদ্রা সত্যতা। মুণ্ডক ৩.১

ঐহাকে বাহ্য কোনো ক্রিয়াকাণ্ড চাহিবে না। তিনি যদি আপন গ্রেবে ধরা দেন তবেই তাহার সন্ধান মিলিবে।

সারসংক্ষেপে প্রত্যক্ষের লক্ষ্যে ন দেখা ন বন্ধা ক্রমেন।

যদেবৈব ক্রান্তে তেন লজ্জতঃস্বয়ং সাত্বা বিদ্বন্তে তদু: বাহু। মুণ্ডক ৩.২.৩



বাউল
শ্রীমন্তলাল বসু

এবং

পুস্তকানুসারে পত্র: কিকিং লা কাটা না পত্রা পতি:। কই ২. ৬. ১১

এই সবই তো পুরাপুরি বাউলিয়া তত্ত্ব।

উপনিষদের লক্ষ্য হইল মুক্তি, স্বর্ণ নহে। শতাই ইহা মুক্তির আলোক দেখাইল। এই উপনিষৎ শুধু মানবকে ধর্ম বিষয়েই আলোক ও অধ্যাত্ম সত্তা মিল তাহা নহে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত সকল দিকেও ইহা দীর্ঘকাল-সঞ্চিত পুরাতন নানা বাধাবন্ধন ঘুচাইয়া বাউলতত্ত্বের মত উপনিষদের সত্য ও সর্বভাবে জ্ঞাতি পংক্তি প্রকৃতি নানা বহু সংস্কার ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল।

বহু উপনিষদে তাহার এই বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা দেখিতে পাই। কিন্তু একটিমাত্র উপনিষৎ হইতে তাহার মুক্তিবাদের একটু পরিচয় দিব। উপনিষৎটির নাম বহুসংহিকোপনিষৎ। বহুসংহিতি বলেন, “ব্রাহ্মণ কহিল বৈশ্ব শূত্র এই চারি বর্ণ। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। এই বেদবচনানুসরণ কথা স্মৃতি সকলেরও উক্ত—

ব্রাহ্মণ-কস্মিন-বৈশ্ব-শূত্র-ইতি চত্বারো বর্ণাস্থেবাঃ বর্ণিনাঃ

ব্রাহ্মণ এব এবান ইতি বেদবচনানুসরণং স্মৃতিভিত্তিশূত্রম্।

এখন বিচার করিতে হইবে ব্রাহ্মণ বলিতে বুঝায় কাহাকে? জীব-বেদ-জাতি-জ্ঞান-কর্ম-ধার্মিক, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কোনটা?—

তন্ম ত্যক্তবস্তি কো বা ব্রাহ্মণে নামঃ কিং ধীমঃ? কিং বেদঃ? কিং জাতিঃ? কিং জ্ঞানম্? কিং কর্ম? ধার্মিক ইতি? তন্ম এবমো ধীমো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ম ন।

তাহার মধ্যে প্রথম হইল জীব। জীবই কি তবে ব্রাহ্মণ? তাহাও তো বলা চলেনা। কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে নানা-জাতীর বেদের মধ্য দিয়াই জীব চলিয়াছে। সে তো একরূপ। এক জীবেরই কর্তব্যে অনেক সেহ উৎপন্ন হয়। সর্বদায়ের জীবের একরূপত্বের কথা বিচার করিলেই বুঝা যায় জীব কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অতীতান্যতাব্যবসেহাবাঃ জীবত্বৈকরূপত্বাৎ একব্রাহ্মণ

কর্তব্যাদ্যনেকসমসংভাব্যং সর্বদায়ীয়াঃ জীবত্বৈকরূপত্বাৎ।

তন্মান্ ন ধীমো ব্রাহ্মণ ইতি—

তবে কি বেদই ব্রাহ্মণ? তাহাও তো নহে। আচঙাল সকল মানুষেরই ধর্মীয় পাকভৌতিক এবং একই প্রকারের। সর্বত্রই “জ্ঞানায়নপাদি একই রূপ ধর্মার্থম্। ব্রাহ্মণ যেতবর্ণ, কস্মিন রক্তবর্ণ, বৈশ্ব শীতবর্ণ, শূত্র কৃষ্ণবর্ণ, এখন তো কোনো নিয়ম নাই। বেদটাই ব্রাহ্মণ হইলে মৃত পিতা প্রকৃতিদের দাও করার পুত্রের ব্রহ্মভাষা পাণ হয়। কিন্তু তাহা তো হয় না। কাজেই বেদও ব্রাহ্মণ নহে।

ভবি বেদো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ম ন। আচঙালশিষ্যভাব্যোঃ যতুভাণ্যো পাকভৌতিকং যদেহৈকরূপত্বাব্যবসায়-
ব্রাহ্মণ্যাদিনামানন্দম্। ব্রাহ্মণঃ যেতবর্ণঃ কস্মিনো রক্তবর্ণো বৈশ্বঃ শীতবর্ণঃ শূত্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাত্মকঃ।
শিষ্যাদিনীলকলসে পূজ্যাদিনাঃ ব্রহ্মভাষাদিনামানন্দম্। তন্মান্ ন বেদো ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ? তবে জাত্যন্তরবিধি অনেক অন্তরে অনেক জাতি হইত। আর সেইরূপ নানা অন্তরে দেখা যায় অনেক জাতিবিধি অনেক মহাবির ভ্রম হইয়াছে। কুই হইতে কথামুখ, মূখ হইতে কৌশিক, তদ্বৎ হইতে জাম্বুক, বঙ্গীক হইতে বাম্বীকি, কৈবর্তকর্তা হইতে ব্যাল, পশপাণ হইতে

গৌতম, উৎকী ইহঁতে বিসিষ্ট, কলশ ইহঁতে অগস্ত্যের জন্ম— এইরূপ ঐতি আছে। জাতির বাহিরেও জ্ঞান প্রতিপাদিতা বহু বর্ণি আছেন, তাই জাতিও ব্রাহ্মণ নহে।

তর্কি জাতিব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। তত্র জাতিগণ-বহুত্বং ব্যবহার্যতিনত্বস্য বহুর্যো বহব্যঃ সতি। বহুশূদ্রাঃ দুগাণাং লৌকিকাঃ শূদ্রাণাং, জাতিভেদাৎ বহুত্বাৎ, বায়ীকো বহুত্বাৎ, বাসঃ কৈবর্তকল্যায়ান্, পশুশূদ্রান্ খোতম্য, বসিষ্ট চৈবগ্ৰাম্যন কল্যাণাঃ কল্যাণে রাষ্ট্র ইতি স্তত্রঃসমাৎ। এতেষাঃ জাতিঃ বিন্যাসপরে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা বহুর্যো বহব্যঃ সতি। তস্মান্ ন জাতিব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ? অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী কত্রিও তো অনেক আছেন। তাই জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নহে—

তর্কি জ্ঞানঃ ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। কত্রিগণবোহপি পরমার্থবর্শিন অভিজ্ঞা বহব্যঃ সতি। তস্মান্ ন জ্ঞানঃ ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি কর্মই ব্রাহ্মণ? সকল প্রাণীরই প্রারম্ভ সঞ্চিত ও অগামী কর্মের সান্না দেখা যায়, কর্মপ্রেরিত হইয়াই লোক কর্ম করে। তাই কর্মও ব্রাহ্মণ ইহঁতে পারে না।

তর্কি কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। সর্বেষাঃ আদিভ্যাঃ প্রারম্ভকৃত্যাদ্যাদিকর্মণামর্থবর্শনাৎ কর্মান্তিমোক্তিত্যঃ সত্ত্বো জ্ঞানঃ ক্রিয়া কুর্বাতিতি। তস্মান্ ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি ধর্মই ব্রাহ্মণ? তাহাও তো নহে। কারণ হিরণ্যদাতা কত্রিও-বৈশ্ব-শূদ্রও বহু আছেন। তাই ধর্মিকও ব্রাহ্মণ নহে।

তর্কি ধর্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। কত্রিগণমো হিরণ্যদাতারো বহব্যঃ সতি। তস্মান্ ন ধর্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কতাকে বলা যায় ব্রাহ্মণ? যিনি অদ্বিতীয় জাতিগুণ ক্রিয়াতীত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ পরমাত্মার প্রত্যেক লক্ষ্যংকার লাভ করিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনিই যে ব্রাহ্মণ ইহঁাই প্রতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসেরও অভিপ্রায়। আর কোনো হতেই ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

তর্কি কো ব্রাহ্মণ্যো ন্যে। ৭ঃ কত্রিগণ্যাবৎ অদ্বিতীয়ঃ জাতিগুণক্রিয়াতীতঃ সত্যজ্ঞানানন্দানন্তরূপঃ সত্যস্বাক্ষরোক্তিত্যঃ বর্ততে স এব ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিপুত্রপুরাণেতিহাসেনাবতিশ্রাভঃ। অতরাং হি ব্রাহ্মণ্যক-সিদ্ধির্নাভোয।

প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে (২৭০-২৮১) খ্রীষ্টাব্দে, এই বল্ম্মুচিকোপনিষৎ চীন ভাষায় রূপান্তরিত হয়। উপনিষৎপানি অসত্য বহু প্রাচীন। এতকাল আগেও বাউলিয়া সমাজ-বিত্তোহ মেনের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

বড় বড় প্রধান উপনিষদগুলির পরিচয় অনেকেরই জানেন। তাহা ছাড়া আরও বহু উপনিষৎ আছে যাহা সাধারণত সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেই প্রচলিত। সেইসব উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সত্য ও বাউলদের মনের আরও বেশি মিল দেখা যায়। F. Otto Schrader মাস্ত্রাখ আজিয়ার লাইব্রেরি হইতে 'গ'ন্যাস উপনিষৎ' প্রকৃতি এইরূপ কয়েকখানি উপনিষৎ Minor Upanishads নামে ১৯১২ সালে বাহির করেন। সেখান হইতেই ১৯৩০ সালে আরও কিছু অপ্রকাশিত উপনিষৎ প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে শাট্যাঘনীয়োপনিষৎ বলেন, মনই হইল মাহবের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ—

মন এব বহুভাণ্যঃ কাল্যঃ বহুবাক্ষরোঃ। পৃ ২২০

বাউলদেরও এই একই কথা। 'বাহুবিচারে কল নাই। ভিতরের বস্ত্র যে মন, তাহাকে আগে শুদ্ধ কর।' বাহু-বিখা-সূত্র-আচার্যদি বার্ষ। পরব্রহ্মোপনিষৎ বলেন, যিনি মনকে লাগন করিয়াছেন, অস্তরেই তাঁহার শিখা, অস্তরেই তাঁহার উপবীত।

অথবা গুরুব্রাহ্মণনিমোপনীতিষৎ। পৃ ২২১

ব্রহ্মোপনিষৎ বলেন, বাহার বোধ অর্থে তিনি বাহিরের পিথাস্বর ত্যাগ করিয়া অক্ষর পরব্রহ্মকেই ব্রহ্ম-
অবস্থে ধারণ করেন—

সর্গিক বসনঃ কৃতা বহিঃ পুত্রঃ ভায়েন বৃথঃ ।

দামকরঃ পরঃ ব্রহ্ম তৎস্বরূপিত্বাৎ ।

বাহ্যদের এই অস্তরের জ্ঞান-ব্রহ্মোপবীত আছে তাহারাই ব্রহ্মবিশ্ব । তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মোপবীতগণ ।

সুমনস্করতঃ সোমঃ জ্ঞানব্রহ্মোপবীতবান্ ।

তে বৈ পুত্রবিশো লোকে তে চ ব্রহ্মোপবীতিনঃ ।

নারদপরিব্রাজকোপনিষদেও (১৫১-১৫২) এই কথাই আছে ।

পরব্রহ্মোপনিষৎ বলেন, ব্রাহ্মণ যদি মুক্তি চাহেন তবে অন্তঃপিত্তোপবীত ধারণ করিবেন—

ব্রাহ্মণঃ সুস্বাদুঃপিত্তোপবীতঃ ধারণম্ ।

বাহ্যদের পিথা জ্ঞানময়ী এবং উপবীত জ্ঞানময়, তাহারাই পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ, অস্তরের কিছুই নাই—

পিথা জ্ঞানময়ী বস্ত উপবীতঃ ত তদসম্ ।

ব্রাহ্মণঃ সৰ্বদা তত্ত নেতরেথাঃ সু ক্রিঃ৫৮ ।

তাই যোগবিজ্ঞানভূষণের বিপ্র বহিঃস্বর ত্যাগ করিবেন—

বহিঃ পুত্রঃ ভায়েন কিংবা যোগবিজ্ঞানভূষণঃ ।

ব্রাহ্মোপনিষদে ব্রাহ্মবস্ত্র অত্রিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াই বুকাইয়াছেন যে, বাহ্য চিত্তের কোনো
প্রয়োজন নাই । ভিতরের চিত্তই বস্ত্রই অঙ্গল সত্য ।

পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষৎ বলেন, অন্তঃজ্ঞানই যথার্থ ব্রহ্মোপবীত, ধ্যাননিষ্ঠাই যথার্থ বেদা । এমন
সাধকেরই কর্ম পবিত্র । তিনিই সর্বকর্মকৃৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠাপ্রাণ, তিনিই নীলাম্বান, তিনিই
ঋষিশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বজ্যোষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই অগ্ন্যঙ্কুর—

ব্রহ্মাত্মৈবৈক্যজ্ঞানঃ তসেব ব্রহ্মোপবীতম্ । তত্ত ধ্যাননিষ্ঠৈব পিথা । তৎকন্ড পরিমন্, স সর্বকর্মকৃৎ, স ব্রাহ্মণঃ,

স ব্রহ্মনিষ্ঠাপ্রাণঃ, স বেদা, স ঋষিঃ, স শ্রেষ্ঠাঃ, স এষ সর্বজ্যোষ্ঠাঃ, স এষ অগ্ন্যঙ্কুরঃ ।

জাতির দ্বারা কাহারও বৈষাধ্য পরিচয় দেওয়া চলে না । মহাবের পরিচয় নিতে হইবে চরিত্রের সাহায্যে,
জাতি দ্বারা আবার কি মহত্ব ? মানুষই হইল সকলের দার । এই কথা বলিয়াছিলেন অর্থবীর—

যে পুরুষ ব্রহ্ম বিদ্যতে বিদ্যঃ পরমহংসম্ ।

তাহার পর মহাত্মারূপে ভীষ্ম বলিলেন—

ন বাসুদেবোঽষ্টমঃ হি কিঞ্চিৎ ।

সবার উপরে বাসুদেব শ্রেষ্ঠ । তাহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই । ব্রাহ্মণেরও বৈষাধ্য হইল তাহার
একতা সমতা ও সত্যতার মধ্যে । ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তাহার ঈশ বহিঃসা সরলতা তপস্বিতা ও কর্মতলের
ত্যাগশক্তি । ইহাও ভীষ্মেরই কথা—

বৈতাণ্ড্যঃ ব্রাহ্মণত্বাতি বিত্তঃ

যৈষকতা সমতা সত্যতা চ ।

ঈশঃ বিতর্কিত্বিধানবার্জকঃ

ভক্তভক্তোপাসন্যঃ ক্রিয়াক্তাঃ । শাস্ত্রিশ্রী ১৭৫, ৩৭

মহাভারতে বাউলিয়া বহু তথ্য আছে। আত্ম আর তাহা বলার স্থান নাই। মহাভারত মাহুশেরই ভ্রমণান করিয়াছেন। এখানে উপনিষদেরই আর কিছু বলা যাউক। ইতিহাসোপনিষৎ বলেন, অশ্বম যদি পড় তবে জানিবে বাহু দেবতারের কথা, মাহুশের তথ্য তাহাতে নাই। বহুবেদে জানিবে শুধু বাহু ছাত্রের কথা, অশ্বরের সাধনা নহে। সাববেদে জানিলে বাহু আর-সব জানিবে, কিন্তু মানসবেদে জানিলেই অশ্বরস্বিত ব্রহ্মকে জানা যাইবে—

যতো হ যো বেদ স বেদ বেদান্

বহুধি যো বেদ স বেদ বহুত্।

সাবানি যো বেদ স বেদ সর্বত্

যো হাবকঃ কে স বেদ ব্রহ্ম।

বর্ষাজ্ঞান ধর্ম ছাত্রের সাধনা করিয়াই মাহুশ আনন্দ-তৃপ্ত হইতে পারে।

কানিচ্ছ্যঃ হি পশিত্যতঃ

বানিশত্বং পুত্রাঃ সন্ততিঃ। যৈস্তে উপনিষৎ

কারণ, বাহু বিগ্রহ পুত্রায় নৃক্তি নাই, তাই নৃক্তির জন্ত স্বতন্ত্রাচীন কর, বাহুচীনা ছাড়।

পাশাপাশোহনন্দিত্যতঃ

পুত্রা পুনর্জননাতোদকরী দুহকোঃ।

তদ্রাৎ বহিঃ স্ত্রীমর্শানিষৎ কুবাৎ

বাহুচীনাঃ পশিত্যতঃ পুনর্জনাৎ।

বাউলদের মতই এইসব উপনিষদবাহীরা বাহু সন্ধ্যা পূজা মানেন না। মিজালা করিলে বলেন, অশোচ হইলে তো সন্ধ্যাময় নাই। আমাদের মোহ-বাতা মরিয়াছেন, বোধহয় পুত্র অস্তিত্ব আছে। জাতানোচ স্ত্রীশোচ দুই অশোচ একত্রে উপস্থিত। কেননে সন্ধ্যা করি?—

ব্রহ্ম মোহময়ী বাতা জাতো বোধমঃ স্ত্রীতঃ।

স্ত্রীকন্যাসঃপ্রাপ্তে কন্য সন্ধ্যা উপাস্যতঃ।

দিনের অবশানে সূর্য অস্ত গেলে বা রাত্রির অবশানে সূর্যের উদয় হইলে তো সন্ধ্যা করা যায়। আমার দ্রবাক্ষণে চিত্ত-সূর্য সন্ধ্যাই আলোকে-আলোকে জ্যোতির্ময়। তাহার উদয়ও নাই অস্তও নাই। কেননে সন্ধ্যা তবে করি—

জ্যাক্ষণে চিত্তাভিত্যঃ সন্ধ্যা তাস্তি জ্যোতিঃ।

বাস্তবমিতি ন চোপেক্তিঃ কন্য সন্ধ্যা উপাস্যতঃ। যৈস্তে উপনিষৎ পৃ ১১০

কাছেই বাউলদের মতই এইসব জানী বাহুরের ভেদ বা আচার মানেন না। তাহার।

অব্যক্তলিঙ্গ অব্যক্তাচারঃ। জ্যাক্ষণোপনিষৎ পৃ ৬৯

বাউলদের সেরা কথাই যৈস্তে উপনিষদে, বেহই তোমার দেবালয়। তাহাতে যে জীব তিনিই তো শিব—

অয়ো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীব কেবলঃ শিবঃ।

কাছেই বাহু ও বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে মাহুশের অশ্বরের ভাব ও চরিত্রই যে বড় কথা সে কথা বাউলদেরও বহু পূর্বে ইহার। জোর করিয়া ভনাইয়া মিলেন।

উপনিষৎ ও তন্ত্রাদির পর বেসবাহু ধর্মগুলির মত দেখা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ মতেও তো মাহুবি সার তত্ত্ব, জাতি-পংক্তি প্রভৃতির বিচার মিথ্যা। রাজ্য। সাধনার মধ্যপন্থাই সার সাধনা। মানবীয় চরিত্রের মহাবই বার্থ্য মহাব। মাহুদের মত মাহুদের দেবা করিতে পারিলে দেবতারাও ধস্ত হন। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ মতের ও বাউল মতের মিল না দেখাইলেও চলে। পূর্ণপের অনেক স্থলেই 'বাউলিয়া' তত্ত্ব দেখা যায়। জাতি-পংক্তি-অগ্রাঙ্ক-কথা এইসব কথা কোনো কোনো পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। কথা ভবিষ্য পুরাণ বলিলেন—সামগ্রী ও অহুষ্ঠানভণে বরন শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণের সমান অর্থ্যাৎ ব্রাহ্মণ হইতে তাহারা কোনো মতেই কম নয়, তখন ব্রাহ্মণে শূদ্রে ভেদ কথ্য কেন? না আধ্যাত্মিক না বাহ্যনিমিত্তক কোনো মতেই এই ভেদ সিদ্ধ হয় না।

সামগ্রাহুষ্ঠানভণা: সবভা:

পূজা বক্ত: সতি সন্ধ্যা দ্বিহাবান্।

তদ্রূপে বিশেষো দ্বিমুহূনাতো

বাংলাঙ্কিকা বাহ্যনিমিত্তকো যা। ভবিষ্য-পুরাণ, অঙ্কপর্ব ৪১, ২০

কোনো স্মিক দিগাই তো শূদ্রে ব্রাহ্মণে কোনো ভেদ মেলে না। না বাহিরে-ভিতরে, না স্বর্গে-ঐশ্বর্গে, না আচ্ছাদ-ভয়ে, না বীর্যে-আকৃতিতে, না জ্ঞানে-কর্মে, না আশুতে-স্বাস্থ্যে, না দৌর্বল্যে-বৈশ্বর্গে, না চপলতার-প্রজ্ঞায়, না বৈরাগ্যে-ধর্মচরণে, না পরাক্রমে-ত্রিধর্মে, না রূপে-বৈশ্বর্গ্যে, না ভেদে-স্বীর্ণভে, না গতিতে-দেহমলসংগ্ৰবে, না অস্থিরত্বে না প্রেমে, না প্রমাণে না লোমে। ব্রাহ্মণে শূদ্রে কোথাও কি একটুও ভেদ আছে?—

তদ্বান্ ন চ বিভেদেন্তরাসি ন বহির্ভিত্ত্যন্তসি।

ন হৃদ্যসৌ চৈতর্য নাজ্ঞাতা: নাজ্ঞেয়সি।

ন বীর্যে নাক্রতো নাক্ষে ন ব্যাপারে ন চাতুসি।

নাজ্ঞেয়পুটে ন দৌর্বল্যে ন দৌর্গে নাজি চাপলে।

ন প্রজ্ঞাতা: ন বৈরাগ্যে ন বীর্যে ন পরাক্রমে।

ন ত্রিকর্ণে ন বৈশ্বর্গ্যে ন জ্ঞানসৌ ন ভেদে।

ন স্ত্রীপুংসে ন বহুমে ন দেহমলসংগ্ৰবে।

নাবিতস্ত ন চ প্রেমে ন প্রমাণে ন লোমে। ই ৪১, ১৫-২০

দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া অতি দ্রুত লইয়া খোজ করিলেও শূদ্রে-ব্রাহ্মণে কোনো ধর্মগত কোনো প্রকার ভেদই পাইলেন না—

শূদ্র-ব্রাহ্মণস্বার্থেভো দৃশ্যমানোহপি বহুত:

দেহভ্যন্তে সর্বধর্মে কইতৈস্ত্রিধৈবসি। ই ৪১, ৩৩

বহুধর্মিকোপনিষদের মত ভবিষ্যপুরাণও বলেন,—ব্রাহ্মণেরাই কি চন্দ্রমরীচিবৎ শুভ, অগ্নিহোত্রাই কি কিংবদন্তপুশবৎ বহুবর্ণ? বৈশ্বর্গ্যই কি হবিজালবর্ণ? শূদ্রেরাই কি অশ্বারোহান কৃষ্ণ?—

ন ব্রাহ্মণ্যশ্বারোহীচিহ্নত:

ন অগ্নিহো: কিংবদন্তপুশবর্গ:

ন চেষ বৈশ্ব: হবিজালকুল:

শূদ্রা ন গোমারসদ্যবর্গ:

ই ৪১, ৪১

চলার-কোরণ্ড ভহুতে-বর্ণে-কেশে হুখে-গুণে রক্তে-হুকে মাংসে-মেনে অঙ্কিত-সম্মত সবাই সমান।
তবে চারি বর্ষে কোথাও প্রভেদ দেখিব ?—

আকস্মিকভূতকৌতবঃ

গুণেন দুঃখেন চ পোদিতেন।

১৬৬. স্বাস্থ্যবোধঃ দ্বিরসৈঃ সমান।

কহুঃ প্রজ্ঞা দি কবঃ ভবতি। ঐ ৪১, ৪২

বর্ষে প্রমাণে আকস্মিতে গর্তবাসে বাক্যে বুদ্ধিতে কর্ণে ইন্দ্রিয়ে প্রাণে বলে হিবর্গে গোণে ভেদভে
কোথাও স্নাত্তিগত কোনো বিশেষই তো দেখি না—

বর্জমাধাকৃতিকর্তবাস-

বাণ্ বুদ্ধিকর্ণেত্রিকৌবিত্তে।

বসত্রিকর্ণাধকর্তবাসে

ন বিজ্ঞতে জ্ঞাতিকতা যিনেৎ। ঐ ৪১, ৪৩

সব কথাই সার হইল, সবাই এক শিতা। পরস্পরের সন্ধান, তবে আর স্নাত্তিভেদ দাঁড়ায় কিসে ? এক
দিতার চারি সন্ধান কি চারি স্নাত্তি হইতে পারে ?—

চক্ষুর একশ পিতৃঃ স্তম্ভাশ

ভেবাঃ স্তম্ভানাঃ কলুসাক্তিরেকা।

একঃ স্তম্ভানাম্ হি পিত্তক এব

পিত্তেকাত্তানাম্ ন চ জ্ঞাতিকতাঃ। ঐ ৪১, ৪৪

তখন বৌদ্ধদের কথা পূর্বেই সামান্য একটু উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখা যাইবে এই দুই ধর্মই সোদে-
গুণে ক্রমেই একেবারে বাউলিয়া মরমী বলিয়া চলিতেছিল।

পরবর্তী কালের জৈন গ্রন্থ পাহড় বোহাই তাহার প্রমাণ। পাহড় বোহার রচয়িতা মূনি রামসিংহ ১০০০
খ্রষ্টাব্দের কাছাকাছির মাদ্রুয। এই এক পাহড় বোহা হইতেই কণাটা অনেক পরিচয় করিয়া বুঝানো
যাইবে। মূল আর উদ্ধৃত করা গেল না। বোহার সংখ্যা দিয়া মিলাইয়া দেখা যায়—

ভেব তো বয়লাইলো, সাপও তো খোলস বদলায়, কিন্তু তাতে কি বিবটুসু সাপ কখনো ছাড়়ে ?
বোহা ১৪

মাথা মুড়াইয়া ধর্মশিক্ষা নিলে ? যখন পরের ভরসা ছাড়িবে তখনই সংসার-স্ত্যাগ হইতে সার্থক।
ঐ ১৪৩

ভীর্ষে ভীর্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুধু সেহুঃখই সার হইল। ঐ ১৭৮

জুহু বোষ্ট, ঈশ সন্ধানে বহিতেছে ঘুরিয়া, তিনি তো তোমারই মধ্যে। হায় সেই শিবস্বরূপগ্রহ
পাইলে না পরিচয় ? ঐ ১৭৯

মন যদি শুদ্ধ না হয় তবে শাস্ত্রপাঠে কি মোক্ষলাভ হইবে ? ঐ ১৪৬

জ্ঞানময় আশ্রা ছাড়া আর সব শাস্ত্রই মিছা কল্পনা মাত্র। ঐ ১৭৯

বুধা বহিতেছে বাহু শাস্ত্র পড়িয়া। জীবনের মধ্যে উন্নত-অন্নের যে সন্ধান তাহাই যদি না পাইলে তবে
সবই বুধা। ঐ ১৭৩

যদি ভিতরেই তোমার চিত্ত মলিন থাকে বাহিরের তপস্কাণ্ড তবে ফল কি ? ঐ ৩১

তীর্থটিন ও দ্বন্দ্বপনা সবই ভগ্নানি। শুক্লর প্রসাদে আপন সেহের মধ্যেই বেবতার সন্ধান কর। ঐ ৩০

বাহু সেবালয় মিথ্যা। সাড়ে তিন হাত এই বেহ-বেবালয়েই সত্ত্ব নিরঞ্নের বাস। যদি তাঁহাকে চাও, নির্মল হইয়া সেখানেই কর সন্ধান। ঐ ২০

সম্মিগের অধিষ্ঠান যে সেহ, হাত, সেই আপন গেহের মধ্যেই তাঁহাকে করিলে না সন্ধান ? ঐ ১৮০

শিবস্বরূপ বিশ্বভ্রমণ তোমার সেহ-বেবালয়ে। আর তুমি কিনা বোঁজ কর তাঁহাকে বাহিরে সেবালয়ে ! মনে আসে হাসি, হাথ হাথ, ভিতরের সিদ্ধপুরুষকে তুমি বানাইলে তিগারি ! ঐ ১৮৬

সিদ্ধি চাও তবে বাহু চেঁচা ছাড়, চিত্ত নির্মল কর। ঐ ৮৮

নির্মল চিত্তে ধরার হয় উদয়। দধা বিনা ধর্ম মেলেনা। ঐ ১৪৭

আপন আশ্বাই তো সর্বত্র। পর বলিয়া তো কেহই নাই। সবাই ধন আদ্যীয়, তপন কলহ-বিষেধ হইবে কাহার নহে ? ১০২

আগে পিছে সর্বমিকে দেখিয়াছি আমারই অন্তরের আন্তরপুরুষকে। আমার সব ভাষ্টি নিট্যাচ্ছে, আর কিছু শুধাইবার নাই। ঐ ১৭৫

শূন্য কখনো শূন্য নয়। অন্তর দিয়া দেখ সব শূন্যই পরম পূর্ণ। ঐ ২১২

এইখানে অধর্ম বেনের বাণী মনে হয়—

পরতি সবে চক্ষু ন সর্বে মনসা দ্বিঃ।

আমার অন্তর-পুরুষই যদি সর্বত্র বিরাজিত তবে শূণ্যই বা বলি কাহাকে ? সম্প্রসূই বা বলি কাহাকে ? তবে কে বা ভাষ্টি কে বা পূরা ? ঐ ১০২

এই সবই তো বাউলদের ধর্মের একেবারে সব সার কথা। তাহার পর তাহাদের মনঃসত্যও পাহাড় দোহার আছে। মলের মধ্যে লবণের মতো আপনাকে সর্বব্যাপীর মধ্যে উপলব্ধি করাই সমরস হওয়া। ঐ ১৭৬

সর্বমগ্নতের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও সময়ল সিদ্ধ হইবে না। একজায়ে ভাবিত হইতে হইবে। ঐ ১৭০

অন্তরের মধ্যে কোনো বোম বা সর্দীপতা থাকিলে চলিবে না। তাহার মতোই গুণ সম্পনের অতীত হইতে হইবে। তবেই হইবে উজ্জয়ের মিলন। ঐ ১০০

এই সেহের মধ্যে আশ্চর্য্যকে পাওয়াই হইল নির্বাণ। ঐ ১৭৮

ইহা তো বাউলিয়ার নির্বাণ। পুরাতন জৈন-বৌদ্ধ নির্বাণ হইতে ইহা ক্রমে ক্রমে এইখানে আসিয়া পৌছিয়াছে।

আরও পরবর্তী জৈন সাধক কবি আনন্দম্বরও এইসব কথাই নূতন করিয়া বলিয়াছেন। পরবর্তী জৈন সাধক সূফা শাহের প্রবর্তিত মতে, চুন্ডিয়া স্থানকবাসীদের সাধনায়, তারনগজ প্রভৃতিদের উপদেশে ক্রমেই এই সব ধরনী মতবাসই আরও পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, ক্রমেই জৈনসাধনার এই ধারা বাউলিয়ার ভাবের দিকে চলিয়াছে।

জৈন মোহার পরেই সেখা বাড়ক পরবর্তী বৌদ্ধ দোহা। বৌদ্ধদের মোহাকোষ তো সহস্র মিথাই আরম্ভ। এই মোহাকোষ ত্রিপ্রবোধস্ত্র বাগটী মহানয় সম্পাদন করিয়াছেন। সহস্রের পরই সময়ল

(১. ২)। তাহার পরই আকাশব্যং পুত্রচিন্তের 'খগমে'র কথা (১. ৫)। শুক্ল রূপাতেই এই পুত্রভবের মর্যবোধ ঘটে (১. ৮)। দেখা যাইতেছে সহস্র, সমরস, পুত্রভবের আনন্দ প্রভৃতি সব বাউলিয়া মতই বোদ্ধ বোধান্তে মেলে।

বাঙ্ক তীর্থ ও বেবতা বার্থ (২. ১২. ৩. ২০)। সহস্রের মধ্যেই পরমানন্দের মর্ম (৩. ২৭)। পরমার্থ হইল স্বলংবেদগম্য (৩. ২২)। মনকে মারিয়া নিমূর্ণ করিতে হইবে, মনের মিথ্যা কল্পনাই যে আমাদের ঘুরাইয়া নারে (৩. ৩৩)। সহস্র ছাড়া নির্বাণ নাই, ইহাই সরহপদ বলেন (১০. ১০)। কার্যকেই সাধনা করিতে হইবে (১০. ২)। শুধু ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নাই (১১. ১৪)। যেখানে মনশবনের লগ্ন্যর নাই রবিশমীর প্রবেশ নাই সেই অস্বরতম লোকেই চিন্তের বিজ্ঞান (১২. ২৫)। পরম মহামুখ আদি-মধ্য-অন্ত প্রভৃতি সীমার অতীত, তাহার মধ্যে আশ্রয়তর ভেদের স্থান নাই (১৩. ২৭)। বদ্ধ মনই চতুর্দিক ঘরে ধাইয়া, মুক্ত হইলে মন হয় নিষ্ঠল (১৫. ৫৩)। এই চক্কল মনকে স্থির করাই হইল সাধনা। এইসব বাউলিয়া মত পুরাপুরি বোদ্ধ মোহার মধ্যেও মেলে। মনকে লইয়াই মরমীষের বত বিপদ।

সেহের উপর কৃপা লোকে কোণ করে, দেহকে কৃপা হুঃখ দেয়। দেহের কি মোহ? মনের যোবে সেহকে কৃপা কেন হও দেওয়া?

এই সেহের মধ্যেই গন্ধা ঘূনা ও সাগর সংগম। এখানেই প্রধাগ বারাগনী, এখানেই চক্ক দিবাকর। সেহকে উৎসেকা করা চলিবে না।

এখু সে সরসরি কলুনা এখু সে গন্ধানাকর।

এখু প্রায় বানারসি এখু সে চর দিবাকর। ১৫. ৫৭

ছরে রহিল তব। বাহিরে কৃপা করি অবশেষ (১৬. ৭২)। অজরামরের কথাও এইখানে (১৮. ৬২)। এই সেহের মধ্যেই সেহাতীতের অপূর্ণ গুণ সীমা—

অসহির কোই সরায়হি লুকা। ২১. ৮২

সকল বাউলিয়া ভবের ইহাই শারতম তব।

পুত্র তরুর কথাও এইসব মোহায় পাই (২৩. ১০৮-১০৯)। সকল ধর্মের সার কথা হইল পর-উপকার ও মৈত্রী (২৩. ১১২)।

কাণহৃদ্যদের মতে আগম বেদ পুণ্য সবই মিচা (২৪. ২)। নিফলুর নিবরণ হইল সহস্রের রূপ, তাহার মধ্যে পাণপুণ্যের প্রবেশ নাই (২৪. ১০)। সেই সহস্রই হইল পরমতব, বেদশাস্ত্র মূর্ততার বিকল্পনামাত্র (২৫. ১২)। সহস্রে মন নিষ্ঠল করিয়া সমরস-সিদ্ধি করিলে অরামরণ দূর হয় (২৫. ১২)।

সরহপদ বলেন, করুণা ও পুত্র এই উভয়কে মুক্ত করিলেই পাণ সিদ্ধি (২২. ৪)। চক্ক ঘূর্ণ মুক্ত করিলেই পাণপুণ্য ঘুচিয়া যায়। পরীর হয় অজরামর (৩০. ৭)। বৈরাগ্য তাঁহাদের মতে পাণ, অর্থাৎ পুণ্য (মোহাকোর ১২৬)। সর্বচরারই স্বপদ— স্বপং সর্বং চরারম্ (ঐ)।

'চর্চাচর্চবিনিচ্চর' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাপ্রবোধ সম্পাদিত) দেখি, প্রমাণ ঘূনার মধ্যে বহু নাকী (২৬. ১৪)। পুত্রের সঙ্গে পুত্র মিলিলেই সহস্র ধাম উদিত হয়—

সুনে পল মিলিয়া ছবে

সকল ধাম উদিত তার। ৬৭. ৪৪।

এইসব বোধগম্যগুলি অষ্টমশতাব্দী হইতে সের।। ইহা অপরূপ ভাষায় লেখা।

সহস্র শতাব্দী নিম্নলিখিত প্রেমকেও সাধকের দৃষ্ট বলিয়াছেন।

এইসব বোধ ও জ্ঞান সাহাব আগে হইতেই গোরক্ষনাথের যোগ ও নানা নাথপন্থীর উপদেশ চলিতে আসিয়া করে। নাথপন্থ বিবধে আবার সহযোগী জ্ঞান হাম্বারীপ্রদাদ দ্বিবেদী বহু কাজ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে দেখা যাইবে, বাউলিয়া মতের প্রারম্ভ সবই দেখানো আছে। সাধকদের মধ্যে এখনও প্রচলিত গোরক্ষ-সংহিতায়, নিবসংহিতায়, ঘেরওঙ্গংহিতায়, ষ্টোবক্সংহিতায়, হটযোগ প্রদীপিকায় আরও নানা গ্রন্থে এইসব তত্ত্ব পাওয়া যায়। গোরক্ষবিজয় গোপীচন্দ্রের ও মন্যনামতীর গানে, তথ্যবিশেষ পদেও সেই সব কথা।

তথ্যের কথা বেশের আলোচনার শেষকালেই করা হইয়াছে। দেহতত্ত্ব ও লোকচাচর-বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত বিবরণে, তত্ত্ব ও বাউলিয়া মতে মিল থাকিলেও তত্ত্ব বাউলদের আসল কথা অমুদ্রায় তথ্যই নাই। অমুদ্রায়ের বলেই ইহার সব বন্ধন অতিক্রম করেন। এই প্রেম-সাধার জোরেই ইহার সব কল্পের উপরে উড়িয়া যাইতে পারেন। তাই তাঁহার বলেন—

আমরা পবীর দাস।

আমরা হাইটা চলার জাপ হামি না,

আমাদের উড়ে চলার দাস।

মুসলমানদের আশায় পরে ভারতীয় চিন্তায় মধ্যে এবং ধর্মসাধনার মধ্যে বড় একটা সংশ্লিষ্ট ঘটিল। পাশাপাশি থাকিলেও হিন্দু-মুসলমান দুই দলেরই পণ্ডিতেরা দেখিলেন চোটা কত্রিয়া কিছুতেই দুই দ্বারকে মিলাইতে পারিলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দলই উভয় সাধনার দান রক্ষা করিলেন।

কবীর দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলমান সাধনাকে উনার প্রেম ও ভক্তিভাবের মধ্যে মিলাইতে চাহিলেন তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন, “তুই তো নিরক্ষর মুর্থ! পণ্ডিতেরা যাঃ পারিলেন না, তাহা তুই কি পারিবি?” কবীর বলিলেন, “আমরা পণ্ডিত নহি বলিয়াই হবত পারিবি। পণ্ডিতেরা পড়িয়া পড়িয়া পাথর বনিয়া গিয়াছেন, তাহার লিখিতে লিখিতে কামা ইট হইয়া গিয়াছেন। তাই দুই দলের ইটে পাথরে ঠোকাঠুকি হইলে আঘাত জলে। আমরা মুর্থ, আমরা হইলাম সহস্র কাগজটি। তাই হিন্দু কাহা মুসলমান কাহার সঙ্গে সহজে মিলিবে। কিন্তু মোক্ষোতে পণ্ডিতেরা মিল হইবে না।”

এই কবীরেরও গুরু ছিলেন সাধক রামানন্দ। রামানন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আচার্যপন্থী রামানন্দদের মতে ছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পের প্রেমভক্তি পাইয়া আর আচার্য বানিতে পারিলেন না। তিনি আচার্যের বেড়া ভাঙিলেন। গল্পসাহে তাঁহাকে ভাগ্য করিল। তাঁহার সঙ্গেশে কিছু ব্রাহ্মণও ব্যক্তি হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্যই হইলেন জোলা কবীর, মুচি ববিদাস, নাপিত সেনা, আঠা ধরা প্রভৃতি। নারীকেও তিনি দীক্ষা দিলেন, তাঁর শিষ্য পীপা ছিলেন রামপুত।

রামানন্দের মধ্যেই বাউলিয়া তত্ত্বের দারম্ভ পাই। তিনি দেখাইলেন, সাধক আচার্যই হিন্দু-মুসলমান সাধনার মিলনের বাণ। ভক্তিভেদে প্রেম তো সবাই মিলিতে পারে। রামানন্দ দেখাইলেন, ধর্ম বাহিরে নয়, ধর্ম ভিতরে। সারতত্ব এই বানবসেহেই মধ্যে। কাজেই বাউলিয়া কাব্যযোগই রামানন্দ জো

করিয়া প্রচার করিলেন। গ্রন্থপাঠেবো রামানন্দেব বে বাণী আছে তাহাতে দেখি— বাহিরে যাও কোথায়? বেহমন্দিরেই তোমার আপন ঘরেই চলিয়াছে অপরূপ শীলা—দেখিয়া দত্ত হও—

কত ছাইই বেঘর লাগে রক্ত। গ্রন্থ নাহেব বলন্ত রাস

রামানন্দ বলিলেন, ভগবানকে পূজিতে ব্যাকুলভাবে চুয়া-চন্দন লইয়া চলিলাম বাহিরের দেবমন্দিরে। শুক বলিলেন, অন্ধ বে তোরাই মনের মধ্যে। বাহিরে যোগেনেই যাইবে, যিগিবে শুধু তীর্থের নামে চল আর মূর্তির নামে পাষণ—

এক দিবস মন ভঙি উমাধ।

যদি চাপেব চোখা বহু দৃশ্যব।

পূজন চালাইব ঠাই।

সো অহম্ বতাইও কত মনই হারি।

চরা ছাইই তই চল পথানা। ঐ

রামানন্দ আরও বলিলেন, বেদে পুরাণে বৃথা তাহাকে খুঁজিয়া মরা। অন্তরের মধ্যে না পাইলে তবে না হয় এই ব্যর্থভাবে বাহিরে তাহাকে খুঁজিয়া মরার কোনো অর্থ থাকিত। কিন্তু অন্তরে সন্ধান না করিয়াই বাহিরে বৃথা ঘুরিয়া মর কেন?—

বেদ পুরাণ সব দেখে ছাই।

ভাঙি ভাঙি ছাইই ধট ইয়া ন হোই। ঐ

আর্থদের চেয়ে আবিড়সের মধ্যে প্রেম ভক্তি ছিল বেশি করিয়া। তাই বলা যায় এতদিন প্রেমভক্তি ছিল ভারতের দক্ষিণ দেশে। উত্তরভারতে ছিল ব্রহ্মজ্ঞান মূর্তিবিচার ও কর্ম। এতদিনে রামানন্দ সেই দক্ষিণের প্রেমভক্তি উত্তর দেশে আনিলেন। সর্বসঙ্গে তিনি উত্তরপূর্ব ভারতের বঙ্গ-বঙ্গের স্থানীয় চিন্তাও নিলেন। ইহাতে এক মহা সাধনার সঙ্গম ঘটিল। এই সঙ্গমের ফল কবীর সর্বত্র ছড়াইলেন—

ভক্তি ত্রাঙ্কি উপনী লায়ে রামানন্দ।

একট কিংবা কবীরেব সত্ত্বীণ মোণও।

এই কাজে সাধক সদনা ও নামদেবের নামও উল্লেখযোগ্য। সদনা ঘাতিতে কসাই। আর নামদেব ঘাতিতে দগ্ধি। কবীর ছিলেন মূলদান বংশীয় মোলা, এবং রক্ষব ছিলেন মূলদান তুলাধুনকর। তবে কবীরের সঙ্গে কাহারও তুলনা নাই।

কবীর বলিলেন, মন্দিরে বা মন্দিরেই যদি ভগবানকে খোজ কর তবে কগড়া মিটিবে না। তিনি সবায় অন্তরে। সকল মানব-দেহের মধ্যেই ভগবানকে পাইলে সব কগড়া যাইবে মিটিয়া; অন্তরে খোজ কর।—খোদা যদি মন্দিরেই থাকেন তবে ব্যক্তি অগুণটা কাহার? তীর্থে মূর্তিতেই রাস থাকিলে কেহই তো তাহাতে তাহাকে পাইবে না? পূবে থাকেন হরি, পশ্চিমে থাকেন আত্মা। আরে অন্তরের মধ্যে যেনো খুঁজিয়া, সেখানেই রাস রহিমান—

মোর বুদাই মদজিল বলহু বৈ শুও মূলক কিসকর।

জীৱণ মূর্তি নামে বিবাসী দুহ্মে' কিনহু ন হোয়া।

পূজন বিলা ইকীকা বাগে পদ্বি অলহ মুকাম।

বিলহী পোয়ি দিষ্টে নিল ভিতরি ইহা রাস রহিমান।

বাউলিয়া মন্ডের সব কথাই কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়। ভ্রাত্তে-মহা বাড়লের এক মহাতত্ত্ব। কবীর বলেন—

জীবন্ত যোঁ মরণা ভল্য জো মরি জায়ে কোয়। সাক্ষীগ্রহ পৃ ৩০১

মরিতে যদি জান তবে জীবন্তেই মর, ইহাই সার পথ।

স্বকীরে তাহাই ‘কমা ফিলা’। বাড়লমের সার সাধনাই এই। কবীর বলেন,—

মরতে মরতে তব দুখা উলব দুখা ন কোয়। ঐ

মরিতেছে সবাই। মরিতে মরিতে—সবাই মরিবে। তবে যথাকালে আপন সাধনায় মরে কে?

জ্ঞাত না মরিলে বেহের মধ্যে ভগবানকে পাইবে না। দেহ-সাগরের অন্ত কোণায়?—

কাল বাহি সন্ধ্য হৈ অস্ত ন পাই কোয়।

মিরতক হোর করি জো হৈ মারিক াটে সোই। ঐ, পৃ ৩০১

বাউলও বলেন—

আছে তোমাই ভিতর অন্তর সাগর তার পাইনি না ঘর।

কাহার মাঝে যে সন্ধ্য, তার অন্ত কে পায়? জীবন্তে যদি মরিতে পার তবেই সে এই সাগরের মানিক পাইবে।

সুজার ভুদুরীদের ‘মরজীবা’ বলে—

জো মরণা সো জন ভৈর সো ঘেরে আনল।

কব মরিতোঁ কব তেটাই পূর্য পরমানব। ঐ, পৃ ৩০২

‘যে মরণকে লোকে ভয়, তাহাতেই আমার আনন্দ। মৃত্যুতে কবীরের ভয় নাই। তিনি আনন্দেই মরিতে চাহেন। কবীর বলেন, কবে মরিব? কবে পূর্ণানন্দের সাক্ষাৎকার পাইব?’

সার কথা জো মরি কহো জীবন্ত মিলে ন রাহ। পৃ ৩০৩

যদি ভগবান বলিতে চাও তবে মরিয়া পাইতে হইবে সেই নাম। জীবিত থাকিলে এই তত্ত্ব পাইবে না—

দিন পালন কী রাহ হৈ। ঐ পৃ ৩০৩

এই সাধনায় পথ দুর্গম। বিনা পাথে সেখানে চলিতে হয়। বাহিরের পাথে-হাটা কোনো পথ এই পথ নহে।

গ্রেষ ছাড়া এই জীবন্তে মরণ সম্ভব হয় না। গ্রেমের ভগতে যে দুইকে এক হইতে হয়। কেহ না কেহ না মরিলে (আত্মবিলায় না করিলে) তাহা হয় কেমনে?

হব, যৈ’ ণ কল পির বহী অব পির হৈ যৈ’ বারি’।

গ্রেম গলী অতি সাকরী ভার্যে কোনে সবাহি’। ঐ, পৃ ৩০৪

যখন প্রিয়তম ছিলেন তখন আমি ছিলাম না। এখন আমি আছি, তিনি নাই। গ্রেমের পথ অতি কষ্ট। ছুইয়ের এখানে ঠাঁই নাই।

এখানে কবীর এক মহাতত্ত্ব বলিয়াছেন। তারতে এক হল হইলেন অশেষবাবী, আর-এক হল শৈতবাবী। ইহাদের বর্ণনা হাজার হাজার বছর চলিয়াছে। তাহা কখনও মেটে নাই। কিন্তু বাড়লেরা বলেন, ছুই-গ্রেমের ঘষ গ্রেম হইলেই তো যেটে। ছুই না হইলে গ্রেম হয় না, আবাত ছুই মিলিয়া এক না হইলেও গ্রেম হয় না। কাজেই ছুই যখন এক হয় তখনই গ্রেমের উদয়। বাড়লেরা বলেন—

নিত্য-ব্রহ্মে নিত্য-এক প্রেম তার নাম ।

কবীরও বলেন দুই-একে তখনই মিলিবে যখন প্রেমের সন্ধান পাইবে । কারণ কবীরের মতে—
প্রেমধারা অতি স্নানকরী, তারে' বো' ন সমাধি ।

এই সংকীর্ণ পথে দুইএর স্থান নাই । কারণই প্রিয়তমের মধ্যে প্রেমের সাধককে মরিতে হয় । ক্রমের মধ্যে বিলীন (merged) হওয়ারকেই মরণ বলে । ইহাই হইল আন্তঃ-মরণ । ইহার মূৰ্ধ হইয়াও পরম সত্যকে ধারণ করিয়াছেন— বৃষ্টির জল নিম্নভূমিতেই পড়ায় । উচ্চ ভূমিতে জল পড়ায় না ।

উচে পানী না ঠিকে নীচে হী ঠহায় ।

শূন্য তথ্য বাউলদের এক বড় কথা । কবীর তো শূন্যের ঐশ্বর্য দেখিয়া মুগ্ধ । তাঁহার পূর্বেও যোগশাস্ত্রে দেখি, আকাশে থাকিলে কৃষ্ণের ভিতরে-বাহিরে শূন্য ; অর্থাৎ থাকিলে কৃষ্ণের ভিতরে-বাহিরে পূর্ণ—

অন্ত: শূন্য বহি: শূন্য: শূন্য: ইত্যদে ।

অন্ত: পূর্ণ বহি: পূর্ণ: পূর্ণ: ইত্যদে ।

কবীরও অক্ষরবিহীন সেই শূন্য অর্থবের সন্ধান জানিতেন । শূন্যের মধ্যেই বিদ্যল আশ্রয় । সেখানেই ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষের সহজ স্থান ।

শূন্যে বীর্ষে' বিদ্যল যৈটক তই ।

সহজ অহান হৈ বৈষকোজ ।

শূন্যেই অদীম অনন্ত তথ্য । শূন্যের মহাব এই যে সহজে সে আপনাকে দিয়া অস্তকে ভরিয়া দেয় । শূন্য আকাশের ঘটের মধ্যেও শূন্য আকাশ, আবার ঘটের বাহিরেও শূন্য আকাশ । সাগরের মধ্যে ভুলিলে ঘটেও সাগর জল, ঘটের বাহিরেও সাগর জল । নিজেতে যদি শূন্যের মধ্যে ভুবাঁইয়া লাগে তবে দেখিবে ভিন্নের বাহিরে কোথাও আর অপূর্ণতা নাই । সেই শূন্যময় তখন তাঁহার আশন ঐশ্বর্যে সব দিয়াছেন পূর্ণ করিয়া ।

এই শূন্যের মধ্যে ভুলিতে হইলে বাহ্য পূজা-অর্চনা নিষ্ফল, তীর্থ-ব্রত নিষ্ফল । সহজ সাধনায় তাঁহার মধ্যে বাইতে হয় ভুলিয়া । সেই সহজ সাধনার কথা কবীর অপূর্ণ ভাবায় বলিয়াছেন । মালাধিও জপি না, করেও জপি না, মুখেও নাম উচ্চারণ করি না—

মালা জপু' না কর জপু' হৃদয়ে কহু' ন নাম ।

অথচ সহজ জপ নিরন্তর চলিয়াছে । এই সহজ-জপ সহজ-সমাধিই কবীরের প্রার্থনীয় ।

সাধো সহজ সমাধি তলী—

ওর এতাপ জা দিনেই উপলী দিন দিন অধিক চলী ।

জই জই ভোলো' সেই পথিকরসা যো বুলু' করো' সে সেতা ।

জব সোতো' তব করে' বওতত পূর্নো' ঠির ন সেতা ।

করো' সে নাম হুরো' সে হুদিগ বার' গির' সে পূজা ।

দিরই উমার এক লম সেখ' তার ন হাধু' হুলা ।

আব ব হুরো' কব ন জ'বো কজা কই নহি যারো' ।

বুলে সেন পছিকো' ঈদি ঈদি হুদর জপ নিহারো' ।

হে সাধু সেই সহজ সমাধিই ভালো । শুষ্ক-প্রভাবে যেদিন ইহা পাইলাম সেদিন হইতে দিনে দিনে

ইহা চলিয়াছে বাড়িয়া। এখন যেখানেই যখন চলি, তাহাতেই চলে আমার পরিক্রমা, যা কিছু করি সবই হয় সেবা। যখনই শুই তখনই করি দণ্ডবৎ। আর কিছুই পূজা বা সাধনা আমার আর নাই। যাহা কিছু বলি, বলা হয় তাঁহারই নাম। যাহা কিছু ভনি তাহা হয় তাঁহারই অরণ, অন্নজল পাই তাহাও তাঁহারই পূজা। গৃহ অরণ্য শস্যের সন্ধ্যাস সবই এখন আমার কাছে এক। কোনো বৈতত্য আর আমার নাই। এখন আমি চক্ষু ও বুদ্ধি না, কানও রুধি না, কাধাকটেও করি না, নয়ন ঘৃণিহা হাসিহা হাসিয়া বেধি সর্বত্র সেই স্বন্দর রূপ, সর্বত্র পাই তাঁহারি পরিচয়।

সহজ নয় তো কি? জলের মধ্যে থাকিয়া যীন কি মল খুঁজিয়া মরিবে? তাঁহার মধ্যেই আছে, সহজে লও চিনিয়া।

শাবী বে' যীন পিচালী ?

বাউলদের মত কবীরেরও বহু হৈদালী আছে।

অবদু সো মোস্তাফিজ হোয়।

জো বা পরকী করে নিবের।

তরবার এক মূল দিন খাড়া

দিন ফুলে' বলা সাগ।

শাখা পত্র কিছু নহি' হোক অষ্ট পদম মূল বাগ।

পের বিন বিরতি করে' বিন বাটর জিতা যীন' যাতে।

গানোয়ারকে রূপ ন রেবা সত্তর হোয় লখাতে।

শাবী কা খোম যীন কা মাল কই কবীর বিচারি।

অপরূপার পার পরূপাতম সুরতিকী হনিহারী। ক. এ. পব ১০০

যে অবদুত, সেই যোগীই আমার গুরু, যিনি এই পদের মর্ম বলিতে পারেন। মূল বিনা খাড়া এক তরু, বিনা ফুলে তার লার্ণে ষল। শাখা পত্র কিছুই তার নাই, অষ্টপদম জনিত তার মুখে। চরণ বিনা চলিয়াছে নৃত্য, কর, বিনা বাজে বাজ, ত্রিহা বিনা চলে নাম। সেই গায়কের না আছে রূপ না আছে রেবা। সঙ্গুরু হইলে দিতে পারে এই রহস্যের মর্ম দেখাইয়া। কবীর বিচার করিয়া কহেন, এই সহজতব আকাশে পক্ষীর পথের মত, জলে যীনবাগের মত চিরুহীন—অপরূপারের পার সেই পুরুষোত্তম। বলিহারী সেই পুরুষের।

কবীরের আরও একটি পদ দেখাই—

এখনে পদম কি পুহকী এখনে এতু এখনে পদম কি শাবী।

এখনে চব কি পূর এখনে এতু এখনে কোন বিনানী।

এখনে পাণ কি পাও এখনে এতু এখনে বরক কি রেত।

এখনে পুহক কি নারী এখনে এতু এখনে বীজ কি বেত।

এখনে দিল কি কৈনী এখনে এতু এখনে পাণ কি পুদ।

কই কবীর ঘা' বলা বিরূপন তই কিছু আহি কি মুক। দিল্লী, ৩০

এই পদের অলুবাণ করার প্রয়োজন নাই। ইহা এতই হৃস্পষ্ট। ইহার অল্পরূপ বাউল পবও আছে।

দাদুপদীরের মধ্যে প্রচলিত দাদুবাণীর মধ্যে মায়াব বাণী পাই—

উজা নার, বৈঠা চিঠির, সাতার: জাগত হুতা ।

তিন লোক ততলাল বিচারণ, তই! মহিগা পুতা? বাবু: বাগা অংগ, ৩৩

বাংলায় বেগী-বাউলনের মতে বাগী পাই—

উজা নার, বৈঠা নার, নার: জাগত হুতা ।

তিন ভুবনে বিহাইজা জাগ, কই খানিরে পুতা ।

গোরখশরীরের মধ্যেও মারের বাগী আছে—

উজা নার বৈঠা নার নার: জাগত হুতা ।

তিন ভবন জগ জাগ পদার: কই জাগা পুতা ।

বাংলায় বেগীদের পরে বেগি—

উজা নার, বৈঠা নার: জাগত হুতা ।

তিন বাগে কব জাগ বিহাইনু— কই খানিরে পুতা?*

গোরখ বাক্যও আছে—

উজা নার, বৈঠা নার, নার: জাগত হুতা

তিন ভবন তে তিন হুইং বেগু: তৌ গোরখ অবুতা ।

ইহার সঙ্গে তুলনীয় বাংলার বেগীর পর—

উজা নার, বৈঠা নার: জাগত হুতা ।

তিন ভবনে পেশ জাগ তত হৌ অবুতা ।*

কাহাংগই বাউলনের পরন তত্ব । কবীরের মত দাঁড় মতোও কারাতবই নার । দাঁড় কাহাবলী
হইতে কিছু অংশ দেওয়া বাউক—

কাহা হাঁহে সিরজনহায় ।

কাহা হাঁহে ও কাহ ।

কাহা হাঁহে হৈ আকাশ ।

কাহা হাঁহে ধরতী পাস ।

কাহা হাঁহে গমন একাল ।

কাহা হাঁহে নীর নিবাস ।

কাহা হাঁহে মহিরে দূর ।

কাহা হাঁহে হাইর জুহ ।

কাহা হাঁহে তীর্থে বেহ ।

কাহা হাঁহে অলপ অতর ।

কাহা হাঁহে চারু: কৈ ।

কাহা হাঁহে পায়: ভেব ।

কাহা হাঁহে জাই: নাই ।

কাহা হাঁহে তৌজানী দিহে ।

কাহা হাঁহে সে অবতার ।

কাহা হাঁহে বাক্যকার ।

কাহা হাঁহে খেল পদার ।

কাহা হাঁহে মাগ অগার ।

কাহা হাঁহে লখ ব্রহ্মভ ।

কাহা হাঁহে টৈ বর কত ।

কাহা হাঁহে দাগর দাত ।

কাহা হাঁহে অধিগত দাগ ।

কাহা হাঁহে নদীর নীর ।

কাহা হাঁহে পহির জতীর ।

কাহা হাঁহে গাং তরং ।

কাহা হাঁহে জমবা মগ ।

কাহা হাঁহে পুতা পাতী ।

কাহা হাঁহে জীর্ণ জাতী ।

* তিন বাগে তপলাল বিহাইনু— পাঠও আছে ।

* নং প্রকৃত দাঁড়, পৃ ৩৩

কাগা বাঁহে বস্ত্র অপার ।
কাগা বাঁহে তর তরকার ।
কাগা বাঁহে বৌদিদি হোই ।
কাগা বাঁহে অঁদিদি সোই ।
কাগা বাঁহে রতন অঘোল ।
কাগা বাঁহে মোল ন তোম ।
কাগা বাঁহে বহ বিস্তার ।
কাগা বাঁহে অনন্ত অপার ।
কাগা বাঁহে খেল গ্রাণ ।
কাগা বাঁহে পদ নিরুণ ।
কাগা বাঁহে অবন্ত সার ।
কাগা বাঁহে কঠে বিচার ।
কাগা বাঁহে কলা অবদক ।
কাগা বাঁহে করতা এক ।

কাগা বাঁহে ভালহার ।
কাগা বাঁহে উত্তরে পার ।
কাগা বাঁহে হৈ দীহার ।
কাগা বাঁহে বেগনহার ।
কাগা বাঁহে দেখা নূহ ।
কাগা বাঁহে রজা তরপূহ ।

কাগা বাঁহে কোতি অবন্ত ।
কাগা বাঁহে নহা বন্ত ।
কাগা বাঁহে হাংলতার ।
কাগা বাঁহে প্রসন্নকার ।
কাগা বাঁহে কর্তার হৈ সো দিদি আসে বাঁহি ।
বাঁহু ভট্টদুখ পাইয়ে সব কিছু সাজা বাঁহি ।

বাণীগুলি এত সরল যে অহুবাসের প্রয়োজন নাই । তবু দুই-এক ভাষণীয় অহুবিধা লাগিতে পারে । তাই একটা অহুবাস দেওয়া গেল—

কাগার মধ্যেই পরিকর্তা ।
কাগার মধ্যেই ঔকার ।
কাগার মধ্যেই আকাশ ।
কাগার মধ্যেই ধরতী আবাস ।
কাগার মধ্যেই পলম একাশ ।
কাগার মধ্যেই নীর বিধান ।
কাগার মধ্যেই চন্দ্র পূর্ব ।
কাগার মধ্যেই ব্যক্তিভেদে তুর ।
কাগার মধ্যেই ত্রুতা বিদ্যু শিব ।
কাগার মধ্যেই অলপ ইন্দ্রিয়াতীত ।
কাগার মধ্যেই চারি দেব ।
কাগার মধ্যেই পাই সত্যাব ।
কাগার মধ্যেই জন্মে মরে ।
কাগার মধ্যেই চৌবানি বোনি স্রবণ করে ।
কাগার মধ্যেই সার অবতার ।
কাগার মধ্যেই বার দাম এই লীলা ।
কাগার মধ্যেই চণ্ডিমায়ে খেলা ।
কাগার মধ্যেই গ্রাণ আধার ।
কাগার মধ্যেই সকল ত্রুতাও ।
কাগার মধ্যেই অখণ্ড বহুধরা ।

কাগার মধ্যেই সত্ত দায়র ।
কাগার মধ্যেই সর্বাঙ্গীত নাথ ।
কাগার মধ্যেই নবীর দীহ ।
কাগার মধ্যেই দাগর দতীহ-পোঁহর ।
কাগার মধ্যেই দগা তরঙ্গ ।
কাগার মধ্যেই ধনুনা স্রব ।
কাগার মধ্যেই পূজা পাতি ।
কাগার মধ্যেই তীর্থ জাতি ।
কাগার মধ্যেই অপার বস্ত্র ।
কাগার মধ্যেই পরিপূর্ণ হাতারা ।
কাগার মধ্যেই নব দিদি বিদ্যাবান ।
কাগার মধ্যেই অষ্ট সিদ্ধি ।
কাগার মধ্যেই অমূল্য রতন ।
কাগার মধ্যেই অমূল্য ও অমূল্য বস্ত্র ।
কাগার মধ্যেই যৈত্রিতা বিস্তার ।
কাগার মধ্যেই অনন্ত অপার ।
কাগার মধ্যেই খেলা গ্রাণ ।
কাগার মধ্যেই পদ নির্বাণ ।
কাগার মধ্যেই অমূল্যকার ।
কাগার মধ্যেই কয়ে বিচার ।

কাচার মধ্যেই কলা অনেক ।

কাচার মধ্যেই কৰ্ত্তা এক ।

কাচার মধ্যেই ভাবনাকৰ্ত্তা ।

কাচার মধ্যেই পারদানী, যে যায় হইয়া পার ।

কাচার মধ্যেই সেই দীশা দর্শন ।

কাচার মধ্যেই দেখেনেওয়াসা ।

কাচার মধ্যেই বেদিন্যাস সেই জ্যোতি ।

কাচার মধ্যেই রহিয়াস ভরপুর হইয়া ।

কাচার মধ্যেই জ্যোতি অনন্ত ।

কাচার মধ্যেই সবা বসন্ত ।

কাচার মধ্যেই মরণাচার ।

কাচার মধ্যেই মরণাকার ।

কাচার মধ্যেই রহিয়াছেন কৰ্ত্তা । কেহ চিনিলা না সেই রত্নকে । সৎগুণের কৃপার সব কিছু পাইয়াছেন দাদু কাচারই মধ্যে ।

সেই হইল সেবমন্দির । কাজেই তাহা পবিত্র (divine) : মনের অপরাধে সেহুকে কৃথা হুঃখ সেওয়া অশুচিত । দাদু তাই বলেন—

কসি কসি কাচার তপস্বত করি করি,

করত করত তন কুণে পরে ।

কহ' নীতল কহ' তপতি ধরে তন ;

কহ' কর' যে করত নীল ধরে ।

কহ' কন তাঁরন কিরি কিরি থাকে

কহ' পিরিপর্ষত দাই চড়ে ।

কহ' দিখর চটি পড়ে বস্ত্রীপর

কহ' হতি আশা গ্রাণ ধরে ।

জঃ ধরে হন বিকটি ন পুতে

তারে' বুঝে তনি দাই ধরে ।

হা হা হরি অব দীন দীন করি

দাদু বহ অপরাধ ধরে ।

‘হায় হায়, তপস্বী ও ভ্রাতারূপ করিতে কাচারে ক্রমাগতই করি করণ (পীড়ন) । ভ্রমিতে ভ্রমিতে পড়িয়াছি বিদন ভুলে । কোথাও মরিয়াছি ঠাণ্ডার, কোথাও তাপে মরিয়াছি পুড়িয়া । কোথাও কোথাও আমি করিতে আপন সেই করিয়াছি দ্বিগুণ । কোথাও আমি বনে তাঁর্যে ঘুরিয়া জ্ঞাত, কোথাও গিরিপর্বত চড়িয়া শ্রান্ত । কখনও গিরিপর্বত হইতে খাঁপ দিয়া করিয়াছি আশ্রয়তা । নিশ্চটে তুমি (আমার অন্তরের মধ্যে) তাহা না দেখিবা অন্ধ আমি তোমাকে ছাড়িয়া পুড়িয়া মরিয়াছি । দাদু বহ অপরাধ, আমাকে ক্ষমা করিবা তোমার মধ্যে ধীনদীন কর ।’

অপরের কৃত সেহকর্ণ-পাণ দাদু আশ্রয়তই মনে করেন । কারণ, সবার সঙ্গে তো তিনিও একাঙ্গ । তাই সবার পাণে তাঁরও অপরাধ । অদ্বিত্য তো সর্বত্রই সমান ।

এইসব সেহকর্ণ ছাড়িয়া পছন্দ সরল কর্মই দাদু বারিত । এই সহজ পথই বাউলদেরও কামা—

আপা মিটে হরি তরৈ তন মন তরৈ বিকার ।

নিরবেরী সব ধীংসো দাদু বহ মত সার ।

অমরিকা মিটাইয়া হরি ভজন, ভক্তমনের বিকার ত্যাগ, সর্বজীবের মৈত্রী, যে দাদু, ইহাই সার সত্য, আর বত সব মিথ্যা জাড়াইয়া একদিন সত্যের অঙ্গ হইবেই—

ভায়ে তরী ছিপাইয়ে শাঁচ ন ধানো হোই ।

সেন রসাতলি গমন হু এন্ট বাহিরে হোই ।

তাই যেখানেই লুকাও, সত্যকে লুকানো অসম্ভব । রসাতলের শেবনাগ হইতে গগনের ঋষভাশ্ব তাহা প্রকাশিত করিয়া দিবে । এই সত্য তো সর্বজনীন, তাই আবার পরিচরও সার্বভৌম ।

মতি হবারী মনতত্ত্ব পছন্দন পরিবার ।

অগংগুর আমার স্বাস্থ্য, পরমেশ্বর আমার পরিবার। ছোট কোনো সংকীর্ণ পরিবার আমার নাই।

পূরণ ব্রহ্ম বিচারিত সকল আত্মা এক।

কায়াকে তপ দেবিরে নানা বস্ত্র অনেক।

কারণ সেই পূর্ণ ব্রহ্মের সমস্ত বিচার করিয়া সবাই এক। কায়ার দিক দিয়া দেখিলে নানা বস্ত্র ও অনৈক্যের আর শেষ নাই।

সকল চর্যাকরের সঙ্গে এক হইয়া বিশ্বের সব সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বশন সাধনা করিব, তখন আমার সারা জীবনই হইয়া উঠিবে এক অগংগু পুত্ৰ। তখন সংসার ও ধর্ম এক হইয়া যাইবে। পুত্ৰা ও জীবনব্যতীর মধ্যে আর বিভেদ থাকিবে না। বাউলদের ইহাই কাম্য লক্ষ্য। তাহাই আসলে বাউলধর্ম। দুই হস্তকণ ভালো থাকে তখন সবই থাকে মিলিয়া, নষ্ট হইলেই ছান! ও মল আলাসা হইয়া যায়। পুত্ৰা ও জীবনব্যতী আলাসা হইলে নৃত্তিব সাধনা নষ্ট হইয়াছে।

দাদুও বলেন—

স্বপ্নিহ সব সুখিত্য করে ঐশা করিত্য চাপ।

অন্তর্বি বিশলে আত্মা তব দাদু প্রাপ্তে আপ। পৃ ৮০

বিনা আয়ালে সর্বকণ পাছের নথ হইতে বাখার শিখা পর্যন্ত সব শরীর আমার রূপ করিতে পারে এমন রূপ কর। হে দাদু, তবেই অন্তরে আত্মা হইবে বিকসিত, তিনি আপনি হইবেন আমার সর্বজীবনে প্রকটিত—

বর-নারায়ণ সকল শিরোমণি ঘনম অমোদিক আই রে।

এই নর-নারায়ণ সেহ, ইহা একমিকে আত্মস্বরূপ আর এক দিকে বেব-স্বরূপ (divine) এই জীবন সকল শিরোমণি, সেই অমর সাধনা না পাইয়া এই অমূল্য জনম কি বুঝাই যাইবে? দাদু বলেন—

হবৈঁ হয় নির্ণয় তয়ে নবৈ রিসানে লোক।

সততসক পলসায় বৈ বেয়ে হরষ ন শোক। পৃ ২৪০

যেদিন হইতে আমি বিশ্বসত্যের পরিচয় পাইয়া সম্প্রদায়-বৃদ্ধি ছাড়িলাম, সেদিন হইতে সবাই আমার উপর হইলেন রুষ্ট। কিন্তু সন্তোষপ্রসাদে আমার তখন না হইল হর্ষ না হইল শোক।

মৈঁ পনি এক অপারক যদি উঠ ব জাবে। পৃ ৪৪১

আমি এক অপারকের মুক্তপথে চলিরাছি, আমার মনে আর কিছুই লাগে না ভালো।

খত খত করি ব্রহ্মকো পনি পনি গায় বটি।

দাদু পূরণ ব্রহ্ম ভক্তি ধর্ম ভরনকী গাঠি। পৃ ১২২

ব্রহ্মকেই খও খও করিয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লইয়াছে ভাগ ভাগ করিয়া। হে দাদু, পূরণ ব্রহ্ম তামিহা বস্তু হইল সবাই জনের গাঠে।

হিন্দু ভুক্ত ন হোইবা লবিব সেতী কার। পৃ ২০৮

না হইবে হিন্দু না হইবে মুসলমান, স্বামীর সঙ্গেই তোমার কাজ।

সন্তদের সঙ্গে বাউল ভাবের মিলের বিষয়ে লিখিতে গেলে শেষ নাই। শূত্র লব্ধে দাদুও কিছু বাণী উদ্ধৃত করি, তাহাতেই শূত্রের পূর্ণতা বুঝা যাইবে—

সংসার আপে লখাইল শূত্র বস্ত্রল মৈঁ ছাঁই। পৃষ্ঠা. ১০

শ্রুতমণ্ডলে গিঢ়া সহস্রেরই আশ্বাকে প্রত্যাক্ষ করা গেল। তিনি আপনাকে সেখানে সহস্রের দ্বারা ঘিরেন।

এক শব্দ জন্ম উৎসে তবু সহস্রি মারেন।

একই শব্দ শুনিয়াই সব বন্ধন হইতেছে মুক্ত, শ্রুত্রে সহস্রের জাগিরা উঠিতেছে প্রাণ।

জন্ম দু'নি নিরুপায়। হুবিরণ অংক, পৃ ৩২০

ত্রুতশ্রুতই এই আশ্বার গৃহস্থ পায়।

শ্রুত বচন নাহি সঁচা নৈ ন ভরি সো কেবিরে। এ পৃ ৩২৪

সত্যাক্ষর বিবাজিত শ্রুতমণ্ডলের মধ্যে, নয়ন ভরিয়া লও দেখিয়া।

শ্রুত সত্যের জই, দাতৃ হংসা হয়ে তই, বিলসি বিলসি নিরুপায়। এ পৃ ৩২৫

যেখানে সেই শ্রুতের (মানস) সন্মোহন, দাতৃ বলেন, সেখানেই হংসের বাস। বিলসি বিলসি সেখানে বসন্তোৎসব।

ইহার পরে আর কিছু দেখাইবার প্রয়োজন নাই। দাতৃ ধর্ম চলিবে অনন্তশ্রুত্রে নিরন্তর সহস্রের। সেই অনন্ত শ্রুত মাহুকেরই অন্তরে। কারণেই মাহুকের চেয়ে সহস্রের আর কিছু নাই। ইহাই বাউল ধর্মের সত্যতম কথা।

অবলিপি

কট। জোড়াল

কথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন জানে মনোবোহন আইল

অবলিপি: জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর

		II		সা		সা		সা		রা:		-ম:		I	
		ম		ন		ন		জা		নে		.		.	
I	মা	মা	পা	পা	পা	মা	-গা	রা	গা	রা	গা	-গা	গা	I	
	ম	নো	নো	হ	ন	আ	.	ই	ল	.	.	.	ম		
I	গা	-রা	.	সা	সা	মমা	রা	-গা	সা	-গা	সা	-গা	সা	I	
	ন	.	জা	নে	ন	স.	খি	.	তা	.	ই	.	ই		
I	সা	সা	-খা	সা	সা	সা	-গা	রা	গা	-গা	প:	প:	I		
	কে	ন	.	ন	ক	রে	.	আ	জি	.	.	.	.		
I	মা	মা	রা	মগা	-মা	রা	-গা	II							
	আ	মা	রা	প্রা	.	গে	.								
II	পা	-গা	পা	সাঁ	-গা	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ		
	ভা	.	রি	সো	.	র	ভ	ব	হি						
I	সাঁ	ধা	ধা	সাঁ	-গা	সাঁ	-গা	সাঁ	সাঁ	-গা	পা	পা	I		
	ব	হি	ল	কি	.	ল	.	বী	র	.	গ	গ			
I	পা	পা	ধা	-গা	সাঁ	সাঁ	-গা	-গা	ধা	-পা	-গা	-গা	I		
	আ	মা	রি	.	প	রা	.	.	ন	.	.	.			
I	মা	-মা	-গা	-গা	রা	-সাঁ	II	II							
	পা	.	.	.	নে	.	.								

তেজস্ক্রিয়তা, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম

জীৱকল্পন ভট্টাচার্য

১

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা

তখন সবে মাত্ৰ এক্স-ৰশ্মি বিকিরণ হৈছে। বেথা গেছে এই ৰশ্মি যটোগ্ৰাফি কামৰে ক'লো কৰে। মাত্ৰ এক্স-ৰশ্মিৰ সৃষ্টি কৰতে হয় এই বস্তু কৰে। প্ৰায় বায়ুশূন্য একটা গোলাকোষৰ মধ্যৰ একটা শক্তিশালী আবেশকুলীৰ পৰা তড়িৎযোগে প্যাঠনো হল, ইলেক্ট্ৰনৰা একটা দ্ৰুত পদাৰ্থে ধাক্কা দিলে, এক্স-ৰশ্মি জন্মিলে। অধ্যাপক বেকাৱেল মন্ত উশায়ে এক্স-ৰশ্মি পাওৱা যায় কি না অস্বস্তান কৰতে থাকিলেন।

ইউৰেনিয়ামৰ অভিনব ধৰ্ম

বেকাৱেল দেখিলেন যে কাশো কাগজে মোড়া যটোগ্ৰাফি কামৰে উপৰ বৰি ইউৰেনিয়াম নাইট্ৰেট পাত্ৰা দাখ তৰে যটোগ্ৰাফি কাম আকান্ত হয়, এক্স-ৰশ্মিৰ জন্তে বেনম হৈছে থাকে। বেকাৱেল ভাবিলেন, তৰে তো ইউৰেনিয়াম নাইট্ৰেটৰ পৰা এক্স-ৰশ্মি বৈৰছে। বেকাৱেল মন্ত পৰে ক'লেন যে ইউৰেনিয়ামৰ পৰা এক্স-ৰশ্মি বৈৰছে তা মোটেই এক্স-ৰশ্মি নহয়, এক্স-ৰশ্মিৰ সৰে তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নেই, তা এক নতুন বস্তুৰ তেজ নতুন বস্তুৰ শক্তি, ইউৰেনিয়ামৰ পৰা তা আপনা-আপনি বৈৰছে, তৰে যটোগ্ৰাফি কামৰ উপৰ তাৰ ক্ৰিয়া এক্স-ৰশ্মিৰ ক্ৰিয়াৰই মতো। বিজ্ঞানৰ ইতিহাসে বোধ হয় আত্ম কোনো পুৰাতন নেই দেখানে তুলে হুজিৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে এমন এক আবিষ্কাৰ হল বা এক নতুন যুগ এনে দিলে।

বেকাৱেল দেখিলেন যে, ইউৰেনিয়ামৰ পৰা এক্স-ৰশ্মি বৈৰছে তাৰ এক ধৰ্ম হল ওই ৰশ্মি কামৰে বায়ুৰে তড়িৎপৰিবাহক কৰে তোলে। একটা তড়িৎনিৰ্দেশক যন্ত্ৰ তড়িৎযুক্ত কৰা হল, যন্ত্ৰে সোনাৰ পাত্ৰাৰ দুটি ডগা দুৰে চলে গেল, এইবাৰ ওই যন্ত্ৰৰ কাছে ইউৰেনিয়াম এনে বেকাৱেল দেখিলেন যে, পাত্ৰা দুটি ধীৰে ধীৰে যুট্ট আসছে।

ৰেডিয়াম আবিষ্কাৰ

ফ্ৰান্সৰ প্ৰতি বেকাৱেলৰ এই গবেষণাৰ আকৃষ্ট হলেন, আৰ ইউৰেনিয়ামৰ চাড়া। মাত্ৰ কোনো পদাৰ্থৰ পৰা ওই বস্তু তেজ বৈৰছে কি না সে সম্বন্ধে ব্যাভাৱিক সূত্ৰী অস্বস্তান আৱন্ত কৰিলেন।

ইউৰেনিয়াম পাওৱা ব্যক্তি পিচব্ৰেণ্ড নামে এক ধনিৰ পৰাৰ্থৰ পৰা। মাত্ৰম সূত্ৰী বাক্য কৰিলেন যে, পিচব্ৰেণ্ডৰ পৰা ইউৰেনিয়ামৰ বাৰ কৰে নেবাৰ পৰা বাকি থাকে, আত্ম এতদিন বাকি মৰেছে। বলে ফেলে সেওহা হুজিল, ইউৰেনিয়ামৰ সৰে তাৰ তেজ অনেক বেশি। এই সময় অধ্যাপক ফ্ৰান্স এই কামৰে বোগ দিলেন। তাৰা ক'লেন যে, পিচব্ৰেণ্ডৰ এনে এক অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদাৰ্থ আছে বা ইউৰেনিয়ামৰ সৰেও বেশি তেজস্কৰ। এই নতুন পদাৰ্থৰ প্ৰথম কৰতে তাৰা নিজেৰে সন্তৰ্ভ শক্তি

নিয়োগিত করলেন। কিন্তু এর ক্ষেত্রে বহু পরিমাণ পিচরেও চাই, তা কেনবার পদমা তাঁদের নেই। অস্ট্রিয়া গভর্নেন্টে লগাপরবল হয়ে বোহিমিয়ার এক পনি থেকে তোলা এক টন পিচরেও কুরীসম্পত্তিকে পাঠিয়ে দিলেন। এখন তাঁরা এক কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত হইলেন, কি করে ওই শত্রু পদার্থ থেকে তাঁদের কল্পিত ওই নতুন পদার্থটিকে বের করা যেতে পারে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে লাগল। প্রথম তাঁরা এক নতুন পদার্থ পেলেন যা ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি তেজস্বর। ম্যাডাম কুরীর জন্মভূমি হল পোলাণ্ড। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ওই পদার্থের নাম দিলেন পোলোনিয়াম।

কিন্তু পোলোনিয়াম বের করে দেবার পরও দেখা গেল যে, আগের তেজ প্রায় সমানই রইল। তাহলে নিচয় পোলোনিয়াম ছাড়া অন্য তেজস্বর পদার্থ ওর মধ্যে আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কয়েক বছর ধরে সমান ভাবে পরীক্ষাগারে কাজ চলতে লাগল, অদমা উৎসাহে কুরীসম্পত্তি তাঁদের সাধনায় মগ্ন হইলেন। শেষে 1902 সালে তাঁরা রেডিয়ম বার করলেন, বিস্তৃত অবস্থায় নয়, রেডিয়ম ক্লোরাইড রূপে। দেখা গেল, এই বস্তু সমপরিমাণ ইউরেনিয়ামের প্রায় লক্ষগুণ বেশি তেজস্বর। বেশব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে রেডিয়ম মিলল তা কি স্বকম শ্রমসাধ্য আর সমরসাধনিক তা এই কথা থেকে বোকা ধাবে যে কুরীরা ব্যাংকো বছর পরিশ্রমের পর একটন পিচরেও থেকে এক গ্রামের অটোভাগের একভাগ মাত্র রেডিয়ম ক্লোরাইড পেলেন, তাও অবিভক্ত অবস্থায়। কিন্তু বা পাওয়া গেল তা যে এক নতুন পদার্থ সে সন্দেহ আর কোনো। সম্ভব হইল না, বর্ণালিতে এক নতুন রেখা দেখা দিল। পিচরেও থেকে রেডিয়ম পাওয়া গেল এটা ঠিক, কিন্তু পিচরেও রেডিয়মের পরিমাণ কতটুকু সে সন্দেহ নে. রে. টনলন এক হিসেব দিলেছেন। তিনি দেখালেন যে, বানিকটী সমুদ্রের মলে বসতী সোনা আছে, সমপরিমাণ পিচরেও রেডিয়মের পরিমাণ তার চেয়েও কম।

1903 সালে ম্যাডাম কুরী এক বক্তৃতায় তাঁদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। পৃথিবীময় একটা লাড়া পড়ে গেল। কয়েক মাস পরে সে সন্দেহ বক্তৃতা করতে তাঁরা লগনে নিযুক্ত হইলেন, স্ট্রেটস্টিটের সমস্ত বিজ্ঞানী এই রেডিয়ম দেখতে, তার শুদাবলী জানতে সমবেত হলেন। অধ্যাপক কুরী পরীক্ষায় দেখালেন যে, রেডিয়ম থেকে তাপ স্বতই বেরচ্ছে; দেখালেন যে, কাছে যদি দ্রিষ্ট লসকাইডের গুড়ো ধরা যায় তবে তা সব সময় ক্রিমিক করতে থাকে। এই বছরের শেষে বেকারেলের সঙ্গে কুরীসম্পত্তিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। এই প্রথম একজন মহিলা নোবেল পুরস্কার পেলেন। করাসি বেশ দ্রুত নতুন পদের সৃষ্টি করে কুরীসম্পত্তিকে বসালেন। জীবনে এই প্রথম তাঁরা স্বে স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করতে লাগলেন। কিন্তু এ স্থ শান্তি বেশি দিন টিকল না। কুরীসম্পত্তি ধন তাঁদের প্যাতিয় ঈর্ষহানে তখন একদিন রাতার চলবার সময় অধ্যাপক কুরী একখানা গাড়ি চাপা পড়লেন, দুর্ভাগ্যে তাঁর স্ত্রী বঁটল। শুধু কুরীর আবাসে নয়, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে শোকের একটা ঘনছায়া পড়ল।

বিষবিভাগের শিরি কুরীর স্থলে ম্যাডাম কুরীকে অধ্যাপিকা নিযুক্ত করলেন। ম্যাডাম কুরী এখন একলা তাঁর গবেষণায় নিযুক্তা হইলেন। শেষে 1911 সালে তিনি বিস্তৃত পোলোনিয়াম ও রেডিয়ম বার করলেন। এই কাজের ক্ষেত্রে আবার তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, এবার রসায়ন বিভাগ থেকে। এর আগে বা এর পরে কোনো পুরুষ বা নারী জ্বায় নোবেল পুরস্কার পান নি।

রেডিয়মের প্রকৃতি

নানা পরীক্ষা থেকে জানা গেল যে রেডিয়ম থেকে আপনা-আপনি যে রশ্মি বেরয় তা এক রকমের নয়, তা তিন প্রকার বিভিন্ন রশ্মির মিশ্রণ। দেখা গেল, আল্ফা-রশ্মি হল ইলেক্ট্রন-বহিত হিলিয়ম অ্যাটম, পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। বিটা-রশ্মি হুবহু একটি ইলেক্ট্রন, আর গামা-রশ্মি হল ঈশ্বর-ভরম—তরঙ্গ-সৈন্য। এক্স-রশ্মির তরঙ্গ-সৈন্যের চেয়েও ছোট। রশ্মি বলতে যদি ঈশ্বর-ভরম বোঝায় তবে প্রকৃত পক্ষে এই গামা-রশ্মিকে রশ্মি বলা যায়, আল্ফা-রশ্মি বিটা-রশ্মি তো পদার্থ-কণিকা। তবে শেষ অবধি আমরা কেনেছি পদার্থই বা কি আর ভরমই বা কি, সবই এক।

আল্ফা-রশ্মি বেরছে সেকেন্ডে প্রায় নশ হাজার মাইল বেগে; বিটা-রশ্মির বেগ আরও প্রচণ্ড, সেকেন্ডে প্রায় এক লক্ষ নতর হাজার মাইল অবধি হয়। কিন্তু পদার্থকে ভেদ করে যাবার শক্তি গামা-রশ্মির সব চেয়ে বেশি। এদের সকলেরই ফটোগ্রাফি কাচের উপর ক্রিয়া আছে, এরা নিকটবর্তী একটা তড়িৎযুক্ত পদার্থকে তড়িৎশূন্য করে ফেলে। একটা জিহ্ব সলকাইড পর্দার সাথেনে যদি এক কণা রেডিয়ম পড়ে যায় আর পর্দাটা যদি একখানা লেন্স দিয়ে কোকল করা যায় তবে দেখা যাবে সেখানে যেন অসংখ্য ফুলকুরি কাটছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এই ভেজক্রিয় রেডিয়ম থেকে এক গ্যাস বেরয় বা আবার তেজক্রিয়। অ্যাটমের বিনাশ নেই তার কোনো পরিবর্তন নেই, রেডিয়ম-অ্যাটমের বেলায় সে কথা তো আর বলা চলল না, কারণ রেডিয়ম-অ্যাটম আপনা আপনি ভেঙে অল্প এক অ্যাটমে পরিবর্তিত হচ্ছে, তারও আবার অল্প অ্যাটমে পরিবর্তন হল, এই রকম কয়েক ধাপ চলল। শেষ অবধি ঝড়াল শিনাতে, এখানে ভেজক্রিয়তার অবসান।

আগে বলা হয়েছিল যে, রেডিয়ম থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিকিরণ বেরছে, এর আর কমতি নেই। কথাটা কিন্তু একেবারে ঠিক নয়। হিসেবে দেখা গেল প্রায় ১৭০০ বছরে এর শক্তি অর্ধেক পাড়াবে। এখন কথা উঠল, পৃথিবীর সৃষ্টি তো অনেক কোটি বছর আগে হয়েছে, তা হলে এতদিনে তো পৃথিবীর সমস্ত রেডিয়মের শেষ হবার কথা। অবশ্য এ হতে পারে যে রেডিয়ম স্বয়ং নয়, আর কোনো তেজক্রিয় পদার্থ থেকে এর উৎপত্তি হচ্ছে আর তার পরিবর্তনের হার আরও মধুর। সেই রকমই দেখা গেল। দেখা গেল যে যে-বস্তু পদার্থে ইউরেনিয়ম আছে সেইখানেই রেডিয়ম আছে, আর দুইএর অল্পপাত একেবারেই ঠিক। আরও দেখা গেল ইউরেনিয়মের ভ্রবণ থেকে রেডিয়ম সম্পূর্ণরূপে বের করে নেবার পরও তাতে রেডিয়ম জন্মচ্ছে। সুতরাং রেডিয়ম হল ইউরেনিয়মের বংশধর, ঠিক ছেলে নয়, কয়েক পুরুষ নীচে। ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম হল দুই মূল ভেজক্রিয় মৌলিক পদার্থ, প্রত্যেকেই অনেক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গিয়ে শিনাতে পৌঁছচ্ছে। এদের মধ্যের কারণ আধা-বহল কয়েক কোটি, আবার কারণ জীবন এক সেকেন্ডেরও কম।

রেডিয়ম থেকে নিরন্তরই শক্তি বেরছে। শক্তির এই রেডিয়ম কোথা থেকে তার শক্তি পাচ্ছে। বাইরে থেকে নিশ্চয় নয়। কারণ দেখা গেল ওই রেডিয়মকে রাখলে বা অঙ্কুর ঘরে রাখ, বাস্তু হানে নিরে মাণ্ড বা তার উপর অত্যধিক চাপ দাও, খুব গরম কর বা অত্যধিক ঠাণ্ডা কর, বিদ্যুৎ অবস্থায় রাখ বা আর-কিছুই সঙ্গে হাস্যারনিক মিলন ঘটানো, একই হারে এর থেকে তেজ বেরছে। কিন্তু বাইরে থেকে যদি তেজ না পায় তবে কোথা থেকে এর তেজ আসছে?

এক কথা রেডিয়াম নেওয়া হল। এর মধ্যে তো লক্ষ লক্ষ অ্যাটম রয়েছে। কয়েকটি অ্যাটম ফাটল, ফাটার কলে থানিকটা তেজ বেরিয়ে পড়ল। ঠিক কোন্ কোন্ অ্যাটম কখন ফাটবে কেউ বলতে পারে না, তবে গড়ে এক রকম হায়ে ফাটবে। ঠিক যেমন একটা শহরে এক বছর কত লোক মরবে আগের হিসেব থেকে অনেকটা বলা যায়, কিন্তু সে বছর রায় মরবে কি বড় মরবে ঠিক বলা যায় না। ইউরেনিয়ামের অ্যাটম রেডিয়ামের অ্যাটম নির্দিষ্ট হায়ে ফাটে, সোহায় অ্যাটম সোনার অ্যাটম ফাটে না। যে তেজস্ক্রিয় সে বসাবরই তেজস্ক্রিয়, আর যে নিষ্ক্রিয় সে চিরদিনই নিষ্ক্রিয়। কিন্তু শেষের কথাটা এখন আর বলা চলছে না, কারণ দেখা যাচ্ছে নিষ্ক্রিয়কে বাইরের আঘাতে তেজস্ক্রিয় করা যাবে, চাব্বকের চোটে গাখা ঘোড়া বনে যাচ্ছে, তবে অবশ্য অল্প সময়ের জন্যে। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন পিরি কুরী ও ম্যাডাম কুরী, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করলেন তাঁদের জামাতা ও কন্যা। 1911 সালে ম্যাডাম কুরী যখন সুইডেনে নোবেল পুরস্কার নিতে বান তখন তাঁর স্বাস্থ্য জেঙে গিয়েছে, সঙ্গে তাঁর কন্যা ইরিন। যে সভায় ওই পুরস্কার দেওয়া হল বালিকা সেই সভায় উপস্থিত ছিল। চক্কিশ বছর শরে ওই বালিকা ওইখানে আবার উপস্থিত হয়ে এবার নিজে পুরস্কার নিল, সঙ্গে তাঁর স্বামীও পুরস্কার পেলেন। স্বামী ও স্ত্রী, তাঁদের কন্যা ও জামাতা চারজনের নোবেল পুরস্কার পাওয়া নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ব্যাপার।

২

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

পদার্থের উপাদান

আগেই ইলেক্ট্রন বেরিয়েছিল। এ বেগেটিড তড়িৎবৃত্ত আর এর ভর একটি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ভরের প্রায় 1850 ভাগের এক ভাগ। জানা গেল এই ইলেক্ট্রন প্রতি অ্যাটমেরই উপাদান, অথচ গোটা অ্যাটমটি তড়িৎবৃত্ত। এখন এর ছড়িয়ার পজিটিভ অংশের খোঁজ চলল। প্রচণ্ড বেগের মুহু আল্ফা-কণিকা পাঠিয়ে রাদারফোর্ড তার সন্ধান পেলেন, তার নাম দেওয়া হল প্রোটন। এর পজিটিভ তড়িৎ ইলেক্ট্রনের বেগেটিড তড়িৎের সমান, তবে ইলেক্ট্রনের তুলনায় এ অনেক বেশি ভারি। এখন মনে করা হল ইলেক্ট্রন প্রোটন দিয়ে প্রতি অ্যাটম গঠিত।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এ ধারণার পরিবর্তন করতে হল। বেরল নিউট্রন। এও একটা মূল বস্তু, এর ভর একটা প্রোটন বা একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের প্রায় সমান, তবে এ তড়িৎবৃত্ত। এই সমর আর-একটা মূল বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল, সে কীণজীবী, ইলেক্ট্রনের মতোই তার ভর, ইলেক্ট্রনের মতোই সে তড়িৎবৃত্ত, তবে সে তড়িৎ পজিটিভ। এর নাম দেওয়া হল পজিট্রন। মেনন বলে আর-একটা মূল বস্তু ছিল, আর কল্পনা করা হল যে নিউট্রিনো বলে আরও একটা মূল বস্তু আছে, এ তড়িৎবৃত্ত, ইলেক্ট্রনের চেয়েও ছোট, কাজেকাজেই একে কোনো দিন ধরা যাবে না।

কৃত্রিম ভেজক্রিয়তার সৃষ্টি

১৯৩৪ সালে ফ্রেডরিক কুরী-মোলিও ও ইরিন কুরী-মোলিও গণনোনিয়ম থেকে যে আলফা-রশ্মি বেরয় তা দিয়ে রিভিভি অ্যাটমকে আঘাত করতে লাগলেন। এই রশ্মির বিশেষত্ব এই যে এতে বিটা বা গামা রশ্মি বেশান নেই। এই রশ্মি অ্যালুমিনিয়ামকে আঘাত করল, তার লক্ষ্য করলেন যে অ্যালুমিনিয়াম থেকে পজিট্রন বেরতে থাকল। আরও লক্ষ্য করলেন, আলফা-রশ্মি বন্ধ করবার পরও কিছু সময় পর্যন্ত পজিট্রন বেরতে লাগল। পজিট্রনের নির্গমন দীরে দীরে কমে এল, ক্ষণস্থায়ী স্বাভাবিক ভেজক্রিয় পদার্থ থেকে রশ্মি বেরবার হার ঘেঁড়াবে করে। তবে কি অ্যালুমিনিয়াম ভেজক্রিয় হচ্ছে ঝাড়া? কিছু সময়ের জন্যে সেই রকম ঝাড়া বৈকি! পরিবর্তনটা এই রকম হল। ২৭ অ্যাটম-ভার অ্যালুমিনিয়ামের উপর ৭ অ্যাটম-ভারের হিলিয়াম গ্যাস দিল, ৩০ অ্যাটম-ভারের ফসফরাসের এক ছুঁড়ির মতো, আর একটা নিউট্রন বেরল। এই ফসফরাস ভেজক্রিয় হল, তাড়ল, পজিট্রন বেরল, শেষ অবধি ৩০ অ্যাটম-ভারের ফসফরাস ৩০ অ্যাটম-ভারের সিলিকনে পরিবর্তিত হল।

কুরী-মোলিওরা তাঁদের পরীক্ষা আলাচনা করে বললেন যে প্রোটন, নিউট্রন বা ভারি হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক ডক্টরনকে বেগবান করে তাদের ছুঁয়া হিসেবে ব্যবহার করলে কৃত্রিম ভেজক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করা যেতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষাগারে সেইরকম করে বহু ভেজক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হতে থাকল। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। বেগবান ডক্টরন বিশেষভাবে আঘাত করল, রেডিয়ম E পাওয়া গেল। যে ভেজক্রিয় পদার্থ প্রকৃতিতে জন্মছিল বিজ্ঞানী এখন তাকে পরীক্ষাগারে তৈরি করল। পজিশানী সাইক্লোট্রনের সাহায্যে ডক্টরন প্রকৃতিকে বেগবান করা হল। সাইক্লোট্রন থেকে ২০ লক্ষ ভোল্টের ডক্টরন বেরিয়ে এসে সোডিয়ামের উপর পড়ে এক বিশেষরকম কৃত্রিম ভেজক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করল। ২৩ অ্যাটম-ভার সোডিয়ামের উপর ২ অ্যাটম-ভার ডক্টরন পড়ল, ২৪ অ্যাটম-ভারের সোডিয়াম হল, আর প্রোটন বেরিয়ে গেল। এই ২৪ অ্যাটম-ভারের সোডিয়াম থেকে দীরে দীরে ইলেক্ট্রন আর গামা-রশ্মি বেরতে থাকল, স্বাভাবিক ভেজক্রিয় পদার্থ থেকে বিটা-রশ্মি ও গামা-রশ্মি যেমন বেরয়। এই রকম সোডিয়ামের নাম বেগুয়া হল রেডিও-সোডিয়াম। দেখা গেল, এই রেডিও-সোডিয়াম থেকে ইলেক্ট্রন নির্গমনের হার বাড়িয়ে বেগুয়া বায়, সাইক্লোট্রনের শক্তি বাড়াতো পারলেই হল।

এক গ্রাম রেডিয়ম থেকে সেকেন্ডে ৩৪০ লক্ষ ইলেক্ট্রন বেরয়। লবল ছুনকে ভেজক্রিয় করে তার থেকে আরও বেশি হারে ইলেক্ট্রন পেতে থাকলেন। বড় রকমের পার্থক্য রইল এই যে, দেখানে রেডিয়ামের ভেজক্রিয়তা প্রায় হাজার বছরে অর্ধেক ঝাড়াবে কৃত্রিম ভেজক্রিয়তা পনের ঘণ্টা অর্ধেক হয়ে যাবে।

চিকিৎসায় কৃত্রিম ভেজক্রিয় পদার্থ

ভেজক্রিয়তা ঈগণির ঈগণির শেষ হওয়ায় চিকিৎসাক্ষেত্রে কতক কতক রোগে এ বেশি কাজের হল। ক্যান্সার প্রকৃতি রোগে রেডিয়াম খণ্ডত্রি, কিন্তু সেহের ভিতরে ক্যান্সার হলে রেডিয়াম দেওয়া চলে না। সেখানে রেডিয়াম দেওয়া চলে না বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট ভেজের রেডিও-সোডিয়াম দেওয়া যায়।

সেহের ভিতরে গিয়ে ওই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিছু সময়ের জন্যে রস্মি বিকিরণ করবে, তার পর আপন। হতে নিষ্কৃত হয়ে যাবে। এখন নিজস্ব হবে তখন ম্যাগনেসিয়ামে পরিণত হবে, আর ম্যাগনেসিয়াম শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। সেহের মধ্যে যদি রেডিয়াম প্রবেশ করিয়ে নেওয়া হত তবে রোগ সারত, কিন্তু রোগ সারবার পরও রেডিয়াম রস্মি বিকিরণ করতে ছাড়ত না, রোগ শেষের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও শেষ হত।

আজকাল অনেক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে, আর তাদের মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ ফল দিচ্ছে। সেদিন শবরের কাগজে একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। এক মহিলার সারাস্বক রক্তের গ্লগণও রোগ হয়। ডাক্তারেরা বললেন, এ রোগ সাধে না, অল্পত আমাদের বেশে এ সারাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। মৃত্যু অনিবার্য। তখন একজন ডাক্তার শেষ চেষ্টা করলেন, তিনি বিলেত থেকে এরাগ্লেনে টাইকা তৈরি তেজস্ক্রিয় সারোজিন আনালেন আর রোগীকে ওই তেজস্ক্রিয় সারোজিন খাওয়াতে থাকলেন। মহিলাটি সেয়ে উঠলেন। এ রক্তের চিকিৎসা এদেশে নতুন হলেও পাকাতা বেশে খুব চলেছে। এ বেশে চালু করতে হলে এখানেই টাইকা তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি করতে হবে। সে ব্যবস্থা এখানে আজও হয় নি। সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে এই রক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি করতে খরচ পড়ে বেত অনেক, সবই লাগতও চের। আজকাল সেখানে অ্যাটমিক পাইলের সাহায্যে অনেক সস্তায় আর অল্প সময়ের মধ্যে এইসব যিনিস তৈরি হচ্ছে।

একই অ্যাটম নিষ্কৃত হোক বা তেজস্ক্রিয় হোক, তার রাসায়নিক ধর্ম এক। কিন্তু সমুদ্রতীরে বাসিরাশির মধ্যে এক কণা বালিকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, সেহমতো একটি নিষ্কৃত অ্যাটমও তেমনি আপনাকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই অ্যাটম এখন তেজস্ক্রিয় হয় তখন তার উপর যেন একটা ছাপ পড়ে, এই লেবেলযুক্ত অ্যাটম তার খাওয়ার পথ জানান দিয়ে চলে। রেডিও-সোডিয়ামযুক্ত হুন যদি খাওয়া যায় তবে তা বন যিনিসের মধ্যে আঙুলের ডগায় এসে পৌঁছবে আর নিকটবর্তী গাইগার কাউন্টারে ধরা পড়বে।

পা-এ গ্যাংগ্রিন হয়েচে। পা কেটে বাদ দিতে হবে। কিন্তু টিক কোন্‌পানটা থেকে বাম দিতে হবে তা স্থির করা এতদিন কঠিন ছিল, কারণ কতদূর অবধি রক্ত চলাচল করছে তা ধরবার কোনো সঠিক পদ্ধতি জানা ছিল না, আর গ্যাংগ্রিন মূলত রক্ত চলাচলের অভাববৈ ঘটবে। এখন রোগীকে রেডিও-সোডিয়াম বাইয়ে সেওয়া হল, কতদূর পর্যন্ত রক্ত চলাচল হচ্ছে টিক কতদূর পর্যন্ত রক্তবোতের সঙ্গে ওই রেডিও-সোডিয়াম পৌঁছবে, আর পার্শ্ববর্তী গাইগার কাউন্টার তা জানিয়ে দেবে।

আমাদের সেহের মধ্যে প্রতিদুর্ভে কি সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে, কোথায় কত ভাড়াভাড়ি তাওয়ে গচ্চে, ভিটামিন এন্‌জাইম প্রভৃতি কি কাজ করছে, এসব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল। আর এই রক্তের লেবেলযুক্ত অ্যাটম সেহের মধ্যে গিয়ে বা এতদিন শুধু অল্পমানের বিষয় ছিল তাকে সঠিক ভাবে জানিয়ে দিল।

আজ এই সব আবিকারে পদার্থবিজ্ঞা, রসায়নবিজ্ঞা, জীববিজ্ঞা ও চিকিৎসাবিজ্ঞা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা, একই সঙ্গে পুঁঠ হয়ে চলেছে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ এই সব কয়টি বিজ্ঞান আলোচ্য বিষয়ের মূলে আছে অ্যাটম, অ্যাণেকার অ্যাটম ও এখনকার অ্যাটম।



প্রিয়দেবী দেবী
১৮৭১—১৮৭৭

প্রিয়স্বদা দেবীর কবিতা

ঐশ্বর্যমণাথ বন্দ্য

প্রিয়স্বদা দেবীর কবিতাগুলি এমন সহজ স্বচ্ছ, এমন অনাড়ম্বর, বিশ্ববার দেহের মত সেগুলি এমন নিরলংকার যে প্রথম অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে সেন্তুলিক অকিকিংকর মনে হওয়া বিচিত্র নয়। শব্দকালের প্রভাতে ঘাসের মধ্যে মুক্তা ছড়াইয়া থাকিলে অধিকাংশ লোকেই শিশিরব্রহ্মের সেদিকে দৃকপাতে নাক্ত করিবে না বলিয়া আশঙ্কা। প্রিয়স্বদা দেবীর কবিতাগুলির দিকেও এ পংখ্য পাঠক-সাম্প্রদায় কিরিদা তাকায় নাই, নিশিরসকরী ঘাসের মধ্যে মুক্তার রত এই ক্ষুদ্রকায় নিটোল কাব্যকণাগুলি সম্পূর্ণ অনাদৃত গহিয়া গিয়াছে।

শিল্পগত স্বচ্ছ অনাড়ম্বরতার প্রতিবেদক হইতে পারিত, প্রিয়স্বদা দেবীর কবিতার সংখ্যা যদি যথেষ্ট হইত। সংখ্যাগত প্রাচুর্য শিল্পগত লঘুতার পরিপূরক। কিন্তু সেদিকেও আশা করিবার বিশেষ-কিছু নাই; পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুলি নিতান্তই হৃষ্টমেঘ। পাঠক-সাম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার ইহাও একটা হেতু।

ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার আলোচনা উপলক্ষে একজন লেখক বলিয়াছেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যেই আর্নল্ডের স্থান, তবে যে তাঁহার আসল সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয় তাঁর কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহার কবিতার পরিমাণ অপ্রচুর; টেনিসন ব্রাউনিং বা হুইনবার্নের ঘৃণীকৃত কীর্তির পাশে আর্নল্ডের কবিত্তি নিতান্তই অকিকিংকর দেখায়। বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কবিরা মৃত্যু পথ রচনা করিয়া অবতীর্ণ হন; পথটা অপরিস্রুত বলিয়া কবির বিরুদ্ধে পাঠকের মনে প্রথমে একটা প্রতিহ্বলতা থাকে, সেই প্রতিহ্বলতা কাটিয়া রচনার সহিত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অস্বস্তিকতা আগে, প্রাচুর্য সেই ঘনিষ্ঠতার অবকাশ দেয়। কিন্তু রচনার পরিমাণ স্বল্প হইলে ঘনিষ্ঠতার অভাবে কবির সম্বন্ধে পাঠকের হ্রস্বচার করিবার সুযোগ ঘটয়া পড়ে না; অর্থাৎ পাঠকে ধারের সঙ্গে তার চায়, আর্নল্ডের কবিত্তিতে ধার যথেষ্ট, কিন্তু ভাবের অভাব। টেনিসন ব্রাউনিং প্রকৃতি ধারে-ভারে পাঠকের মনে কাটিয়া বসিয়াছেন, ভাবের অভাবে আর্নল্ড পাঠক-হৃদয়ের আগুন প্রাপ্য স্থানটি হইতে বঞ্চিত আছেন।

প্রিয়স্বদা দেবীর কাব্যও ভাবের অভাব। একে তাঁহার শিল্পের মধ্যে এমন-কিছু আছে পাঠকের পক্ষে গাহার ধারণা করা কঠিন, তার উপরে পরিচয়ের লঘুতা, দুই মিলিয়া তাঁহার কবিতার উপেক্ষার আগ্রহ বেশ প্রশস্ত করিয়া গড়িয়াছে।

আরও একটি বিষয়। তাঁহার কবিতা কেবল পরিমাণে সামান্ত নয়, শিল্পে স্বচ্ছ সহজ নয়, আকৃতিতেও অধিকাংশই অভিশয় ক্ষুদ্র। তাঁহার বেশির ভাগ কবিতাই চোদ্দ বা আঠারো ছত্রের বেশি নয়, পাঁচ-দশ ছত্রের কবিতা অল্পই আছে, আট-দশ-চার ছত্রের কবিতার সংখ্যাও প্রচুর। আকারের এই ক্ষুদ্রতাও তাঁহার কবিতার স্বমর্যগাপ্রাপ্তির পক্ষে একটি অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস। আকৃতির সৈমধ্য একরকমের ভার, উহাতে পাঠকের বিশ্বাস সন্মাইয়া দেয়। পাঠকে মনে করে, এত দীর্ঘ স্বল্প নিশ্চয় কিছু

বস্ত্র আছে। নিছক আকৃতির দাবিতেই বুদ্ধসংহার-কাব্য আর পর্বত পাঠকদ্বয়কে টিকিয়া আছে। আকারে ছোট হইলে সংখ্যা দ্বারা পূর্যাইয়া লইতে হয়; বৈকল্পিকগুলিও ছোট, কিন্তু সংখ্যার বাহুল্যে ছোটকে আর ছোট মনে হয় না। শিল্পগত স্বচ্ছতা, সংখ্যার অল্পতা এবং আকৃতির দৃষ্টতা তিনই প্রিয়তম। দেবীর কাব্যের স্বমর্যাদাপ্রাপ্তির পক্ষে অস্তিত্ব। সাধারণ পাঠকদ্বয়কে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, বিশেষতঃ পাঠকেও তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন এমন মনে হয় না, তাঁহার কবিতার বস্তু পাঠকের সংখ্যা তাঁহার কবিতার চেয়েও অপ্রচুর। যাহাযে বিচারে যেমনি হোক, বিখ্যাত এক দিকে রূপগতা করিয়া আর-এক দিকে পূর্যাইয়া দেন। প্রিয়তম। দেবী এমন-এক অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন-এক স্থান হইতে তাঁহার কাব্যের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন যে, আর কোনো ব্যক্তির লেখকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ নিম্নের একখানি কাব্যগ্রন্থে নিম্নের কবিতাগুলি প্রিয়তম। দেবীর পাঁচটি কবিতাকে স্থান দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, অল্পত উক্ত কবিতা-কয়টি রবীন্দ্রনাথের রস-বিচারের মাপকাঠিতে শান-মার্কা পাওয়া। এই সাক্ষ্যের সাধারণ পাঠকের অধিকারিত অভাব পূরণ করিয়া দেয়। প্রিয়তম। দেবীর কোন্ডের কারণ থাকা উচিত নয়।

পূর্বোক্ত ইতিহাসটুকু সবিত্তারে বর্ণনা করা বাইতে পারে—

“কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলাম। শ’ড়ে বিশেষ তুলি বোণ হল। মনে হল ভালোই লিখেছি। ১০ পড়ে দেখলাম—

তোমারে কুলিতে ঘোর হল না যে মতি

এ অগতে কারো তাহে নাই কোনো কতি।

আমি তাহে লীন নহি, তুমি নহ কণী,

সেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিম্নের লেখা ছেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভাবে উঠেছে। পেটুক-চিত্র পাঠকের পেট ভরাবার ক্ষেত্রে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্বত ব্যক্তির তোলা যেতে পারত, এমন কি, একে বড় আকারে লেখাই এর চেয়ে হস্ত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিম্নের অল্প কবিত্বের প্রণয়নই করলেন।

“তার পর আর-একটি কবিতা—

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে

জিলে জিলে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে

কিছুই নাহি যে হায় এ কূলের কাছে

ক-কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম শাশ্বত। জন্মের ভিত্তিকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাছাকার করে উঠেছে, এ কথাটা এক সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? এর উপরে আর-একটি কথাও বোঝা করবার জো নেই। কীর্ণপট্ট পাঠক এতটুকু ছোট কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না ছেনেও আমি যে নিম্নের লেখনীকে সংকত করে দিলাম এমন নিম্নের মনে মনে বলতে হল হয়।

“তার পর আর-একটি কবিতা—

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
 জ্বলন্ত ধারা-পাতে প্রাবৃত ভূমি ।
 কেন এতটুকু নাম সোহাগের ভবে
 ডাকিলে আমারে তুমি ? পূর্ণ নাম ধরে
 আচ্ছাদিত ডাকিলে দিন, এ হেন সময়
 শব্দে সোহাগ হাসি কৌতুকের নয় ।
 জাগার অন্ধর পৃথী, পথ চিহ্নহীন,
 এল চিরজীবনের পতিত-দিন ।

‘মানসী’ লেখবার আগে, সে আত্মকথার কথা নয়, এই ভাবেরই উ-একটি কবিতা লিখেছিলেন বলে মনে পড়ে । কিন্তু কোন্ অনিবার্য দ্বারা তাই তবু আত্মকথারই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে ।

“আর-একটি ছোট কবিতা—

প্রভু তুমি দিয়েছ বে-ভার
 যদি তাহা রাখা হতে
 এই জীবনের পথে
 নামাইয়া রাখি বার বার—
 তেনো তা বিদ্রোহ নয়,
 কীণ প্রাণ এ ধন্য,
 বলহীন পরান আমার ।

লেখাটি একবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেধনা বের বৃষ্টিভাঙা জুঁইফুলটির মত দ্রুত উঠেছে ।

“আমি বিশেষ সৃষ্টি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা-করাট আত্মনিবেশের পাতের উপরে স্বচ্ছন্দে নকল করে নিলাম । যথাসময়ে অস্বাভাবিক কবিতাকার সঙ্গে এ-করাটও আমার ‘লেখন’ নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল ।”

ইহার পরে পাঠক-সাধারণ যদি জয়শ্রী না জানায় তবে কি বিশেষ ক্ষতি আছে ? এমন অস্বাভাবিক প্রশংসা কর জন কবির ভাগ্যে ছুটিয়াছে ?

আগেই বলিয়াছি যে প্রিয়ম্বদা দেবীর অধিকাংশ কবিতা আকারে ক্ষুদ্র । শুধু তাই নয়, কবিতাগুলির মধ্যে এমন-একটি সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা আছে যাহা লিখিত কবিতার চেয়ে এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার স্বভাবসংগত । লিখিত কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের ক্ষমতা একটুখানি বিশ্বাসের আবরণ, এপিগ্রামের ঠিক তাহার বিপরীত । এপিগ্রামের সহজ, সংঘত করিনতা সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি সহজ নয় । ‘শেট্টক চিত্ত পাঠকের শেট’ তাহাতে ভবে না, আর এপিগ্রামের নিরাভরণ সৌন্দর্য ঐকান্তিক সহজেই প্রাকৃতিক অনের মৃদুস্রী আকর্ষণ করিতে অক্ষম । এও একটা কারণ যেসকল প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্য অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে । এপিগ্রাম-ধর্মী কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

তোমারে ফিরায়ে যদি-যেন আরবার
 মেঘভারে দিতে পারি সর্বস্ব আমার,

তুমি যে সর্বস্ব মোর তাই বড় ভয়
শপথ রাখিতে শক্তি হৃদ কি না হয় ।

আর-একটি—

দুর্বল, বুঝিছি তোমার হৃদয়ের কথা,
দুর্লভ হারিয়ে গেছে তাই শুধু বাধা ?
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়
তাই তোমার এত ভয়, এত হার হার !

আরও একটি—

উভয়ে সমান মম স্বপ্ন-দুঃখ আর
তুমি মোর দুঃখ, তুমি স্বপ্ন সে আমার,
তুমি চির-বরণীয়, তাই এ অস্থিরে
স্বপ্ন-দুঃখে বরিচাছি তুল্য সমাদরে ।

আবার একটি—

স্বপ্ন শুধু এতটুকু অংশ জীবনের,
প্রিয়জন সর্বস্ব তাহার ;
স্বপ্ন গেলে এ জীবনে তবু দিন কাটে
প্রিয় গেলে প্রাণে বাঁচা ডার ।

এখন আরও অনেক উদ্ধার করা যাইতে পারে ।

লিরিকের উদ্ভব হুদয়ে, স্বপ্ন-দুঃখের বেদনায় ; এপিগ্রামের উদ্ভব নজ্জিকে, ভালো-মন্দে
বিচারে ; হুদয়ের সজ্জিত বেদনা ছাড়া পাইয়া লিরিকে বিভাসিত হইয়া যায় ; ভালো-মন্দের বিচার
সংহত হইয়া এপিগ্রামে দানা বাধিয়া গঠে : লিরিক নৌহারিক, এপিগ্রাম নক্ষত্র । একই কারণ সাগর হইতে
দুয়ের নৃতি হইলেও কার্ণত দুই ভিন্ন । দুয়ের কার্ণ ও ধর্ম স্বতন্ত্র । প্রিয়তমা দেবীর অনেক কবিতার
একটি ক্রটি এই যে, লিরিক-ভাব এপিগ্রাম আকারে প্রকাশিত হইয়াছে । বেদনাতে শিল্পের সাধন
চড়াইয়া কাটিয়া-ছুটিয়া ছাঁটিয়া-ছুটিয়া একেবারে তাহার স্বন্দতম রূপে লইয়া গিয়া তবে তিনি প্রকাশ
করিয়াছেন । লিরিক-বেদনার গন্ধে এটি ক্রটি বলিয়া মনে করি ; বেদনার সঙ্গে বেদনার ভাব অত্যাবত্ক,
সেই অত্যাবত্কটুকুও সর্বত্র সজ্জিত হয় নাই, তাহাতে ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস । এই
একটি দ্বার ক্রটিই তাঁহার কাব্যে আমার চোখে পড়িয়াছে, বাকি সবই প্রশংসার ।

২

প্রিয়তমা দেবীর কাব্যের সত্যই তাঁহার জীবন ঘটনাবলি, বাস্তবায়িত এবং একটি চরম বেদনার
মধ্যে সংহত । ক্ষেত্রান্তর হইতে তাঁহার জীবন-কথা উদ্ধার করিয়া দিলাম—

“ইনি প্রথমদরী দেবীর একমাত্র সন্তান । ১৮৭১ সালে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার
জন্ম হয় । ১৮৮২ সালে প্রিয়তমা বেপুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এই

বৎসরেই মধ্যপ্রদেশের ষাৰহায়াজীৱ তাবাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর বাইতে না বাইতেই তাঁহার বৈদবা (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৫) মৃতে।

“শৈশবাবধি বাংলা সাহিত্যে প্রিয়দ্বন্দ্বার অল্পরাগ ছিল। ১২২২ সালের আদিনি সংখ্যা ‘বান্দা-বোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘মূল’ নামে একটি ক্ষুদ্র সম্বর্ভই তাঁহার মূল্যিত প্রথম রচনা। পর বৎসর ‘ভারতী ও বাঙ্গাল’ (কার্তিক ১২২০) তাঁহার একটি ‘গান’ ‘বালিকার রচনা’ হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১০০৫ সাল হইতে ভারতীতে তাঁহার গল্প পদ্ম বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বকবি হিসাবে প্রিয়দ্বন্দ্বা অত্যন্ত অর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রাথমিক—

- ১ রেণু (কাব্য) : ১২.১২০০। পৃ ৬২
- ২ তারা (শোক কবিতা) : ১৮.১১.১২০৭। পৃ ৩৪
- ৩ পদ্মলেখা (কাব্য) : ১০.১.১২১১। পৃ ১৫৮
- ৪ অংশু (কাব্য) : জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ (১২২৭) পৃ ১২৫
- ৫ চম্পা ও পাটল (কাব্য) : ইং ১২৩২। পৃ ৩৮

“ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ‘অনাথ’ (১৮ ফেব্রুয়ারী ১২১৫), ‘কথা ও উপকথা’ ও ‘পদ্মলাল’ (১২২০) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে, (২২) ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪১)।”†

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রেণু, পদ্মলেখা, অংশু এবং চম্পা ও পাটল কাব্য চতুষ্টয়।

৩

রবীন্দ্রনাথ চম্পা ও পাটল কাব্যের ছোট একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

“প্রিয়দ্বন্দ্বার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলংকারশাস্ত্রে থাকে বলে প্রকাশপূর্ণ। স্বল্প তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং বে নিজের অগোচরেই লুপ্ত নিরে এগেছে। আর, সেই ফুলটি যুগ্মী মালতী আভের, পেলব তার চিকনতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্ভ প্রগাথন, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অব্যক্ত বৃগন্ধের প্রেরণায়। বিম্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়দ্বন্দ্বার স্পর্শগেচেন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে মনের উপরে যেন আলোর বিক্ষুব্ধ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অব্যবহীর্ণ অশ্রুধারার মতো।...”

প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবীর কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ যুগ্মী মালতী ফুলের মত বলিয়াছেন, এই প্রলম্বে মনে পড়িতেছে এত ফুলের ছড়াছড়ি আর কারো কাব্যে এমন সর্বব্যাপী নয়। তবে সে ফুল কেবল যুগ্মী মালতী আভের নয়, তার মধ্যে চম্পা পাটল গোলাপ কুঙ্কড়া কলরামচুড়া কামিনী প্রভৃতি নানা জাতের নানা রঙের ভীর্ণ সৌগন্ধের ও উগ্রবর্ণের ফুলেরও অভাব নাই। উপমা ও উপাদানকে অল্পসংখ্য করিয়া কবির অবচেতন মনোলোকে প্রবেশ করিবার সাহিত্যিক রীতি আছে বটে, তেমন করিতে

† বাংলা-সাহিত্যে বসমহিলায় বান : প্রিয়দ্বন্দ্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারতী পত্রিকা, বৈশাখ-মাঘ ১৩৭৭

পারিলে এই পুশ্পোন্মেষবাহুলা হইতে কোনো গুপ্ত সভা উদ্ধার করা হয় তো একবারে অশক্ত হইত না। কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ফুলের মত এমন সুসুন্দর, এমন স্পর্শকাতর অথচ এমন স্বন্দর আর-কিছু আছে কি না সন্দেহ। একমাত্র ভালোবাসার সাধেই ফুলের ফুলনা চলে। 'দীপশিখা সম কাশে ভীত ভালোবাসা' এ কথা ফুল সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ফুলের ও প্রেমের এই সাধারণ লক্ষ্য করিয়াই কবি যেন পুশ্পমুষ্টিতে নিজের কাব্য ছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার চোখে ফুল-প্রেম; তাঁহার ফুলের কাব্য নানাতরুর প্রেমের কাব্য। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতে কবি বুঝিয়াছেন যে, প্রেম ফুলের মতই স্বন্দর অথচ ক্ষণপ্রাণ; আরও বুঝিয়াছেন যে, ফুল করিয়া গেলেও তাহার গন্ধ বাতাসে থাকিয়া যায়, প্রেমাস্পদ গত হইলেও প্রেমের উত্তর-রাগ 'প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎ সন্ধ্যামেঘে' লাগিয়া থাকে। সেই পুশ্পসৌন্দর্য, প্রেমের শক্তি, প্রেমের বেদনার কাব্যই যে তিনি লিখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের ফুল চিরম, তাহা প্রেমের প্রতীক।

৪

দুঃখ-বেদনা-বিচ্ছেদ সকলের পক্ষেই অসহ, কিন্তু যারা কল্পনাপ্রবণ, অমূল্য দ্বিধার ভীত, তাহাদের পক্ষে না জানি আরও কত অসহ। কিন্তু তাহাদের কতি নিছক ক্ষতি নহ, তাহাদের হৃদয়ের খাতার বামে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অন্য একটা রেখা যায়। দুঃখের অমূল্যত্বকে তাহারা শিল্পে মূর্তি দিয়া থাকে, তখন সেই মূর্তি সকলের অমূল্যবোধের ধর্মান্বিত হইয়া ওঠে। সাধারণ লোক অজ্ঞভাবে দুঃখের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; শিল্পীর কলমে দুঃখের স্বরূপ সুঠা উঠিলে তবেই তাহারা দুঃখকে দেখিতে পায়, শিল্পীর দুঃখের অভিজ্ঞতায় নিজের দুঃখের মৌলিক দেখে। অথ সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। প্রিয়তম! দেবী নিজের দুঃখের অভিজ্ঞতার বিস্তার সাধারণের দুঃখের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন।

যেহু তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বলিয়াই হোক, আর শেকের কারণ অন্তিম নিকটবর্তী বলিয়াই হোক, সবগুলি কবিতা স্বয়ং শিল্পমূর্তি লাভ করে নাই। তবে যেসব উপাদানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা গঠিত, যেহু-কাব্যই সেগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল তন্তুতে তাঁহার শ্রেষ্ঠকবিতাগুলি রচিত, যেহু তাহার ব্যতিক্রম নহ। যেহু বর্ণা বিরহিণী; শরৎ প্রকৃতি সেহুয়ী যাত্রা। আবার দেখি হেমন্তের হিমালী, সেও বিরহিণী। কবির বিচ্ছিন্ন হৃদয় শরৎ শরৎ কুরঙ্গের মত ছুটিয়া গিয়া যে সরোবরতীরে উপনীত হইয়াছে তাহা প্রকৃতির অন্তর সেহু ও শক্তি।

পত্রলেখা-কাব্য পূর্ণ পরিণত, হয়তো এখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্য কিংবা বলা উচিত যে তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা পত্রলেখার অন্তর্ভুক্ত, কেননা, তাঁহার এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যের প্রকৃতিগত কোনো স্বাভাব্য নাই, সবই যেন এক স্বার্থ বিচ্ছেদবেদনার ক্রৌঞ্চীশ্রুতি।

পত্রলেখার আলিয়া শোক স্নোক হইয়া উঠিয়াছে। সার্থক শিল্পমুষ্টির পক্ষে বাস্তব ঘটনা হইতে যে দুঃখের আবক্ষক, যে বিবিক্ত ভাব অনিবার্য, পত্রলেখা-কাব্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। প্রকৃতি ও মাহুকের যে যুগল তন্তুর বিষয় আগে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সেই দুনিয় আরও নিখুঁত, দুইকে এক বলিয়া মনে হয়।

আর-এক দিকে দেখি রেণু কাবোয় অশেষাকৃত লিরিক বিকৃতি ঘনতর শিন্দু হইয়া সংহত এপি-গ্রামের
কটি করিতে চলিয়াছে, নীহারিকা নক্ষত্রে পরিণত। কাবোয় এই ক্রমবর্ধমান সংহতি সম্বন্ধে পেশিকা
সচেতন, তাই কৈকিয়তস্বরূপ যেন বলিয়াছেন—

আমার অনন্ত বাধা ছাড়া পেতে চায়
অর্থহীন অর্থভরা অক্ষর ভাষায়।
তবুও ধ্বনি কিছু বলিবারে ঘাই
অজ্ঞপ্তে কোনো কথা সূঁজিয়া না পাই।

আবার—

এক বিশ্ব অস্ত্র যদি কেলি করু আমি
অমনি করার মত আসে ক্ষুণ্ণ নামি
অনন্ত শোকের যোর অবাধ প্রাবন
ভাঙিয়া পৈতের বাঁধ ভাষাইয়া মন।
তাই আছি স্তব্ধ স্তব্ধ পাষাণের মত
প্রবল উৎসের মুখ স্পন্দিতা নিবৃত।

ঊহায মৌন ঋণাত্মক নয়, ঊহায স্বাক্ষরীণতা বেদনার গভীরতা-সূচী; মহাকাশের শুষ্কতা যেমন
শূন্য নয়, নির্জনতা যেমন রিক্ত নয়, এ-ও তেমনি। পরলেখা-কাবো দেখিতে পাই যে, দৃষ্টির পরে
দৃষ্টিতর সহিত পুনরায় মিলন হইবে এইরূপ একটা আশা দেখা দিতেছে এবং সেই আশার সূত্রেই
উপবাদের প্রতিও বিশ্বাস আগিতেছে, কবির কাছে এখানে প্রেম ভগবৎবিশ্বাসের পূর্বসূর।

অন্ত কাব্যখানি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হইলেও 'কবিতাগুলি প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বের রচনা'।
পরলেখা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হইলেও কবিতাগুলি যে আরও আগে রচিত সম্ভবতঃ কল্পা অসুচিত
হইবে না। পরলেখার কবিতাগুলির সঙ্গে অন্ত-কাবোয় শিল্পগত প্রভেদ না দেখিতে পাইলেও
পরিপ্রেক্ষিত-গত পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে। শোকের কারণ বেশ দূরে গিয়া পড়িয়াছে, আগেকার সে
ক্ষতিবোধ নাই, তবে ক্ষতিবিদ আছে, সেই ক্ষতিবিদ মনে একপ্রকার বেদনার স্বতিময় ব্যাকুলতা তাগাইল
তোলে। বোধ করি এইজন্যই অন্তর অনেকগুলি কবিতা নৈর্ব্যক্তিক ও তব-স্বাক্ষরিত। ব্যক্তিগত
বাধা হইতে কবির মন তবে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, বাধাশ্রয়ী মন এখানে তথ্যশ্রয়ী। কিন্তু তববিশ্রাস
বা তবপ্রতিষ্ঠা প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবীর প্রতিভার স্বরূপ নয়, তাই অচিরে নূতন আশ্রয় সন্ধান করিয়া বাহির
করিয়াছে। আগেকার কাব্য প্রকৃতি ও মাছুষের টানা-পোড়নে বোনা, অন্তর অনেক কবিতার একটি
সূত্র প্রেম, আর-একটি সূত্র পৌরাণিক দেবদেবী এবং পৌরাণিক নরনারী। একদা বাখার সাহসনার দ্রুত
বেদন প্রকৃতির কাছে কবি গিয়াছিলেন, এখানে তেমনি গিয়াছেন পৌরাণিক যুগের মহত্ব ও ত্যাগোচ্ছল
চারিত্র্যে; উদ্বেগ অভিভূত, লক্ষ্য ভিন্ন, এই যাত্রা। এই শ্রেণীর কতকগুলি কবিতা পড়িয়া মনে হয় কবি
যেন কতক পরিমাণে নিজের বেদনা ও বিচ্ছেদের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। অপরের
বাখার অপূরণীয় ভীততা নিজের ব্যথাকে কতক পরিমাণে স্থগত করিয়া তুলিয়াছে।

চন্দা ও পাটল প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবীর শেষ কাব্য, দৃষ্টির পরে প্রকাশিত। এ বইখানা ঊহায কবি-

জীবনের উপসংহার। জীবনান্তের বাধা যেন সযে আগির। আবার উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, দিনান্তের সন্ধ্যাকালে যেন সূর্যোদয়েরই সমারোহ, তবু ঠিক এক নয়, ভালো করিয়া নিরিখ করিলেই স্রাস্তির আভাস ধরা পড়ে প্রভাতের সে নবোদয় কই? তৈরবী আর পূরবী দুইই ব্যাকুল করা রাগিনী, কিন্তু সে ব্যাকুলতার মাত যে ভিন্ন।

বাখার উপসংহারে বাখার কুসিকার উপাদানগুলি আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পৌরাণিক ভবন পরিবর্তে প্রকৃতির প্রতি পতীর আশ্র। ও অল্পরোগের তক্ত ফিরিয়া দেখা দিয়াছে; ফুলের বাগানে ফুলই ফোটে।

আরও একটি বিষয় কবির অবসর জীবনান্ত স্বরণ করাইয়া দেয়। চারি দিকের নবনারীর জীবনলীলার প্রতি এমন একটি বিরক্ত আগ্রহ পরিদ্রুত বাহা কেবল বিবাহ-চেতন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

৫

প্রিয়দর্শা দেবীর কবিতা সংখ্যায় অল্প, আকারে ক্ষুদ্র, অলংকারে বীন, ভাষায় বন্ধ এবং ভাবে ও রূপে বিচিত্র নয়। এগুলি এমন সূত্র, এমন বাক্‌সূত্র, এমন অর্থোক্ত—মনে হয় এ যেন কবির স্বপ্নোক্তি; বিচ্ছিন্ন মধ্যাহ্নে পরবে নিদ্রান ঘুঘুর স্থগিত বিলাপের যে স্রাস্ত্র ব্যাকুলতা, তাই যেন এ কবিতাস্ত্রের মর্মে মর্মে অড়িত। এমন রচনার সমাদর হওয়াই কঠিন, বাংলা কাব্যস্ত্রের বর্তমান অবস্থার তো একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবু ব্যথা যদি গভীর হয়, অভিজ্ঞতা যদি দত্য হয়, আর সেসব যদি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করিয়া থাকে, তবে সে স্বপ্নস্ত্রের দার নাই। আধুনিক পাঠক যদি উপেক্ষা করিতে পারে, তবে এ কাব্যও অপেক্ষা করিতে পারিব। আধুনিক আর সবই করিতে পারে, কেবল অপেক্ষা করিতে অক্ষম; আত্মকার যিনের সঙ্গেই দার গাঁটছড়া বঁধা, আত্মকার যিনের সঙ্গেই যে তার সহস্ররূপ অবলম্ব্যবী। শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন চাকরের মতই নূতন বিষয়কে বিশ্বাস করা দুঃখিনের লক্ষণ নয়, প্রিয়দর্শা দেবীর কাব্য মাহুঘের ব্যথার মতই পুরাতন, সেইজন্যই চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি দ্বারা সূচনা করিয়াছিলাম আবার তাঁহার উক্তিই শেষ করি, “বাংলা সাহিত্যে প্রিয়দর্শার কবিতা স্বকীয় আসন দখল করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম”।

বীকৃতি: এই লেখায় মুদ্রিত কবিতাব্যাহার চিত্রের প্রক অল-ইন্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে ও বাউল চিত্রের প্রক
শ্রীকমলনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রক

গ্রন্থপরিচয়

ভারতকথা। চক্রবর্তী বাবাপোপালাচারী। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। দ্বা. আট টাকা।
ভারতসম্বাদে। জগদ্বলাল মেহর। সিগনেট প্রেস। দ্বা. গাড়ে আট টাকা।

‘আমার কুটিরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জলিতেছে— ভগবদ্গীতা।’ শিবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এট
কথা বলে তাঁর ‘সীতাপাঠ’ গ্রন্থে আলোচনা আরম্ভ করেছেন। উপমাটি খুবই অর্থবাহক। গীতা নামে
বিশ্বব্রহ্মের এক তত্ত্বকথা যুগ যুগ ধরে অনিবার্য দীপশিখার মতই আলোক বিস্তার করে ভারতের মনীষী
ও বিজ্ঞানী উদ্ভাসিত করেছে। এই উপমাকে আর-একটু প্রসারিত করে নিয়ে বলা যায়, গীতা নামে
বিনা তৈলে দীপ্যমান এই অক্ষর প্রদীপটি বিনা শিলায় রচিত এক বিরাট মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে,
সে মন্দিরের নাম মহাভারত।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত, ব্যাসদেব বিরচিত, ভারতের ‘পঞ্চম বেদ’ নামে পরিচিত এই মহাভারত-
সংহিতা বস্তুত বিনা শিলায় নির্মিত এক অক্ষরিত্ব মন্দির, যার অভ্যন্তর হতে সহস্র সহস্র স্নোকে
উদ্গীত কাব্য কাহিনী তর ও ইতিহাসের সুখর ভারতের চিত্র যুগ যুগ ধরে মজ্জিত করে রেখেছে।
সুদূরাতীত যে ভারতের কথা মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সে ভারতের বিরাট ইতিহাসের
বাস্তব নিদর্শন আরও কোনো পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানী কোনো প্রাস্তবে, ভূগর্ভে বা উপত্যকায় আবিষ্কার
করতে পারেন নি। সে ইন্দ্রপ্রস্থের কোনো প্রাঙ্গণনিকেতনের একটি ইষ্টকখণ্ড, সে কুরুক্ষেত্রের
কোনো মহাবীরের রথচক্রের একটি ভগ্নাংশ, সে রাজস্বের যজ্ঞস্থলীর কোনো একটি ধূপাধারের এক টুকরা
চিরুণ্ড আর পৰ্ব্বত প্ররতনবিহারী ঐতিহাসিক খুঁজে বের করতে পারেন নি। সেই মহাভারতীয়
ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাম ও পরিচয় নিয়ে বহু স্থান আজও রয়েছে, কিন্তু তুণ নামটুকুই মাত্র,
মহাভারতীয় যুগের কোনো বাস্তব নিদর্শন ও সাক্ষ্য কোথাও নেই।

যাহূ শিলা রত্ন ও কাঁচে নির্মিত সেই মহাভারতীয় সভ্যতার ঐশ্বর্য হারিয়ে গেছে চিরকালের মত।
এমন করে হারিয়েছে যে, সে ইতিহাসকে আর একটা কল্পলোকের আখ্যানিকা বলেই মনে
করতে হয়। কিন্তু সে ইতিহাসের সকল রূপ এক মহাকাব্যের কাহা ধারণ করে আজও যেন সভ্য
ও প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে। মহাভারত নামে এই বিশ্বব্রহ্মের গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে শুধু এই কথাই
মনে হবে, সে ভারত হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যায় নি। ইন্দ্রপ্রস্থ আর হরিদ্রাপুরের প্রাসাদ ধুলি
হয়ে গেছে, কিন্তু তার রূপ উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে মহাভারতের স্নোকে-স্নোকে, সর্গে-সর্গে এবং
অধ্যায়ে-অধ্যায়ে। কালের বিনাশলীলায় যে ঐতিহাসিক রূপের বস্তুময় সাক্ষ্য সকলই লুপ্ত হয়ে গেছে,
তারই ভাবময় রূপটুকু অবিনশ্বর হয়ে আছে ঋষি ষেণায়নের কাব্যিক সৃষ্টির মধ্যে।

পুরাণকার ভারতভূমির ভৌগোলিক পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

উত্তরঃ যং সমুদ্রতঃ হিমাদ্রৈশ্চৈব দক্ষিণম্।

বর্গঃ তদ্বারতঃ নাম ভারতী বহু সত্ততিঃ।

—সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে যে বর্ষ অবস্থিত তারই নাম ভারত, এবং তারই গভ্যনগণ ভারতী নামে পরিচিত। আসমুদ্রহিমাল এই ভূখণ্ডে যে ‘ভারতবর্ষ’ নামে ঐতিহাসিক পরিচয় লাভ করেছে, সেটা রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ফল নয়। অতীতের ভারত কোনো নরপাল ও রাজস্বের প্রতাপে বা প্রভাবে কখনো একটি অথবা রাষ্ট্ররূপে পরিণাম লাভ করে নি। তবুও, নিত্যকাল বিশ্বায়ক হলেও সত্য এই যে, ভারত নামে একটা অথবা দেশস্বার্থে কিছু-গণ্য-ব্রহ্মপুত্র-নর্মদা-গোদাবরী-কাবেরীর গলিলবিশেষে বিভিন্ন উপত্যাকাকূষ্মির প্রতি জনপদবাসীর চিন্তে একটা সংস্কার-রূপে গড়ে উঠেছে। সংস্কার হিসাবে, বা ভাব হিসাবে, কিংবা আইডিয়া হিসাবেই হোক, ভারত নামে দেশস্বার্থে দুগ্ন দুগ্ন ধরে সত্য হয়ে আছে এক বহুস্তরিক ও বহুভাষিক ভূখণ্ডের অধিবাসীর মনে। আর্থচিত্তার অত্যন্ত সূত্র বেন ভারতীয় মনীষাকে সহস্র গৌরব দান করেছে সত্য, কিন্তু ভারতের মানুষকে দেশস্বার্থে তথা দেশস্বার্থে দান করেছে পুরাণ, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দান হল পুরাণ-মহাজারতের। ভারত নামে দেশস্বার্থে বোধ এবং ভারতীয়তা নামে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতি যে মূল আইডিয়া থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেই আইডিয়ার ধারক বাহক এবং স্ফূর্তক মহাভারত নামে পরিচিত গ্রন্থটি। এই মিক দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো মহাগ্রন্থের তুলনা হয় না। কোনো মহাকাব্যে একটা দেশ ও জাতি সৃষ্টি করেছে, তার একমাত্র উদাহরণ হল মহাভারত। বিজ্ঞানীরা বলেন, বাণীর নীহারিকাপুত্র মহাজাগতিক শক্তির সীলায় কঠিন কারা লাভ করে গ্রহে পরিণত হয়েছে। তেমনি, যে ভারত পৌরাণিক কবির ভাবলোকে একটা কল্পনা বা আইডিয়া রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, তাই ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি করে দেশরূপে পরিণাম লাভ করেছে।

মহাভারত বস্তুত ভারত-অন্ধারের ইতিবৃত্ত। স্বকল্পে শুধু রণক্ষেত্রই নয়, বিরাট এক ঘটনা-বিবরণের সঙ্কলন। কোথায় পূর্বপ্রান্তের মণিপুর আর পশ্চিমের ধারকা, উত্তরের গান্ধার আর দক্ষিণের ময়— তবু এই খণ্ডে বিজ্ঞি ও বিকল্প বহুঘটি এবং বহুরাজ্য প্রচণ্ড স্বয়ং-সংঘাত-সময়ের এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একীভূত হয়ে উঠেছে, মহাভারত সেই ঐক্যবিধায়ক ঘটনার কাহিনী। হুমন্ত-শকুন্তলার পুত্রের নাম ভারত এবং এই নৃপতি জন্মের শাসিত দেশেরই নাম ভারত, পৌরাণিক উপাখ্যানে এই কথা বলা হয়েছে। কিম্বদন্তীর সেই ক্ষুদ্র ভারত আসমুদ্র-হিমাল ভারত নামে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভ করেছে মহাভারত-রচয়িতার বর্ণিত জাতীয় সমন্বয়ের কাহিনীতে। এক কথায় বলা যায়, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ হিসাবে মহাভারত হল ভারতের প্রথম জাতীয় সংগঠনের ইতিবৃত্ত।

কিন্তু মহাভারত কি নিছক অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কাহিনীবহুল এক মহাকাব্য? যদি তাই হয়, তবে মহাভারতের এই শুধু ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা সমাধারের সামগ্রীভূত পরিগণিত হত। কিন্তু মহাভারত অতীতের একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের বা জাতিগত সমন্বয় ও সংহতির কাহিনী মাত্র নয়। মহাভারত বহু কাহিনীর, বহু বিভিন্ন বিষয়ের ও ভক্তের বর্ণনার পরিপূর্ণ এক মহাগ্রন্থ। কখনো মনে হয়, মহাভারত ভারতের কথাসাহিত্যের এক সংকলন গ্রন্থ। এক যুগের বা দুই যুগের কথাসাহিত্য নয়। অতীতের বহু সহস্র বৎসর ধরে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কেলকল রূপকথা ও উপকথা মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছিল, জাতি-স্বতন্ত্র

(face memory) বাহক সেইসব কাহিনীও মহাভারতে স্থান লাভ করেছে। তার মধ্যে অল্প অলৌকিকতা, অভিরহন, বল্লীলতা এবং উদ্ভটরসের আভিযাও আছে। সংকলনিতা সকল কাহিনীকে আর্থকটিকত একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। অনেক কাহিনী আছে, যা মূলত আর্থকটিকত সম্পন্ন সমাজের কাহিনী ছিল না। কিন্তু সংকলনিতা সেইসব কাহিনীর নাহক-নাহিকাদের নাম-ধাম-পরিচয়কেও আর্থকটিকত সংস্কারে সম্বোধন করে বস্তুর ভিতর কথাসাহিত্যের এক এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন বিরাট সংকলন এক শতাব্দী ধরে বা কত শতাব্দী ধরে, এক জন সংকলনিতার চেষ্টায় বা বহু সংকলনিতার চেষ্টায় হয়েছে, তা পণ্ডিতের বিচার্য বিষয়। এর মধ্যে বিশ্বদেবর গুপ্ত সেই সংকলনিতার প্রতিভা, যিনি সর্বভারতের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ঐতিহ্যগুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ শত শত অঙ্গীকৃত কাহিনীকে আর্থকটিকত সংস্কারে উপযোগী রূপ ও অঙ্গ-কণ্ঠ দিয়ে বস্তুর নতুন রূপ এবং ক্লাসিক বা সনাতন রূপ দান করলেন। হুতরাং মহাভারত গ্রন্থকে বিরাট ভাষার সংগঠন ও ঐক্যসাধনের একটি পরিকল্পিত উদ্যোগের মত ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। সাহিত্যের ভিত্তিতে একটি ধ্যান: বা দেশের সকল বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও সমাজের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।

জন্মের কাছে মহাভারত হল— ‘ঈশ্বরের ঝাপটের লীলার কাহিনী’। মহাভারতে বর্ণিত মূলকাহিনী অর্থাৎ কুরুপাণ্ডব-দ্বন্দ্বের কাহিনীতে এমন কোনো কোনো ঘটনার সংস্কার পাণ্ডবা দ্বারা, দ্বারা ভাষার সাধারণত প্রবোধ্য বলেই মনে হবে। পাণ্ডবদের অনেক কাজই ধর্মগত হয়েছে বলে মনে করবার হেতু পাণ্ডবা দ্বারা না এবং কৌরবদের অনেক কাজে বহুদেব পরিচয় পাণ্ডবা দ্বারা। কিন্তু ছোট-গাট এই ধরনের ঘটনা বাহু দিলে মোটামুটিভাবে বেগা দ্বারা যে পাণ্ডবেরা সত্যনিষ্ঠ এবং কৌরবেরা দুষ্টের প্রতীক। রাহুদের ইতিহাসে সত্য কথ্য ঐশ্বর্য অধিগতা ও বিনয় বনাম কড়ত্ব দ্বারা দ্বারা ও অক্ষমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত কোন্ পক্ষের জয় হয়, কুরুপাণ্ডব-সংগ্রামে তবুই দ্বারা দ্বারা পাণ্ডবা দ্বারা। এই সংগ্রামে কুরুপাণ্ডব ঐশ্বর্য শক্তিই ধর্মপুত্রের সহায় হয়েছেন। দ্বারা দ্বারা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেই কুরু-ভগবান তবু ঝাপটের লীলা প্রকট করেছেন। সত্যের জয়, মহাভারতের মূল কাহিনীতে প্রতিপন্ন এই তবু যে নিগূঢ় আবেদন সত্য করেছে, তার প্রভাব আজ পর্যন্ত প্রতি সাধারণ ভারতীয়ের মনে প্রায় স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সংস্কার হয়ে উঠেছে। ভারতীয় চরিত্রের মূল প্যাটার্ন এই বিশ্বাসবাদের দ্বারা পণ্ডিত হয়েছে— ঐশ্বর্য জ্ঞাত জয়। ‘কাল্পার’ কথাটির প্রকৃত ভাষার পার্সনিকের দ্বারা বলে থাকেন স্যেট। হল, মনের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী অর্থাৎ ভাবনার বিশেষ প্রকৃতি (attitude of mind)। ভারতীয় ভাবনার বিশেষ প্রকৃতি ও প্রবণতা হল ঐশ্বর্য শক্তির ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা। দ্বারা পরাজয় হয়, সত্যের প্রতিষ্ঠা হবেই; দুর্বলকে ও পীড়িতকে পুরিভাষের ভাষা ঈশ্বরই গ্রহণ করে থাকেন। এই বিশ্বাসবাদের দ্বারা মনের যে প্রবণতা ও প্রকৃতি ভারতের রাহু লাভ করেছে তাই তার কাল্পারের বৈশিষ্ট্য। এই কাল্পার মহাভারতেরই দান।

লক্ষ্য করবার বিষয়, বেদব্যাসের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত নামে মহাকাব্যগ্রন্থ বা পুরাণের সাহিত্যগত উৎকর্ষের ওপরেই মহাভারতের ক্লাসিক গুণ, শক্তি বা ঐশ্বর্য নির্ভর করে নেই। সংস্কৃত নামে রচনা:কার সত্য যে ভাষায় মহাভারত রচিত হয়েছে, সে ভাষা ভারতীয় জনসাধারণের মুণ্ডের

ভাষা নথ এবং অধিকাংশই সে ভাষা জানে না ও বোঝে না। ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের স্থানীয়
মাতৃভাষায় মহাভারতের সকল উপাখ্যানই যেরূপে গড়ে বা পড়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে
প্রসিদ্ধ আছে, তার সাহিত্যগত উৎকর্ষ সংকৃত ভাষায় রচিত মূল মহাভারতের চেয়ে বেশি নয়।
তবুও মহাভারতের কাহিনী ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে প্রায় প্রাণের জিনিষের মত
সহজগ্রাহ্য ও উপভোগ্য হয়ে আছে। এর থেকে এই মত্যা প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গাঙ্গীকারের ক্ষমতা, বক্তৃত
কাহিনীর গুণেই মহাভারত সত্যজন শক্তি লাভ করেছে। সত্যজিটার যুগিষ্ঠির, পৌরুষের অর্জুন,
উদারভারতীয় ভীষ্ম, দ্রোণের কৰ্ণ, দ্রোণের দুর্ভোজন, হিঙ্গার নকুল, বাৎসল্যের গান্ধারী, বিনয়ের বিদুর—
মহাভারতের প্রত্যেক চরিত্রই এক-একটি মানবীয় মহাব কিংবা হীনতার প্রতীক। আরও তো মানুষের
সংসারে এই ধরনের ভাল-বন্ধ্য চরিত্রের অভাব নেই; ভাল-বন্ধ্যের ক্ষমতাও শেষ নেই। আরও সাধারণ
মানুষের মধ্যেই কারও আচরণে যুগিষ্ঠিরের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, কারও মনোভাবের দুর্ভোজনের দৃষ্ট, কারও
আচরণে বিদুরোচিত বিনয়। মহাভারতীয় নরনারীর জীবনে যে স্বপ্নদৃশ্য, হাসি-অশ্রু এবং আশা-
হতাশার বন ও সমুদ্র ছিল, তেমনই আরও আছে। তাই প্রাচীন মহাভারত আরও নতুন।
মহাভারতের অল্প কাহিনীর নাটক-নাটিকার জীবনে যে আবেগের দৃশ্য ও যুক্তির প্রয়োগ কীর্তিত
হয়েছে, তার মধ্যে আত্মিকার মানুষ নিজেই জীবনের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায়। শুভশক্তি এবং
অশুভশক্তির চিরকালের ভিতর দিয়েই মানুষের ইতিহাস পথ করে নিয়ে চলেছে। এই দৃশ্যবাদ আধুনিক
বঙ্গবাসী ঐতিহাসিকেরাও উপলব্ধি করে থাকেন। দৈবী ও আত্মীয় শক্তির সেই দৃশ্যই প্রাণ
মহাভারতে অল্প কাহিনীর দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে শুভ বদ্য অশুভের সংঘর্ষ
থাকে নি, থাকতে পারে না। এই দৃশ্য ইতিহাসের চিরন্তন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তির জীবন, সমাজের
জীবন এবং জাতির জীবনও এক চিরন্তন ক্রমক্ষেত্র— শুভ ও অশুভে নিয়ত সংঘাত চলেছে। এই সংঘাতে
ব্যক্তিক সমাজকে ও জাতিকে শুভশক্তিতে আশ্রিত হয়ে থাকতে হলে যে অটল বিশ্বাসবাদ এবং বলিষ্ঠ
কর্মবোধের প্রেরণা প্রয়োজন, মহাভারত তারই আধার। তাই মহাভারত সাধারণ মানুষের জীবনেও
সকল দৃশ্য ও সাক্ষ্যে পথপ্রদায়ক মর্মান্বিত লাভ করেছে। তাই মহাভারতের বাণী তাই সাধারণের
মর্মলোককে চিরকালের সাধিবে ও সারথী লাভ করেছে। এই দিক দিয়ে বিচার করে মহাভারতের কথাকে
‘অমৃত সন্ধান’ বললে কোনো আলাংকারিক অতিশয়োক্তি করা হয় না।

মহাভারতের মূলকাহিনী ছাড়া আরও শত শত উপাখ্যানে এই গ্রন্থ আত্মীয়, তার মূল্য সহস্র
বৎসরের প্রাচীনতার প্রত্যেকপেও একটুকুও হ্রাস পায় নি। কারণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কগত
দেশ সমগ্র মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সেসব সমগ্রা বিশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন
থেকেও অন্তর্ভুক্ত হয় নি। নরনারীর প্রণয় ও অশ্রুবাণ, দাম্পত্যের বন্ধন, অগত্য, বাৎসল্য, লগা,
স্বার্থ ও বৃহত্তর পরার্থের দৃশ্য, সমাজকল্যাণের ক্ষমতা আত্মবলিদানের আবেগ, গুরুভক্তি, শিষ্যভক্তি,
সামাজিক সংগতি ও সৌভাগ্য বৈদ্য সংস্কারের গুণের মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা
এইসব উপাখ্যানের নাটক-নাটিকার জীবনের সমগ্র ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। মহাব ধর্মাত্ম নল
দময়ন্তী দুঃখ নকুললা চাবন হুও পুলাবা অগত্য লোপাদ্রা বেবদানী— শত শত ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ
সেই কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে এই বিশ শতাব্দীর যে-কোনো মানুষ তাঁর নিজে

স্বীবনেরই সমস্তার রূপ দেখতে পাবেন। এই কারণেই শতক শূন্যের কবিরাজ মহাভারত থেকেই তাঁদের রচনার আধ্যাত্মিক আহরণ করেছেন।

অতি পুরাতন হলেও মহাভারতের মত ক্লাসিক সাহিত্য আধুনিকের মনের পক্ষে কোনো বাধা নয়। মহাভারত 'পঞ্চাঙ্গমী' নয়, কোনো দেশের ক্লাসিকই তা নয়। বরং ইতিহাসের ঘটনা থেকে এই শিকড় পাওয়া যায় যে, চিন্তা ও শিল্পের স্বরূপে রেনেসাঁ বা নবযুগের সন্ধারে আসে ক্লাসিক সাহিত্যের অহুসীলন থেকে। গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চা যুরোপীয় রেনেসাঁসকে প্রাণবান করেছিল, প্রতিফলিত। এই কথা বলে থাকেন। যুরোপের কথা ছেড়ে দিয়ে, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নবযুগের ঘটাব্যের রচনার প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্যের সমস্ত তানের রচিত কাব্য কাব্যসাহিত্য ও রবাকলায় কি পরিমাণ রুচি ও শক্তি দান করেছে। বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমসাময়িক অসংখ্য সাহিত্য-স্রষ্টা থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক সার্থক স্রষ্টা ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্যে অহুপ্রানিত ছিলেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষ আসে আবার নতুন করে ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্য অহুসীলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাভিত্তিক কমিশন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য পশ্চাতি বেসব প্রভাব করেছেন, তার মধ্যে ভারতের 'মহাভারত'ের কথাও বলা হয়েছে।^১

অসুত সমান দ্বার কথা, সেই মহাভারত প্রকৃতবের নির্জীব নিদর্শন নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে মূল প্রসারিত করেছে মহাভারত। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাভিত্তিক কমিশনের আর-একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারা যায়: 'মহাভারতের মত চিরায়ত সাহিত্যের অহুসীলনে 'অতীতে ও বর্তমানের মধ্যে আত্মীয়তার বোধ স্থাপিত হয়'।^২ অতীতের সঙ্গে আত্মীয়তা অহুভব করা শিখিয়ে পড়ার ব্যাপার নয়, ইতিহাসের চিরপ্রবাহমান রূপের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা লাভ করা। মহাভারতীয় অতীত আরও সজীব হবে আছে ভারতীয় মাহুয়ের সংস্কার ও সংস্কৃতিতে। আধুনিক ভারতীয়ের এই সৌভাগ্য যে, তার অতীত তার কাছে পিরামিড মাত্র নয়। ভগিনী নিবেদিতা সাধারণ ভারতীয় কৃষকের চোখে-মুখে একটি বিশেষ প্রকৃতির ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন: কত সহস্র বংশের চরিত্র মুদ্রিত হয়ে রয়েছে ঐ মুখের রূপ ও গঠনে। সাধারণ ভারতীয়ের মনটিও সহস্র বংশের ভাবনার ধাতু দিয়ে গড়া। নিষেক বহুগুণে আগ্রহ বেদনা ও মমতার স্বষ্টি বলে যে উপলব্ধি করতে পারে, সেই তার সত্যিকারের ঐতিহাসিক আত্মপরিত্য লাভ করেছে বলা যায়। এই আত্মপরিত্যের উপলব্ধি দ্বার হয়েছে ভারতীয় চরিত্র ও ব্যক্তির প্রকৃত বনিয়াদ পাথ। সাহিত্যের দিক দিয়ে পুরাণ-মহাভারত ভারতবাসীর জন্য এই বনিয়াদ তৈরি করে রেখেছে।

মহাভারতকে ক্লাসিক সাহিত্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য দেশের ক্লাসিক সাহিত্যের তুলনায় মহাভারত কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। এই মহাভারতই বস্তুত ভারতের সাধারণ লোকসাহিত্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীয় কাহিনীর রসে লালিত। ভারতীয়

^১ 'The epics Ramayana and Mahabharata are rooted in India's culture but are not in any way fettered by it. They deal with problems of ethics and politics and are at the same time great literature. . . . They are not works of past, but through the translations in the several Indian languages are alive and active in the life of India.'

^২ 'Comradeship is established between the past and the present.'

চিত্রকারের কাছে মহাভারত হল রূপের আকাশশশি, ভাস্করের কাছে মূর্তির ভাণ্ডার। গ্রাম-ভারতের কথক ভাট চারুণ ও অভিনেতা, সকল শ্রেণীর শিল্পী মহাভারতীয় কাহিনীকে তার নাটকে সংগঠিত ও ছড়ায়ে প্রাণবান করে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী ও কাহিনীর নায়ক-নায়িকার চরিত্র ও রূপ ভারতীয় ভাস্কর স্থপতি চিত্রকার নট নর্তক ও গীতকারের কাছে তার শিল্পকীর্তির শতক উপাদান, ভাব, রস, ভাবী, কার্যমিতি ও অলংকারের বোণান দিয়েছে। মহাভারত গ্রন্থ প্রতিশব্দ উপমা ও পরিভাষার অভিধান। মহাভারতের শত শত উপাখ্যানে নানা ঘটনার ও প্রসঙ্গে বেশব বেষতাবন্দনা আছে, সেই বন্দনাগুলি কাব্যিকভাষ্য, কল্পনাজ্যে ও ভাষাগত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য, যার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভারতের জ্যোতির্বিৎ মহাভারতীয় নায়ক-নায়িকার নাম দিয়েই তাঁর আবিস্কৃত ও পরিচিত গ্রন্থ-লক্ষ্য-উপগ্রহের নামকরণ করেছেন। আকাশলোকের ঐ কালপুঙ্খ অকল্পিত যোহিণী চন্দ্র বৃষ ও কৃত্তিকা, কতগুলি জ্যোতিষ্কের নাম মাত্র নয়—ওরা সকলেই এক-একটি কাহিনীর, এক-একটি খ্রীতি ভক্তি ও রোমাঞ্চের নায়ক-নায়িকা। গঙ্গা নর্দমা ঘনুনা ও কৃকবেণা—কতগুলি নদীর নাম মাত্র নয়, ওরাও কাহিনী। ভারতের বট অশোক শামলী করবী অশোক ও কর্ণিকার উদ্ভিদ মাত্র নয়, তারাও সবাই এক-একটি কাহিনীর নায়ক এবং নায়িকা। নৈদর্শিক রহস্য ঐ বেক্ষোভির অজ্ঞাতের কাহিনী আছে, সামুদ্র বায়ুবহির অস্তরণে কাহিনী আছে, সপ্তাশ্বোজিত রথে আসীন হর্ষের উদঘাটন থেকে শুরু করে অস্তাচল পর্বত অভিযানের সম্বলশেষ কাহিনী আছে। মহাভারতীয় কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নামই হল ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদী ও হ্রদের নাম। ভারতীয় শিল্পের নাম-পরিচয় মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নামেই নিশ্চয় হয়।

মহাভারত নামে একটি কাব্যকাহিনী ভারতের মানুষ থেকে আরম্ভ করে তার গুল ফুল ও আকাশকেও পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। এ এক বিশ্বের ব্যাপার। ভারতে রামা ছিলেন, রাক্ষসও ছিল, শাসন ও শাস্তির সংহিতাও ছিল। কিন্তু জনসাধারণের মনের রাজ্যে সম্রাট হয়ে ছিল মহাভারত নামে সাহিত্য। সভ্যতার ইতিহাসে একমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা গিয়েছে যে, জাতি এক মহাকাব্যের প্রভাবে শাসিত ও লালিত হয়েছে।

যানী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্ণ'। ভারতের ঐতিহাসিক রূপ তিনি সনত্র স্বপ্নের বিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মানুষের শংসারকে স্বপ্নের করার ক্ষমতা জান ও রূপকল্পের যে মূগ্ধগাভ্রব্যাপী ইতিহাসের ধারা ভারতভূমির ওপরে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সেই ইতিহাসের স্পর্শপূত ভারতের মৃত্তিকা সম্রাসী ভারতীয়েদের কাছেও স্বর্ণ বলে বোধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাস বা মহাভারতীয় রূপের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তিনিই প্রকৃত বেশপ্রবেশী হতে পেরেছেন। বেশের ক্লাসিক সাহিত্য অংশীদারের একটা প্রত্যক্ষ ফল এই যে, বেশপ্রবেশের পূর্ববিকাশ সম্ভবপর হয়। তা না হলে হয় না। এমন নিপুণ ভাবে ভারততত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মনোবী শংকরাচার্যও বলতে পেরেছিলেন—'স্বর্ণ চাই না, বরং স্বরূপী গঙ্গার জলে বীন মকর ও কমঠ হয়ে থাকতে চাই'।

ভারতের ইতিহাসই একটি ভব। সামাজিক দৌলিক রাসনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যসত্যনের তত্ত্ব। এই ভারততত্ত্ব অংশীদারের একটা নতুন প্রকাশ সম্ভবিত দেখা গিয়েছে। ভারতীয় ক্লাসিক বা চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি নতুন করে অন্বেষণের উদ্যোগ স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের মনে কিছু কিছু লক্ষ্য করা

যায়। দ্বিতীয় হিসাবে এই প্রসঙ্গে দুটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে: ঐতিহাসিকগোপালচন্দ্রী রচিত 'ভারতকথা' এবং পণ্ডিত ঞওহরলাল রচিত 'ভারতসন্ধান'।

ঐতিহাসিকগোপালচন্দ্রীর ভারতকথা হল বেদব্যাসকৃত মহাভারতের কাহিনীগুণির অঙ্গনিত তত্ত্ব ও রূপ নতুন করে উপলব্ধির প্রয়াস। এই তত্ত্ব কখনো পুরনো হয় না, এই রূপও জীর্ণ হবার নয়। কবিকল্পিত সেই পৌরাণিক রূপের দ্বীপটি আজ আর নেই, মুসাহরও নেই। কিন্তু ভাগতিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় দ্বীপটির আয়তনের তত্ত্বকে আজও নিশ্চেষ্টাধীন ও অকারণ বলে মনে হয় না। এবং সেই আয়তনের রূপ আজও একটুইও মূল্যহীন হয়েছে বলা যায় না। হোক সে কল্পনায় দ্বীপটি, কিন্তু সে যে ভারতের পৃথিবীর দৈনন্দিন ইতিহাসের ওপরও তার মং প্রভাব সকার করে চলেছে। তাই তো অইতিহাস, অথবা পৌরাণিকের, কিংবা কল্পনিকের স্বষ্টি দ্বীপটি চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। ভারতকথার লেখক মহাভারতের অঙ্গরূপ অনেকগুলি উপাখ্যান এবং মূলকাহিনীরও এক-একটা বিশেষ ঘটনাস্থলিত আখ্যান বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনায় এই বিশেষ ভঙ্গীটিই ভারতকথার প্রধান নতুনত্ব। লেখক কাহিনীগুণিকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যার প্রয়াস করেন নি। শুধিবে বললে কাহিনীর গঠন যে সৌষ্ঠব লাভ করে, ভারতকথায় বর্ণিত মহাভারতীয় গল্পগুলি সেই সৌষ্ঠব লাভ করেছে: সেই কারণেই গল্পের ভাংপর্শও স্পষ্টতর ভাবে পরিচুট হতে পেরেছে। ভারতকথার লেখকের অভিনব সাফল্য এই যে, তাঁর বর্ণিত বিভিন্ন মহাভারতীয় আখ্যায়িকার অঙ্গনিত দৈনিক তত্ত্বগুলি খুবই প্রাণ প্রকাশ লাভ করেছে। কাহিনীর রূপ এবং কাহিনীর শিক্ষা, উভয়েরই সমান সংগতি থাকায় পাঠকের মনে যে অর্থও আবেগন স্বষ্টি করে, তাই হল ক্লাসিক সাহিত্যের বিশেষ প্রকাশ। ঐতিহাসিকগোপালচন্দ্রী মহাভারতীয় কথাসাহিত্যের সেই ক্লাসিক গঠন ও রূপ অটুট রেখেই তার মধ্যে নতুন সারল্য ও প্রাণলতা সকার করতে পেরেছেন।

পণ্ডিত নেহরু তাঁর 'ভারতসন্ধান' গ্রন্থে ভারততত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকত্ব শিক্ষায় রচিত ও বিজ্ঞানে দীক্ষিত একটি মনের কাছে ভারতের ভিতর ও বাহিরের রূপ যেভাবে ধরা দিয়েছে তারই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা। নেহরুর ভারত হল নবভারত, কিন্তু সে ভারত তার বিরাট ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতি দুরাতী ভারতের সমাজ ও সভ্যতার বেটুই বিবরণ এবং নিদর্শন পাওয়া যায়, সিদ্ধান্তের উপত্যকায় যে উপনিবেশের ভয়াবশেষ আজও মুক শাকীর মত পড়ে রয়েছে, হস্তাক্ষর সেই অখ্যায় থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে আলোড়িত বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকাল পর্যন্ত ভারত-সংসারের পতন-অত্যাচার-বন্ধুর ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ের পথে সন্ধানী পরিভ্রমকের মন নিয়ে লেখক তাঁর স্বদেশভূমি ভারতের রূপ ও আকার সন্ধান করেছেন; এক অসাধারণ অহুত্বপ্রবণ অথচ বুদ্ধিবির্ভর শিল্পীমনের সঙ্কীর্ণতা। অতীত ও আধুনিক ভারতের সব-কিছুকেই নেহরু নিঃসংশয়ে এবং নির্বিচারে সত্য বলে গ্রহণ করেন নি। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারত-জীবনের সেই ঐতিহাসিক মহাভারতীয় স্বরূপের আসল পরিচয়টুকুই সাক্ষ্য তিনি লাভ করেছেন, বিমিত্ত হৃদ ও প্রকাশিত হয়েছেন। পণ্ডিত নেহরু সাধক-মূলত কোনো অভিনিগূঢ় মননশীলতা ও উপলব্ধির দাবি করেন না। তিনি আধুনিক ঐতিহাসিকের বিচার ও শিল্পীমূলত আগ্রহ নিয়েই ভারতকে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। ডব্লু 'ভারতসন্ধান'র

পাঠকের পক্ষে দ্রুততঃ কষ্ট হয় না যে, নেহরুর দ্বিতীয়বার উপলব্ধিতে ভারতের যে ঐতিহাসিক রূপ ধরা দিয়েছে, সেটা সাধারণ উপলব্ধিগত ভারতের আন্থিক বস্তু থেকে বেশি ভিন্ন মিলিস নয়। লেখক ভারতের ইতিহাসকে বিশ্ব-ইতিহাসেরই প্রকাশ রূপে উপলব্ধি করেছেন। প্রাচীন ভারতের কবি-কবিও তাঁর বেশভূমিকে খরীদীক্ৰমেই উপাসনা করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরুও ভারতের বহুগুণাঙ্গী ইতিহাসের মধ্যে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার সেই পরিণামপ্রবণ গতি ও অতিবাহিত্যের ধারাটি সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। নেহরু আর পৃথিবীতে তাঁর আন্তর্জাতিকতার স্তর বিখ্যাত। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ধারণায় তাঁর মন পরিপুষ্ট। তিনি নৃতনের প্রতি আগ্রহীণ। অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতের ক্ষুদ্রই তাঁর মনস্তাঃ বেশি, বিষাদ বেশি। সেই নেহরুই বলেন, 'ভারত আমার শোণিতে রয়েছে'। মহানবাবের পুণ্যতীর্থ ভারতের কবিও উপলব্ধি তাঁর স্বদেশের এই মহাভারতীয় রূপ করেছেন— 'আমার শোণিতে রয়েছে ধনীতে ভারি বিচিত্র হু'। এই হু'র বার অন্তর স্পর্শ করেছে তাঁর ভারত-প্রেম বস্তুত বিশ্বমানবের প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে। ভারতের ইতিহাস তার কাছে একটি তত্ত্ব এবং ভারত তার কাছে একটি দেশ বা স্বদেশ মাত্র নয়, ভারত হবে ওঠে একটি 'আইডিয়া'।

জর্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর 'আইডিয়া' নিয়ে সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরুও তাঁর 'আইডিয়া' নিয়ে সন্ধান আরম্ভ করেছেন: ভাব হতে রূপে পৌছবার সন্ধান। কিন্তু দুই চিন্তাশীলের সন্ধানের সাধনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হল, তাই লক্ষ্য করবার বিষয়। হেগেল তাঁর আইডিয়া'র সার্থক ও বাস্তব রূপ বেঁধতে পেলেন জর্মান 'রাষ্ট্র'র মধ্যে, পণ্ডিত নেহরু পেয়েছেন তাঁর বাস্তব 'ভারত'র মধ্যে। দুই সিদ্ধান্তে কত পার্থক্য।

সুবোধ ঘোষ

বাংলায় সংস্কৃতির ইতিহাস। জীবনলাল সেন। পূর্ণাঙ্গা লিমেটেড, পি-১০ গণেশচন্দ্র আভিনিউ, কলিকাতা। দুল্য দুই টাকা।

বাঙালির অনেক গুণ ও যোগ্যতা থাকলেও সে আন্তঃজালা। নিম্নতম সংস্কার ও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার ধ্যান অস্থির একাগ্রতার অভাবে। কাব্য চিন্তাবিজ্ঞা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে পরের অহঙ্করণ ছেড়ে বিবেচনা আত্মতৃপ্তির দিন আগত। লেখক মণিলাল সেনের মতে ঐতিহাসিকদের আবিষ্কারের বহু পূর্বেই বাঙালির প্রতিষ্ঠা দেখা দিয়েছে। শ্রীত-বাস্ত-নৃত্যের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করে তিনি দ্বারাবাহিক প্রমাণদ্বারা বাঙালির আত্মবিকাসের দিক নির্দেশ করেছেন। মাত্র একশ শতাংশ পৃষ্ঠায় তিনি বাঙালির সংস্কৃতিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিচিত্র সামগ্রিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে শুধু বাঙালির নয় সমগ্র ভারতবাসীরও ধন্যবাদ অর্জন করলেন। কারণ এখনও ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস লেখা হয় নি। বহু দেশ ও জাতির পরিচয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হলেও তার অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠা সংস্কৃতির হুবহান একেবারে মধ্যে পড়িছুট হয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে বৈদ্য বৌদ্ধ ও বর্ণাশ্রমী মতবাদের অলোপনীয় ভেদবৈষম্যের মধ্যেও পান্ডবের বন্ধন অক্ষয় ও অচ্ছেদ আছে। ভারতী বিচিত্রপদসম্পদশালিনী মহাভোজ্যতীর্থীক্ৰমে অনাথিকাল

থেকে প্রতিভাত। ভারতীয় আত্মীয় মধ্যে বাঙালি যদি তার নিজস্ব ধ্যান ও মানসপুশ্পাঙ্কলি দিয়ে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদবিক্ষেপ দিয়ে ভারতীয় অর্চনা-পরিচর্যা করে গর্ভ অমৃতভব করে তাতে ভারতীয় গৌরব ও সমৃদ্ধি খর্ব করা হয় না। ভারতীয় মহিমা ও বাঙালির গর্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কিছুমাত্র দার্পকতা নেই। বরং সন্ধান বহন মাথের গৌরবের মধ্যে নিম্নে কৈ সমর্পণ করে, মাত্র তখনই আত্মত্বের বন্ধন হৃদয় হয়। মণিলাল সেন এই পুস্তকের মধ্যে বাংলাদেশ ও বাঙালির ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যবৃদ্ধির সন্ধানগুলিও আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ পাঠক-মাত্রই স্বীকার করবেন, সে চেষ্টা সফল হয়েছে।

গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সরল এবং রচনায় নিপুণতার পরিচয় আছে। গ্রন্থকার বহুশব্দে অল্প গবেষকদের মত সমাধার করে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু মনে হয়, এ বিষয়ে বাহ্যল্যব কারণে তার নিজের মত স্থানে স্থানে কিছু অপরিস্ফুট থেকে গিয়েছে। বক্তব্যের ভঙ্গিতে বুঝা যায়, বিবরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। পৃথকপৃথক তথ্যের প্রতি তার বেদন আশ্রয় দেখা যায় তাতে আশা করা যায় কোনও পরবর্তী সংস্করণে বিশদতর আলোচনা করে লেখক এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে সর্বসম্পূর্ণ করবেন।

কয়েকটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

উত্তরভারতের ধ্রুবপদ গীতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি অনেক তথ্য উন্মোচন করেছেন। এসকলের মধ্যে একটি অল্পমাত্র আনন্দের চোখে পড়ে, যথা— বৈজ্ঞান্যগুপ্ত ও তাঁর শিষ্য গোপাল নায়কের কাহিনী। এই দুই ধ্রুবপদ শিল্পীর কথা ব্রজীয চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাসে স্থান পায় নি। কিন্তু পরম্পরা-গত কিম্বদন্তীর মধ্যে এঁদের বৈদ্য মর্যাদা করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় সাধক বৈজ্ঞান্যগুপ্ত ও পরবর্তী কালের হরিনামস্বামী এবং নায়ক গোপাল ও পরবর্তীকালের বিদ্যা তানসেন, এই দুটি যুগলের মধ্যে কে বড় কে ছোট বাছাই করা শক্ত। গীতশিল্পী হয়েও সাধক বা স্বামীজির মর্যাদা আর কেউ পায় নি; নায়ক অথবা মিথ্যা উপাধিও আর কেউ পায় নি। এ পর্যন্ত সময়ে বৈজ্ঞ, গোপাল, হরিনামস্বামী ও তানসেনের রচিত গীতি ধ্রুবপদসম্মতিতেই গাওয়া হয়। পরন্তু এঁদেরও পর্যন্ত বৈজ্ঞান্যগুপ্ত প্রবর্তিত গুরুশিষ্যপরম্পরা ও গীতসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দাবি করার যোগ্য ধ্রুবপদ গায়ক আছেন। যথুনিবাসী বিখ্যাত ধ্রুবপদ শিল্পী চন্দনচোবেজি ঠিক একই বকমে হরিনামস্বামী (বা হরিনাম ভাণ্ডার বা থেকে ‘ভাণ্ডারবান্’ হীতি নামকরণ হয়েছে) প্রবর্তিত বিশিষ্ট গুরুশিষ্যপরম্পরা ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও মর্যাদা দাবী করতেন। যিনি যে বা নিষৃত আশ্রমে কিংবদন্তি অর্থাত্ ঠাকুরের সম্মুখে ধ্রুবপদ ভজন প্রভৃতি গান করার প্রথা ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। তার মধ্যে রাগ-রাগিণী, রস-ভাব ও বিশিষ্ট তাল দিয়ে রচিত নিবন্ধ গীতই ধ্রুবপদ। তালের বৈশিষ্ট্য এই যে, চার তালের কমে ধ্রুবপদ হয় না; ধামার, স্বরকাক্স, ঝাঁপতালকে কখনও ধ্রুবপদ বলা হয় না। ধ্রুবপদের আসরে এঁদের মর্যাদা করা হয়েছে সুদূর বা পাণ্ডোরাঙ্গের সংগতের কারণে। এসকল অত্যন্ত মূল কথা চোবেজি বিনয়ধর্মি গোস্বামীজির মুখ থেকেই শুনেছি। তাঁরাও এসকল কথা সংস্কৃতির ঐতি বা কিম্বদন্তীরূপেই গালন-শোষণ করে এনেছেন। কিন্তু কিম্বদন্তী হলেই যে তা যুক্তিহীন হবে এমন মনে করা যায় না। বিশেষ এই যে, কিম্বদন্তী-নিরপেক্ষ ইতিহাস আলোচনা করে সংস্কৃতির ইতিহাস চেষ্টা করা পণ্ডিত্য হবে।

তার কারণ অন্তর্গত ও কিম্বদন্তীর মধ্যে একটি শুভ সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এঁদের সঙ্গে তথা-

কবিতা নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রচেষ্টার সে স্বপ্ন সত্য নহে। কিম্বদন্তীর একটি নিম্ন বর্ণিত ইতিহাস আছে, শুধা ও সঙ্গমভট্টাই এই ঐতিহ্যের মূল। জনশ্রুতি 'শোনা-কথা' মাত্র। ইতিহাসরচয়িতা টাকায় এক আনা (পূর্ব বর্ণিত করে ধরে) প্রত্যক্ষনন্দী; এবং তিনি পনের আনা পেনো কথার উপর থামতি অস্থান প্রবেশ করে ইতিহাস লেখায় চেষ্টা করেন। অর্থাৎ মূলে জনশ্রুতি, লোকমুখেই হোক বা লিখিতই হোক, না থাকলে ইতিহাসরচনাই সম্ভব হয় না। শোনা কথার মধ্যে যা কিছু পাণ্ডিত্য, যা কিছু শিষ্ট বা বিশুদ্ধমনের অল্পবোধিত, যা কিছু জ্ঞানী শিক্ত ব্যক্তি গভীরগতিকভাবে বীকার করে অস্থান করেন, তাকেই কিম্বদন্তী বলে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে সঙ্গ্রহ জ্ঞান বা বাতী আধরণ করে সেই ব্যক্তিই কিম্বদন্তী আশ্রয় করে। এককথায়, মায় বিশেষজ্ঞের মূখের কিম্বদন্তীই নির্ভরযোগ্য ও সার্থক; 'শিষ্টা কিম্বদন্তী'। অল্প নিকে তথাকথিত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সর্বদাই পড়াশুল; অধিকন্তর নিরপেক্ষতাই 'bonafides' নষ্ট করে দেয়।

দৃষ্টান্তরূপ আইন-ই-অকবরী গ্রন্থের প্রণেতা আবুলকজল-ই-অল্লাহীর সাংগীতিক প্বেষণা। সাংগীতের বিষয় উত্থাপন করেই তিনি অধ্যায়বিভাগ করেছেন; অধ্যায়বিভাগটি অর্থাৎ নামকরণ হয়েছে 'সংগীত-বন্ধাকর' নামে দ্বিতীয় অধ্যায় পত্নাকীর বিখ্যাত সাংগীত গ্রন্থের পরপর অধ্যায়বিভাগ অস্থান। দ্ব্যাকর ছাড়া অল্প কোনও সাংগীতগ্রন্থে এতদ অধ্যায়বিভাগ নেই, অথচ ঐতিহাসিক মহোদয় শাস্ত্রের নামও করেন নি। তার কারণ এই, তিনি সাংগীত-বন্ধাকর বা অল্প গ্রন্থ পড়েন নি; রাজসভা বা মহিসভার কোনও পণ্ডিতের কথা শুনে সেই শোনা কথার ভিত্তির উপর প্বেষণা করে গিয়েছেন। অধ্যায়দন্ডার সূচনায় তিনি যে প্রকরণ প্রদশ করেছেন তা থেকে প্রমাণ হয়, তার সাংবাদিকতা নিম্নেই 'সংগীতবর্ণন' 'সংগীত-বন্ধাকর' এবং সন্তত: ছিটেকোটী জনশ্রুতি— এই তিনটে মিশিয়ে ঐতিহাসিকের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। একারণে আমি ঐ রাজকীর ঐতিহাসিকের চেষ্টাকে প্বেষণা বলেছি। আইন-ই-অকবরীর বেশকল পাঠক ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মতত্বের বৃহৎদেী, সাংগীত-বন্ধাকর, সাংগীত-বন্ধাকর ও সাংগীতবর্ণন গ্রন্থগুলি পড়েননি তাঁরা সবল মনে জানাব আবুলকজল-ই-অল্লাহীর বন্ধাকর ও বর্ণনাকে ভারতীয় সাংগীতের নিরপেক্ষ ইতিহাসের অংশবিশেষ বলে মনে করতে পারেন। বন্ধত এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নেই।

তারপর আবুলকজল-ই-অল্লাহী যে ভাবে দ্বিতীয় সাংগীত প্রদশে প্রবণদ শীত ও তার ত্রণ বর্ণনা করেছেন, তাকে করে কোনও সাংগীতজ্ঞ পাঠক মনে করতে পারেন, ঐতিহাসিকগ্রন্থের সাংগীতে কৃতকর্ম বা জানী ছিলেন অথবা তিনি অল্প কোনও বিশেষজ্ঞের বা সঙ্গম ব্যক্তির নিকট সাংগীতের তথ্য আহরণ করেছিলেন। বাস্তবত্বের বর্ণনা প্রদশে পাণ্ডিত্যের কথা থাকলেও সঙ্গমের নাম পণ্ড নেই; অথচ তার আগে সাংগীতের প্রবন্ধাধ্যায়ে সাংগীত-বন্ধাকর উল্লিখিত বেদিনী মানদ্বিতী দ্বীপদী তাম্রবদী নামে প্রবন্ধের পূর্বতন জাতিত্ব উল্লেখ করে, এবং নীতি সেনা কবিতা বা চন্দ্র উল্লেখ না করে তথ্যাহরণে উক্ততার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'নট্টা'র হাতে পাণ্ডিত্য দিয়েছেন, অথচ তাদের

৩ ১ আইন-ই-অকবরী; আবুলকজল কর্ণেল এইচ. এল. ক্যান্টন, এনিস্টাটিক সোসাইটি বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত;

দিয়ে গ্রন্থপত্র গান করান নি। দরবারে পাখোয়াজ ব্যবহৃত হত কি না, এবং তাতে 'খাট' চড়ানো হত কি না এবং পাখোয়াজেই বা কিরূপ তাল বাজান হত, সেসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ্য নেই। 'হুজুরি' ও 'চাড়া' নামে পঞ্চচলতি শেশাবীরদের উপর তিনি 'কড়া' (কিরকে ?) নামক প্রচারপীত এবং গ্রন্থপত্র পীতের ভাব দিয়েছেন, কিন্তু সংগতের মন্ত তাদের হাতে পাখোয়াজ বেন নি, নিয়েছেন তাত্কালাক চাড়া নামে বাজ, বাব বর্ণনা নেই! চাড়া স্বীকৃতদের দিয়েও গ্রন্থপত্র গান করিয়েছেন। এবং সংগতের মন্ত দিয়েছেন 'ভঙ্' ও 'ভুবন' (চোল ?)। তিনি মাজ 'খ' এই আখ্যা দিয়ে এমন একটি বালাবহুর বর্ণনা করেছেন বা শাস্ত্রে জনশ্রুতিতে ও কিম্বদন্তীতে অনাদিকাল থেকে 'বীণা' নামে খ্যাত হয়ে এসেছে; অথচ 'বীণা' নামোচ্চারণ করে যে বালাবহুর বর্ণনা করেছেন তাতে দিয়েছেন মাত্র তিনটি তার; এবং 'কিরক' শুধু এই নামটি দিয়ে যে বালাবহুর বর্ণনা করেছেন, তাতে দিয়েছেন মাত্র দুটি তার। বিশ্বাস করে নিতেই হবে, তার সামনে কতকগুলি বালাবহুর ছিল এবং অন্য কোনও ব্যক্তি তাঁকে ঐকল নাম শিখিয়ে দিয়েছিল। সন্দেহে অসম্মান করতে হবে উক্ত রাজপুত্র ঐতিহাসিক মহোদয় শাস্ত্র কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেন নি। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস লিখতে বসে কিম্বদন্তীকে অবহেলা করে রাজকীয় ঐতিহাসিক কতখানি আবিকারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, আবুলফজল-ই-আলানীর লিখিত সংগীত বিবয়ক প্রস্তাবগুলি পাঠ করলেই তা বুঝা যায়।

আলোগ্য গ্রন্থের লেখক যখন বলেন (p. ১৫, প্রস্তাবের ভিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের অনুবাদ) পেপাসার নট-নটীরা পথে পথে ঘুরে যে গান করত সেই জেগীরা বা সেই চংএর গানকেই বঙ্গ প্রকৃতি গায়কবিশেষ ঘষেঘষে সাজিয়ে রাজাবাদশাহের দরবারে গ্রন্থপত্র পীতরূপে প্রচার করেছিল, তখন আমি বুদ্ধি আবুলফজল-ই-আলানী সংগীতবিবরে বখাৰ্খই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক, কারণ তার সম্বন্ধে বহু পূর্বে থেকে ভারতে যে রাগালাপ ও রাগবদ্ধপীতের সাধনা হয়ে এসেছে, নাট্যশাস্ত্র প্রমুখ সংগীতগ্রন্থগুলির মধ্যে নাট্য ও গান্ধার্য বিষয়ে যে ধারাবাহিক স্রোতবাতী প্রচারিত হয়েছে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে ভারতীয় সংগীতের যে সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছে, লালক বৈজু বাগদা, হরিদাস শামী, গোপলনাথক যে ধরনের পীতি গচনা ও গান করে কিম্বদন্তীতে অমর হয়ে আছেন, এবং হীরাবাই ও অন্ন বহু ভক্তিময় পীতযনিক ব্যক্তির মাথিয়ে নিভৃত আশ্রমে বেবাদিসেব পত্নী শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে শাস্ত্র বীণ ও শূদার হলেব পদ রচনা ও গান করে ভারতীয় রাগশিল্পকে প্রকাবাস্তুরে স্বয়ং-শোষণ করে এসেছেন, এসবই জানাব আবুলফজলের নিকট বিরর্থক ও অমূলক কিম্বদন্তী মাজ, অতএব অগ্রাহ্য। তবুও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, সন্দেহ নেই। কারণ পথে ঘাটে নট-নটী বা মূললয়ান চাড়ীদের পতিচয় নিয়েছিলেন, তাদের গানও শুনেছিলেন, এবং তাদের মেরেবা বাদশাহ ও ময়ীসের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে চোলক বাজিয়ে গান করে এবং রাগীমহোদয় থেকে আয়ত্ত করে অন্তঃপুরের চাকরানী পর্যন্ত স্বীগোষ্ঠীচিত্তবিনোদন করে এসকল সাম্প্রতিক সংস্কৃতির সংবাদ রাখতেন নিশ্চয়ই। এ বঙ্গ প্রত্যক্ষ তাত্কালাক অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করার পরে তিনি একটি হুজুরি অনুমান-বাণ দিয়ে বাদশাহের দরবারে তানসেন বাজবাহাদুর প্রমুখ পীতশিল্পীদের প্রচেষ্টা ও নট-নটী চাড়ীদের পীতপ্রচেষ্টাকে বিদ্ধ করে দিলেন। কেন দিলেন? সত্তবত ঐ দুবকমের পীতের মধ্যে তিনি কিছু সাদৃশ্য আবিকার করেছিলেন। সাদৃশ্য আবিকার করা একেবারেই আশ্চর্য নয়। মনোবী অনুন্দ নাহি পীতকাদা ও কোলাহল-কলরবের মধ্যে একটি স্থ

সাদৃশ্য আবিষ্কার করে বলেছিলেন 'music is the least disagreeable noise'! অতঃপর আবুলককর সাহেব অহুমান করলেন, যেমন ব্যাঙটি থেকে ব্যাঙ হয়, সেদিকম নট-নটী-ঢাড়াইয়ের গীত সংস্কৃত হয়ে ক্রমশঃ পরিণত হয়েছে। এককথায় নট-নটী-ঢাড়াইয়ের গীত ও দরবারী গীত একই জাতি, কেবল মাঝাফখার অভাবে নটদের গান কিছু মোটা, বেশোয়ালী ও অসংস্কৃত; এবং মাঝাফখার কারণেই দরবারী গীত চিকন, শব্দে ও গদ্যগাটি। কোন্ অল্পত সংস্কার দিয়ে গীতকে মাঝাফখা করলে দরবারের যোগ্য হয় ও তানসেনের মূখে উঠে, সেই সংস্কার প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে অথবা অকস্মাৎ তানসেন-বাহাদুরের মস্তিষ্কে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং নট-নটীদের মধ্যেই বা ঐ সংস্কারটি—সেখা শেষ নি কেন—এসকল বিষয় অল্পসন্ধান করা নিরপেক্ষ প্রত্যাশমণী ঐতিহাসিকের কতব্য নয়; অতএব এমিকে তাঁর দৃষ্টি যায় নি। অথবা দৃষ্টিগত করলেই সেই পুরানো অমূলক বিশ্বদৃষ্টির নবক উন্মোচন হতে পারে এই ভবে স্বাস্থ্যকর কল্পে তাঁর দৃষ্টি সংকত হবে থাকবেন। তিনি নট-নটীদের সংগীত ও দরবারী মাজিত সংগীত লম্বা একাত্তাই সম্বন্ধী ছিলেন, কারণ তানসেনের গীত বা রচিত একটি শেষে একটি চরণও উচ্চৈঃস্বরে যোগ্য মনে করেন নি। একেই বলে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা।

জনাব আবুলককর-ই-অলমীয়ার পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও (অর্থাৎ ভারত যাবতী হওবার পূর্বে পর্যন্ত) দিল্লী আগ্রা লাহোরের প্রান্তবর্তী বিভিন্ন মধ্যে মূল্যমান সম্প্রদায়ের 'ঢাড়া' ও 'মেজাদি' সারেকী ও ঢোলকের সংগতে বেশোয়ালী গান গেয়ে, পথে ঘুরে অথবা বিরোবাড়িতে বৃহৎ জনসমূহ বায়না নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। বাংলা 'folk-song' তাল্লাশ করেন তাদের জন্য একটি সংবাদ দিলাম। বাবাসীতে এখনও কথঞ্চিৎ নট-নটীরা হিন্দুগৃহস্থের ভিতর ও বাইরে বাড়ীর উঠানে সেই প্রাচীন সারেকী ও ঢোলক কোমরে নিয়ে পাড়িয়ে, বসে, নেচে, গান গেয়ে আসর বসায়। শাকাপাকি ও শাক্যভাবে গত চল্লিশ বছর থেকে এদের মূখে 'পুরবী' 'শাওন' 'ঘাটো' 'মুন' 'গজল' প্রভৃতি বেশোয়ালী গীত শুনে এসেছি এবং আনন্দও পেয়েছি। অজবিক, এবং মাত্র দুচারটি গুটীত সাপেক্ষ, বিশ্বনাথজি, চন্দনচোবে, গোলাইজি, মহিমাবাবু, কুতনাথবাবু, এটালির হরিবাবু, প্রভৃতি বিশিষ্ট গীত-শিল্পীদের মূখে—বৈজ্ঞানিক ও রচিত 'প্রথম বর্ষিকায়, যেমনবর্ষি মহাসেব, জ্ঞানবর্ষি গোবর্ষ, নবীনবর্ষি গঙ্গা' (জয়জয়ন্তী চৌতাল), ও 'বাকে বৈজ্ঞানিকীমালা তাকে বৃগছালা, বাকে মুরলী অথব ভবক তাকে কররে' (কৌশিকীকানাকা চৌতাল), অথবা হরিদাসস্বামীজি রচিত 'চন্দন গোর অক চতুরে আবার লিখে এডো এডো ভোলত পনতই হো আশন মন ভারে' (হরদাসীসারঙ্গ-চৌতাল) অথবা—তানসেন রচিত 'ভাষসো ঘনভান উমত দুবত আকো, মন্স বন্স মুরলীতান গগন ধোর ঘরহাই' (ঐরাবিকার বিরহোন্মাদবিবরক পদ—গৌড় বজার-চৌতাল) ও 'কম দুবতব আয়েরি নয়ন তিহাবে' (ঐরাবিকার বিরহ বর্ণনে শবির উক্তি—বেহাগ-চৌতাল) অথবা—ঐআনন্দ কিশোর রচিত 'নোকো ভো তিহায়ে ভরোপো মেহো অবগহনো হুধ ততো ঘনবে বসগুধ হোত দিটকধ' (ধাফা-চৌতাল) প্রভৃতি ঐশদ গীতরূপ শুনেও প্রবণ ও মন সার্থক করেছে। বেশোয়ালীগান ও এসকল গান শুনে মনে হয়েছে—তেলাপোকার নিজস্ব সৌন্দর্য আছে; পাখিরও নিজস্ব সৌন্দর্য আছে; এবং তেলাপোকা ও পাখির পাখাও আছে। কিন্তু তেলাপোকা পাখি হতে বেবিনি, শুনিওনি। জনাব আবুলককর-ই-অলমীয়ার মতে যদি তাঁর সময়ে অকস্মাৎ ঐরকমের অভ্যাস (mutation) হয়ে থাকে তাহলে খুবই আশ্চর্য বলতে হবে। আমি নিজে

বীরবলের 'কিন্দা' অথবা 'রাজারাম-তানসেন-বারগ্রীব-পেতহস্তী' বিবরণে কিম্বদন্তী বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু ঐরকম অত্যাচ্যুত প্রগতি স্বীকার করতে অসম্ম।

প্রথমত বলা যায়, বৈজ্ঞান্যগরা ও গোপাল নাথক সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনেছি। দেগুলি জনশ্রুতি নয়; ঐরকমপদ্ধতির বিশেষজ্ঞেরাই শুকনিত্ত পবনস্রাব সেগুলি বহন করে এনেছেন। বৈজ্ঞান্যগর সম্প্রদায়ক একজন ঐরকম গায়কের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি পাঠ্যবী দ্বিমু। বৈজ্ঞান্যগর কোনও কোনও পদে 'কহে বৈজ্ঞান্যগরে শুনেছো তানসেন' ইত্যাদি বকবের ভণিতা পাওয়া যায়। এ থেকে সন্দেহ হয়, বৈজ্ঞান্যগর ও তানসেন হযত সমসাময়িক। কিন্তু উক্ত বৃদ্ধ গায়কটি ঐ বকবের ভণিতায় যোর আপত্তি করেন এবং বলেন তাঁদের সম্প্রদায়ে ঐ বকবের পদ পাওয়া হয়না; কারণ ওগুলি জাল বা নকল। এই সম্প্রদায়কে বৈজ্ঞান্যগর প্রসিদ্ধ শিল্প গোপাললাল উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ; প্রতিষ্ঠাতা উক্ত শিল্পে উঠে তিনি শুক বৈজ্ঞান্যক স্বীকার করেছিলেন বলে তাঁর প্রতিভা ও বদ ক্ষীণ হয়েছিল। গোপাল লাল ঐরকম রচনা করেছিলেন এবং ঐরকম গান করতেন।

বৈজ্ঞান্যগর, হরিদাসবাহী, গোপাল—এই তিনজন এখনও কিম্বদন্তীর প্রবাহে ভাসমান আছেন। রাজকীয় ঐতিহাসিকেরা এখনও এঁদের আবিষ্কারের যোগ্য মনে করেন। কিন্তু কিম্বদন্তীর স্রোত ও গতি অনিবার্য এবং ইতিহাসের অগ্রগামী হয়ে চলে। সঙ্গীতরচাকর এঁদের চীকারকর ঐকম্মিনাথ ঐ এঁদের প্রবন্ধ-অধ্যায়ের চীকার অবসরে মনৈক গোপাল নাথকের উল্লেখ করেছেন। রচাকবের প্রকাশক ঐকম্মেন তিলকের স্ফুটনিত্ত মতামুসারে কল্পিনাথ ঙ্গ চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই চীকা রচনা করেছিলেন। সোমনাথ কৃত রাগবিবোধ গ্রন্থ দ্বিতীয় ১৬০২ সালে রচিত হয়। সোমনাথ কল্পিনাথের উল্লেখ করেছেন। হাই হোক, গোপাল নাথক যে একজন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যায় ছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই। ঐকম্মিনাথের সেন স্বরচিত 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামে বাংলাভাষায় এঁদের (সন ১২২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত) আলাউদ্দিন বামনা, আমির খসক ও নাথক গোপাল সম্বন্ধে কৌতুকপ্রদ কিম্বদন্তী বর্ণনা করেছেন। তা থেকে মনে হয় আমীর খসক প্রণীত 'তোকাং-উল-হিম্ব' নামক কোনো গ্রন্থই ঐ উল্লেখের উৎস। অর্থাৎ সেন মহাশয়ের মতে বহু আমির খসকই 'তোকাং-উল-হিম্বের' গ্রন্থেতা। প্রকৃত কিত্তিমোহন সেন লিখিত সাম্প্রতিক গ্রন্থের মতামুসারে বিদ্যা ঙ্গ ইবন কব্বকদ্দিন মঙ্গন নামে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিই তোকাং-উল-হিম্বের গ্রন্থেতা। কিত্তিমোহন সেন মহাশয় এই গ্রন্থ দেখেছেন। অতএব রাধামোহন সেন বোধ হয় কুল করে থাকবেন। শুনেছি, মহারাজ প্রমোদকুমার ঠাকুর এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এখন, এই গোপাল নাথক, অর্থাৎ প্রথম শিল্পী প্রসিদ্ধ গোপাল, উত্তর ভারতীয় অথবা দক্ষিণ ভারতীয় ব্যক্তি, অথবা ঐ একই নামে দুজন লোক আবির্ভূত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ উঠে। কাংৎ প্রকৃত কিত্তিমোহন সেন মহাশয় 'ভারতীয় সঙ্গীতে দ্বিমু মঙ্গনানের বৃত্ত সাধনা' নামে গ্রন্থে গোপালকে দক্ষিণভারতীয় ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এবং 'বাঙালীর গান' রচয়িতা ঐকম্মিনাথ নাথিকী মহাশয়ও গোপালনাথকে দক্ষিণদেশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় নি। রাধামোহন সেন মহাশয় ও কল্পিনাথ গোপালের জন্ম-জাতির উল্লেখ করেননি। অন্তর্দিকে বৈজ্ঞান্যগর সম্প্রদায়ের কিম্বদন্তী অনুসারে ঐরকমসাধক গোপাল উত্তরভারতীয় ব্যক্তি। সাধাবণ গায়ক-বৃন্দের জনকতিতেও গোপাল উত্তরভারতীয় ব্যক্তি। এমনকি আমি শুনেছি গোপাল গৌড়দেশীয় লোক

ছিলেন। আন্ডার ট্রিশ পয়ত্রিশটি ধ্রুপদ গোশালের ভূমিতার গাওড়া হয়েছে। প্রত্যেকটি উত্তরভারতে প্রচলিত হিন্দিভাষায় রচিত। গীতির মধ্যে ঠাঁয়ে কোলিঙ্গ হিওল গীতক নামের ও বেলালা এই ছয়টি বাগ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়; এবং প্রত্যেকের ছয়টি করে ভাষা। এতদুপ সাতমাত্র মন্তব্যও পাওয়া যায়। শিব দুর্গা গোপীনাথ যথুদেব ভবানী প্রভৃতি দেবতাবাদক শব্দ এবং ধাক-ধ্রুপদ, ছন্দ-প্রবন্ধ-চতুঃশ-ত্রিষ্ট-তেলানা-মুদ্রা প্রভৃতি গীতরূপবাদের শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোনও শব্দ পাওয়া যায় না যা একমাত্র দক্ষিণভারতে বিশিষ্ট বাচকরূপে প্রচলিত। কয়েকটি গীতির মধ্যে বৈষ্ণবগোরা নামের উল্লেখ দিয়ে গুরু-বন্দনা পুস্তক ভণ্ডিতাও শুনেছি। এতদুপ ক্ষেত্রে কিংবদন্তী স্বীকার করে ধ্রুপদসাতক গোপাল উত্তর ভারতীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং হরিদাসস্বামীও তানসেনের পূর্ববর্তী ছিলেন এতদুপ অস্থান সংগত মনে করি। এতে করে দক্ষিণ ভারতীয় কোনও গোপালকে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু এই দক্ষিণ ভারতীয় জনৈক গোপালই একমাত্র গোপাল ও ধ্রুপদসাতক, এতদুপ মনে করার সংগত আশংকা আছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাভাষায় লিখিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের কথা এসে পড়ে। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ত্রিহাষাবোহন সেন বিরচিত 'সঙ্গীততত্ত্ব' নামে আত্মোপাত্ত পঞ্চগ্রন্থই সর্বপ্রথম; বহিঃ অধ্যাপক ত্রিহাষাবোহন চক্রবর্তী মহাপ্রবন্ধের নিকট শুনেছি এ থেকেও প্রাচীনতর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এ পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উক্ত সঙ্গীত-তত্ত্ব এবং হৃদয়বিগতি ৮ মহারাজ রাঘবসিংহ বিরচিত ও তত প্রণেতা রাঘব ত্রিহাষাবোহন সিংহ কর্তৃক সন ১২২৭ সালে প্রকাশিত 'রাগমালা' নামে পুস্তিকা— দুইখানি পঞ্চগ্রন্থ। গ্রন্থকার মণিলাল সেন বাংলা ভাষায় রচিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের একটি তালিকা সন্নিবেশিত করে মিলে ভাল হ'ত।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও রাগ-রাগিণী নামের প্রণেতা একটি ব্যাপার লক্ষ্য হয়েছে। পূর্বকাল থেকে গীতিরচনার শিরোনামে রাগ-রাগিণী নাম নির্দেশ করার প্রথা চলে এসেছে এ বিষয়ে লেখক মণিলাল সেন প্রাচীন তথ্য উদ্ধার করেছেন। বাংলাদেশে বৃষ্টিগত উনিশ শতকের গীত-রচনার শিরোনামে প্রায়ই 'সিদ্ধ-ভৈরবী' 'বৈরাগ-বাখা' 'মূলতানি-ধানশী' প্রভৃতি যুগল নামের আধিভাব দেখা যায়। বাংলার বাইরে অন্তত এতদুপ দেখা যায় না। বঙ্গালী গীতি-কাব, গীত-শিল্পী ও সমগ্রনামের কানে যে গীতরূপটি বৈরাগ ও বাখাঘের মিল, অথবা শিল্প ও বরবার মিল বলে লাগে বাংলার বাইরে সেইরূপগুলি এখনও 'বাখা' 'বা' শিল্প নামে চালু আছে দেখা যায়। বাংলার এতদুপ অল্পতর-মুদ্রতার কারণ সম্ভবত এই যে বাঙালি, বিশেষ করে শিক্ষিত শৌখিন শ্রেণীর বাঙালি, বেতন আদায় করে ধ্রুপদ ও রাগবন্ধ গীতের চর্চা করেছে সেখানে ভারতে আর কোথাও হয়নি। সেই বাঙালি যখন শোয়াই হেমচন্দ্র মতহুল-মুলের টাঙ্গা চর্চা করে টপখোয়াল ও খোয়ালের দিকে মন দেয় তখন তার কাণে কিছু কিছু পূর্বাভূত রাগরূপ এবং টাঙ্গা প্রভৃতির মিল রাগরূপ পুঙ্ক বলে দেখা দেয়। বলা উচিত মনে করি, আজকের দিনের যেদকল বাঙালি রাগশিল্পী ও প্রোতা ইতিপূর্বের বিভক্ত অরুণরসী বা কোয়ার ধ্রুপদগত বিশিষ্ট অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত নয়— তাঁদেরই সামনে আধুনিক খোয়ালশিল্পীরা অরুণরসী নামে মেন-গাথা-কাকির বিহুড়ী অথবা বাখাঘের নামে— বাখীজ-ভিলস-বৈরাগ-বাওএর অথবা কোয়ার নামে— কোয়ার-মল্লার-ভাষের মিল বস্ত পতিবেশন করে পদক সংগ্রহ করে সেপে ফিরে যাবেন, তাতে আশ্চর্য কি।

লেখক মণিলাল দেন লোচন পণ্ডিত প্রণীত বাণতরঙ্গিনী গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন, ভারতের মধ্যে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম সংগীত শাস্ত্র প্রচার করেছে এবং লোচন পণ্ডিত নামধের সৌভদ্রেশবাসী ব্যক্তি ভারতে সংগীতশাস্ত্রের সর্বপ্রথম আচার্য। বস্তুবোটা বিচারসহ হলে বড়ই গৌরবের কথা হত। সংগীত বলতে যদি গীত-বাছ নৃত্যের উৎকর্ষ বুঝায়, শাস্ত্র বলতে যদি নৃ-দিক, বিশেষজ্ঞদের সমাপ্ত শাসন-সংসারমূলক গ্রন্থ বুঝায়, এবং আচার্য বলতে সম্ভ্রমায়প্রবর্তক, অথবা সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব ও প্রয়োগের ব্যাখ্যায় তাত্‌কালিক সব চেয়ে জানী ব্যক্তিকে বুঝায়—তা'হলে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম সংগীতশাস্ত্র, কারণ এর মধ্যে গীতবান্য নৃত্যের উৎকর্ষ প্রচারিত হয়েছে, এবং এই নাট্যশাস্ত্রকে উত্তরকালীন সমস্ত সংগীতগ্রন্থ প্রণেতা শাস্ত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতের পরবর্তী সমস্ত সংগীত ব্যাখ্যাতা মহামুনি ভরতকে আচার্য বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে সংগীতশাস্ত্রের আচার্য বলেননি, কারণ শাস্ত্রের আচার্য হয় না, শাস্ত্রের সংগ্রহকর্তা হয়, প্রণেতা হয়, প্রবক্তা হয়, উপদেষ্টা হয়; এবং সম্ভ্রমায়েরই আচার্য হয়। সম্ভ্রমায় নেই আচার্য থাকেন গ্রন্থ হয় না। কোনও একগানি গ্রন্থ গ্রন্থন করে আচার্য নাম লাভ হয় না। এমন কি, শাস্ত্রের বিস্তারিত সংগীত-রচায় গ্রন্থকে শাস্ত্র মনে করেন নি; এবং পরবর্তী কোনও চীকারার শাস্ত্রবৈবেকে আচার্য বলেন নি; যদিও ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের পরে এত বিশদ ও সুন্দর গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এই গ্রন্থে সর্বত্র ৬৬৬ শ্লোক আছে। গীতবান্য নৃত্য বিষয়ে প্রকরণ পরিণামীর তুলনা হয় না। তবুও শাস্ত্রবৈবে কোনও বিশিষ্ট প্রাচীন সম্ভ্রমায়কে অছবর্তন করেন নি এবং নিয়েও কোনও সম্ভ্রমায় প্রবর্তন করেন নি। এ কারণে তাঁকে আচার্য মনে করা যায় না। তবে তাঁর প্রণীত গ্রন্থকে সংগীত অর্থাৎ গীতবান্য নৃত্যের শাস্ত্র বলতে কিছুমাত্র অসংগতি হয় না।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র একটি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বা শিল্পবিজ্ঞান শাস্ত্র। মহামুনি ভরতই এর প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে ভরতের শতপুত্রের নামোচ্চারণ পাওয়া যায়। সেগুলি ভরতের ঐরসপুত্র নয় এবং এককালীন শিল্পশাবকও নয়; কারণ নাট্যশাস্ত্রের প্রকরণের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোনও অধ্যায় বা উপদেশ প্রসঙ্গে, কোনও তত্ত্ব বা প্রয়োগপ্রসঙ্গে বা অন্ত কোনও প্রয়োজনে এদের নাম ব্যবহৃত হয় নি। বস্তুত এগুলি ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের পরম্পরাগ্রন্থত আচার্যদের নাম। প্রাচীন আত্মিকাবাদী সম্ভ্রমায়ের এককালে একজনকে বৈশিষ্ট্যময় আচার্যের স্বীকার নেই। এবং পূর্বপূর্ব আচার্যদের নাম অরণ করা প্রত্যেক উত্তরকালীন আচার্যের অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হত। মহামুনি ভরতচার্যের পর উত্তরোত্তর একশত আচার্য আবির্ভূত হয়েছিল। সম্ভ্রমায় সকলের শেষ আচার্যই নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় ও সংক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক ইতিহাস সফলনের কর্তা। পরে ঐ সম্ভ্রমায় বাৎসরিক ভাবে লুপ্ত হয়ে গেলে আচার্য লোপ হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্র নষ্ট হয়নি; অর্থাৎ গীতবান্য নৃত্যনাট্য প্রভৃতির তত্ত্ব ও প্রয়োগগুলি বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত প্রকীর্ণ হলেও—তাদের ঐকান্তিক লোপ হয়নি। বহুদিন পরে অগ্রহমান হয়—স্ববোধপ্রণীত 'বুদ্ধচরিত' নামক কাব্যের কিছু পূর্বে এবং নিশ্চিত ভাবে রামায়ণ মহাকাব্যের সফলনের পূর্বে নাট্যশাস্ত্রের আধুনিক আকারে সফলন হয়েছিল। এ বিষয়ে বহুদূরী প্রমাণ থাকলেও বাহ্যিক হবে বলে এখানে তার আলোচনা করব না। তবে এইমাত্র বলা যায়—ভারতীয় সম্ভ্রমায়ের লোপপাথন হয়ে গিয়ে কান্তন, দুর্গাশক্তি, নৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আবির্ভূত হয়েছিলেন;

এবং এঁদেরও কিছু পথে মতক 'বৃহৎশৈবী' নামে অভিনব প্রস্তাবনা করেন। বেহুকেই হোক, পুঁথিপুঁথি ভারতীয় সম্ভার ও আচার্যদের লোপ হয়ে গিয়েছিল। একদা হুশে বঙ্গাল সেনের সময়কার 'রাগতরঙ্গিনী' ভারতে সর্বপ্রথম সংস্কৃতপাত্র, এবং তার প্রশ্নেতা লোচন পণ্ডিত ভারতে সংস্কৃত শাস্ত্রের সর্বপ্রথম আচার্য মনে করতে পারিবে। লোচন পণ্ডিত কোনও সম্ভারের প্রবর্তন করেছিলেন কিনা, অথ কোনও পরবর্তী সংস্কৃত বিশারদ বা গ্রন্থকার তাঁকে আচার্য বশে স্বীকার করেছিলেন কিনা, এগুলি বিষয়ে মণিলাল সেন বা কিত্তিমোহন সেন কিছু বলেন নি।

বিশেষ এই যে, স্ত্রাব্য কছে লোচনপণ্ডিত প্রণীত 'রাগতরঙ্গিনী' আছে। শ্রব্দের কিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের বক্তব্য পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। তবে কি দৌড় বেগে হুমান সংস্কৃত লোচন পণ্ডিত দুখানি রাগতরঙ্গিনী লিখে গিয়েছেন? আমার কাছে যে 'রাগতরঙ্গিনী' আছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যথা—গ্রন্থানি দরভাঙ্গা রাজপ্রেস থেকে প্রকাশিত তা: সনৎ ১৯৯১ হসহা। পণ্ডিত বলদেব মিশ্র এর সম্পাদন করেছেন। গ্রন্থরম্ভে "ও নমস্তুভে। অথ রাগতরঙ্গিনী।" এবং শেষে "ইতি শ্রীলোচনশর্মা বিরচিতায়াং রাগতরঙ্গিনীয়াং রাগসংস্থানাদিকথনান পকনপ্তরকঃ। সনাপ্তঃ।" লিখিত আছে। শ্রব্দের কিত্তিমোহন সেন মহাশয় যে পুস্তকোক্তের বিচার করেছেন এই গ্রন্থে সেক্ষ কিছু নেই। শ্রব্দের সম্পাদক বলদেব মিশ্র বৃহৎশৈব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের কথা বলে, পাণ্ডুলিপির ভূপ বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন—গ্রন্থকার লোচন শর্মা বৃষী পনের শতাব্দীর চতুর্ভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাপতি রচিত কয়েকটি পর আছে। তাঁদের মধ্যে একটিকে সিদ্ধাস্বদিন হুগতানের প্রশতি আছে যথা—চিরজিবে জীবন্ত গ্যাগনি হুহতান। তাছাড়া শিব সিং ও লছিয়া দেবীর প্রশতি হৃৎক ভণিতাও আছে। লোচন পণ্ডিতের স্মরিত পদও আছে এবং তার মধ্যে রাজা মহিমানাথের প্রশতি আছে। গ্রন্থে রাগরাগিণীর ধ্যান আছে, কিছু সংস্কৃতে কিছু তাম্রলিঙ্গ মৈথিলী ভাষায়। মণিলাল সেনকে অতুরোধ করি এই লোচনকৃত রাগতরঙ্গিনীর আলোচন করেন। এর মধ্যে বাঘা বা নৃত্যের তত্ত্ব ও তথ্য নেই। পুস্তকের রাগতরঙ্গিনী নাম সার্থক কারণ আগাগোড়াই রাগবিষয়ে তথ্য আছে। গ্রন্থকার লোচন কোনও সম্ভারের প্রবর্তন করেননি, অথবা কোনও সম্ভারবিবরণের বাতী বহন করেননি। পটাস্থিতিক ভাবে আবহমান সংস্কৃতিক কিছু কিছু তব মোকে লিখে গিয়েছেন। 'হুহনন্ত' বক্তের রাগরাগিণীর নাম-ধ্যান বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হুহনন্ত কে বা কখন আবির্ভূত হয়েছিলেন কিছু বলেননি। রাগশ্রেণীকরণ বিষয়ে বাঘাটি সংস্থান মাত্র বর্ণনা করেছেন; জনক-জন্ত মেল চিত্তা করেন নি। এ থেকেও প্রমাণ হয় যে জনক-জন্ত মেলের প্রধান উদ্ভাবক রামানাত্য (খৃষ্টীয় ১৫৫০) থেকে লোচন পূর্ববর্তী। আদি বত্ধর ধবর ধাণি, রামানাত্যই কোনও মূলধান সংস্কৃতজ্ঞর এবং হুগতানের অতুরোধের প্রধানে 'ঠাট' পদ্ধতি (অথবা সংস্কৃতে 'জনক-জন্ত মেল') উদ্ভাবন করেছিলেন; এই 'ঠাট' (দেস্তাবে পর্বা) সাধারণ কায়দা বিশেষ) পদ্ধতি ভারতীয় প্রাচীন রাগশ্রেণীকরণের পক্ষে একেবারেই বিজাতীয়। যাই হক গ্রন্থানি (১৯৯ পৃষ্ঠার) শাস্ত্র নামের যোগ্য নয়। তবে সংস্কৃত মোকে কিছু তথ্য লিখতে পারলেই বহি শাস্ত্র রচনা হয়, এবং কোনও রকমে তাতে গান-বাজনা সংক্রান্ত কথা থাকলেই বহি সংস্কৃত প্রস্তাবনার বর্ণনা দেওয়া হয়—তাহ'লে অবশ্যই এই গ্রন্থ 'সংস্কৃতশাস্ত্র' মনে করতে হবে।

মণিলাল সেন প্রথম রচনা ও গায়ক সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখার কথা বলেছেন। কিন্তু বেতিয়ার রাজা আনন্দকিশোর এবং বাংলার স্বনামধন্য শ্রীহুঁড়টের প্রসঙ্গ করেননি। বৈষ্ণু-হরিনামধারী প্রভৃতির পরে বৎসর প্রথম গানের পদ রচয়িতাদের মধ্যে আমি এই দুজনকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, যদিও এঁরা আধুনিক যুগের ব্যক্তি। মণিলাল সেনকে আমি কিছুমাত্র সোব দিইনে, কারণ আধুনিক ভারতের রাগশিল্পী রাগের প্রবণবহনের মায়াছাই ভুলে বাঁধার চেষ্টার আছে এবং বাঙ্গালী প্রবণবহিনী নিঃস্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করাই হুঁসিরে উঠতে পারছেননা, পরের কথা পড়ে। বিশ্বনাথজির মুখে আনন্দকিশোর রচিত হৃদয় হৃদয় প্রবণ শুনেছি এবং এর বার্তা বাংলায় প্রচারিত হয়েছে (১৯১২ থেকে ১৯১৪ সাল)। হৃদয় আলি বাঁ সাহেবের শিষ্যদের কর্ণে আনন্দকিশোরের বার্তা পৌঁছানি একথা আমি ভাল করেই জানি। আবার বিশ্বনাথজি অ-বাঙ্গালি হইবেও হুঁড়টের রচিত গীতের ভূমদী প্রশংসা করতেন এবং হুঁড়টের পদও গান করতেন। হুঁড়টের ত্রিপুরার থাকি কালের অনেক ও বিখ্যাতবোণা কীতি/কলাপ বিশ্বনাথজি ও রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ গীতশিল্পী নগেন্দ্র ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছি। কিসবন্দী বার বিয়ে মাত্র প্রত্যক্ষ অধিকার অভিজ্ঞতা অহুত্বের মাৎকাটিতে বিচার করে আনন্দকিশোর ও হুঁড়টের রচিত গীত রূপ শুনিকে কোনও অংশে বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সাধকদের রচিত গীতরূপ থেকে নিষ্কট মনে করতে পারেনি। এবং এখনও পারিনি, কারণ কিছুদিন হল আমাকে নোটগুটি বেড়ি হাওয়া প্রবণ গীতরূপ—গীতিমধ্যে নয়—পরীক্ষা করতে হয়েছিল। আনন্দকিশোর ও হুঁড়টের বিশেষ প্রচার হয়নি; সম্ভবত একারণে যে তাঁরা পূর্বের চর্চিত চর্চণ না করে নিজ রচিত পদ গান করতেন।

মণিলাল সেন 'মার্গ'সঙ্গীত প্রসঙ্গে সারবান কথা দিবে কীভীন গীতকে 'মার্গ'-পদ্যভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'মার্গ' ও 'সৈন্য' দ্বয়টির বহুল ও অগুণ্টিভুক্ত ব্যবহার দেখে মনে হয়—এই দুটি শব্দ বর্জন করাই ভাল। কেন মনে হয় নিবেদন করি।

গীত বাস্তব নৃত্য সম্বন্ধে এখনও পর্বত প্রাচীনতম বলে বীজত—ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে গাছবা বা সঙ্গীতকে উপলব্ধ করে মার্গ-সৈন্য-ভেদ প্রস্তাব করা হয় নি। মূত্রিত বা প্রকাশিত সঙ্গীতপ্রবাহণীয় মধ্যে মতঙ্গ শ্রীতি 'বৃহদেব' নামক গ্রন্থেই সর্বপ্রথম এই শব্দটি ও শ্রেণী-করণ পাওয়া যায়। বেদান্তবতী সঙ্গীতের বাস্তব অথবা 'নিশা' সঙ্গীত গ্রন্থেও মার্গ-সৈন্য প্রস্তাবনা দেই। 'বৃহদেব' নাম থেকেই বৃহতে হবে গ্রন্থের মধ্যে 'সৈন্য' তব ও তথা আলোচিত হয়েছে। 'সৈন্য' বিবরণ তথ্যের মধ্যে ও প্রথমে বাজিক বা বৈদিক চৌরাস্তা মূর্ত্ত্তা তান খটিত ব্যাশার, পরে ভারতীয় গাছবোর সঙ্গীতটি জাতি প্রকরণ, এবং শেষে লোক প্রচলিত কতকগুলি রাগরূপই মতঙ্গমূলি বাখ্য। বিবরণ করছেন।

তব প্রসঙ্গে আরম্ভেই মতঙ্গ 'মার্গ' ও 'সৈন্য' ভেদ বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। 'মার্গ' প্রস্তাবনার নির্ণীত অর্থ এই, গীতশিল্পী সাধকের আত্মগত এমন একটি ধ্বনি আছে যা কণ্ঠ বা স্বরের সাহায্যে বাইরে অভিব্যক্ত হতে চায় না, এবং মাত্র আত্মর ব্রহ্মসত্তাকেই 'স্বগদ্য' বা অহুসন্ধান করে। 'নাম' নামক স্বরের হৃদ উপলব্ধি দিয়েই এই স্বগদ্যর পথ আবিকার করা যায়। নামকে অহুত্ব করার সামর্থ্য বা যোগ্যতা না হলে—'মার্গ'সঙ্গীতের পদ্য লভাই হয় না। এক কারণ—গীত বাস্তব নৃত্য উপভোগ বা সাধনা করার অবসরে—আত্মার মধ্যে বৃদ্ধি ঘন প্রকৃতির introversion বা বিবর্তন না হলে মার্গসঙ্গীতের স্বরূপ

উপলব্ধ হওয়া অসম্ভব। ফলে—আত্মস্থখী মার্গসাধনা স্বধন ও অল্প প্রোতা বা প্রেক্ষকের উপভোগ্য হ'তে পারে না। নিম্নছাড়া—মার্গসঙ্গীতের প্রোতাও নেই, প্রেক্ষকও নেই।

অতঃপক্ষে, সেই একই আশ্রয়ত ধ্বনি বা 'নাথ' স্বধন প্রাকৃত, বহিমুখী পরিণাম ও অভিব্যক্তি লাভ করে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে নানাক্রম প্রত্যক্ষ, উপভোগ্য, শ্রীত-বান্ধা-নৃত্য বিকসিত হয়, তখন সেই পরিণামাভিব্যক্তিশব্দকে 'দৈশী' বলে। এক কথায়, অভিব্যক্ত সংশ্লিষ্টপ্রোতা নাজই 'দৈশী'। বলাই বাহুল্য—অভিব্যক্ত সংশ্লিষ্ট প্রোতার সঙ্গেই সাময়িক মাহবের নানাবিধ কামনা, প্রকৃতি ও মার্গ জড়িত থাকে। অতএব 'বৃহদৈশী' নামে প্রস্তাবনার সার্থকতা।

মতেশ্বর বহুকাল পরে, (বৃহত্তীর্থ ১২৪৭ সালে) শাক'দেব সঙ্গীতরচাকর নামে অপরূপ সংশ্লিষ্ট বিবরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মার্গ-দৈশী ভেদ স্বীকার করেও—মতেশ্বর গৃহীতগী ত্যাগ করে নিম্নর প্রস্তাব সমুপস্থাপিত করেছেন। তাঁর হুস্পষ্ট মতটি যথা—

পুরুষার্থের সম্যক অনুদায়কে বৃন্দা করে এমন সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ শ্রীতবান্ধানুভূতই 'মার্গ'। পুরুষার্থের, অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের, সাধনার চরম বা শেষ ফলই সেই সেই সাধনার 'অনুদায়'। যথা—সামান্যগত হয়ে, পুরুষার্থের উত্তম সাধনা করে যে কর্ম আশ্রয় সঞ্চিত হয়—তার অনুদায় বা ফল স্বরূপ 'অনুদায়' লভ্য হয়। শাক'দেবের স্পষ্টোক্তি থেকে বুঝা যায়—সংশ্লিষ্টের অভিব্যক্তি—অনভিব্যক্তির দ্বিগুণ দৈশী-মার্গ ভেদ সিদ্ধ নয়। যথা, তাঁর কথায়—

শ্রীতঃ বান্ধাঃ নৃত্যঃ নৃত্যঃ সঙ্গীতমুচ্যতে ।

মার্গো দৈশীতি তদ্বাণী তত্র মার্গঃ স উচ্যতে ।

যো মার্গিতো বিরিক্যামোঃ প্রযুক্তো ভবতাদিতি : ।

ধেবস্ত পুত্রতঃ শস্তোনিষতাত্ম্যগরগ্রন্থঃ ।

অর্থাৎ—শ্রীত বান্ধা নৃত্য এই তিনকে একত্রে সংশ্লিষ্ট বলা হয় ; সেই সংশ্লিষ্ট মার্গ ও দৈশীভেদে যিবিধ। তাবের মধ্যে মার্গ সংশ্লিষ্ট বলা হচ্ছে যথা—যে সংশ্লিষ্ট নিরন্তর অনুদায়গ্রন্থ এবং সেই হেতু ব্রহ্ম প্রকৃতি ব্যক্তির নামে বৃন্দা করেছিলেন^২ ও ভবত প্রকৃতি ব্যক্তির নামে বেবাদিদেব শত্ৰুয় সমুদে প্রয়োগ করেছিলেন তাকেই মার্গ সংশ্লিষ্ট বলে। এক কথায় অনুদায়প্রাপ্তিই হার চরম ও লক্ষ্য সেই সংশ্লিষ্টই 'মার্গ'। সংশ্লিষ্ট অত্মস্থখী কিংবা বহিমুখী গ্রন্থ তর্কেও অবদয়ই নেই। এর পরেই শাক'দেব দৈশীর সংজ্ঞা দিয়েছেন, যথা—

বেশে বেশে জনানঃ যচ্চর্যা ভবতঃকম্ ।

গানং চ বাহনং নৃত্যঃ তদৈশীত্যাভিধীয়তে ।

অর্থাৎ যে গান, বাহন ও নৃত্য বেশে বেশে মাত্র কচি-সাপেক্ষ হয়ে লোকের চিত্ত বিনোদন করে তাকে দৈশী অভিহিত করা হয়। প্রকারান্তরে—কোনও অনুদায়কামনা করে দৈশী সংশ্লিষ্ট প্রবর্তন করে না ; কচি অনুদায়ী হয়ে চিত্তবিনোদন মাত্র কামনা করেই দৈশী সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বেশে প্রবর্তিত হয়।

২ চতুর্বেদে যথা অবশ্য করেছিলেন উক্তি টীকাকারের অভিপ্রায়

মর্ত্যক বাক্যে 'মার্গ' বলে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন—পাথরের তাকে অনাহত নামের পর্যায়ভুক্ত করে পাশ কাটিয়ে দিয়েছেন যথা—

তদ্রূপাং সপ্তপথানাম্ বৃত্তি নৃজিত্ত নিগুণাং ।

পান্নমেকাগ্রচিহ্নৈকপাথাং ন স্বকরং নৃপাম্ ।

তদ্বাদশ্ব হুগোপাথং ত্রিমান্বদনানাহতম্ ।

গুরুপদিতমার্গেণ নূনঃ সধূপাসতে ।

সোহপি বক্তিবিশীমবাস্ত্ব মনোরথকোত্তরাম্ ॥

অর্থাৎ তদ্র (অনাহত ও আহতের প্রসঙ্গে)—মানবের সপ্তপথান দিয়ে ভোগবাস্ত লাভ হয়; কিন্তু নিগুণ-পথান বিশেষই মুক্তি লাভ হয়। পান্ন ব্যাপ্যগ্ৰচিহ্ন একাগ্রচিত্রপাথাং, সে হেতু সাধারণ মানুষের স্বকর নয়। সে কারণে—নূনিরা অর্থাৎ নিভৃতপ্রবাসাদিয়া গুরুপদিত পথ অবলম্বন করে, সেই স্ববের উপায়স্বরূপ ত্রিমান্ব অনাহত নাম (বা অস্ত্রের) উপাসনা করেন। তারলেও সেই মার্গ অহুরাগবিহীন বলেই সাধারণ মানুষের মনোরথন করে না।*

পাথরেরের পর থেকে আস্ত পথের সংজ্ঞিত বিষয়ক গ্রন্থে বা কিছু মার্গ সেনী প্রস্তাব দেখা যায়—তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় না বক্তা উক্ত দুই মতের কোনটি গ্রহণ করেছেন, নাকি নিরবত প্রকাশ করেছেন। যদিই বা নিজমত প্রকাশ হল, সেই মতকে কোনও রকম বৃত্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেখা যায় না। কিন্তু শব্দ দুটি ঝাঁকড়ে ধরে থাকবার বিলম্বন চেষ্টা আছে। সম্ভ্রতি 'মার্গ' ও ইংরাজি ক্লাসিকাল শব্দ একাধে ব্যবহার হচ্ছে। এতে কোনও স্মৃতি বা লাভ নেই। কারণ শব্দটিও তার প্রারম্ভিক অর্থ ও ইঙ্গিত থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। নানা বিভ্রম্না ভোগ করার পর সম্ভ্রতি ইউরোপ ক্লাসিকাল তথা রোমান্টিক 'অবস্থা' সেক্রেড Sacred তথা প্রোফেন Profane নাম-শ্রেণীকরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতিস্থ হওয়ার চেষ্টায় আছে।

যদিলাল সেনে স্বাস্থ্যর সাধন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন—তাতে একমত হতে পারলাম না। কারণ ভারতীয় নাট্যাশাস্ত্রের মধ্যে স্বাস্থ্যর সাধন, অথবা যোগাত্মক শব্দ 'নামাস্তবস্বরতা' উপনিষ্ট হয়েছো প্রয়োজনবের বশে। প্রয়োজন যথা—পাথক-পারিকাসের কঠপ্রথের সাধার্থ্যভেদে এবং বাসিত্বকরণ অর্থাৎ অক্টোব্রাইমেশনের বিশিষ্ট উদ্দেশ্যভেদে স্বরপ্রয়োগে নামাস্তবস্বরতান অবস্থ কর্তব্য। বিশেষ এই যে স্বর কখনও অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু তার নাম ও সম্বন্ধই অঙ্কুরিত বা পরিবর্তিত হয়; একারণে নামাস্তবস্বরতাই বর্ণার্থ বৈজ্ঞানিক শব্দ; 'স্বাস্থ্যর' শব্দ দিয়ে গুরুপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ—scale change এর প্রতিপক্ষ 'নামাস্তব সাধন' স্বাস্থ্যর সাধন নয়। আমাদের দেশে ঐ অর্থ ঐ শব্দটি কে চানু করেছেন আমাদের জানা নেই। কিন্তু কাজ ডাল হয় নি।

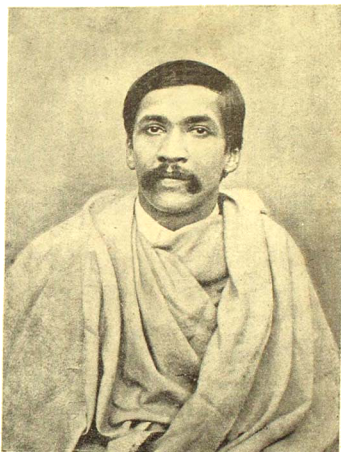
বাংলায় বাইরে কীর্তন গানের অমানব প্রসঙ্গে লেখক বলতে চেয়েছেন—কীর্তন গানের

* অথবা সেই অনাহত নাম অহুরাগ বিহীন বলেই সাধারণ মানুষের মনোরথন করে না। এই অর্থ সন্থীত বলে বোধ হয় না; কারণ—অনাহত নামকে দ্বা বা নিত্যপ্রবের উপায় গুরুপ বলা হয়েছে। অহুরাগ বলিত দ্বা বা নিত্য দ্বা নাহি অপদ্রব।

প্রাদেশিকতাই অনানবের হেতু। কথাটি বুঝা গেল না। বাংলার বাইরে কেউ যদি বাংলা ভাষা না বুঝে, ইংলণ্ডের বাইরে কেউ যদি ইংরাজি ভাষা না বুঝে অথবা বাঙালী যদি হরিয়াস স্বামীজির গদ্য না বুঝে তবে কি সে সব ভাষা বা পদের প্রাদেশিকতা-রোধ? লেখক জানেন, বাঙালি হিন্দি ভাষার প্রবণ, পাঞ্জাবি ভাষার টঙ্কা প্রভৃতি চর্চা করেছে। বর্ধার কথা এই কীর্তনশ্রীতির মধ্যে সূক্ষ্ম বসতাবের যে দ্যোতনা আছে তাকে বাংলার বাইরে প্রাদেশিক মনোভাবগ্রন্থ ও বলাহুভবী শ্রোতা বুঝতেই পারে না। বহুত প্রাদেশিক কে বা কাতা আমরা মর্মে মর্মে অহুভব করছি। কীর্তনগান বা শ্রীতকে তর্কের ব্যতির প্রাদেশিক মনে করলে পৃথিবীতে এমন একটি ভাষা বা শ্রীত পাওয়া যায় না যা প্রাদেশিক নয়। যদি কোনও কালে সারা অগুণের অন্ত একটি অপ্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়—এবং সেই ভাষার সম্পূর্ণ অপ্রাদেশিক শ্রীত রচিত হয় তাহলেও পৃথিবীর সবত্র লোক সেই শ্রীত বা ভাষা উপভোগ করবে কি না—স্বপ্নেই সম্ভব হয়। 'রাগ' বা 'melody' উপভোগ করতে হলে মাত্র হৃদই নির্দোষ অবশেষেরই প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীত উপভোগ করতে হ'লে—অধিকন্তু ভাষা বুঝবার ক্ষমতা থাকা চাই, এবং ভাব ধ্বনি ও রস গ্রহণ করার যোগ্যতাও অর্জন করা চাই। আমাদেরই বাংলাদেশে সকলেই কি কীর্তনশ্রীত উপভোগ করার যোগ্যতা রাখে?

বাংলাদেশের লোক হরেও বাঙালী কতখানি অপ্রাদেশিক, লেখক মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যোত্তরনার প্রসঙ্গেই উদাহরণ দিয়েছেন। স্বকীর্তনের প্রচেষ্টায় বাঙালি শিল্পী বাংলার বাইরে থেকে কতখানি সংগ্রহ করেছে তার অন্ত আত্মগাম্যমান দৃষ্টান্ত উদাহরণের পরিকল্পনা বৈচিত্র্য, তবে আপনাপন সংস্কার ও প্রতিভা অবহেলা করে বাইরের অহুভব করাই অবনতির লক্ষণ। এই আত্মবিস্ময়না থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে নিজ দেশের মর্ম ও নিজ সমাজের ঐতিহ্য আলোচনা করা উচিত। মণিলাল সেন মহাশয়ের পুস্তক এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে থাকল সম্ভব নেই। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের বিষয়ে তিনি হৃদই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যৎ কোনো সংস্করণে তিনি বিশদতর আলোচনা করে বাংলার স্বকীর্তনের ইতিহাসের উৎকৃষ্টতম অংশের উপর আলোকপাত করবেন।

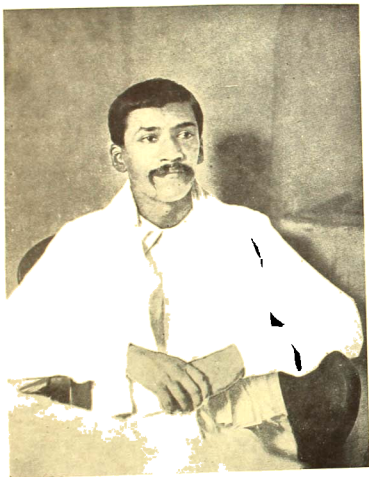
শ্রীঅশ্বিনাথ দাস্তাল



শ্রী অরবিন্দ

অভিযুক্তি
১০১৫ ৭

১৫ আগস্ট ১৮৭২ - ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০



কারামুক্তির পর
বৈশাখ ১৩১৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা



মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথ-চাওয়া নয়নের বাণী ।

২

বইল বাতাস, পাল তবু না জ্বোটে—
ঘাটের ধাপে নৌকো মাথা কোটে ।

৩

কাছে থাকি যবে ভুলে থাকো,
দূরে গেলে যেন মনে রাখো ।

৪

যে বন্ধুরে আজো দেখি নাই
তাহারি বিরহে ব্যথা পাই ।

৫

হে বনম্পতি, যে বাণী ফুটিছে
পাতায় কুশুমে ডালে—
সেই বাণী মোর অন্তরে আসি
ফুটিতেছে সুরে তালে ।

The same voice that finds form in leaves
and flowers
sings and dances in my life.

৬

বসন্ত, আনো মলয়সমীর,
কূলে ভরি দাও ডালা—
মোর মন্দিরে মিলনরাতির
প্রদীপ হরছে জ্বালা।

Bring thy south breeze, Spring,
fill the basket with flowers.
For in my house the lamp has been lit
for the meeting of love.

৭

আকাশের চুষনহুটিরে
ধরদী কুম্ভমে দেয় ফিরে।
The sky rains kisses.
The Earth returns it in flowers.

৮

ঐশ্বর্য নিশার
গোপন অস্তরাল,
তাহারি পিছনে
লুকায়ে রচিলে
তারার ইন্দ্রজাল।
From behind the screen of night
You spread the magic of your stars.

৯

অণুকালের গীতি
চিত্রকালের স্মৃতি।
The song is for a few moments,
its memory is for long days.

১০

বেদনার অশ্রু-উর্মিগুলি
গহনের তল হতে রয় আনে তুলি।
On the shore smile gems
thrown up by anguished waves of tears.

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

জীৱাঙ্কশেখর বসু

সকল লোকেরই কথায় ও আচরণে নানাপ্রকার ভঙ্গী থাকে। এই ভঙ্গী যদি ব্যক্তিগত লক্ষণ হয় এবং অনর্থক বার বার সেখা যায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। যেমন লোকবিশেষের তেমনই ভাতি বা শ্রেণী বিশেষেরও মুদ্রাদোষ আছে। দক্ষিণ ভারতের পুরুষ লজ্জা হানাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সর্কৌতুক বিশ্বয় প্রকাশের জন্য ইংরেজ শিশু সেথ। অনেক বাঙালী নবযুবক পথ দিয়ে চলবার সময় কেবলই মাথায় হাত বুলায়— চুল ঠিক রাখবার জন্য। অনেক বাঙালী বেয়ে নিরুত্তরী হয়ে এবং ঘাড় কিত্তিয়ে নিচ্ছেন সেই নিরীক্ষণ করতে করতে চলে— সাজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। বাঙালী বুদ্ধশেখরও সাধারণ মুদ্রাদোষ আছে, অকৃত্রিম ভা বলেতে পারবেন।

ভাতি বা শ্রেণী বিশেষের অঙ্গভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের ভাষার সম্ভ্রতি বেশকল মুদ্রাদোষ ও বিকার বিস্তারিত হচ্ছে তার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ জোড়া শব্দ, রবীন্দ্রনাথ বার নাম দিয়েছেন শব্দযুগল। ‘বাংলা শব্দভণ্ড’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘বস্তুই দেখিছাছি তাহাতে বাংলায় শব্দযুগলের প্রাচুর্য্যই দৃষ্ট বোধ, অল্প অল্প ভাষায় ওত নহে।’ তিনি সংস্কৃত থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন— গরুগর, বর্বর, জল্পজল্পনি, উত্তরোত্তর, পুনঃপুনঃ, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দযুগল কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা— মধ্যে মধ্যে, বাঁধে বাঁধে, হাড়ে হাড়ে— এগুলি পুনরাবৃত্তি বাচক। বৃকে বৃকে, কাঠে কাঠে— পরস্পর সংযোগ বাচক। সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে— নিহতবর্তিতা বাচক। চলিতে চলিতে, হাসিয়া হাসিয়া— দীর্ঘকালীনতা বাচক। অল্প অল্প, লাল লাল, যায় যায়, হুড়ি হুড়ি— বিচলিত বহুলতা বাচক। টাটকা টাটকা, গরম গরম, নিজে নিজে— প্রকর্ষ বাচক। দাব দাব, শীত শীত, মানে মানে— ঐক্যবৃত্তি বহুলতা বা অসম্পূর্ণতা বাচক। গলগা টগল, বেঁচকা বৃঁচকি, গোলা গুলি, কাগড় চোপড়— অনির্দিষ্ট প্রকৃতি বাচক।

দ্বিগী এবং অস্ত্রান্ত ভারতীয় ভাষাতেও অস্বাভাবিক শব্দযুগল আছে। বিদেশীয় দৃষ্টিতে এই রীতি ভারতবাসীর মুদ্রাদোষ। শুনেছি, সেকালে চীনাভাষারের হোকানদার সাহেব ক্রোডাকে বলত, টেক টেক নো টেক নো টেক, একবার তো নী। একজন ইংরেজ পণ্টক লিখেছেন, মাহাঃ প্রদেশে কোনও এক হোটেলের হুইকির দাম খিজাস করায তিনি উত্তর পেয়েছিলেন— টেন টেন আনা ওমান ওমান পেগ। বিদেশীয় কাছে বড়ই অস্বস্তি মনে হ’ক, শব্দযুগল আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং অর্থপ্রকাশের সহায়ক, অতএব তাকে মুদ্রাদোষ বলা যায় না। কিন্তু যদি অব্যবহৃতক স্থলে দুই শব্দ জুড়ে দিয়ে বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ। রবীন্দ্রনাথ বাকে ‘অনির্দিষ্ট প্রকৃতি বাচক’ বলেছেন সেই ক্ষেত্রের অনেক জোড়া শব্দ সম্ভ্রতি অকুরণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এগুলির বিশেষ লক্ষণ— জোড়ার শব্দযুগল

অলম্বন ক্রিষ্ট প্রায় অল্পপ্রাসঙ্গিক এবং প্রত্যেকটিরই অর্থ হয়। এই প্রকার বহুপ্রচলিত এবং নির্দোষ ভোড়া শব্দও অনেক আছে, যেমন— মণি-মুক্তা, ধান-ধারণা, ঘল-ঘল, খেত-খামার, নদী-নালা।

দুঃখ-দুর্ভাগা, ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ-সুবিধা, উল্বেগ-আহোজন, প্রভৃতি ভোড়া শব্দ আত্মকাল খবরের কাগজে দূর দেখা যায়। স্থলবিশেষে এই প্রকার প্রয়োগের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি শব্দই যথেষ্ট। কেবল দুঃখ বা কেবল দুর্ভাগা, কেবল ক্ষয় বা কেবল ক্ষতি, ইত্যাদি লিখলেই উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই রকম শব্দ যদি সর্বদাই ভোড়া লেগে থাকে এবং অনর্থক বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা দুঃসাহায্য।

দুজন ছাত্র সবল স্নোক যদি সর্বদা পরস্পরের কাঁধে ডর দিয়ে হাঁটে। অভ্যাস করে তবে দুজনেরই চলনশক্তির হানি হয়, একের অভাবে অপর জন খচ্ছন্দে চলতে থাকে না। প্রত্যেক শব্দেই স্বাভাবিক অর্থপ্রকাশশক্তি আছে যার নাম অভিধা। এই স্বাভাবিক অর্থ আরও স্পষ্ট হবে মনে হবে যদি সর্বদা আর একটি শব্দ ভুড়ে দেওয়া হয় তবে দুই শব্দেরই শক্তি কমে যায়। যেখানে একটিতেই কাব্য চলতে পারত সেখানে দুটিই না লিখলে আর চলে না। আত্মকাল অনশাধারণের ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান উপায় সংবাদপত্র। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ভাল বা মন্দ, যে প্রয়োগ লোকে বার বার দেখে তাই শিষ্ট রীতি মনে করে আত্মস্বা করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের মুখে 'পরিস্থিতি, বাধ্যতামূলক, অংশগ্রহণ, কার্যকরী উপায়,' ইত্যাদি শোনা যায়।

সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধুলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই নামে মিলে বোঝানো হয় না, কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধুলা বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে— মাঠে খেলা দেখতে যাকি। খেলাধুলা দেখতে যাকি বলে না। শুধু খেলা শব্দে যখন কাজ চলে তখন অল্পপ্রাসঙ্গিক মোহে খেলাধুলা লেখবার দরকার কি?

শব্দব্যবহা বাঙ্গালীর একটি রোগ। ক্লাইড স্ট্রীটের নাম এখন নেতাজী স্তম্ভের রোড করা হয়েছে। শুধু নেতাজী রোড বা স্তম্ভের রোড করলে কিছুমাত্র অসম্মান হত না অথচ সাধারণের বলতে আর লিখতে সুবিধা হত। সম্প্রতি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের নাম নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ করা হয়েছে। শুধু নীলরতন কলেজ করলে কি মোহ হত? বন্ধিন চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বদলে বন্ধিমন্ডল বা বন্ধিন স্ট্রীট করলে অবধাঙ্গ হত না। গান্ধী প্যাতিসর শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর দরকার হয় না।

বন্ধিমন্ডল, রামনারায়ণ, শরৎচন্দ্র, স্তম্ভচন্দ্র প্রভৃতি সন্যাসধর্ম পুরুষ। কৌলিক পদবীর বোকা থেকে সাধারণত তাঁদের অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে, কিন্তু ভক্তদমন তাঁদের বন্ধে নতুন উপসর্গ চাপিয়েছেন। অনেক মনে করেন প্রত্যেক বার নামোচ্চারণের সময় যদি বন্ধিমন্ডল, যদি রামনারায়ণ, অপরাধের কথাশিরী শরৎচন্দ্র, দেশপ্রেমের নেতাজী স্তম্ভচন্দ্র না লিখলে তাঁদের অসম্মান হয়। রবীন্দ্রনাথ মহাভাগ্যবান, তাই হুবহি, কবির, মহাকবি, কলিঙ্গপ্রভৃতি তুচ্ছ বিশেষণের উল্লেখ উঠে গেছেন, দরকার হলে নামের পরিবর্তে তাঁকে শুধু কবি বা কবিশ্রুত আখ্যা মিলেই যথেষ্ট হয়।

যেখানে কোনও লোকের স্বমহিমা পূর্ণাঙ্গ মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আসে। দারোয়ানের চৌগৌণা, পাগড়ি আর জমকালো পোশাক, কিশু-বার্শালের ভাস্করের চামড়ার প্রকাণ্ড হুপি, সম্মানী

বাংলায় লিখিত ঘটা পেরুয়া আর সাতনদী কবিতার মালা—এ সমস্তই মহিমা বাড়ানোর কৃত্রিম উপায়। আধুনিক সংস্কারচর্চায়ের নামের পূর্বে এক শ আট স্ত্রী না দিলে তাঁদের মান থাকে না, কিন্তু আদি সংস্কারচর্চারে স্ত্রীর প্রয়োজন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি স্ত্রীতেই তুষ্ট।

বাণ গোষ্ঠী রীতির লক্ষণ বলেছেন, অক্ষরভর। এই আভ্যন্তরে প্রবৃত্তি এখনও আছে। অনেক বাক্য অক্ষরবে শব্দবাহ্য্য এসে পড়েছে, শব্দকরা গভাভূগতিক ভাবে এইসব শব্দসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করেন। ‘সন্দেহ নাই’—এই সরল প্রয়োগ প্রায় উঠে গেছে, তার বদলে চলেছে—‘সন্দেহের অবকাশ নাই’। ‘চা পান’ বা ‘চা খাওয়া’ চলে না, ‘চা পর্ব’ লেখা হয়। ‘মিষ্টান্ন খাইলাম’ স্থানে ‘মিষ্টান্নের সন্ধ্যাবহার করা গেল’। মাঝে মাঝে অসংস্কার হিসাবে এরকম প্রয়োগ সার্থক হতে পারে, কিন্তু যদি বার বার দেখা যায় তবে তা মুদ্রাসংস্কার।

শব্দের অপচয় করলে ভাষা সঙ্কট হয় না, দুর্বল হয়। যেখানে ‘বার্খ হইবে’ লিখলে চলে সেখানে দেখা যায় ‘বার্খভায় পর্যবসিত হইবে’। অনেকে ‘বিলেন’ স্থানে ‘প্রবান করিলেন’, ‘যোগ বিলেন’ স্থানে ‘অংশগ্রহণ করিলেন’ বা ‘যোগদান করিলেন’, ‘গেলেন’ স্থানে ‘গমন করিলেন’ লেখেন। ‘হিন্দীভাষী’ লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়, অথচ লেখা হয় ‘হিন্দীভাষাতারী’। ‘কাছের জ্ঞাত (বা কর্মক্ষেত্রে) বিশেষে গিয়াছেন’—এই সরল বাক্যের স্থানে দুই-তিন প্রয়োগ দেখা যায়—‘কর্মব্যাপসে বিশেষে গিয়াছেন’। ব্যাপসেশের মানে ছল বা ছুতা। ‘পূর্বেই ভাষা উচিত ছিল’ স্থানে লেখা হয়—‘পূর্বেই-’। পূর্বাভাসের একমাত্র অর্থ সকালবেলা।

বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিজের শায়ে ঠাড়াবার শক্তি আছে, সংস্কৃতের বেশে চলবার কোনও দরকার নেই—এই কথা অনেকে বলে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যেও প্রচুর বিকৃত সংস্কৃতশ্রীতি দেখা যায়। বাংলা ‘চলন্ত’ শব্দ আছে, তবু তাঁরা সংস্কৃত মনে করে অশুদ্ধ ‘চলমান’ লেখেন, বাংলা ‘অভিমান’ স্থানে অশুদ্ধ ‘অগ্রসরমান’ লেখেন, হুগ্ৰলিঙ্গ ‘পাহারা’ স্থানে ‘গ্রহণ’ লেখেন। বাস্তব সংস্কৃত বহু নয়, পাঠ্য সংস্কৃত পট্টক নয়, পাহারার সংস্কৃতও গ্রহণ নয়।

অনেক লেখকের শব্দবিশেষের উপর ভৌক দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ করেন। একজন গল্পকারের লেখার চার পৃষ্ঠায় পঁচিশ বার ‘রীতিমত’ বেখেছি। অনেকে বার বার ‘বৈকি’ লিখেই ভালবাসেন। কেউ কেউ অনেক প্যারাগ্রাফের আরম্ভে ‘হা’ বসান। আধুনিক লেখকরা ‘বুক বুঝী’ বর্জন করেছেন, ‘তরুণ তরুণী’ লেখেন। বোধ হয় এঁরা মনে করেন এতে বহুল কম বেখায় এবং লাগিতা বাড়ি। অনেকে গাড়ির বদলে অকারণে বিম্বচিহ্ন (!) দেন। অনেকে সেবার বিনু (....) দিয়ে লেখা কাপিয়ে তোলেন। অনাবশ্যক হৃৎচিহ্ন দিয়ে লেখা স্বত্বকিত করা বহু লেখকের মুদ্রাসংস্কার। ডেজিটেবল থি-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে খাবার তৈরির বিধি দেওয়া থাকে তাতে বেখেছি—‘তিনটি ভিন্ ভেনে নিন্, তাতে একটু হুন্ বিন্’।

আর একটি বিজাতীয় বোধ আমাদের ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। একে মুদ্রাসংস্কার বলে ছোট করা হবে, বিকার বলাই ঠিক। ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার কৃত্ত আমাদের আচারব্যবহারের আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমরা বিস্তার ডাল জিনিস পেয়েছি। জু শ

বংসরের সংসর্গের ফলে আচার্যের কথাই ও লেখার কিছু কিছু ইংরেজী রীতি আসবে তা অবশ্যস্বামী। কিন্তু কি বর্ণনীয়, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীয় তা ভাববার সময় এসেছে।

পাচ বছরের মেয়েকে নাম দিচ্ছিল। উত্তর দেয়— কুমারী দীপ্তি চ্যাটার্জি। স্থপিত্তিক লোকের অগ্ন্যবধনের যেন— হিন্টার বাহু (বা বাসিউ), বিশেষ রহ, মিস ডাট। মেয়েদের নামে তুলি দিলি কবি ইভ! প্রভৃতির বাচ্চা ধোঁয়া বায়। ঘর নাম শৈল বা শীলা সে ইংরেজীতে লেখে Sheila। অনিল হয়ে বাহ O'neil, বলেন হয় Warren। এরা অন্যে ৭৩ হতে চায় না, নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হানুসকর ও হীনতাসূচক তা খেয়াল হয় না। সংক্ষেপের অস্ত্র বন্যোপাখ্যায়কে ব্যানার্জি না করে বন্যা করলে যেন কি? সেই রকম মুখা চট গম্বা ডটও চলাতে পারে। সম্ভ্রুতি অনেক নামের মধ্যম লোপ করেছেন, নাথ চন্দ্র কুমার বোহন ইত্যাদি বাব দিয়েছেন। ভালই করেছেন। বিবোজ্ঞানারায়ণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড নাম এখন কাশন নয়। পদবীও সংক্ষিপ্ত করলে কতি কি? মিস-এর অল্পকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হয়? কয়েক বংসর পূর্বেও কুমারী লখা বিধবা সকলেই শ্রীমতী ছিলেন। এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুষের কৌবার্য তো ঘোষণা করা হয় না।

আদিত্য হার নাম ছিল আর. জি. কব মেরিক্যাল কলেজ, লাট স্যাক্সের অগ্রগ্রহ লণ্ডনের অস্ত্র তার নাম কারমাইকেল কলেজ করা হয়। এখন আবার প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করে আর. জি. কব কলেজ করা হয়েছে। ইংরেজী অক্ষর না দিয়ে রাখাগোবিন্দ কলেজ করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির বিজ্ঞাপন নামে নামে দেখতে পাই— Better Bengal Society। বাংলা বেশ এবং বাঙালীর উন্নতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইংরেজী নাম আর ইংরেজী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজ মুরব্বীর প্রশংসা পাবার আশা আছে?

মেকনওহীন অলস হুকুমার কমলবিলাসী হবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, লজ্জার নামকরণে তা প্রকাশ পায়। বোকাবদলেরও বশনপসারী তরুণকুমার হবার সাধ হয়েছে। আমাদের পাড়ার একটি মুরব্বীর দোকানের নাম— দি ডব্লিউল্যাণ্ড স্টিকার্স। অস্ত্র বশন লিও ও বেবেছি। তরুণ হোটেল, তরুণ বিটায় ডাওয়ার, এবং ইংল্যান্ডের নামধারী বোকান বিস্তার আছে। পাচ ছ বংসর আগে বউবাঝারে একটি দোকান ছিল— ইংল্যান্ডের বোম্বের্ড গ্র্যান্ডব্রুইট ফ্রেণ্ডস। একসঙ্গে তারুণ্য ইসলাম আর পাল করা বিচার আবেদন।

অরবিন্দ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক দিন যনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁকে নেপে যা আমার মনে বেগেছে সেই কথা লিখতে ইচ্ছা করি।

ফুটান শাস্ত্রে বলে বাণীই আত্মশক্তি। সেই শক্তিই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। নবদ্বীপ নবদ্বীপ, সে কখনও পত্নিকার তারিখের কর্তৃক থেকে নেমে আসে না। যে যুগের বাণী চিন্তায় কর্তৃক বাহুঘের চিত্তকে মুক্তির নতুন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবদ্বীপ।

আমাদের শাস্ত্রে মনের আদিতে ঠ, অন্তেও ঠ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অমরং ভো— কালের শব্দসুহরে অসীমের নিবাস। করাসি রাষ্ট্রবিগ্ৰহের বান থেকে যে যুগ অতল ভাব-সমুদ্র থেকে কলসজে ডেলে এল তাকে বলি যুরোপের এক নবদ্বীপ। তার কারণ এ নয়, সেদিন ক্রমে ঘরা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে। তার কারণ, সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। সে বাণী কেবলমাত্র ক্রান্তের আত্ম রক্ষিক প্রয়োজননের খঁচায় বাধা পবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা, ইহুদ-বইয়ের বুলি আগুড়ানো, টিমে পানি নয়। সে ছিল মুক্তগণ আকাশবিহারী বাণী, সকল বস্তুকেই পূর্ণতর মহত্ত্বের দিকে সে পথনির্দেশ করে দিয়েছিল।

একথা ইটালির উন্মোচনের বৃত্ত ছিলেন মার্টিনী, গারিবান্দি। তাঁরা যে মত্রে ইটালিকে উদ্ধার করলেন সে ইটালির তৎকালীন শত্রু-বিনাশের দ্রুতফলদায়ক মারণ উচ্চাটন শিশ্যে-মন্ত্র নয়— সমস্ত বাহুঘের নাগশাপ-বোতলের সে গল্ফরম, নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে মত্রে অবতীর্ণ। এইমত্রে তাকেই বলি বাণী। আত্মলৈ আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা অন্ধকারে বাহুঘ ঘরের প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারে। সেই স্পর্শবোধ তারই নিম্নের। কিন্তু সূর্যের আলোতে নিখিলের যে স্পর্শবোধ আকাশে আকাশে বিস্তৃত তা প্রত্যেক প্রয়োজননের উপযোগী অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনের অতীত। সেই আলোককেই বলি বাণীর স্বরূপ।

সাধারণ একদিন যুরোপ যুগান্তর এনেছিল। কেন। বস্তুরগতে শক্তির সন্ধান জানিয়েছিল বলে না, অগ্ন্যন্তর সমুদ্রে জ্ঞানের অমৃততা ঘুসিয়েছিল বলে। বস্তুরগতের বিবরণ স্বীকার করতে সেদিন বাহুঘ প্রাণ পণ্ড দিয়েছে। আত্ম সাধারণ সেই যুগ পার করে নিয়ে আর-এক নবতর যুগের সমুদ্রে বাহুঘকে দাঁড় করালে। বস্তুরগতের চরম সীমানায় মূল ভরের দ্বারে তার রথ এল। সেখানে সৃষ্টির আদিবাণী। প্রাচীন ভারতে বাহুঘের মন কর্তৃকও থেকে যেই এল জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এল সৃষ্টির যুগ। বাহুঘের আচরণকে লক্ষ্য করে আত্মকে ডাক পড়ল। সেই আত্মা হস্তচালিত কর্তৃক বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে বাহুঘের জাগ্রত চিত্ত বলে উঠেছিল, চিরজনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে বাওনা, তার উল্টাই মহতী বিনষ্ট। সেই যুগের বাণী ছিল : ৭ এতনবিদ্রুতমত্রে ভবতি।

আর-একদিন ভারতে উন্মোচনের বাণী এল। সমস্ত বাহুঘকে ডাক পড়ল, বিশেষ সংকীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারই বাণী নিয়ে। সেই বাণী বাহুঘের চিত্তকে তার সমগ্র উন্মোচন শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করলে।

বাণী তাকেই বলি, যা বাহুঘের অমরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান

করে আনে, বা উপস্থিত প্রত্যেকের চেয়ে অনাগত পূর্বতাকে বাতবতর সত্য বলে প্রমাণ করে। প্রকৃতি পত্রকে নিছক দিনমজুরি করতেই প্রভাহ নিযুক্ত করে রেখেছে। স্বস্তির বাণী সেই সংকীর্ণ জীবিকার ভগ্ন থেকে মানুষকে এমন জীবনধারায় উদ্ধার করে দিলে তার লক্ষ উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের কানে এসে জিকে থাকতে হবে, এ কথা তোমার নয়; তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, সেজন্তে মরতে যদি হয় সেও ভালো। প্রাণধারণের বহু গতির মধ্যে যে আলো জ্বলে সে রাত্রির আলো; পথের তাজে কাছ চলে। কিন্তু মানুষ নিশাস্ত জীব নয়।

সমুদ্রযাত্রার দুঃস্বাদ কাষে বাণী মানুষকে ডাক দেয় তলার বরকে তীরে আনার কাছে। এতে করে বাইরে সে যে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড় সিদ্ধি তার অন্তরে। এ যে দেবতার কাছে সখ্যেন্দ্রিয়ার। এতেই আপন প্রকৃত বৈবশক্তি 'পরে মানুষের স্রষ্টা ঘটে। এই স্রষ্টাই নূতন যুগকে মর্ত্যগীনা থেকে অমর্তের দিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই স্রষ্টাকে নিঃসংশয় স্রষ্টাভাবে দেখা যায় তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্য। স্বল্প জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমা প্রকাশিত। কেবলনার বৃত্তি নয়, ইচ্ছাশক্তি নয়, উদ্ভব নয়, থাকে সেখান বোকা যায় বাণী তাঁর মধ্যে মূর্তিমতী।

আমি এইরূপ মানুষকে যে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চার দিকেই আমি মানুষের মধ্যে আশা-অবিশ্বাস প্রবল। এই আশা-অবিশ্বাসই আশ্রয়। তাই রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধিই আমি আর-সকল সাধনাতেই পিছনে ঠেলে ফেলেছি। মানুষ বস্তুর মূল্যে সত্যকে বিচার করছে। এমনি করে সত্য এখন হয় উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হয় আর-কিছু, তখন বিবয়ের সোত উগ্র হয়ে ওঠে, সে সোতের আর তর সর না। বিশ্বাসিদ্ধির অব্যবশায়ে বিশ্ববুদ্ধি আপন সাধনার পথকে বড়ই সংকীর্ণ করতে পারে ততই তার স্রিত। কারণ, তার পাণ্ডুরতা হল সাধনা-পথের শেষ প্রান্তে। সত্যের সাধনার সর্বক্ষেণেই পাণ্ডুর। সে যেন গানের মতো, গাওয়ার অন্তে সে গান নয়, গাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই। সে যেন ফলের সৌন্দর্য, গোড়া থেকেই ফলের সৌন্দর্যে যায় ভূমিকা। কিন্তু সোতের প্রবলতায় সত্য এখন বিবয়ের বাহন হয়ে উঠল মহেজকে তখন উচ্চৈশ্বরের সহিগিরিতে ভর্তি করা হল তখন সাধনাটাকে ঠাকি দিয়ে সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাতে সত্য বিমূহ হয়, সিদ্ধি হয় বিকৃত।

স্বার্থ নির্বাসন ব্যাপ্ত করে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। বড়ই দ্রুত পেয়েছেন ততই গাঢ়তর করে উপলব্ধি করেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্বিক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ মুক্ত সীতাকে দাবণের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলেন।

কিন্তু দাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিম্নেরই মধ্যে। রাক্ষসে কিংবে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতির আন্ত প্রয়োগে ধ্বংস করতে চাইলেন, তাঁকে বললেন : সর্বজনসমক্ষে অগ্নিশরীক্ষার অনতিকালেই তেনার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু এক মুহূর্তে জ্বালুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। দশ জন সত্যকে যদি না স্বীকার করে তবে সেটা দশ জনেরই দুর্ভাগ্য। সত্যকে যে সেই দশ জনের ক্ষুদ্র মনের বিরুদ্ধি-অস্থিরতার আপনায় অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বললেন : আমি মুহূর্তকালের দাবি সেটাটার অসম্মান মানিব না, চিরকালের মতো বিবোধ নেব। রামচন্দ্র এক নিমিষে সিদ্ধি চেয়েছেন, এক মুহূর্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকালেও আমরা এসেছি এই কালেও আমরা তাড়াতাড়ি দশের-যন-তোলাবো সিদ্ধির সোতে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ করেছি।

বন্ধু কিতিনোহন সোনের দুর্লভ কাব্যরচয়ের স্থূলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাড়ির গান পেয়েছিলাম। তার প্রথম পদটি নবন পড়ে :

নিহুর গরমী, তুই কি মানসমূল্য ডানবি আঙনে।

যে মানসমূল্যের বিকাশ সাধনসাধেশক, দেশের সামনে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সভ্যকে আশ্রয়ালের গরমে সপ্রমাণ করতে চাইলে, আরোহনের ধূমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে বাধ, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্ধান করে।

এই সোডের চাকশো সর্বত্রই ধ্বন সত্যের পীড়ন চলেছে তখন এর বিরুদ্ধে তর্কযুক্তিকে বাড়ানি করে ফল নেই। মাহুৎকে চাই, যে মাহুৎ বাগীর মৃত, সভ্যসাধনায় স্বকীয়কালেও বাঁচ বৈধুত্বটি ঘটে না, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই অন্তর পাথর থাকে আনন্ডিত রাখে। আমরা এমন মাহুৎকে চাই যিনি সর্বাঙ্গীণ মাহুৎয়ের সমগ্রতাকে শ্রদ্ধা করেন। এ কথা গোড়াতেই মনে নিতে হবে যে, বিধাতার কৃপাবশতই সর্বাঙ্গীণ মাহুৎটি সহজ নয়, মাহুৎ অটল। তার ব্যক্তিক্রমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুবিচিত্র। কোনো বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাগে ছেঁটে এককোঁকা ভাবে তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তোলা চলে। মাহুৎয়ের বনটাকে যদি চাণা দিই তবে চোখ বুজে শুকবাকা মনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হতে পারে। বুদ্ধির বলার পরিভ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো করে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোকা বাড়ানো, বিভ্রান্তির পরিবর্তে ত্রি-শান্ত, সহজ হয়। স্বাধীনধাতাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার বহনভার কমে আসে। তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেয়ে বড়ো কথাটা ভুললে চলেবে না যে, আমরা মাহুৎ, আমরা সহজ নই।

ভিক্তিতে ময়ূরঙ্গের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মাহুৎয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বলেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সভ্যতার ময়ূরঙ্গ একটুও সহজ নয়। সেটা শুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তি একাগ্রতা। হ্রীতবী এসে বললেন : সাধারণ মাহুৎয়ের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, অতএব ময়ূরঙ্গকে সহজ করার খাতিরে ঐ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া বাক, কিছু না-ডেবে না-বুঝে শব্দ আউরে গেলেই সাধারণের পক্ষে ঘণ্টে ; সমীচ ছাশাখানার মতো প্রাত্যহ কাগজে হাজার বার নাম লিপলেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ করার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরও সহজই-বা না করব কেন। চিত্তের জেবে মূখ চলে বেগে, মূখের চেয়ে ঢাকা। অতএব চলুক ঢাকা, ময়ূর চিত্ত।

কিন্তু মাহুৎয়ের পদ্য সবচেয়ে যে গুণ বলেন 'দুর্গ পথতঃ' তাকে নববার করি। চরিতার্থতার পথে মাহুৎয়ের সক্ষম শক্তিকেই আমরা দাবি করব। বহুলতা পদার্থটিই মন এই মতের খাতিরে বলা চলে যে, ভেলা ছিনিসটাই ভালো, নৌকাটা বর্জনীয়। এক সময়ে অত্যন্ত সাধাসিধে ভেলায় অত্যন্ত সাধাসিধে কান চলত। কিন্তু মাহুৎ পারলে না থাকতে, কেননা সে সাধাসিধে নয়। কোনোমতে ভ্রোভের উপর বসতে দিয়ে নিম্নের কান সংক্ষেপ করতে তার লজ্জা। বুদ্ধি ব্যত হলে উঠল, নৌকায় হাল লাগালে, দাঁড় বানালে, পাল দিলে ভুলে, বাঁশের লগি আনলে বেছে, গুণ চানবার উপায় করলে, নৌকায় উপর তার কর্তব্য নানা গুণে নানা দিকে বেড়ে গেল, নৌকায় কানও পূর্বের চেয়ে হল অনেক বেশি ও অনেক বিচিত্র। অর্থাৎ মাহুৎয়ের তৈরি নৌকা মানবগ্রন্থতির ঘটিলতার পরিচয়ে কেলেই এগিয়ে চলল। আর যদি বলি 'নৌকা কেলে দিয়ে ভেলায় দিয়ে গেলে অনেক দায় বাঁচে' তবে তার উত্তরে বলাতে হবে : ময়ূরঙ্গের

যাহ মানুষকে বহন করাই চাই। মানুষের বহণা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলই উদ্ঘাটিত করতে হবে, মানুষ কোথাও থামতে পারে না। মানুষের শব্দে নাশ্রেন্দ্রমতি। অদিককে বাহ দিয়ে সহন করা মানুষের নয়, লবজকে নিয়ে সামন্তত করাই তার। কলকারখানার ছুগে বায়বা থেকে সৌন্দর্যবোধকে বাহ দিয়ে ভিনিসটাকে সেই পরিমাণে সহন করেছে, তাতেই মুনফার বৃত্তা কৃষ্টিতায় দানবীর হয়ে উঠল। এ বিকে মানুষতার আনন্দের হাল লাগল যানি ঢেঁকি থেকে বিজ্ঞানকে চেঁচেমুছে ফেলায় ওগুলা সহন হয়েছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত জীবিকা অশ্রুতায় স্থাবর হয়ে রইল; বাড়েও না, এগিরে চলেও না, নড়বড় করতে করতে কোনোধাতে ঠিক থাকে। তার পরে মার খেয়ে মরে শক্ত হাতের থেকে। প্রকৃতি পঙ্ককেই সহন করেছে, তারই জন্ত বসন্ত; মানুষকে করেছে অটল, তার জন্তে পূর্ণতা। গাঁতারকে সহন করতে হয় বিভিন্ন হাত পা নাড়ার সামন্তত ঘটিয়ে, হাঁটুজলে কাপা ঝাঁকড়ে অন্ন পরিমাণে হাত পা ছুঁতে নয়। ধনের আচ্ছন্ন থেকে গুচ্চ আঘাতের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অগ্রবস্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে আগ্রত ক'রে।

এই সমস্ত কথা ভাবছি, এমন সময় আনন্দের করাসি জাহাজ এল পণ্ডিতের ব্যবহার। ডাঙা শরীর নিয়ে কখনো কঠোর করেই নামতে হল। তা হোক। অরবিন্দ যোগেব লগ্নে বেধা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুলুন, ইনি আত্মায়েই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্তার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা গুচ্চপ্রোত। আমার মন বলল : ইনি এর অত্মদের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পকণ ছিলুম। তাঁরই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহন প্রেরণাশক্তি পুষ্টিত। কোনো বরদস্তর মতের উপবেশতার নৈবেদ্যে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি স্রিষ্ট ও বর্ধ করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যের শাস্তির উল্লস আসা। মধ্যম্ভের দৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে বীকা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত গুচ্চ করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনায় মধ্যে কবি পিতামহের এই বাণী অহুভব করেছেন : বৃত্তাস্থানঃ সর্ববৈবাবিশিষ্ট। পরিসূর্ষের যোগে শব্দগেই অণে প্রবেশাদিকার আত্মার স্রেষ্ট অধিকার। আমি তাঁকে বলে এসুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আনন্দের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অশেষর থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে : শূন্য বিশে।

প্রথম ভগবানে শকুন্তলার উদ্বেগান হয়েছিল বৌবনের অভিযাতে প্রাণের চাকলো। বিত্তীয় ভগবানে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শাস্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর বৌবনের মুখে স্রষ্ট আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্তার আসনে সেবেছিলুম সেখানে তাঁকে মানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

আমি তাঁকে দেখনুম তাঁর বিত্তীয় তপস্তার আসনে অগ্রগণ্য স্রষ্টতায়, আশ্রণ তাঁকে মনে মনে বলে এসুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

ਅਰਾਜਿਕ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ !
 ਨੇ ਰੱਖੀ, ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੁਪਰ-ਅਰਾਜਿਕ
 ਸਾਰੀ-ਸ਼ਾਇਰੀ ! ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰ,
 ਸਾਰੇ ਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੁਆ; ਆਪਣੇ ਸੁਆ ਸਾਰ
 ਸਾਰ ਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੁਆ; ਆਪਣੀ ਸਾਰ
 ਸਾਰ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ! ਸਾਰ ਸੁਆ
 ਸਾਰ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ, -
 ਸਾਰ ਸੁਆ ਸਾਰ-ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ
 ਸੁਆ ਸੁਆ; ਸਾਰ ਸੁਆ ਸੁਆ
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ, ਸੁਆ ਸੁਆ
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ; ਸਾਰ ਸੁਆ
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ;
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ; - ਸੁਆ ਸੁਆ
 ਸੁਆ ਸੁਆ - ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ -
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ,
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ,
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ
 ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ ਸੁਆ

[illegible]

[illegible][illegible]

ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାରର ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଅନ୍ଧାରର, ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏହି ସମୟରେ ।

ଓଡ଼ିଆର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାଏ, ଯାଏ ଶୃଙ୍ଖଳାର
ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଯାଏ- ଯାଏ,
ଯୁଦ୍ଧର ଯାଏ ଯାଏ, ଯାଏ ଯାଏ
ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ, ଯାଏ ଯାଏ
ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ- ଯାଏ
ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ।

ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ,
ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ,

ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ - ଯାଏ ଯାଏ

ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ,

ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ,

ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ,

ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ,

ଓଡ଼ିଆର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ !

୧୯୮୯-୨୦୧୫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০১-১০৪৭

বিভূতিভূষণের রচনা

বিভূতিভূষণের রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব ইচ্ছা ছিল। কখনো কখনো এ বিষয়ে বিভূতিভূষণের সহিত কথা বলিয়াছি। তিনি খুশি হইয়াছেন, বলিয়াছেন, 'বেশ হবে, তুমি দেখো।' কিন্তু কিছুই করা হইয়া গঠে না, সমস্যাভাব ও আলস্য প্রধান কারণ। আরও একটি কারণ ছিল, তাহািহাি এত ঘরা কিনের? আলোচনার যোগ্য অনেক বই বিভূতিভূষণ অবস্তা লিখিয়াছেন, কিন্তু আরও কিছু লিখুন না কেন। হর সময়ে কাছে আসিলে তবে তাহার পূহা রূপটি সহজগ্ৰাহ্য হয়, বিভূতিভূষণ রচনার ধারা তো এখনো সমাপ্তির কাছে আসে নাই, তবে আবার এত ঘরা কেন। কিন্তু 'সবের' কাছে আসিবার আগেও যে হরকাহের জীবন সমাপ্ত হইতে পারে এই মূল কথাটা মনে পড়ে নাই, অন্তত বিভূতিভূষণ সম্পর্কে মনে পড়িবার কোনো কারণ ছিল না। হর সবল প্রাণবান পুরুষ ছিলেন তিনি। দুত্ব চরম ঘনিকা টানিয়া বিহা অকালে সমাপ্তি ঘটাইয়া দিল। বিভূতিভূষণ সাহিত্যিক ব্যাতি অক্ষর হইল, কিন্তু তাহার সাহিত্যধারার আর প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। আবার প্রত্যাশিত সব আসিল না, আসিল চরম শাস্তি। এক সময়ে ভাবিয়াছিলাম এত ঘরা কেন, এমন জাতিতেছি আর বিলাস কিসের? এখন এ আলোচনার তাহার খুশি হইবার সম্ভাবনা আর নাই; নাই ধাতুক, আদি তো খুশি হইব, আর আমার হত তাহার অহুয়াগ্নিগণও খুশি হইবেন আশা করিতে পারি।

বিভূতিভূষণ রচনার সাহিত্যিক আলোচনার ইচ্ছার মূলে বিশেষ একটি কারণ ছিল, দে-কারণ এখনও বিস্তারিত। সেটি বুঝাইয়া বলিলে বিভূতিভূষণের রচনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইবে, অমনি প্রসঙ্গত বর্তমান সাহিত্য সংক্রান্ত কুশাশাও বানিকটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

বিভূতিভূষণ সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, তাহার রচনার কালের ও সমাজের পরিচয় একেবারেই নাই। আবার বিভূতিভূষণের রচনার তাহার অহুয়াগ্নি তাহার এ কথা স্পষ্ট না বলিলেও অহুয়াগ্নি সম্বন্ধে যে তাহার মনেও আছে, কেবল বিচ্ছিন্ন পক্ষের শক্তিবৃদ্ধির ভয়েই প্রকাশ করেন না, এমনও মনে হয়। বিভূতিভূষণ সমালোচকগণ বলেন যে, বর্তমান ব্যাঙ্গি লেখকগণের সকলেরই রচনা যকণ ও বদমায ধারা চিত্তিত, কিন্তু বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনার মনে বেশকালের কৈবল্য ঘটয়াছে, সেসব যে আবাকর 'সেটা' তাহা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধিবার উপায় নাই, তাহার রচনার যে কোকিল জাতিতেছে তাহা শুনিয়া মনে পড়ে 'বাংলা দেশে ছিলার বেন তিন ন বছর আগে'। তাহার-বহর তাহার বাংলা দেশের অস্ত্র দুইজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর উল্লেখ করেন। তাহার বলেন যে, তাহার-বহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বনজলের রচনা পড়িলেই মনে হয় যে লেখক বহর-বিশ শতাব্দীর বাংলা দেশের লোক। আর শুধু তাই নয়, বৃহদ্রাজের বেশবেশবের ভাবাবেগনের অব্যক্ত আদিয়া তাহারের শিল্পকলকে নিরন্তর বোলাইভেছে; বিভূতিভূষণের রচনার তেমন সেবি কই? তাহারের মতে বিভূতিভূষণের শিল্প তরবহীন,

কালের চাকলাহীন সন্ধ্যাবের পল্ল। এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে চিন্তার বিষয় বই কি। কিন্তু আমরা কি এ অভিযোগ সত্য? কোনো কৃতী শিল্পীর পক্ষে স্বকাল ও স্বসমাজকে এড়াইয়া শিল্পকষ্টি করা কি আরো সম্ভব? সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস স্বরণ করিয়া তো এমন একটি দৃষ্টান্তও চোখে পড়িতেছে না। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, তারাপন্থর বন্দোপাধ্যায় ও বনকুলের রচনায় কালের ও সমাজের ঠিক যে লক্ষণগুলি প্রকট বিকৃতিবাস্থ্য রচনায় হয়তো সেগুলি প্রকট নয়। কিন্তু অল্প লক্ষণ যে প্রকট হয় নাই তা কে বলিল? কাল যে কেবল নিরবধি আর পৃথিবী যে কেবল বিপুল্য তাই নয়, বেশ ও কালের ধর্ম ও লক্ষণও বিচিত্র। এমন কোন ধর্পণ আছে বাহ্যতে সমগ্র আকাশের প্রতিবিম্ব ধরে? এমন কোন লেখক আছে সমগ্র জীবনের ছাপ যে ধরিতে সক্ষম হইয়াছে? জীবন যখন অপেক্ষাকৃত সরল ছিল তখনকালও সমস্ত ছাপই কি হোমায়ে আছে, না, দাস্তেতে আছে, না, শেক্সপীয়ারে আছে? জীবন তো ক্রমেই অঙ্গি হইয়া উঠিতেছে। ডিকেন্স ও থ্যাকারে দুই জনেই সমসাময়িক এবং দুই জনেই দুগুণ উপন্যাসিক। কিন্তু ডিকেন্সের উপন্যাসে যুগের যেদব লক্ষণ প্রকট, থ্যাকারের উপন্যাসে সেগুলি প্রকট হয় নাই, অল্পগুলি প্রকট হইয়াছে। তাই বলিয়া ডিকেন্সের তুলনায় থ্যাকারেকে কেহ নিন্দা করে না, এই-টুকু মাত্র বলে যে তাঁহাদের ধর্পণ ভিন্নমুখে অবস্থিত, তাই ভিন্ন দিকের ছায়াকৃতি পরিগ্রহে। কাজেই তারাপন্থরবাস্থ্য ও বনকুলের রচনায় স্বকালের ও স্বসমাজের যে লক্ষণ প্রকট, সেগুলি যদি বিকৃতিবাস্থ্য রচনায় না থাকে, তাই বলিয়াই তিনি নির্দার্য নহেন। তাঁহার রচনায় হৃদয় সমাজের ও কালের অল্প দিকের ছায়া পড়িয়াছে। সেগুলির স্বরূপ-আবিষ্কারই বর্ধার সমালোচনাকর্ম। সমালোচক ও নিম্নক পিত্র গোত্রের মাস্থ্য।

এ যুগের কতকগুলি লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট, কাহারো চোখ এড়াই না, এমনকি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের পক্ষেও সেগুলি সহজগ্রাহ্য। তেমন একটি লক্ষণ ঐতিক-ধনিক-সংঘাত, আর-একটি লক্ষণ সর্বজনীন অসন্তোষ। এই দুটি দ্বারা অঙ্গসরণ করিলে বাকি অনেকগুলি লক্ষণকে উপধারা রূপে পাওয়া যাইবে। বর্তমান অধিকাংশ বাঙালি লেখকের রচনা এইদব দ্বারা ও উপধারার দ্বারা চিহ্নিত। বীকার করিতেই হইবে যে, বিকৃতিভূষণের রচনায় এগুলি বৈশিষ্ট্য নয়। ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, তিনি বিশিষ্ট। সেটা তো নিন্দার বিষয় নয়।

২

বিকৃতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোট গল্পের অবলম্বন কি? মাস্থ্যের প্রাত্যহিক জীবন। মাস্থ্যের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো স্বধ-দুঃখের যে লীলাচাকলা আছে, স্বধের ভিতরে যে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দের ইচ্ছিত আছে, বিকৃতিভূষণ সাহিত্যরচনায় অল্প সেগুলিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, জীবনাক্ষর তাঁহার সাহিত্যের উপকীর্ষ্য নয়। এদিক দিয়া তাঁহার গ্রন্থগুলিকে গার্ব্য উপন্যাস বলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে যেসময় গার্ব্য উপন্যাস বাংলাদেশে লিপিত হইয়াছে বিকৃতিবাস্থ্য রচনা ঠিক সে পর্যায়স্থক নহে। কারণ এমন একটি নূতন উপাধান তাঁহার রচনায় আছে, জলে যে ভাবে ছায়া মিশ্রিত হইয়া থাকে সেইভাবে আছে, দ্বারা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের



বিত্তিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্রামকীর্তন কবিচরণ গুপ্তের স্মৃতিচিহ্ন

গার্হ্য উপভাসে ছিল না। সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অজানিত ছিল। এটি জীবনের একটি নতুন যন্ত্র, আশ্বাসের সেনে তে। বটেই, পাশ্চাত্য সেনেও। প্রকৃতিকে জীবনের উপাদান রূপে গ্রহণ ও স্বীকার নতুন যুগের লক্ষণ, সে নতুন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে রবীন্দ্রোত্তরণ গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তরণ কথাসিদ্ধান্তের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনা নতুন, সেন ও কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক, প্রমিত-ধনিক-সংঘাত বা সর্বজনীন অসন্তোষের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নতুন সাহিত্যের এখানেই প্রভেদ। এই প্রভেদের রচনা কবে কিরূপভাবে হইল? এখানে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নজির গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে Lyrical Ballads ও Industrial Revolution সমসাময়িক। ভূতাই নয়, একই মনোভাবের ও জীবনধারার এপিঠ-ওপিঠ। আরও একটি নজির স্বরণ করা বাইতে পারে। রূপো ও জন্টোয়ারকে ক্রাদি বিশ্ববের পূর্বসূরি বলা হয়। কিন্তু দু'জনের জীবনধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। জন্টোয়ার যন্ত্রপাতির পরোক্ষ ভুক্ত, আর রূপো প্রকৃতির প্রতি অন্ধ আকর্ষণের প্রত্যক্ষ স্ববি। একজন নিরিকাল ব্যালাডের শব্দে মতামত, অপরজন মতামত ইনভাণ্ট্রিয়াল রিভলিউশনের শব্দে। আর পর্বত সভ্যসম্প্রদায়ের জীবনধারা এই দুই ধারার দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও আন্বলিত। একটির উপায়া প্রমিত-ধনিক-সংঘাত, অপরটির উপায়া প্রকৃতিকে জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ। এই ধারা ও উপায়া কালক্রমে আমাদের জীবনে, কাজেই আমাদের সাহিত্যেও, আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রচনায় আছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি প্রধানত একতরফে গ্রহণ করিয়া তাহাতে বৈচিত্র্য, পটুতা ও আধ্যাত্মিক আলোক আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তীপন কেহ একটিকে, কেহ অপরটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ঐহিকের রচনা প্রমিত-ধনিক-সংঘাতের বা সর্বজনীন অসন্তোষের বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া সকাল ও বসবার লক্ষণ পাইলাম মনে করি, তাঁহার আধুনিক মনে করি, এ যেমন সভ্য, তেমনি ঐহিকের রচনা প্রকৃতিকে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হইতে দেখি, তাঁহারাও তেমনি আধুনিক হইবেন, ইহাও তেমনি সভ্য। বস্তুত কোনো লেখক ইচ্ছা করিলেও অস্বাভাবিক হইতে পারেন না, বস্তুত্বের আধুনিকতাকে প্রকৃত রাখিতে পারেন, এই পণ্ড। বিভূতিবাবু ইচ্ছা করিয়া আধুনিকতাকে প্রকৃত করেন নাই, আবার উগ্রভাবে প্রকট করিয়াও তোলেন নাই, শিল্পের ইন্দ্রিয়ের সাতরঙের সঙ্গে স্বেকশেলে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে তাহা অনেকের চোখ এড়াইয়া যায়। বর্ণিত ব্যক্তির মত কাব্যিক ব্যক্তিও সংসারে অবিরল নয়। চোখের সোপানের স্তম্ভকে সোপী করা কি ক্রান্তমত !

বিভূতিবাবু যে আর মনজর শক্তিশালী বাঙালি লেখকের মতই আধুনিক, সকাল ও বসবার লক্ষণের অধীন, এতদঞ্চ ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম। এবার সেই লক্ষণের বিশেষ রূপ কি, দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ও

সাহিত্যে প্রকৃতির দুটি রূপ দেখিতে পাই। একটি বাহ্যের প্রতিকূল ও প্রতিস্পর্শী, সে মানববিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, আপন নিম্নে ও আপন প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ও চালিত; আর-একটি বাহ্যের অন্তর্কূল,

ও সর্বদা মাহুঘের কাছে ধরা বিতে প্রান্তত, সে ক্ষণে ক্ষণে মানবলম্বালের সঙ্গে মিশিয়া নিয়া মাহুঘকে বিচিত্রতর ও স্বন্দরতর করিয়া তুলিতেছে। প্রথমটির রূপ দেখিতে পাই হান্তির *Egdon Heath* এ এবং হেগার *Toilers of the Sea* সমুদ্রে; দ্বিতীয়টির রূপ বিভিন্ন মহাকবির কাব্যে লুপ্তমান। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে, কাদিহাসের শব্দভাষা ও অজ্ঞাত কাব্যে, রবীন্দ্রনাথে, শেলি প্রভৃতির কাব্যে প্রকৃতি মাহুঘের অহুকুল ও অহুবকী। অবশ্য কবির ভাব অবশ্যই এবং কালের কতি অহুসারে তাহাতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাই অধ্যাত্ম মহিমা, মাহুঘ ও প্রকৃতি যেন একই সাধনপথের সাধক ও উত্তরসাধক; রবীন্দ্রনাথে 'মানবের রূপ হেঁসি বরণার মাত্রে'। একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। ঐহারাই মাহুঘ ও প্রকৃতিকে একত্রে দেখিয়াছেন ও গাঁথিয়াছেন সকলেই কবি। বহুমতান্ত্রেও এই কবিপ্রাপ্ততা লক্ষ্য করিবার মত। বিহুতিভূষণও মূলত কবি।

বিহুতিভূষণের উপর্যাসেও প্রকৃতি ও মাহুঘ একত্রে প্রতিভা। তাহার সর্বজনপরিচিত অণু-অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি'। কিন্তু এটি কেবল অণুর লক্ষণ নয়, বিহুতিভূষণের সমস্ত রচনায়ই সাধারণ লক্ষণ। তবু এটাই মধ্যে একটু প্রভেদ ও একটি বিবর্তনের বেগ লক্ষ্য করা যায়। তাহার প্রথমজীবনের উপর্যাসে মানবকে নিগূর্ণনিত ও নিগূর্ণকে মানবায়িত করিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকৃতি পন্নী-প্রকৃতি। বাংলাদেশের পন্নীতে প্রকৃতির যে রূপ বেশা যায় তাহা ক্ষুদ্র নয়, ভীম নয়, তাহা বিহু ও ক্ষুদ্র। তাহা আবাদগকে মুক্ত করে, অতিক্রম করে না। পন্নীবালক অণু ও পন্নীপ্রকৃতি যেন পরস্পরের পোষায় সাধী, যেন পরস্পরের পরিপূরক।

তাহার পরবর্তী কালের গ্রন্থে, যেমন আরম্ভকে ও যে অরণ্য কথা কও গ্রন্থে, প্রকৃতির রূপ ভিন্ন। বসন্তত ভাবে সে প্রকৃতি পাহাড়পর্বত, অরণ্যমালা ও ক্ষুদ্র বহুর ভূষণ। কিন্তু এখানেও দেখি একটি পরিবর্তন ঘটিত হইয়াছে। পাহাড়পর্বত, অরণ্য ও বহুর ভূষণ— কোনোটাতেই ভীমকায় সৌন্দর্যকে কবি দেখান নাই, কারণ তিনি দেখেন নাই। তাহাদের মুক্ত ও স্বন্দর দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন এবং আঁকিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির দুর্গম বৃত্তিগুলিকে যেমন তিনি অঙ্কিত করেন নাই, তাহার প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র রূপটাকেই যেমন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনই প্রকৃতি লয়ভেদে তিনি এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন। বসন্ত বাঙালিও অণু বালকই থাকিচা গিয়াছে, বালাজীবনের সরল সৌন্দর্যই তাহার প্রাধান্য সম্পন্ন। এই সরল সৌন্দর্য অমনেই বিহুতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। প্রকৃতির মধ্যেও সেই সরল সৌন্দর্যেরই তিনি সন্ধান করিয়াছেন। পন্নী-প্রকৃতিতে তাহা সহজলভ্য। পাহাড়পর্বতে ও দুর্গম অরণ্যে তাহা সহজলভ্য নয়, কিন্তু একবারে দুর্গতও নয়। এই দুর্গভের আবিকাবেই বিহুতিভূষণের প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। বিহুতিভূষণ সমস্ত মানবলম্বাকে অণুর সমাবেশরূপ দেখিয়াছেন, আবার প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকেও পন্নীপ্রকৃতির রূপান্তরভাবে দেখিয়াছেন। তিনি কৈশোরের কবি, সরল সৌন্দর্যের সন্ধানী। গৃহের আত্মনা তাহাকে যেমন মুক্ত করে, এমন আর কিছু নয়। জীবন তাহার কাছে সংগ্রাম নয়, বেলাঘর। সেইজন্য রথক্ষেত্র তাহাকে আকর্ষণ করে নাই, করিয়াছে বালকের বেলাঘর। বৃহৎ বিশ্বকে বেলাঘরে পরিণত করিয়া দেখিতে না পারিলে যেন তাহার কৃতিত্ব নাই। বিহুতিভূষণের বিষ একটি অস্বপ্ন ও অবিচ্ছিন্ন বেলাঘর; তাহার অবিচলিতা সবলেই বাসক-বালিকা, সেখানকার পাহাড়পর্বত অরণ্য প্রান্তর সবই বেলাঘরের মাগের। তাহার বিশ্বকর্মা নিজেই যেন বালক, খেলার সঙ্গী পড়িয়া খেলার শব্দ মিটাইয়া গাইতেছেন— বিহুতিভূষণ নিজেও শেষ পর্যন্ত বালক

ছিলেন। তাই জীবনের অটল ও দুর্গম দিকটা তাঁহার চোখে পড়িত না, কিংবা পড়িলেও অটলতার নর-বৃদ্ধিতে পারিতেন না, সম্বন্ধেই নিম্নের ছাঁচে সয়ল করিয়া প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার বেবদান গ্রন্থখানিও এমনি একটি রহস্তময় পেলাওয। রহস্তময় এই মত বলিলান যে বেবদানের মত রহস্তময় আর কি হইতে পারে। জীবনের সমস্ত ব্যাপ্তি যে স্ত্রীস্বভাবের পাণ্ডা যার, তাহার সাহচর্যের ক্ষুদ্রতাই কি দেখিব ? তাহার রহস্তের অভলতা কি কিছুই নয় ?

পরলোকের মত ব্যাপার, বাহার প্রমাণ নাই, বাহার অস্তিত্বে অনেকেই অবিবাসী, তাহাকে শিল্প-বস্তুতে পরিণত করা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়গাভীকে ইন্দ্রিয়গাভীরূপে প্রকাশের মাধ্যম কোথায় ? চরের নাপকাটি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবু বিহুতিবাবু বেবদানে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অসাধারণ। পরলোককেও তিনি একটি পেলাওরূপে রচনা করিয়াছেন, বড়োড়ের সে বেন ও বাড়ির পেলাওর, বড়োড়ের তাহার পেলাওর বেন আর-এক অয়ের লোক। হয়তো এই একটিনায়ে রূপেই পরলোককে ইন্দ্রিয়গাভী শিল্পরূপে পরিণত করা সম্ভব, অতঃপর হয়তো সত্যই নাই।

ধাহারা বেবদান গ্রন্থে পরলোকের দেখিতে পান তাহারের সঙ্গে আমি একমত নই। উহা পরলোকভব নয়, পরলোকের উপস্তাপ। বস্তুত ধাহারা বিহুতিভূষণের রচনায় অণেকণে ওয় অবিচার করিয়া থাকেন, তাহারেরই সঙ্গে আমার মন্তের গভীর অনৈক্য। তবু যদি কিছু থাকে থাকুক, তাহাতে বিহুতিবাবুর কৃতিত্ব নর, বরঞ্চ বেবদানেই তবের বাড়াবাড়ি দেখানাই তাঁহার রচনার দুর্বলতা। যখনই তিনি ভাবিতে শুরু করেন, অপুর মত কথা বলেন ; কিন্তু যখন তিনি সম্বন্ধ করিতে শুরু করেন, তাঁহার তুলনা নাই। বিহুতিবাবুর অণং স্নিগ্ধ নয়, দ্রব। এই ধানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। বাহুরের ও প্রকৃতির সংগারে (বিহুতিবাবুর কাছে দুই ঘনে প্রতিবেশী ও একই খেলাঘরের খেলুড়ি) বে-আনন্স ছড়ানো রহিয়াছে, El doradoর রাজপথে যেমন হনিবাবিকা ছড়ানো থাকে তেমনই ভাবে যে সহস্র স্বপ্নরূপ ছড়ানো আছে—বিহুতিবাবু মূঢ় অপুর মত তাহা হুড়াইয়া আঁচলে সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে কি তাঁহার ভ্রগতে ভ্রগ নাই ? অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাও খেলাঘরের ভ্রগের চেয়ে উত্তরতর নয়, বেলা জাতিসেই সে ভ্রগ ভূমিতে বেশিগ্ন লাগে না, অবিশিষ্ট থাকে বেলায় স্বষ্টি। যে Joy in widest commonality spread, তাহাকেই গভীরভাবে শুদ্ধভাবে দ্রবয়ে গ্রহণ এবং সয়লভাবে প্রকাশ বিহুতিভূষণের স্বাধ কৃতিত্ব এবং তাঁহার সাহিত্যিক অমরত্বের দাবিও এই সূত্রে।

বিহুতিভূষণের রচনার পরিমাণ নিত্যান্ত সামান্য নয়। দু-একখানা বই বানে তাঁহার সবগুলি রচনাই স্বপণা ও উচ্চাদের সাহিত্য। মূল্যবান বেশি কাগজ যেমন নিবিশেষে গায়ে লাগিয়া থাকে, একটুও বেখাপ হয় না, তেমনই তাঁহার ভাষা ও ভাব গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে, কোথাও এতটুকু ব্যাবধান নাই। এমন যে হইতে পারিগাছে তাহার কারণ বিষয়নির্বাচনে তিনি তুল করেন নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ পথের পাঁচালীকে অনেকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। প্রথম গ্রন্থেই তিনি তাঁহার প্রতিভার যোগ্য বিষয়কে লাভ করিয়াছেন, এমন সৌভাগ্য অল্প লেখকেরই হইয়া থাকে। অনেক লেখক আছেন ধাহারা তুল করিতেই অভ্যস্ত। হেমচন্দ্রের স্বাভাবিক শক্তি ছিল ব্যঙ্গ-রচনার, অথচ তিনি বৃহদাকার মহাকাব্য রচনার শক্তির অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আবার নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক শক্তি শিথিল রচনা, তিনিও মহাকাব্য রচনার শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। বিহুতিভূষণ একিক দিয়া সৌভাগ্যবান।

বিষয় ও বিষয়ী এখানে অস্বাভাবিক। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার আবার মূল কারণ, বিকৃতিভূষণের দোষাকার শিল্পী ও ব্যক্তিতে কোনো ক্ষম ছিল না, শিল্পী ও ব্যক্তি পরস্পরের সমর্থক ও পরিপূরক ছিল। অনেক মূলেই দেখা যায় ব্যক্তি ও শিল্পীতে একটা স্বস্থের ডাব বিস্তমান, এবং সেই স্বস্থে তাঁহাদের রচনা যিগায়ত, তাঁহাদের রচনা ও পাঠককে পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বিকৃতিভূষণের তুচ্ছতম রচনা ও বৃহত্তম উপভাস সম্বন্ধেই পাঠককে তৃপ্ত করিয়া থাকে, কারণ সেখানে ব্যক্তি ও শিল্পী দুই মনেই সমান তৃপ্তির সহিত রচনাকারে সহযোগিতা করিয়াছে, কোথাও এতটুকু অতৃপ্তির ঘিমা নাই।

বাংলাদেশে বিকৃতিভূষণের চেয়ে শক্তিমান লেখকের অভাব নাই, কিন্তু একমাত্র শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে এমন অনগ্রসর ও তৃপ্তিদায়ক লেখক আর আছেন কি না সন্দেহ। ইহার কারণ তাঁহার অল্প (তাঁহার সৃষ্ট সব চরিত্রই অল্পবিস্তর অণুব্রাজ্য) আমাদেরই বিম্বত শৈশব। তাঁহার নিশ্চিন্দ্রপুর আমাদেরই ছাড়িয়া-আসা গ্রাম, তাঁহার রচনা সেই গ্রামেই মানসগাহার পথ; আর স্বয়ং বিকৃতিভূষণ, তাঁহার রচনা পঙ্কিতে পঙ্কিতে তুলিয়া বাই তিনি যে একজন লেখক, মনে হয় তিনি যেন আমাদের শৈশবের বিম্বত-প্রায় বেলার সান্না, মনে হয় তিনি যেন আমাদের পূর্বজন্মের বিম্বত বেলার সান্না। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র, তাঁহার অঙ্কিত পরীপ্রকৃতি, তাঁহার রচনা, এবং স্বয়ং লেখক-মাহুঘটি আমাদের এমন মূঢ় করে, এমন তৃপ্তিদান করে, আমাদের বিম্বত শৈশবকে আগাইয়া দিয়া পুনরায় সেদিনকার খেলাঘরে এমন অনায়াস আনন্দিত্যের সহিত আনন্দ করে। আবার মনে হয়, এখানেই তাঁহার অনগ্রসরতার বহুস্তর মূল। এমন কথা কখনো সাহিত্যিক সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। সাহিত্যসত্য তিনি যোগ্য আসন পাইবেন কি না জানি না, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে এই সর্গার বেনুড়ির গলায় বনফুলের মালা পরাইয়া দিতে অল্প বেনুড়িগণ যিগা নাজ করিবে না।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

বিকৃতিভূষণের ছোটগল্প

যে কারণেই হোক, বাঙ্গালি পাঠকের নিকট ছোটগল্প অপেক্ষা উপভাসের আদর বেশি। তাই পথের পাচালী, অপরাজিত, দৃষ্টপ্রদীপের স্রষ্টা বিকৃতিভূষণ পাঠকের নিকট ঘত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, দেবদাস, মৌরীকুল, পুঁইমাচার লেখক বিকৃতিভূষণ ততটা নহেন। উপভাসের বৃহৎ পটভূমিকায় তেলরঙে আঁকা বর্ণাঢ্য চিত্রপটের পাঠকের চোখে এক বলসাইয়া দিয়াছে যে, তাহারই কাঁকে কাঁকে অলসভে আঁকা ছোট ছোট চিত্রগুলি হৃদয়কে পরিপূর্ণ সমাধির পাথ রাই। কিন্তু মূঢ় পাঠকের বিচারে এই ছোটগল্পগুলির উৎকর্ষ তাঁহার উপভাস হইতে এক তিল কম নহে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা সেইবা বিতর্কের অবসান আঁকও হয় নাই, কারণ আসলে ছোটগল্পের সংজ্ঞাই নাই। চুলচেরা হিসাব করিয়া পদে পদে মিল খুঁজিয়া অভিধান সেখিরা লনেট রচনা যদি-বা সম্ভব হয়, অসম্ভব পান্থিক কোশলে ছোটগল্প লিখিবার চেষ্টার বার্বতা অবগতাবী। বিকৃতিভূষণের সাফল্যের প্রধানতম

কারণ এই যে, তিনি এই গাণিতিক কৌশলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অবলীলাক্রমে কাহিনী বলিয়া গিয়াছেন, এবং বিনা অস্বাভে বাহা বলিয়াছেন তাহাই পরিপূর্ণভাবে রপোত্তীর্ণ ছাটপল্ল পদ্বিত হইয়াছে।

বিহুতিভূষণ বেশ ঘুরিয়াছেন প্রচুর। কিন্তু বাঘে বাঘে ফিরিয়া আসিয়াছেন বশোর জেলার এক অবাণ্ড পল্লীগ্রামে, বাহার শব্দ শ্রবণ রস গন্ধ তাহার কল্পনাকে প্রেরণা আঁগাইয়াছে। এই নগণ্য পল্লীর মধ্যে এত কাব্য, লুকাইয়া আছে—এ খবর বিহুতিভূষণের আগে কেহ পায় নাই। ইহারই মধ্যে তিনি অবিরাম গল্পের বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন, ইহারই ধাঁধাঝড় পুস্তক ভোবা বন্যপ বন্যহৃদয়ের স্বাস্য তাঁহাকে নব নব স্রষ্টারে অহুপ্রাণিত করিয়াছে।

এ কথাই অর্থ ইহা নহে যে, বিহুতিভূষণ শুধু এই গ্রাম ও পারিপার্শ্বিককেই চিনিয়াছিলেন, আর-কিছুই খবর রাখেন নাই। 'তিনি নানা দেশ, নানা মাহুয়, এমন কি বিভিন্ন কাল লইয়াও গল্পরচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কল্পনার উৎস কোথায়, তাহা বুঝিতে পারি হই না।

সর্বসম্মত তিনি চিনিয়াছিলেন পল্লীর মাহুয়গুলিকে। গল্পের পাঞ্জরায়ী হওয়ার বিশেষ-কোনো যোগ্যতা তাহাদের নাই। নাগরিক সভ্যতার হাওয়া তাহাদের গায়ে লাগে নাই, রাগামাটিকে ও তাহার পদম সঁজার চোখে দেখে, দাখিলিত মেলের কার্ট-সেবে ও ক্লাসের আলোকমালা দেখিয়াও তাহার বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে; বাহাদুরপুর পর্যন্ত রেলপথে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের কাছে যে সম্মান পাওয়া যায়, বাহিরের পুঁথিবীতে ততটা সম্মান পাইতে হইলে অন্তত স্নেহের পর্যন্ত ভ্রমণ করা প্রয়োজন।

এই নিত্যন্ত অল্প সরল মাহুয়গুলির বিবরণ তাহার অনেক গল্পেই পাওয়া যায়। এইরূপ একদল মাহুয়ের পরিচয় নিম্নে মরীচিকা গল্পে :

এটী গাঁ, সবচেয়ে বড় পল্ল্যের লোকের বাস। কেহ বিশেষ বাঘ না, চাকুরী করে না, কতিয়োর দরকারও নাই। সামান্য পরিষদাই নাকি। চাউরি একতরফে একরকম নিবাসিত করে। কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় জগটা আছে, সে-সময়ে কেহ কিছু জানেও না, ছাতিবার ভক্ত বাধাও বাধায় না। তাই কাল ঘন জালা বেশ, চাউর-বাড়ির বেতে দেখিতে যে আসিতেছে, সে কলিকাতার জেল ও কমাণে শিকিত, তখন এই অকৃতপূর্ণ জীবটিকে বেঁধার ও তাহার সহিত কথাবার্তা করিবার আনন্দটা বাঙাল আনন্দকে ছাপাইয়া উঠিল। —মৌরীজুল, মরীচিকা, পৃ ১১২

উপরের বর্ণনা শুধু কুলবেড়ে গ্রামের নহে, বিহুতিভূষণের রচনার বহুগুলি পাড়াগাঁয়ের বিবরণ আছে, সকলের উপরেই প্রযোজ্য। এ ঘেন একটা ভিন্ন জগৎ। এ জগতে কলকারবানো নাই, মোটরগাড়ি-ট্রাম নাই, সিনেমা নাই, হুতো কাছাকাছি রেলপথও নাই। এখানে দিগন্তপ্রসারী মাঠ আছে, ধানক্ষেত আছে, ঘনবন ঝোপঝাড় আছে, ঠৈঠৌর ঝকল আছে, বেটুফলের সুহৃৎ সুহৃৎ স্বাস্য আছে। অশরৎ পল্লীযু নির্জন মেঠো পথ বিধা পুস্তকের জল লইতে আসে, গা ধুইতে ধুইতে হুঁহের শেখরশি দিলাইয়া যায়, চকিতে কলস ভরিয়া লম্বুপে শক্তিতা বধু বাড়ি ফিরিয়া যায়।

অতীতের কাহিনী নয়, ঘোঁটাঘুটি বর্তমান যুগেরই কথা। নাগরিক জীবনের অবিরাম চকলতা এখানে অজ্ঞাত, কলিকাতার মত শহর ভ্রমবিপ্লব। নাগরিক সভ্যতার বড় সুখসুখের খবর ইহারা পায় নাই, নিজেদের ছোট সুখসুখ লইয়াই বাস্তব, সুখের সুখেরও প্রয়োজন অহুভব করে না, দুঃখেরও খবর রাখে না।

বিহুতিভূষণের রচনার রসোপলব্ধি করিতে হইলে এই মাহুয়গুলি ও তাহাদের পারিপার্শ্বিকের সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই অতিসাধারণ নগণ্য প্রাণীগুলির অস্বাভাবিক-অস্বাভাবিক-বেবনায় কাহিনীই তাঁহার ছোটগল্পের অস্তিত্ব উপলব্ধি।

ইহারা দেবদেবী মানে এবং দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস কখন জ্বলন্ত হুঁতুরে পরিণত হয় ইহারা জানিতেও পারে না। পুরাণোক্ত দেবদেবী এবং মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবদেবী তো আছেই, তাহা ছাড়া যে-কোনো অতি প্রাকৃত ঘটনার সংবাদ পাইলেই দৈবশক্তির অতিব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লয়। বাণেশ হুঁটির মধ্যেও দেবতা লুকাইয়া থাকেন, প্রয়োজন হইলে বেথা দেন, বিপদে উদ্ধার করেন, রোগীকে রোগমুক্ত করেন। দম্ভলালের বড়ছেলের বউ বিবাহের চার বৎসর পরে ক্যান্সারে পড়িল, জীবনের কোনো আশা রহিল না, যন্ত্রণার ছটকট করিতে করিতে একরাত্রে অন্ত্যায় হইয়া পড়িল—

ভায়াঃ ঘনে হইল, শাণের খুঁটি আর খুঁটি নাই।
তাহাদের শ্রাবের প্রাথমিক-মন্দিরের ভায়ায় ঠাঁহুর বেন সেখানে ঝুলিয়া
হু হু হালিহুং তাহার দিকে চাহিয়া আছে।—তাহাদের হুঁটি তাহার অপরিসীম নয়—তাহার হুঁটি, হুঁটি, হুঁটি
কমরী ভল প্রবীণী!—

—মৌজুল, খুঁটি-দেবতা, পৃ ১০

বহু রোগ লাগিয়া গেল। লেবক বলিতেছেন, “শতা মিথ্যা আনি না, কিন্তু খুঁটি-দেবতা সেই হইতে এই অকালে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।” কিন্তু সম্বোধের কোনো অবকাশ নাই। তাহাদের ধর্মের ভিত্তি বিশ্বাস, তাহারা স্বপ্নে ভাবনারূপে বেথিয়া রোগমুক্ত না হইলেই বিশ্বাসের কারণ ঘটে।

প্রসিদ্ধ মাপকারিতে কেলিয়া বিচার করিলে এ গল্পটির মধ্যে অনেক খুঁট মিলিবে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বিকৃতিভূষণের ছোটগল্পের ভিত্তিতে আইনকাছনের ধাপ-ধরা নিয়ম নাই, তাই ছোটগল্পের কোনো নিয়ম না মানিয়াও লিখকের বিচারে গল্পটি সঙ্গমানে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এমনি নিয়মবিহীন বেহিসাবী গল্প বিকৃতিভূষণের অনেক আছে। ‘হাসি’ গল্পটি অলৌকিক ঘটনার আখ্যান : পশ্চিমের কোনো ষ্টেশনে কয়েকজন বন্ধু ষ্টেজে কাতর হইয়া বসিয়া আছে, হাতির অধিকারের সহিত ষ্টেজের হাওয়া শিখিয়া যে অস্বাভাবিক সৃষ্টি করিয়াছে, একজন তাহাকে বলিল ‘uncanny sensation’। তাহার পরে ষ্টেশনমাস্টার আসিলেন, গল্প করিলেন স্বপ্নবনের মধ্যে নবীর উপরে নৌকার বসিয়া একরাত্রে হাসির শব্দ শুনিয়াছিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

আর বিশেষ কিছু নাই গল্পটিতে। কিন্তু গল্প শেষ হইবার পূর্বেই পাঠকের শরীরও uncanny sensationএ ভরিয়া যায়, যদিও ভীতিপ্রদর্শনের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও গল্পটির মধ্যে নাই। লেবক অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিনা কারিকুরিতে গল্প বলিয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহাতেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

‘প্রতাপ’ গল্পটিও অতিপ্রাকৃত বিষয় লইয়া। প্রতাপবিক্রম প্রাচীন সৃষ্টি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহারা হস্তে স্বপ্ন দেখিলেন, নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের সজ্জাবির দীপকর স্ক্রীডান তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। গল্পের বক্তব্য এ দুঃসংবাদ, প্রাচীন বৌদ্ধগণের আভাস আসিয়াছে প্রতাপবিক্রম অবলম্বন করিয়া।

বৌদ্ধগণ লইয়া বিকৃতিভূষণ একাধিক গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বহুবৎসর পূর্বে রচিত ‘বেবনায়’ অবিশ্বাস্যভাবে শ্রেষ্ঠ। শুধু বিকৃতিভূষণের রচনার মধ্যে নহে, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্পের সমগ্র খুঁজিলে এমন সার্থক গল্প সামান্য কয়েকটির বেশি পাওয়া যাইবে না। অতি বড় পাণ্ডিত্যিক সমালোচকও ইহার ক্রটি খরিতে ইচ্ছা করিবেন না।

তরুণ ছাত্র প্রাণির বাশির আলোপে অধিতীয়। স্বরসাস ছরনামধের কাশালিক গুণাচোর প্ররোচনার সে আশাটী পূর্ববার রাত্রে বেঘনমগ্নে আলাপ করিয়া দেবী সপথতীকে পৃথিবীতে আকর্ষণ করিয়া আনিল, সেই রাত্রেই গুণাচোর নগ্নে তিনি বশ্মিনী হইলেন, দেবীও তুলিয়া সামান্য অসহায়্য ভীক মানবীতে পরিণত হইলেন। ফলে দেশ হইতে বিস্তা ও শিল্পকলা অস্তিত্ব হইল, শিল্পী ছবি আঁকা তুলিলেন, শক্তি ব্যাকরণ তুলিলেন, ভাষার তথাগতের নৃত্তি গড়িতে দিয়া গড়িলেন দহা মনকের নৃত্তি।

দেবীর পূর্বরূপ কিয়দ্বিহা নিবার একটিমাত্র উপায়, কেহ যদি মন্ত্রপূত বল তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দেব। কিন্তু যে এ কাজ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে সে পাথবে পরিণত হইবে। গুণাচা কৃতকর্মের ক্রম অসুতপ্ত, কিন্তু পাথবে পরিণত হইতে বাসি নয়। কারণ, 'মৃত্যুর পরে হুজো পরমপং আছে, কিন্তু পাথব হওয়ার পর?'

সে কাজ করিল প্রভু, বাশির আলোপে যে দেবীকে গুণাচোর প্রভাবে আনিয়াছিল।

ভাষার দিক দিয়া এ গল্পটির তুলনা নাই—

হঠাৎ বাশির বাটটা থেকে সমর অস্ততার ফেটে গিয়ে সারা বাটটা তরল আলোকে ভ্রাবিত হয়ে গেল! এতদূর নবিতার সেকেন্দ, বাটের বাতখানে বস পূর্ণিমার সোণহার বস অপরূপ আলোর হতে কে এক ভাংএবাবই অনিশ্চয়তায় বহিরাবনী তরুণী! তাঁর নির্ভীক কলকপয়ালি অপরিস্রব-ভাবে তাঁর অপরূপ প্রাণবোধের পাণ দিয়ে হৃদয়ে গভীর, তাঁর আচরনম্বনর বীর্ণ কলকপ কোম স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর সুস্বাদুস্বাদু বাণবনী শ্রিতদুন্দুভরগণে বহিত, তাঁর স্বীণ কটী নীল বসনের মধ্যে অপরূপাভিত বসিবেশমায় শীতলিবা, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে বোঝার মতো মাটিতে দাসতী পুন্ডর বস ফুটে উঠেছে—ঐ, ঐ তো দেবী বাণী!

—বেশমার, পৃ ১০

একাধিক লেখক প্রাচীন যুগের কাহিনীতে দাঙ্কল্যাত করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই সে যুগের আবহাওয়ার স্রষ্টা করিয়াছেন সত্যভূতভাঙ্গা ভাষার সাহায্যে। একান্ত পরিচিত সহস্র ভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধযুগের মায়া রচনা করিয়া পাঠককে বিভোর করিতে ইহার পূর্বে আর কেহ পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। এইখানেই বিকৃতিভূষণের কৃতিত্ব। তাঁহার ভাষা বিবয়নিরপেক্ষ হইয়া শুধু রচনার গুণে বাঙালার পল্লী, বিহারের বনভূমি, বৌদ্ধযুগের বিমিশার আবহাওয়ার স্রষ্টা করিয়াছে। পল্লীবধুর মর্মবেবনা, কপাহীন গরিবের মেয়ের শোভাতুরবার উদ্বেগ, অপরাধী আত্মার ভীত হাহাকাহ, সবই ফুটিয়াছে ঐ একই ভাষায় সাহায্যে। মূলীয়ান্য দেখাইবার চেষ্টা নাই, কলে ভাষায় সহস্র সাবলীল গতি কোথাও ফুর হয় নাই। পাঠককে চমক লাগাইবার প্রয়াস নাই, বিনা আয়াসেই পাঠকের মন মুগ্ধ বিম্বিত হয়, হানকালের বন্ধন তুলিয়া কখনো প্রাচীন বিমিশার, কখনো বাঙালার পল্লীতে, কখনো বা তিন শ বছর আগে কীতি রায়ের ঘেঁষে ঘুরিয়া গিয়ে।

'মৌরীকুল' ও 'পুঁইঘাটা' দুইটি পল্লীরমণীর ইতিহাস। এক জন তরুণী, কালের মধ্যে স্থলবী, মুগ্ধা। অপর জন কিশোরী, কপাহীন, অতিমদ্রিতের কল্পা এবং আহা-বিষয়ে অতিশোভা। এই দুইটি মেয়ের জীবনের দুঃখও দুই রকম। এক জন স্বামীকে লোহাণ চাহিয়া পায় নাই, সেই রূপ তুলিয়াছে স্বামী-পতন-শাওড়ির গহিত কলহ করিয়া। আরেক জনের স্বামীর জীবনের অসহনীয় দারিদ্র্যে কোনো দিন শেট ভরিয়া আহা-জুটিল না, শুধু ঘাঘের লজ্জা ও বাপের বিপদের কারণ হইয়াই রহিল।

স্বামীশাকে পতন-শাওড়ি কলহপ্রিয়া মুগ্ধা বধু বলিয়াই চিনি, তাহার মধ্যে জঘন বলিয়া যে কিছু থাকিতে পারে, সে খবর কেহ পাইল না। স্বামী সারাদিন জাহুরি করে, গভীর রাত্রিতে বন্ধুহলে আচ্ছা

বিদ্যা বধন করিবে, তখন আর স্ত্রীকে গোহাগ করিবার সময় থাকে না, কোনো রকমে খাইয়া শুইতে পানিলে বাচে। কিন্তু আঠাতো বছর বয়সের ডক্টরী বধূর ভবন স্বামীর নিকট একটু আদরের আকাঙ্ক্ষা আবুল, সে নানা ছলে সেই আদরটুকু আদায় করিতে চাহে। কিন্তু সেই আদরের আকাঙ্ক্ষাই করন তুহুল জ্ঞোষে পরিণত হয়, নিজেই বৃথিতে পারে না।

স্বশীলা গল্প শুনিতে চাহ। উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, গল্পের ছলে স্বামীকে আগাইয়া রাখিবার এক ঝাঁকে একটু সোহাগ আদায় করা। জিন করিবার বলে—

যেনো না একটা, একটা ছোট মেয়েই না হয় বলা— এত ক'রে বলহি, একটা কথা রাখতে পারো না!

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল— আ! এ তো বড় ভালো হল! রাতের একটু ঘুমবার বেলা বেই—সবতদিন তো দলবান্ধিতে বাড়ি সদরঘর রাখবে, রাত্রিরটাও একটু শান্তি দেই?

এইটাই ছিল স্বশীলার বাখার স্থান। স্বামীর সূত্রে এ কথা শুনিয়া সে বেশির সেল—বেশ করি, দলবারি করি, তাতে অসুবিধা হয় আবারে পাঠিয়ে বাও এখন থেকে—রাতদুপুর করুন কে! নিজে আসবেন রাতদুপুরের সময় আড্ডা দিতে, কে এত রাত পর্যন্ত ভাত নিজে হলে থাকে? সিনেইই দেহ, পরের আর তো বেহ না! যেটোটে এসে একলায়ে রান্না করছেন আর কি! নিজের বাড়িনিটাই কেবল—

—মৌরীফুল, পৃ ৩

এ হেন উত্তরের পরে ক্রমে যাহা ঘটী অবশ্রম্ভাবী, তাহাই ঘটিল, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার, এবং স্ত্রী কর্তৃক নখাঘাতে স্বামীর হাতে রক্তপাত। এমন বধূকে ভালোবাসিতে পারে কে?

পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বশীলার সহিত আলাপ হইল ধনী ঘরের এক বধূর সহিত। অল্প আলাপেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সখীত্বকে দৃঢ় করিল নদীর ধারের মৌরীফুল উপলক্ষ করিয়া ‘মৌরীফুল’ পাতাইয়া।

বেলায় এক বৃদ্ধি ঔষধ বেচিতেছিল, স্বামীর গ্রেম নিবিড় করিয়া পাণ্ডুরা আশায় স্বশীলা তাহার কাছে ঔষধ কিনিল, কিন্তু সেই ঔষধই কাল হইল। স্বামীকে পাণ্ডুয়াইতে গিয়া স্বশীলা ধরা পড়িয়া গেল, সকলে ধরিয়া লইল সে স্বামীকে বিব খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। ঠিক হইল, এমন বধূকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে পরদিনই।

সেই একদিন একরাত্রি ধরিয়া বধূ কত অতীতের স্বপ্ন দেখিল— ভবিষ্যৎ বাহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে বেদন করিয়া দেখে, ভেদনি করিয়া। বিবাহের অব্যবহিত পরে স্বামীর গ্রেম, কত আশা, কত আনন্দ। স্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। স্বশীলা ভাবিল, অগতে কেউ তাহাকে ভালোবাসে না, কেবল ভালোবাসে মৌরীফুল।

কিন্তু সে ভালোবাসার অভিব্যক্তির সময় মিলিল না। এখন স্বামী তাহার উপর বিরূপ হয় নাই, তখন সেখান পরায় গল্প করিত, সেইসব স্রোত্মস্রোতের পরায় মেনেই বোধ হয় স্বশীলা চলিয়া গেল দুইদিন মাত্র অল্প ভোগ করিয়া। শেষ কথা শুধু বলিল, ‘সত্যি মৌরীফুল, তা নয়, ওরা বা বলছে—আমি অস্ত্র ছেবে-’

এই ডাগাইনা রমণীর অব্যক্ত বেদনা আকাশ-বাতাল পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে, কিন্তু বাহারা জীবিতকালে তাহার মনের কথা বুঝে নাই, বোঝার চেষ্টাও করে নাই, আসন্নমৃত্যুকালেও তাহারা বৃথিল না—মৌরীফুলই বা কে, আর বধূ কি ভাবিয়া কি বেন করিতে গিয়াছিল, বাহাতে বিপরীত বল করিল।

‘পুঁইমাচা’ গল্পের ক্ষেত্রি চোন্দ-গনেয়ে বছর বয়সের মেয়ে, ‘দখা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কক ও আগোছালা— বাতাসে উড়িয়েছে, দুখানা খুব বড়, চোব দুটা ভাগর-ভাগর ও শব্দ।’ মেয়েটির সোভের অস্ত্র নাই। আহাের বিন্দুবাড় উপায় থাকিলে প্রায় অশান্ত ভিনিস ও কুড়াইয়া আনিতে তাহার আশ্রিত নাই। সোভের বাড়ির বাগান পরিষ্কার করিবার ক্ষত বৃদ্ধ পীতবর্ণ পুঁইগাছ ফেলিয়া গিয়াছে, ক্ষেত্রি তাহাই কুড়াইয়া আনিয়াছে। গরিবের ঘরে বসিয়া কুমারী ঘেঁষে থাকাই পাশ, তাহার উপরে আবার কপাইনা। সপ্তমকে ছাপাইয়া তাহার সোভাভূরতা অসম্ভব। মাঘের বাণ হইবারই কথা, তা বাণ বড়ই আশ্রিতোলা হইয়া মাঘের চার এবং বেঙ্গুর-গঙ্গের সন্ধানে কিরিয়া বেড়ান।

বিবাহ হইলে ক্ষেত্রি নাকি চার ছেলের মা হইত, এবং তৎসঙ্গে বাগরার নামে তাহার জ্ঞান থাকে না, মেয়ের এতখানি নোলা মাঘের অসম্ভব। পুঁইভাটা আশ্রিত হইয়া পাইল, ক্ষেত্রির রসনা বৃদ্ধি আর তাহা আশ্রিতবনের সুযোগ পাইল না। কিন্তু বাগরার সময়ে ক্ষেত্রি বেবিল পুঁইভাটা আবার কিরিয়া আনিয়াছে, এবং চক্কড়িতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পুঁইভাটা-সোভী মেয়েটি কোথা হইতে একটা পুঁইগাছের চারা আনিয়া অসময়ে পুঁতিয়া রাখিল, ভবিষ্যতে বড় হইয়া রসনার ইচ্ছা জোগাইবে এই ভরসা। সেই পুঁইগাছ একদিন বড় হইল, কিন্তু ক্ষেত্রির ভোগে আসিল না। তাহার আগে অনেক-কিছু ঘটয়া গেল, ক্ষেত্রির বিবাহ, পতিব্রহ্মে গাত্রা, এবং কুড়া—

কোবে বাড়ির সেই সোভী মেয়েটির সোভের পুঁতি পাতার-পাতার পিয়ার-পিয়ার কুড়াইয়া তাহার কত সাতের নিম্নের হাতে পোতা পুঁইগাছটি বাত। কুড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে— বর্ষার মাস ও কান্তিক মাসের শিরির মইয়া কটি-কটি নতুন কুড়াগুলি বাতাতে লগ ধরে নাই, বাত। হইতে বাড়ির হইয়া কুড়াইয়াছে— হুশুট, ববর, এবং মাস মাসের লাক্ষণ্য জবর। :— দেবমাস, পুঁইমাচা, পৃ ১৭৮

নারিকা হওয়ার উপযুক্ত গুণ নৌরীফুল গল্পের হুশীলার যদি-বা থাকিয়া থাকে, ক্ষেত্রির একেবারেই নাই। বহিরা পল্লীভূষণ বহুতর দুঃখবন্দনা লইয়া কাহিনী রচিত হইয়াছে, কিন্তু সোভরূপ ট্রাফেটি আগে বোধ হয় স্থান পায় নাই।

গুরু কয়েকটি গল্পের সাহায্যে বিভূতিভূষণের সাহিত্যপটের উৎকর্ষের বিচার সম্ভব নয়।) কিন্তু তাহার সহজভূতি কোন দিকে, এই কথাটি গল্প হইতেই তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। যে সমস্ত প্রাচ্যের বাণির চানে মর্ত্যে আসিয়া শুভাচ্যের মাঘ বসিনী হইয়াছিলেন, বিভূতিভূষণের লেখনীর উপর তাহার আশ্রিত অন্তিমপরিমাণে বর্ষিত হইয়াছিল, তাই তাহাই তিনি লিখিয়াছেন, প্রায় সবই হুশাঠা ও হুশম্পলী হইয়াছে।

বাগলি যতই নাগরিক সভ্যতা আশ্রিত করুক, তাহার অন্তরে ছাত্রাশ্রিত পল্লী সময়ে একই দুর্বলতা থাকিয়াই যায়। তা সে পল্লীতে এক পা-ও শহরের বাহিরে না গিয়া থাকিলেও। প্রাচ্যের সমস্ত যে কল্পনা তাহার মনকে আশ্রিত করিয়া থাকে, তাহার সহিত বাস্তবের খুব বেশি মিল হয়তো সব সময়ে থাকে না। কিন্তু সেই প্রাচ্যের এবং তাহার মাহুগুণির কথা সঙ্ঘবস্তার সহিত বলিতে পারিলে তাহার মন আশ্রিত হইতে বাধ্য। বিভূতিভূষণের সাক্ষ্যলোম মূলে এই কারণটি অন্তত কিছু পরিমাণে বর্তমান। আরো অনেক লেখকই পল্লীভূষণের কাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলে যে অতুলন সাক্ষ্যলাভ করেন নাই, তাহার কারণ পল্লীকে বিভূতিভূষণ যেন ভাবে চিনিয়াছিলেন, পল্লীর মাছের সহিত নিষেধে

যেমন ওতপ্রোত ভাবে মিথাইয়াছিলেন, ততটা হয়তো সবাই পারেন নাই। বিকৃতিভূষণ ঘূষ হইতে কোঁক্কালা দৃষ্ট দিয়া মাহুকের স্ববৎস্ব খেঁচিয়া ধখাধ খণিষক করিয়া কাত হন নাই, তাহাদের স্ববৎস্বের অংশ স্বঃ গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার অহুত্ব উহার মল লেখনীর সহিত মিশিয়া যে হল সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কখনো শান্ত, কখনো ককশ, কখনো কক, কিন্তু সব সময়েই মধুর।

বাঙালি পাঠকের ঘট্টা সমালোচক-দৃষ্টি, অস্ত্র ভাবার পাঠকের বোধ হয় ততটা নয়। সাধারণ পাঠকের বিচারে কাহা খেকি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, বাঙলা সাহিত্যে তাহা কখনো ধীর্ঘজীবী হয় নাই। বাঙালি পাঠক কাহা কুল করিয়াছে, অস্ত্র দিকে। (যেকিকে আসল বলিয়া ভ্রম তাহার হয় নাই, কিন্তু উৎকৃষ্টকে সাধারণ বলিয়া কুল কখনো কখনো সে করিয়াছে। কালের বিচারে সেসব রচনা বিশ্বস্তির অন্তর্গত হইতে আবার কিরিয়া আসিয়াছে।

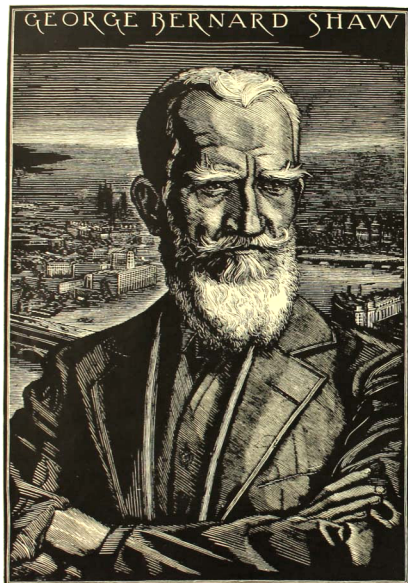
কিন্তু যেসব সৌভাগ্যবান লেখকের লেখাকে পাঠক গ্রহণ হইতেই সাদর সম্মতি জানাইয়াছে, বিকৃতিভূষণ তাহাদের অন্ততম। তবু মনে হয়, ছোটগল্প-লেখক বিকৃতিভূষণ এখনো তাঁহার প্রাণ্য সম্মান পান নাই। তাঁহার যে কল্পনা কখনো অজ্ঞান নবীর ভাবে, কখনো দারবাসিনীর বৈক্যবপন্নীতে, কখনো যোগেশবংশের গভীর অরণ্যে, কখনো-বা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বিবিদ্যার ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে, আবার অসম্বিকৃত্যবে যশোর জেলার ছোট পন্নীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার স্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি তাহার উপন্যাসে নহে, ছোটগল্পে।

কিন্তু শুধু কল্পনা নহে। নিছক কল্পনা দিয়া কাল্পনিক মাহুকের স্ববৎস্বের কাহিনী হয়তো লেখা যায়, কিন্তু প্রাণের সৃষ্টি করা যায় না। মাহুকের সহিত কল্পনার এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিকৃতিভূষণের লেখনীতে হইয়াছিল বলিয়াই তাহার এত সার্থকতা।)

ঐআর্বকুমার সেন

পথের পাঁচালি

পথের পাঁচালির আখ্যানটা অত্যন্ত সোপ। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় থাকি থাকে। যেখানে আত্মকাল আছি সেখানেও সব মাহুকের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়ারায়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার শুণ এই যে, নতুন জিনিস কাপলা হয় নি, মনে হয় খুব পাঁচি, উঁচুয়ের কথায় হন ভোলাবার অস্ত্রে সত্তা গরের রাতভার সাজ পরাবার চেঁচা নেই। বইখানা গাড়ির আছে আশন মতায় জোরে। এই বইখানিতে শেষেতি বখার্ব গল্পের খাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক বা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে পাছপালা পথবাট ঘেরপুকন স্বঃঃঃঃঃ সত্যকে আবারের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে নূবে গ্রীকিণ্ড করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে জ্বল্জ্বল।



জর্জ বার্নার্ড শ
দিলী পিকচার

জর্জ বার্নার্ড শ

১৮৬৮-১৯৫০

শ্রীমিনয়েন্ড্রামোহন চৌধুরী

জর্জ বার্নার্ড শ'র ঘটনাবলি জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বলতে গেলে কতকটা এইরূপ ধাঁড়ায় : ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে, অর্থাৎ গ্রাম ২৫ বৎসর পূর্বে, আয়ারল্যান্ডে ডাবলিন শহরে তিনি এক দরিদ্র প্রটেষ্ট্যান্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জর্জ কার্‌ শ এবং শিশুকুল থেকে তিনি পেয়েছিলেন এক বিশেষ জাতের কৌতুকপরাধতা, বা আপন উজ্জলভায় স্থান কাল পাতের বাধা অস্বীকার করে সভ্যসমাজের বিম্বয় এমনকি ক্রোধ উদ্রেক করেছে। কার্যকালে নিজের জীবনে বিপরীত ব্যবহার সবেও জর্জ কার্‌ শ বাক্যে এবং মনে মস্তপানবিরোধী ছিলেন। পুত্রের চরিত্রে শিউরিটান সংস্কার বহুদূর হয়েছিল এবং শুধু মন নয় দুঃখপান পর্যন্ত তাঁর অভ্যাসবিরুদ্ধ ছিল। মাতা লুসিও এলিজাবেথের নিকট শ পেয়েছিলেন তীব্র সংস্কারময় এবং অসাধারণ কল্পনাপ্রবণতা। শৈশবে স্নেহহীন শাসনশীল উমাসীন পরিবেশে একপ্রকার অসংস্পর্শ ভাবে তিনি মাহু হন। বিদ্যালয়ে শিকা এমন কিছু পেয়েছিলেন বা পান নি দার ফলে উত্তরকালে নিজের শৈশব স্মৃতি উৎসাহহ্রস্ক কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কৈশোরে মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে পারিবারিক অর্থোপার্জনবন্ধন বিভাগ্য ভাগ্য করে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে তাঁকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। তাঁর পূর্বেই অবস্তা তিনি লিখতে শুরু করেন। আকিসের কাছে বৎসসত্ত্ব অবলো প্রবর্ন করে ঐ বয়সেই তিনি ধর্মবিষয়ে তর্কপটুতা, সাহিত্যপ্রচেষ্টা এবং সংস্কৃত-প্রিয়তার পরিচয় দেন। ডাবলিনে বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করে অনন্য বধন আশ্রয়পত্র বিক্রয় করে লণ্ডনে চলে গেলেন তখন ঘরে শুধু পতিপুত্র নয়, শিয়ানোফ্রটিও রেখে গেলেন। সংস্কৃতহীন পুঁহে সংস্কৃত সৃষ্টি করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পুত্র এবং নিজের চেষ্টার এবং আনন্বে ক্ষুদ্রবেগে তাঁর সংস্কৃতশিক্ষা অগ্রসর হল।

ইতিমধ্যে আকিসের কাছে তাঁর উন্নতি হয়েছিল, তথাপি ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে, অর্থাৎ গ্রাম হুড়ি বৎসর বয়সে, তিনি আকিস পরিভ্যাগ করে মাতার কাছে লণ্ডনে উপস্থিত হন। সফল ছিল তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা, অস্বস্ত প্রাণশক্তি, অসাধারণ এবং অবাধাবিক আত্মবিশ্বাস, অস্বাস্ত পরিশ্রম-পরায়ণতা। লণ্ডনে অভাবিক দায়িত্বের মধ্যে প্রথমটা অর্থোপার্জনে সফল হন নি বটে কিন্তু সাহিত্য-প্রচেষ্টার তাঁর বিরাম ছিল না : নিয়ম করে প্রত্যহ পাঁচ পৃষ্ঠা (quarto pages) লিখতেন, ফলে লেখা হুঁহে গাড়িয়েছিল অনায়াসসাধ্য। ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ এই পাঁচ বৎসরে তিনি পাচটি উপন্যাস লিখে ফেলেছিলেন।

১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ সাল শ'র জীবনে চরম দায়িত্বের কাল। সচ্চন্দ্রে এ কথাও বলা যেতে পারে— এটা তাঁর শিক্ষার কাল। অবস্ত শিক্ষাটা তিনি অর্জন করছিলেন লণ্ডনে, জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে। দরিদ্র পিতা এবং দরিদ্র মাতা নিজেকে সামান্ত আয় থেকে সাহায্য করে শ'কে বাড়িয়ে রেখেছিলেন। সামগ্রিক অর্থে কোনো কাঙ্ক্ষাই তিনি প্রবেশ করলেন না। বলা বাহুল্য, তাঁর উপন্যাস কোনো প্রকাশকের আগ্রহ উৎপাদন করে নি।

এই নয় বৎসরে লিখে তিনি শেষেছিলেন ছয় পাউণ্ড, তার মধ্যে পাচ পাউণ্ডই আয় হয়েছিল একটি বিজ্ঞাপন-রচনায়, পাচ শিলিং একটি বাস্কবিভা লিখে এবং বাকি পনেরো শিলিং পেয়েছিলেন একটি গল্প রচনা করে। আর্থিক অগাঙ্ক্য তাঁকে নিরুত্তম বা বর্ধহীন করতে পারে নি। তথা, তবু এবং চিন্তায় অগণ্ডে তাঁর স্বাধীন বিচরণ এবং নিয়ম সাহিত্যগ্রন্থে বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে। জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন এই সময়ে, লওনে। প্রচলিত ধর্মের অর্থোডক্সতা এবং বিখ্যা অতিরিক্তপ্রিয়তা লক্ষ্য করে সোব্যানক কৌতুকবর্ণন নিকোপ কথার আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই তাঁর একটা অভ্যাসে পাড়িয়েছিল; লওনে অত্যধিক শৈলী-প্রীতির ফলে সেই আগ্রহ ক্রমে 'না-ইন্সর বিম্বাস' পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবনে এই নেতিগ্রহণ যুগ কেটে ছেতে বেশি বেশি হয় নি। প্রচলিত ধর্মের যোরতর বিরোধিতা সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃতি এমনই ধর্মনির্ভর যে তাঁকে ধর্ম সাবিত্তার করতে হয়েছে এবং তার পর তাঁর নিম্ন ধর্ম তিনি উগ্রভাবে প্রচার করেছেন।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই ভারী তর্কবীর লওনে একটি বিতর্কলভায় যোগ দেন এবং বক্তৃতাকালে নিদারুণ জ্বাম্পকন অল্পতব করেন। এই দুর্বলতা তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে বাণ্যামাত্র সংকল্প করলেন যে এখন থেকে তিনি প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হবেন এবং স্বযোগ পেলেই বলবেন। এই সংকল্প তিনি কার্যে পরিণত করেছিলেন। তিন বৎসর পর ১৮৮২ সালে এইরকম এক সভায় তিনি আমেরিকার বিখ্যাত বক্তা হেনরি জর্জের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। ফলে ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি ছেড়ে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সমাজব্যবস্থা বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবস্থিত হন। এই সময়েই তিনি মাস্টারের *Das Capital* পড়েন এবং সমাজতন্ত্রবাদের সারতত্ত্বে বিশ্বাস জন্মন থেকেই স্থাপন করেন। সমাজতন্ত্রবাদের তাঁর ধর্ম পরিণত হয়। তিনি Fabian Societyতে যোগ দেন ১৮৮৪ সালের বে মাসে, এবং অল্পিহই এই মাসের অন্ততম প্রধান বক্তা এবং নেতায় পরিণত হন। তাঁর এই সমাজতাত্ত্বিক যুগে উপন্যাসগুলি ধারাবাহিক ভাবে আনি বেসান্ট সম্পাদিত OUR CORNER কাগজে প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে TO-DAY কাগজে তাঁর শেষ উপন্যাস *An Unsocial Socialist* প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৮৮৪ সাল থেকে শ'র সাহিত্যগ্রন্থে অর্ধাঙ্গবের দিক দিয়ে বানিকটা উন্নতি লাভ করে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সহায়্যারী বন্ধু উইলিয়াম আর্চারের সহায়তায় THE PALL MALL GAZETTEএ পুস্তক-সমালোচনার কাজ পান; অতঃপর এই কাজে এবং THE WORLD ও OUR CORNER কাগজে চিত্র সমালোচনা দ্বারা ১৮৮৫ সালে সর্বশুদ্ধ তাঁর আয় ১১২ পাউণ্ডে^৩ ঠাঁড়ায়। বিগত নয় বৎসরের তুলনায় ১৮৮৫ সালে তাঁর আয়, শ'র ভবিষ্যতে বলতে গেলে, নতকরা ১৬৭.০০ বা ১৬৭ গুণ বেড়েছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ এই নয় বৎসরকাল বিভিন্ন কাগজে ব্যাক্রমে পুস্তক, চিত্র, সংস্কৃতি এবং নাট্যসমালোচনা দ্বারা লওনের চিন্তামূল সমাধে বিশেষ চাকলা উৎপাদন করেন। সংস্কৃতি ওয়াগনার এবং নাটকে ইবসেন এই দুই নবায়ত শিল্পীর আদর্শ তিনি প্রচার করেন। সংস্কৃতি এবং নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁর এই সময়কার মতামত *The Perfect Wagnerite, The Quintessence of Ibsenism, Dramatic Opinions and Essays* গ্রন্থে এবং অর্থনৈতিক মতামত *Fabian Essays* ইত্যাদি গ্রন্থে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে।

শ'র জীবনে ১৮৯৮ সাল বিশেষভাবে অগ্রগীর্ণ : এই বৎসর কঠিন পীড়ানিবন্ধন তিনি *Saturday Review* কাগজে নাট্যসমালোচনার কার ছেড়ে দেন, ইতিমধ্যে অবশ্য নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং গ্রিক এই সময় আমেরিকার রহস্যকে তাঁর একটি নাটক (*The Devil's Disciple*) অভিনয়ের ফলে বিশেষ অর্থাগমের হৃদয় হয় ; বিগত বারো বৎসর তিনি সম্ভ্রমে প্রায় তিনবিন দ্ব্যন্তর বক্তৃতা নিয়ে বেড়াতেন এবং জনসভার বক্তা হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন— এই সময় থেকে এত ঘনঘন বক্তৃতা দেওয়া ছেড়ে দেন ; এই বৎসরেই তিনি প্রচুর বিতরণালিনী এক মহিলার পাবিত্রহরণ করেন। অন্তঃপর তাঁর সাংবাদিক-সমালোচক এবং বক্তার জীবন একরূপ শেষ হয়— যদিও মাকে মাকে সমালোচনা এবং বক্তৃতাদান ছুইই করেছেন— নাট্যকারের কাজই প্রধান স্থান অবিকার করে এবং আর্থিক অবস্থান দূর হয়।

শ'র প্রথম নাটক *Widowers' Houses* উইলিয়ম আর্চারের সহযোগিতায় (কথা ছিল দুই উদ্ভাবন করবেন আর্চার এবং শ লিখবেন সংলাপ) লেখা আরম্ভ হয় ১৮৮১ সালে, দুই অর্থ লেখার পর আর্চারের শঙ্ক না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। সাত বৎসর পর ১৮৯২ সালে 'নতুন নাটকের' তালিকায় শ নাটকখানা শেষ করেন এবং *Independent Theatre* প্রথম অভিনীত হয়। এ ছাড়া ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে শ লিখিত *The Philanderer*, *Mrs. Warren's Profession*, *Arms and the Man*, *Candida*, *The Man of Destiny*, *You Never Can Tell*, *The Devil's Disciple*, *Caesar and Cleopatra* এবং *Captain Brassbound's Conversion* এই নয়খানা নাটক রচনা করেন। রহস্যকে আর্থিক শাস্ত্রা অর্জন না হোক, চাকলা উপার্জনের বিক দিয়ে শ কৃতকার্য হয়েছিলেন বলা চলে। নাট্যকীর উৎকর্ষের বিক দিয়ে *Candida*, *The Devil's Disciple*, এবং *Captain Brassbound's Conversion* সম্বন্ধে ঘোড়ের উপর সমালোচকেরা একমত হয়েছিলেন। উইলিয়ম আর্চার *Mrs. Warren's Profession* এরও প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু সেসব এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ায় বহুকাল অভিনীত হতে পারে নি। অন্ত নাটকগুলির সম্বন্ধে মতভেদ হলেও এটা দৃশ্যেই স্বীকার করেছেন যে, লেখকের নাট্যকর্মতার পরিচয় প্রত্যেক বইই পাওয়া গেছে। শ'র নাট্যকাররূপে খ্যাতির সোপান হিসাবে এই প্রথম দশটি নাটকের উল্লেখ করা চলে।

১৯০১ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে তাঁর খ্যাতির স্বর্ষ প্রায় বয়োগগনে উঠেছে। সাতটি নাটকের মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : *Man and Superman*, *John Bull's Other Island*, *Major Barbara*, *The Doctor's Dilemma* রচনার পর তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এই সময় ভেনড্রেন-বার্কার (*Vendrenne-Barker*) এর দ্বারা পরিচালনায় *Court Theatre* বিশেষ করে তাঁর নাটক অভিনীত হয়ে নাট্যসাহিত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আনন্দদান করেছে। এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নাটকের পর নাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসাবে *Getting Married*, *The Showing-up of Blanco Posnet*, *Misalliance*, *Fanny's First Play*, *Androcles and The Lion*, *Pygmalion* ইত্যাদির নাম করা চলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর *Heartbreak House* প্রকাশিত হয়, অন্তঃপর *Back To Methuselah* এবং *Saint Joan* এ শ নাট্যকার হিসাবে কীর্তির উজ্জ্বলিখরে আরোহণ করেন। এর পরও তিনি বহু নাটক লিখেছেন (পেথ

নাটক ১৯০০ সালে অর্থাৎ মৃত্যুর বৎসরে লেখা) ; তার মধ্যে *The Apple Cart* এবং *On the Rocks* এই দুইটি রাজনৈতিক নাটক এবং *In Good King Charles's Golden Days* এর উল্লেখ করা যায়। সর্গতঃ ৭ সত্যায়টি* নাটক রচনা করেন ১৮৯২ থেকে ১৯০০ এই আটটি বৎসরে।

নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের পর তিনি প্রধানতঃ নাট্যরচনাতই কীকনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়েছেন। অবশ্য তাঁর বহু বিচিত্র বিষয়ে উৎসাহ, চিরস্বাগ্রস্তচিত্ত এবং ক্রান্তিবিহীন দেখনী ও রসনা থেকে নানাপ্রকার রচনাই ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যে সঞ্চার করেছে। তাই প্রধানতঃ নাট্যকার হলেও সমালোচক এবং ধর্ম নৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক পুস্তিকাকার হিসাবেও তাঁর স্থান সমসাময়িক সনাত্ত এবং ইংরেজি সাহিত্যে অতি উচ্চে। বাকচাতুর্যে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর ক্ষমতায়ও (repartee) তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতা বিখ্যাত। এ হিসাবে তাঁকে সচরাচর ভাস্কর জনসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু ভাস্কর জনসনের স্বভাবে অনেক সময় একটা ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করা যায় যা শ'র স্বর্ধবিকৃষ্ট। মোট কথা এ দিক দিয়ে শ' অস্বিভীয় ছিলেন।

১৯১১-১৮ সালে বিশ্বযুদ্ধের অস্বাভাবিক আধঃাওয়ায় অত্যন্তভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্ষ' হ'। শ'র কাছে সত্য কথা অগ্রিম হলেই বলার তাগিদ বাড়ে। শ' এই সময় *Common Sense About the War* নামে এক ইস্তাহার লেখেন এবং তাঁর ফলে শ'-বিষয়ে নিরাক্ষণ ভাবে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের পরে এই ভাব দূর হ' এবং শ' যে বোটেই অস্ত্রায় কিছু বলেন নি এই ধারণা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে তাঁর হাত্তরস, কৌতুকপরায়ণতা, তাঁর বাগ্ধৈবদ্য এবং অন্তঃলাগরণ ব্যক্তিত্বের ফলে কীবদশাতেই তিনি কাহিনীতে পরিণত হয়েছিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯০০ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে পরিণত বয়সে মৃত্যু স্বভাবিক হলেও শ'র মহাপ্রাণ এত আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক মনে হয়েছে যে অল্প ধপটা স্বাভাবিক ঘটনার মত লগৎ তা গ্রহণ করতে পারে নি। মনে হয়েছে, একটি দিকৃশালের মৃত্যুতে কেন একটা যুগের সমাপ্তি ঘটেছে।

২

বর্তমান যুগের ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নাটক লিখতে শুরু করেন দূস্ততঃ প্রাণের তাগিদে নয়, অনেকটা প্রয়োজনের বশে। সমসাময়িক ব্রিটিশ থিয়েটারে যে-স্বাতীয় নাটক অভিনয় হত নাট্যসমালোচক হিসাবে শ' তার খোর বিরোধী ছিলেন। এই-স্বাতীয় নাটকে নাট্যকার গঠনকৌশলের উপরই খোর দিতেন বেগি; বস্ততঃ শুধু গঠনমাহাত্ম্যেই এই নাটকের নান হয়েছিল অগঠিত (well-made) নাটক এবং গঠন ব্যাপারটাও ঠাড়িয়েছিল দ্বাত্রিক কল্পমূল্য। বাস্তব কীবনের সঙ্গে এই নাটকের কোনো সন্ধ ছিল না, ফলে এই নাটক হয়েছিল প্রাণহীন। ইংলেন তাঁর গুপ্ত নাটকে গতানুগতিক বিষয় ছেড়ে প্রচলিত সমাজ ও সামাজিক আধর্শের স্লেষাত্মক সমালোচনা করেন এবং তাই

২ এই পন্থায় বই হিসাবে প্রকাশিত হয় নি এমন ছোটখাট একাধ নাটিকা এবং অস্ত্রান্ত নাট্যরচনাও ব' হয়েছ। *The King And the Doctors* (১৯২২) অস্ত্র ব' হ' দি, শ' দিয়েই এই রচনার দাব দিচ্ছেন *An Improbable Fiction* এবং নাটকের মত কল্পাপেক্ষনের আদিকেও তিনি ইচ্ছা লেখেন নি। *The King, the Constitution and the Lady* (১৯২০) পন্থায় ব' হয়েছ, *Why She Would Not* অলপাটু রস ব' হ' দি।

নিরে ইউরোপে তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। শ ইংলেন্ডের নতুন এবং ইংলেন্ডের নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে আন্দোলন চলে তিনি ছিলেন তার পুরোতাপে। এই 'নতুন নাটক' প্রবর্তনের সঙ্গে যোগা ছিল অনেক। আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত প্রযোজক পাওরা গেল, কিন্তু নাটক কোথায়? শুধু ইংলেন্ডের নাটক ড্যাঙ্কে কতকাল চলেবে? নতুন নাটকের এই জরুরি দাবি যেটাতে শ তাঁর ১৮৮৫ সালে অর্ধস্বাক্ষরিত *Widowers' Houses* সম্পূর্ণ করলেন এবং *Independent Theatre* তা রূপমুখে পরিবেশন করলেন।

সামাজিক অব্যবস্থা এবং দুই ব্যবস্থার বহু বিচিত্র তথ্যে তাঁর মস্তিষ্ক তখন ভরপুর, এই দুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দৃষ্টিবিরোধী মন্থন আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহও দুর্ভাগ্য, তার সঙ্গে যোগ হল তাঁর অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা। নতুন নাটকের দাবি যে উপভুক্ত ভাবেই মিটেবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ হইল না। কাল্পনিক পরিবেশে নাটকীয় দৃষ্টের সাহায্যে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে নাটকের পর নাটক রচনা করতে লাগলেন : *Widowers' Houses*, *Philanderer*, *Mrs. Warren's Profession*, *Arms and the Man*, *The Man of Destiny*, *You Never Can Tell* ইত্যাদি। স্বপ্নের প্রাচুর্য এবং প্রাণশক্তির বিপুলতায় নতুন নাটক প্রতিষ্ঠিত হল। ক্রমে অসংখ্য প্রতিভাব সমাবেশে তা বিচিত্র হল। ব্রিটিশ নাট্যক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম শাব্দে নতুন যুগের প্রতিষ্ঠা হল। নতুন নাটকের জরুরি প্রয়োজন মিটে গেল; কিন্তু শ'র বিকশিত স্বপ্ন-প্রতিভা ততদিনে তার প্রকাশের মাধ্যম আবিষ্কার করেছে। এককাল তাঁর বলিষ্ঠ, মূবর, বিদ্রোহের মত উজ্জল প্রতিভা উপভুক্ত মঞ্চ খুঁজে পায় নি, অবশেষে রঙ্গমঞ্চ তা সার্থক হল।

ইংলেন্ডের নাটক সম্বন্ধে শ এক খানা বই লিখেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে উগ্র, কিন্তু তাই বলে এ কথা ভাবা কুল হবে যে তাঁর নাটকে তিনি ইংলেন্ডের অস্থকরণ করেছেন। খুঁজলে ইংলেন্ডের সঙ্গে তাঁর বিশেষ চেয়ে অবিলম্বে বেশি চোখে পড়বে। অন্ততঃ, এমন-একটি গুরু বিষয় তিনি ইংলেন্ডের নাটকে খুঁজে পেয়েছেন বলেছেন যা ইংলেন্ডের নাটকে থাক বা না থাক তাঁর নিচের জীবনে এবং নাটকে প্রচুর। ইংলেন্ডের *A Doll's House* নাটকের শেষ অঙ্কে বিগত জীবন সম্বন্ধে Nora-র স্মৃতি ঘন কেটে গেল তখন স্বামীকে সে বলল, "Sit down here, Torvald. You and I have much to say to one another. Sit down. It will take some time; I have a lot to talk over with you." এই উক্তিকে অসাধারণ প্রাণান্ত দিয়ে শ বলেছেন আলোচনার উপর এই ঘোর দিয়ে ইংলেন্ড ইউরোপ জয় করেছেন এবং নতুন নাটকের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

আলোচনা-প্রধান নাটক যদি নতুন-নাটকের সর্বপ্রধান পরিচয় হয় তবে তার পুরোহিত ইংলেন্ড নন, জর্জ বার্নার্ড শ। কেননা তাঁর নাটকে সরল আলোচনা এবং বিতর্ক এত প্রাধান্য পেয়েছে যে তা একদিকে যেমন তাঁর নাটকের বিশেষ আকর্ষণ অন্যদিকে এর ফলে তাঁর নাটকের অসংখ্য মূল্যবান দিকের প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় নি। অবশ্য সেক্ষেত্রে শ দাবী নন, দাবী সমসাময়িক সমালোচকদের অক্ষমতা। তাঁর নাটকীয় চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য, তাদের অস্বাভাবিক প্রাণশক্তি, তাঁর নাট্যকল্পনার বলিষ্ঠতা এবং গভীরতার উপভুক্ত স্বীকৃতি শ তাঁর সমালোচকদের কাছে পান নি। তিনি বলেছিলেন, 'I could get drama enough out of the economics of slum poverty,' তাঁর এ দাবি অসঙ্গত অনেক দাবির মতই স্বাভাবিক।

ভাবাবেগহীন হুজির তত্ত্ব আলোচনা শ-নাটকের বিশেষত্ব। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা নিছক আলোচনা নয়, নাট্যকীর চরিত্র এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে এই আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে, কখনো এই আলোচনাকে বলা যেতে পারে নাট্যকীর আলোচনা। নাট্যোদ্ভিগত চরিত্রগুলি তিনি চুটিবে তুলেছেন তাদের জীবনের সমস্তা নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনার ভিতর দিয়ে। সত্যরূপ নাটকে যে প্রকার জন্মের সাক্ষাৎ মেলে শ'র নাটকে তা স্থলত নয়। তাঁর নাটকে ভাবাবেগকে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নি। তাই প্রচলিত প্রেমের দ্বন্দ্ব তাতে জন্মে উঠে নি। তাঁর নাটকে দ্বন্দ্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নৈতিক আবেগের দ্বন্দ্ব, গোড়ের সঙ্গে নির্দোষের দ্বন্দ্ব, বীরের সঙ্গে কাপুরুষের দ্বন্দ্ব, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার দ্বন্দ্ব, এককথার ভুলোর সঙ্গে মন্থের দ্বন্দ্ব। তাঁর নাটকে পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে যে ভালো কে মন্দ, কে বীর কে কাপুরুষ সে প্রশ্ন প্রধান নয়। নাট্যকীর দ্বন্দ্ব জন্মে উঠেছে চরিত্রগুলির পরিবেশগত এবং চরিত্রগত দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে। Mrs. Warren এবং Vivie Warren দুজনের মতামতই প্রবল হুজিরসহকারে উপস্থিত করা হয়েছে Mrs. Warren's Profession নাটকে। যে সমাধে Mrs. Warren-এর বাপ সে সমাধ কামনিক নয়, ঋণা দর্পকের আসনে বসে এই নাটক দেখেছেন তাঁরাও এই সমাধেরই বাসিন্দা। শ শুধু সমসাময়িক সমাধের নরনারী নয়, তাদের সমস্তা এবং তাদের পরিবেশের বাস্তবত্বও কল্পনায় স্থলী করেছেন। তাই নাটকের পাত্রগঞ্জীর যে সমস্তা সে সমস্তা সমস্ত সমাধের। যে সমাধে Mrs. Warren সত্ত্ব সেই সমাধের নরনারীকে ডেকে এনে যেন শ বলছেন, 'এই যে তোমাদের কীতি, এই যে তোমরা কি সমস্তা স্থলী করছ'। তিনি বলতে চেয়েছেন, এক নাট্যিক নিয়ে দুই প্রেমিকের দ্বন্দ্ব এবং সমস্তা নিত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার; তাঁর নাটকে সমস্তা সামাজিক, যে সমস্তা সমাধনের দ্বারা সমস্ত সমাধের। এই জন্যই তাঁর নাটকে বলা হয় Problem Play বা সমস্তাদুলক নাটক।

নাটকের আঙ্গিকে নানারকম পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন। ইতিপূর্বে নাটকে দৃশ্যসংকত এবং মকনির্দেশ ব্যাপারটা কোনো নাট্যকারের হাতেই এক বিদ্বত আকার ধারণ করে নি। তাঁর এই নির্দেশ অনেক অভিনেতা এবং মকপরিচালকের বিরক্তির কারণ হয়েছে। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বলসে অনেক সমালোচক এই পরিবর্তন ভালো চোখে দেখতে পারেন নি। উপস্থাপনের পদ্ধতি অল্পস্বল্প করে তিনি নায়ক-নাট্যকার বিদ্বত বিবরণ দিয়েছেন। গ্রীক নাটকের কোরাসে নাট্যকারের মতামত, দর্শন এবং নাটকের ভাবগর্ভ প্রকাশ পেয়েছে। শ'র নাটকে বিদ্বত মকনির্দেশ, দৃশ্যবর্ণনা এবং বিদ্বততর কৃত্তিকা প্রকৃতপক্ষে গ্রীক কোরাসের তুল্য।

শ রচনাকে আর-একটি জিনিষ আমদানি করেছেন, সে হচ্ছে মননশীল হুজিবাদী বাস্তবত্বের নায়ক। নাট্যকীর এবং নাট্যঘটনা হুজির তত্ত্বের কল্পিত কালে নায়কনাট্যিক এবং তাদের কথাপঞ্চধনও সেই তত্ত্বের হয়েছে। এতে নাটকের সংগতি এবং স্বাভাবিকতাই রক্ষা পেয়েছে, নাট্যকল্পনার বিচরণপীঠা এবং নাটকের সম্ভাবনার গীর্ঘাও বিদ্বত হয়েছে।

নাটকে চরিত্র, ঘটনাসংস্থান এবং কথাপঞ্চধন দ্বারা হুজিরহুজিরের আইডিয়া প্রকাশ এবং বিচার যে অল্পস্বল্প নয় অসংগত নয় শ'ই তা প্রথম প্রকাশ করলেন। তাঁর নাটকে গঠনস্থলত নেই, এ নাল্পন হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'Instead of planning my plays, I let them grow as they came.' এক কথার অর্থ এই নয় যে, তাঁর নাটকে কোনোই মান্য নেই; এর অর্থ এই যে,

সচরাচর গঠন বলতে বা বোঝায় সেই-স্বাভাবিক বস্তুর ক্ষত্র তিনি মাথা ঘামান নি। তাঁর নাটকীয় কল্পনার যে আইডিয়া চরিত্র এবং পরিবেশবোধে মূর্ত হয়েছে, তার নাট্যরূপ স্থির হয়েছে ঐ আইডিয়া বিকাশের সক্ষেপক্ষে। বিচ্ছিন্ন, এমনকি অপ্রাসঙ্গিক, ঘটনাবলী বলে ধানের মনে হয়েছে তাদের ঐক্য দান করেছে তাঁর আইডিয়া। গঠনশিল্পিতার চরম বুটাম হিসাবে তাঁর *Heartbreak House* নাটকের উল্লেখ করা হয়, কিন্তু ঐ নাটকের ঐক্য একান্তভাবে সেই আইডিয়া-নির্ভর যে আইডিয়া ঐ নাটকে তিনি নাট্যরূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর ঐ প্রচেষ্টা হয়তো সর্বমুখই দৃঢ়বদ্ধ ঘটনার পরিণত হয় নি। কিন্তু তাঁর নাটক-সমালোচনার এ কথা শ্রবণ রাখা কর্তব্য যে তাঁর নাটকে বিচ্ছিন্ন ঘটনার নাটকীয় ঐক্য আইডিয়ার মূলে প্রতিষ্ঠিত।

মুক্তিপ্রদান নামক যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন তেমনি নারিকাত সৃষ্টি করেছেন, যারা অবলা নয়, লক্ষ্মীশীলা নয়, ফুলের খেয়ে যারা দুর্ভাগ্য ঘাব না ; যারা শুধু তর্কে পট্টু নয়, যারা এগিরে প্রেম করতে জানে, গাভমুখ খিঁচিয়ে হাতাহাতি পর্বত করতে সক্ষম। ভিক্টোরীয় যুগে বাসীকে প্রহারনিয়ত নারিকাত *Blanche Sartorius*কে সেবে কেন সমসাময়িক সমালোচকগণ হতবাক এবং প্রতিবাদপরায়ণ হয়েছিলেন তা বোঝা শক্ত নয়। তাঁর ঐ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তববীচনের সঙ্গে নাটকের যোগাধান করেছে।

নায়ক-নারিকাতের মূখে দীর্ঘ বক্তৃতাও তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় সংগতি নষ্ট হয় নি। *Hamlet* নাটকে *Hamlet*এর 'To be or not to be . . .' এই স্বগতোক্তিই চরম অবস্থা *Merchant of Venice*এ *Shylock*এর 'Hast not a Jew eyes . . .' বক্তৃতার চেয়ে *The Man of Destiny* নাটকে *Napoleon*এর 'No, because the English are a race apart . . .' এই বক্তৃতাতে নাটকীয় অসংগতি বেশি প্রকাশ পায় নি। বস্তুতঃ নাট্যকল্পনার গভীরে ঐ স্বগতোক্তি এবং দীর্ঘ বক্তৃতা উভয়েই সংগত এবং বোধ হয় অনিবার্য।

এককথায় তাঁর নাটককে বলা যেতে পারে সামাজিক এবং বুদ্ধিগত, মননশীলতা তাঁর প্রাণ। তাঁর বক্তব্য এত জটিল, সমসাময়িক সমাজের দিক দিয়ে এত গুরুতর, তাঁর নাট্যকল্পনা এত আইডিয়াবোঁধ যে গঠনকৌশল নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন তিনি অহুতব করেন নি। স্ক্রিব (Scribe) এবং সার্দু (Sardou) পরিকল্পিত 'হুগটিং' নাটকে বলবার কিছু ছিল না, তাই নাট্যকার তাঁর সমস্ত ক্ষমতা গঠনকৌশলে নিয়োজিত করেছেন। শ'র নূতন নাটকে তাঁর প্রয়োজন নেই। তাঁর নাটকে চরিত্রগুলি প্রাণপন্থিতে এত উজ্জ্বল, তাদের বাকচতুরতা এবং বাকভঙ্গি বুদ্ধির উজ্জ্বলো এমন বীণামান, হুস্তির ক্ষম এবং বিতর্ক পরিবেশন এমন চাতুর্ধ্বর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক, সমস্তর এমন চিত্তাঙ্গল অথচ সৌক্যক আলোচনা, বাস্তব এমন কথোপকথন যে দর্শক এবং পাঠক তত্ত্বনিঃশ্বাসে তা উপভোগ করে। যদি দর্শকের মনে হয় যে তাঁরাই অপর্যাপী, তাদের উপলক্ষ্য করেই ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হচ্ছে, তাহলেও তাঁদের হৃৎকরবার হেতু নেই, কেননা ব্যঙ্গের ঘৃণির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রণ ঘূষ বেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অগ্রিম কথা তো কৌতুক করেই বলা চলে, শ তাই বলেছেন। স্বাী পাঠক বা দর্শক বুঝবেন এ শুধুই কৌতুকরূপে পরিপূর্ণ কমেতি নয়, এ কমেতি ব্যঙ্গপূর্ণ এবং এর একটা ব্যবহার হচ্ছে সম্বার্ষনীয়।

৩

শ'র নাটক শুধু কমেডি নয়, ব্যঙ্গ এমনকি বিশেষ একপ্রকারের সোশাল কমেডি। এ বিষয়ে অনেকটা তাঁর সমধর্মী নাট্যকার ছিলেন অ্যান্টিক্যানিস্। অবশ্য সোশাল সাহিত্যের এককমন্ডেয় আছে। সুইকটের স্নেহ নিষ্ঠুর এবং বিচ্ছেদস্বার্থ, ক্রাজেভেলের ব্যঙ্গ ধর্ম-মাথানো, চোলেভোরের স্নেহ বৃত্তির অসমিকার অবজ্ঞাপূর্ণ, চোট্টাখানো, হারলো'র ব্যঙ্গ সৃষ্টির অট্টহাস্যে আকাশকাটানো, অ্যান্টিক্যানিসের স্নেহ কৌতুকপরাধ, উট্ট টাডামোমিসিত এবং মাঝে মাঝে তীব্রভাবে ব্যক্তিগত। শ'র স্নেহেও উট্ট টাডামোমিসিত কৌতুক রয়েছে, তবে তা আত্মবিশ্বাসে ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু। নির্বোধকে তা আক্রমণ করে সত্য, কিন্তু আক্রমণকারীর উদ্দেশ্যের তুল্য পবিত্রতার এবং কৌতুকহাস্যের প্রাবল্যে সে আঘাত ব্যক্তিগতভাবে নির্বেশের গায়ে লাগে না, শুধু নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য পায়। উচ্ছল প্রাণশক্তি এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতার সঙ্গে ব্যঙ্গকৌতুকের সংমিশ্রণে সমাধিসংস্কারের দিকটা যে আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না বা মনে হয় না তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু কমেডীর প্রতিভা যেন তাঁর সম্বন্ধে প্রমাণ করা, তেমনি তাঁর চিন্তামূলক সংস্কারকের দিকটা অগ্রাহ্য করলে তাঁকে সম্পূর্ণ বোকা যাবে না।

শ'র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সমসাময়িক জীবনে এবং সমাজে প্রচণ্ড দুর্ভেদ্যতা এবং বিরাট ভগ্নামি : সমাজের মুখোপন্যাস বিখ্যা, ধর্মের মুখোপন্যাস অধর্ম, আর্থের মুখোপন্যাস আর্থপরতা। এই ভগ্নামি তিনি অল্পকালীন কঠোরতার সঙ্গে তাঁর নাটকে প্রকাশ করেছেন। *Major Barbara*তে তিনি দেখিয়েছেন, আধরা যে সমাজে বাস করি তাতে *Salvation Army*কেও বেঁচে থাকতে হয় সেই ব্যাক্তর দ্বারা যার অস্ত্রের বিরাট কারখানা মনোবলময় ধর্মের হাতিয়ার তৈরি করছে। *Widowers' Houses* দেখিয়েছেন, যে-উচ্চশিক্ষিত এবং স্বচ্ছল লোক নিজেদের মহৎজ্ঞানে দরিদ্র বস্ত্রীবাণীনের শোষণ মালিককে ঘৃণা করবার বিলাস গোষণ করছে তার নিজের উচ্চশিক্ষা এবং স্বচ্ছলতার মূল ভ্রষ্টেই সেই স্বর্থ বা উচ্চহারে বহুকীর্ষ হিসাবে ঐ বস্ত্রীবাণীনের নিকট থেকে কড়াকড়িহিসাবে আগার হচ্ছে। *Mrs. Warren's Profession*এ তিনি বলেছেন, যে-সমাজে নারী কোনো ভরসায়ে পরিভ্রমণকারী বাহিনী-ভাবে ব্যতীত থাকে না এবং স্বচ্ছলতার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ না করতে পারবে, সে সমাজে বেজায়গি বেশ মেবেই এবং বাধ্য হয়ে নারী তার স্বতন্ত্রতা এবং নীতিগত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পতিতা সাধবে। *The Doctor's Dilemma* নাটকে একজন ডাক্তার বলেছেন, 'ডাক্তারী তো পেশা নয়, এ একটা বড়মুখ'। ঐ নাটকের দুনিয়ার আরও স্পষ্টভাবে গোলাবৃত্তি শ বলেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তারদের ঘোষ না হলেও সমাজের এটা একটা অদ্বুত দৃঢ়তা যে যে-ডাক্তার রোগীর পা কাটবার ক্রমে টাকা পাবে তার উপরই বিচার করবার তার সেওয়া হয়েছে পা-টা কাটা সংগত কি না। জ্ঞান নিজের হাতে ফাঁসি দিয়ে যে টাকা পায় তাতে তার জীবিকা নির্বাহ হয়, কাকে ফাঁসি দিতে হবে সে বিচারের ভারটাও যদি তার হাতে থাকত তবে ফাঁসির ঘড়ি থেকে কম লোকের গলাই অব্যাহতি পেত। বলা বাহুল্য এগন কেসে অপরাধী ডাক্তার নয়, বেজ্ঞ নয়, অস্বকায়বানার মালিক নয়, অপরাধী সেই সমাজ যার ব্যবস্থার এগনত সত্ত্ব হয়, শোষণের উপর যার ভিত্তি এবং নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ঠুরতা যার উপজীব্য। দারিদ্র্যের চেয়ে বড় অপরাধ বর্তমান সমাজে নাই, অতএব বার্নার্ড শ সমাজকে বলছেন, তোমার এই অমানুষিক ব্যবস্থা বদলাও ; সদস্যদের ব্যক্তিকে

সাবধান করেছেন, যতদিন সম্ভব তার ব্যবস্থা না বদলাচ্ছে ততদিন পথরোধ, আর বাই হও, গরীব হয়ে না।

সমাজ কতকগুলি আদর্শ নিয়ে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে, এর বিকণ্ডেও তিনি প্রতিবাদ করেছেন। সৈনিক লম্ফে, বীর লম্ফে, বুদ্ধ লম্ফে বেশমত বিখ্যা কাল্পনিক আদর্শ সমাজে ছড়িয়ে আছে তার সুযোগ তিনি খুলেছেন একাধিক নাটকে। *The Man of Destiny*তে বেশিরভাগে সত্যিকার নেপোলিয়ন আদর্শের পোষক বহু নন, সত্যিকার নেপোলিয়ন বুদ্ধিমান, চতুর, বিবেকহীন, আত্মব্যর্থপন্থায়। *Arms and the Man* নাটকে পেশাদার সৈনিক Bluntschli পকেটে গুলি না রেখে চকোলেট রাখেন,* না টেকে লড়াই করে না; নেপোলিয়নের মতে সাহসের উৎস হচ্ছে ভয়,† মরিয়া হলেই যুদ্ধে সাহস দেখায়। বড় বড় কথা, যথা আদর্শ, কর্তব্য, প্রাণই শুধু হীনতা এবং দুর্বলতা ঢাকবার উপায় নাই। *The Doctor's Dilemma* নাটকে Sir Patric Cullen বলেছেন, 'A blackguard's a blackguard, an honest man's an honest man, and neither of them will ever be at a loss for religion or morality to prove that their ways are the right ways'। সমাজের প্রচলিত ধর্ম এবং নীতি, অর্থ এবং অন্তর ঢাকবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই সম্বন্ধে তাঁর চরিত্র না উন্মোচন করেছেন।

তাঁর নাটকে যারা প্রকৃত ধার্মিক, সত্যিকার নীতি মেনে চলে তাদের প্রকৃতিতে সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে অকপটতা, আত্মবিক্রম। Richard Dudgeon (*The Devil's Disciple*) প্রকৃত ধার্মিক, Blanco (*The Shewing-up of Blanco Posnet*) প্রকৃত সংলোক, তারা কোনো অবস্থায়ই প্রচলিত নীতি এবং কর্তব্যের ধার খায়ে না। যখন তাদের জীবনে পরীক্ষা আসে তখন নিতান্ত সহজ এবং আত্মবিক্রম তাৎক্ষণিকই যেন প্রকৃতির ধর্ম হিসাবেই তারা আত্মত্যাগের পথটাই বেছে নেয়।

The Devil's Disciple নাটকের শেষ অঙ্কে ধর্মবাহক Anthony Anderson 'পরতানের শিখ' Richard Dudgeonকে লক্ষ্য করে যা বলেছেন তা ত্যাগবর্ণন।‡

ইংরেজ এবং আইরিশ জাতির প্রতি ব্যঙ্গ সরস হয়ে উঠেছে John Bull's Other Island। Larry Doyle এবং Tom Broadbent চরিত্রের বৈপরীত্যে উত্তরের জাতীয় চরিত্রের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। Tom Broadbent চরিত্রের সাক্ষ্যে কোভুকরণ এবং Keegan চরিত্রের গভীরতার অন্তর্গত এই নাটক অবির হয়ে থাকবে।

রোমান্টিক প্রেম লম্ফেও শ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। রোমাঞ্চ মাত্রই অব্যক্ত এবং সমাজের গাঢ় হানিকর, এই বিশ্বাসে তিনি প্রেমকে শুধু জীবন-বিধাতার (Life Force) অল্প হিসাবে

* শ যেন ঠিক কবাই বলেছেন তা পেশাদার সৈনিকের অন্তরঃ বীকার কলন। Duke of Wellington কলহিলেন, 'The Army crawls on its belly.'

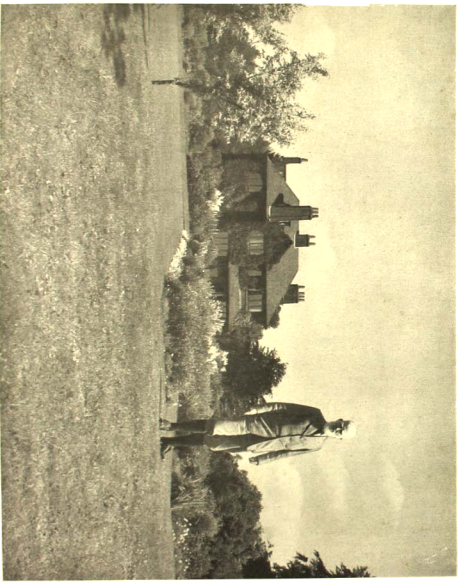
† "Napoleon: It is fear that makes men fight it is indifference that makes them run away: fear is the mainspring of war."—*The Man of Destiny*.

‡ "This foolish young man boasted himself the Devil's Disciple; but when the hour of trial came to him, he found that it was his destiny to suffer and be faithful to the death. I thought myself a decent minister of the gospel of peace; but when the hour of trial came to me, I found that it was my destiny to be a man of action."

দেখেন। এই তত্ত্ব *Man and Superman*এ নাট্যরূপ পেয়েছে। তাঁর মতে নিরন্তরের জীব থেকে যেমন মানুষের বিকাশ হয়েছে তেমনি বিবর্তনের ফলে মানুষ থেকে অতিমানুষ জন্মাচ্ছে। জীবনবিধাতা সেই অতিপ্রায়ে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। প্রেম, বিবাহ এসমস্ত তাঁর অস্ত্র; নারী প্রকৃতি বা জীবনবিধাতার চর, বিবর্তনের মাধ্যম মাত্র। এই তত্ত্ব অবশ্য সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিষেধ নয়; প্রেম এবং গর্ভধারণে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি তৎপর, এ ধারণাও তাঁর একার নয়; পলায়মান পুরুষের পশ্চাদ্ধাবন এবং অবশেষে পাণিগ্রহণ ইতিপূর্বে অল্প নাট্যকারও দেখিয়েছেন। কাজেই Ann কচুর্ক পলায়মান Tannerএর পাণিগ্রহণে খুব নতন কিছু নাই এবং এটাই এ নাটকের বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি কিছুটা বিবর্তনবাদ, কিছুটা নীতিশাস্ত্র, শোপেনহাউয়ার-এর দার্শনিক তত্ত্ব নিজস্বভাবে আচ্ছন্ন করে নাট্যবস্তুর সাহায্যে *Man and Superman* নাটকে পরিবেশন করেন। তৃতীয় অঙ্কে Tannerএর বিয়াট ক্ষুণ্ণের নাট্যরূপের ভিত্তি দিয়ে বিবাহ এবং স্বস্তিমূলক বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে। বিবাহ সম্বন্ধে দত্তরকম মতামত এবং পুষ্টিভিদি সম্বন্ধে প্রায় সবই নাট্যকারে আলোচিত হয়েছে *Getting Married* নাটকে। *You Never Can Tell* এবং *Candida*তেও বিবাহ সম্বন্ধে শ'র মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে নিরপদস্থ ব্যক্তি অথবা যেসমস্ত চরিত্র সাধারণের মত নয়, একটু ক্যাণ্টে ধরনের এমন লোকের মুখেই শ' অনেক সময় তাঁর জ্ঞানগর্ভ কৌতুকমিশ্রিত দার্শনিকহলত কথা বেশি করে দিয়েছেন। *Getting Married* নাটকে স্বজ্ঞি-বিক্রোতা Collins বলেছে, 'Marriage is tolerable enough in its way if you're easygoing and don't expect too much from it. But it does not bear thinking about. The great thing is to get the young people tied up before they know what they're letting themselves in for'. *You Never Can Tell* নাটকে হোটেলের পাশপরিবেশক Walter (নাম Walter, কিন্তু Dorothea সেক্সপীয়ারের সঙ্গে চেয়ারার দিল আবিষ্কার করে তার নামকরণ করেছে William) পরিণয়োক্ত হতাশাপরাণ Valentinকে বলেছে, 'Cheer up, sir, cheer up. Everyman is frightened of marriage when it comes to the point, but it often turns out very comfortable, very enjoyable and happy indeed, sir, from time to time. I never was master in my own house, sir : my wife was like your young lady : she was of a commanding and masterful disposition, which my son has inherited. But if I had to live my life twice over, I'd do it again : I'd do it again, I assure you. You never can tell, sir : you never can tell'. Peter Keeganকে সকলেই পাগল বলে জানে ; গভীর সত্যের বাণী শ' তাঁর মুখেই প্রকাশ করেছেন।

Candida নাটকে ত্রীর মধ্যে বাস্তবের রহিমা তাঁর অস্ত্রতম জ্যেষ্ঠ নারী-চরিত্রের (Candida) মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনেকের মতে এই নাটক শ'র জ্যেষ্ঠ কবেডি, প্রচলিত মতাবলম্বী সমালোচকের দ্ব্যবোধও জ্যেষ্ঠ ব্যাহত হয় নি। শ'র বিশিষ্ট মতামত ও রূপগ্রহণে কারো কোনো বাধা জন্মায় নি। বাস্তবিক চরিত্রমহিমা, কথোপকথন, ঘটনাসংস্থান এবং নাটকীয় ক্ষমতার তীব্রতা ও স্পষ্টতার পাতাবিক পরিণতির জন্মে এই নাটক অসাধারণ হয়েছে। রচয়িতা পার্থক্যভাবে প্রকৃত ভাষা-কবির চরিত্র





वार्नी ठे भ'द वार्नीठवन

(Marchbanks) উপস্থিত করার এমন স্থবর দৃষ্টান্ত বিহীন। আর Candida চরিত্র তো শ'র শ্রেষ্ঠ চরিত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রবল স্বাভাবিকতা এবং ব্যক্তিত্ব শ'-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর কয়েকটি প্রধান চরিত্রে বর্তমান। Andrew Undershaft, Peter Keegan, John Tanner, Caesar ইত্যাদি চরিত্রে শ'র ব্যক্তিগত চরিত্রের অনেকটা আঁচ পাওয়া যায়। সমালোচকরা এই চিত্রাবীর নিম্নের দাবীকে এবং সাহিত্যে যে পরিমাণে ব্যক্তিস্বাভাবিক ছিলেন তা দুজোঁর মানবচরিত্রের এক বিচিত্র উদাহরণ।

৪

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাদের সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রারম্ভে অনেক সময় বেথা যায় সমসাময়িক সমালোচকদের সঙ্গে তাদের মতান্তর, এমনকি মনান্তর, ঘটে। ফলে সমালোচকগণ সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে বেতাবে চিত্রিত হন তা তাঁদের আনন্দবর্ধন করে না বটে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা ধ্বংস। হেমরি ফিল্ডিং *Tom Jones* গ্রন্থে সমালোচকদের প্রতি যে মন্তব্য* প্রকাশ করেছেন তাতে সমস্ত যুগের সাহিত্য-স্রষ্টাই সায় দেবেন। *Fanny's First Play* নাটকে শ সমালোচকদের প্রতি যে ব্যঙ্গব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন তাও উল্লেখযোগ্য।

যদিও এবং সমসাময়িক সমালোচকের ভিতর এই ঘৃণার হেতু একাধিক। একটা বড় কারণ এই যে, সমালোচকেরা কুলে ঘান সময় শিল্পস্রষ্টাদের বিচার করার ন্যূনতম এক নয়। দে-মাগকাটি শেক্সপীয়ারের প্রযোজ্য তা শ'র উপর প্রয়োগ করা অনেক সময় নিরর্থক এবং মূর্থতা, এর বিপরীততাও অবশ্য সত্য। শেক্সপীয়ারের সত্ত্বে শ বিরাগ উক্তি করেছেন সত্য, কিন্তু সেই উক্তির বিশেষ তাৎপৰ্য অগ্রহাণন না করে সমালোচকগণ শেক্সপীয়ারের নাটকের বিশেষ প্রকার উৎকর্ষের তুলনায় শ'র নাটক হীন এই মন্তব্য প্রকাশ করেই কতকা পেয়েছেন। বাস্তবিক এ কথাটা অনেকে কুলে ঘান যে, শেক্সপীয়ার এবং শ উভয়েই ব ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক কারণে এবং স্বস্তির প্রয়োজনে শেক্সপীয়ারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা শ'র প্রয়োজন ছিল, কেননা শেক্সপীয়ারের প্রভাব শ তাঁর স্বস্তিতে যে সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার নিরাকরণ বাধা হয়েই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেক্সপীয়ারের মাশকাটি দিয়ে শ'কে বিচার করে ধারা শ'র হীনতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাঁরা নিজেদের হীনতা প্রমাণ করেছেন মাত্র।

শেক্সপীয়ার ট্র্যাগেডি এবং কমেডি দুইই লিখেছেন এবং এই দুই স্রাষ্টীয় নাটকের আবেদনও ভিন্ন প্রকৃতির। শ যদিও ট্র্যাগেডি লিখেছেন, তা খুব কম এবং ভিন্ন স্রাষ্টের। শ'র প্রতিভা বিশেষভাবে

* "Now, in reality, the world have paid too great a compliment to critics, and have imagined them men of much greater profundity than they really are. From this complacency, the critics have been emboldened to assume a dictatorial power, and have so far succeeded, that they are now become the masters, and have the assurance to give laws to those authors from whose predecessors they originally received them.

"The critic, rightly considered, is no more than the clerk. . . The clerk became the legislator, and those very peremptorily gave laws whose business it was, at first only to transcribe them."—*The History Tom Jones*, Vol. I (Book V, Chapter I).

কমেডিও প্রতিভা এবং সে কমেডির সঙ্গে শেক্সপীয়ারের কমেডির তুলনা করা নিরর্থক, কেননা শ'র এবং শেক্সপীয়ারের আশ্রয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বরীশ্রেণীয়ায় অনেক তফাত। তথাপি ইংরেজি সাহিত্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মিলও আছে। গুট বিবাহ, গঠনকৌশল ব্যাপারে উভয়ের কিছুটা ঐক্যমত এবং চরিত্রস্বরূপে বিশূল আগ্রহ এবং সাফল্য লক্ষ্য করবার বিষয়। এটা তুলনাও উচিত নয় যে, বেংগলত গ্রন্থকারের লেখা শ সবচেয়ে বেশি শেড়েছেন এবং তাদের স্বরীর রূপ আকর্ষণ পান করেছেন তাঁদের মধ্যে শেক্সপীয়ার অন্ততম। তিনি দাবি করেছেন, নাটকে গঠনকৌশল অবহেলা করে তিনি শেক্সপীয়ারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে গুট নিয়ে রাখা ঘানানোর ফলে নাট্যস্বরীর ব্যাঘাত জন্মে। সে দাই চৌক, শেক্সপীয়ারের স্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শ'র মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, তিনি একাধিক বার শেক্সপীয়ারের গুণকীর্তন করেছেন।*

শেক্সপীয়ার যে মানবদ্বারের স্রেষ্ঠ কাব্য লিখেছেন সে সম্বন্ধে শ'র সন্দেহ থাকবার কারণ নাই। শ কমেডির দৃষ্টে জীবনকে বেখেছেন এবং সৃষ্টির স্তরে তাঁর চরিত্রদের স্বরী করেছেন, কমেডী শেক্সপীয়ারের সঙ্গে তাঁর তুলনার কোনো কথাই ওঠেনা। তবে শ'কেও শেক্সপীয়ারের মত করে

* "Thus instead of taking a step forward technically in the order of the calendar, I threw off Paris and went back to Shakespeare, to the Bible, to Bunyan . . . in whom I had been soaked from my childhood."—*Current British Thought*, No. 1, 1947.

"Though I was saturated with the Bible and with Shakespeare before I was ten years old. . . . Preface to *The Admirable Bashville*.

✓ *Three Plays For Puritans* মার্কসের কৃতিত্ব থেকে বিরলিত অংশ উদ্ধারনাঃ :

"I am far too good a Shakespearean ever to forgive Henry Irving for producing a version of *King Lear* so mutilated that the numerous critics who had never read the play could not follow the story of *Gloster*.

"It does not follow, however, that the right to criticize Shakespeare involves the power of writing better plays. And in fact—do not be surprised at my modesty—I do not profess to write better plays. No man will ever write a better tragedy than *Lear*. . . . It is true that when we search for examples of a prodigious command of language and of graphic line, we can think of nobody better than Shakespeare and Michael Angelo. But both of them laid their arts waste for centuries by leading later artists to seek greatness in copying their technique. The technique was acquired, refined on, and elaborated over and over again; but the supremacy of the two great examples remained undisputed. . . . Human faculty being what it is, is it likely that in our time any advance, except in external conditions, will take place in the arts of expression sufficient to enable an author, without making himself ridiculous, to undertake to say what he has to say better than Homer or Shakespeare?" আসল কথা তিনি বলেছেন এর পরেই : "But the humblest author, and much more a rather arrogant one like myself, may profess to have something to say by this time that neither Homer nor Shakespeare said. And the playgoer may reasonably ask to have historical events and persons presented to him in the light of his own time, even though Homer and Shakespeare have already shown them in the light of their time. For example, Homer presented Achilles and Ajax as heroes to the world in the *Iliads*. In due time come Shakespeare, who said, virtuously: I really cannot accept this spoilt child and this brawny fool as great men merely because Homer flattered them in playing to the Greek gallery. Consequently, we have, in *Troilus* and *Cressida*, the verdict of Shakespeare's epoch (our own) on the pair. This does not in the least involve any pretence on Shakespeare's part to be a greater poet than Homer."

লিপিতে হবে, তা না হলে তাঁকে সার্বিক নাট্যকার বলা যাবে না এই ধারণা যে কুল শ তাঁর নাটকে ধ্যাত্মিক এবং সার্বিকতা দ্বারা তা প্রমাণ করে গেছেন। যাকে বলা হয় মানবচিন্তার গভীরতম ভাবাবেগ (fundamental passions) তা নিয়ে প্রচুর ভাবে শ কারবার করেন নি, কিন্তু জীবন নিয়ে কারবার করেছেন এ কথা তুললে চলবে না। শ আটের জন্ত লেগেন নি, বলেছেন; অর্থাৎ জীবনের জন্তই তাঁর আর্ট।

আগল কথা, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাকে বিচার করবার মানকটি পাওয়া যাবে তাঁরই হস্তেই। শেক্সপীয়ারের নাটকের উৎকর্ষ পরীক্ষা করে যে-কোনকি আনন্দ পাওয়া গেল সেই আনন্দের অস্তিত্বের উপর অন্য নাট্যকারের রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে না। এই তুল, অর্থাৎ পূর্ণবর্তীনের মানকটি ধরা পরবর্তীনের বিচার করা, শ্রেষ্ঠ সমালোচক আদ্রিস্টটল কপনও করেন নি। তিনি নিজের মনগড়া বা কাল্পনিক মতবাদের কষ্টপাথরে গ্রীক নাট্যকারদের দাঁতাই করতে চেয়েছিলেন নি, বরং তাঁদের আদর্শহীন বলে গ্রহণ করে তাঁদের নাটক অস্বাভাবিক করে উৎকর্ষের কারণ এবং কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। অতীত বিকৃপালগণের দৃষ্টান্তে লজ্জাগত বিকৃপালের মহিমা-বিচারে বিশেষ আছে। এমিক দিয়ে শ'র মত শেক্সপীয়ারকেও সমসাময়িক সমালোচকের হাতে অবিসার লঙ্ঘন করতে হয়েছে।

সমসাময়িক সমালোচকদের সঙ্গে সাহিত্যস্রষ্টাদের মতান্তরের আর-একটা কারণ সমালোচকের ব্যক্তিগত সংস্কার, তাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা। যে-নৈব্যক্তিকতার অভাবেই জন্ত শ বড় নাট্যকার হতে পারেন নি বলে আচার সাহেব মিথ্যা আক্ষেপ করেছেন নিজের সমালোচনার সেই নৈব্যক্তিকতার অভাবের জন্তে শ'র কোনো কোনো নাটক তাঁর কাছে অসম্মত মনে হয়েছে। সমালোচককেও শুধু নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কষ্টপাথরে ঘাসাই না করে স্রষ্টার চোখে দেখতে চেষ্টা করতে হয়— কি কথা স্রষ্টা বলতে চেয়েছেন, কেন এবং কি ভাবে সে কথা বলেছেন এবং যে ভাবে বলেছেন সে ভাবেই বা কেন বলেছেন।

শ্রী দৃষ্টান্তে আসা যাক। *The Doctor's Dilemma* নাটকে নাটক Louis Dubedat এর বৃত্তার পর তাঁর বিবরণকে লক্ষ্য করে একটি সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছেন, 'Do you think she would give me a few words on How it feels to be a widow? Rather good title for an article, isn't it?' এই দৃষ্টে এই উক্তি একাধিক ইংরেজ সমালোচককে পীড়া দিয়েছে। Dubedat বৃত্তাশ্রয়ী বলেছে, 'I believe in Michael Angelo, Velasquez, and Rembrandt; in the might of design, the mystery of colour, the redemption of all things by Beauty everlasting, and the message of Art that has made these hands blessed. Amen. Amen.' এই উক্তিও স্বাভাবিক নয় তাঁর অভিজ্ঞতা তুলেছেন। তাঁরা মনে করেন সাংবাদিকের উক্তিতে ধরা পড়েছে শ'র উদ্ভাসি এবং Dubedat এর বৃত্তাশ্রয়ী উক্তিতে তাঁর বক্তৃতা-প্রিয়তা, এবং দুটোই হয়েছে অব্যবহা। শেক্সপীয়ারের *Macbeth* নাটকের পঞ্চমকে পঞ্চম দৃষ্টে নানাভাবে বিশেষত্ব ঘোর বিশদগত ব্যাকবোধ পড়ায় আকর্ষিত বৃত্তাশ্রয়ী বর্ণন 'To-morrow and tomorrow বলে দীর্ঘ উক্তি করলেন সে-উক্তি এই-জাতীয় সমালোচকদের

কানে বোধ হয় যেমাননি, অস্বাভাবিক এবং অস্থানে কাব্য বলে মনে হবে। অথচ অন্তরে আদর্শ শেক্সপীয়ারের উপর না চাশিবে তাঁর নিজের স্বষ্টির মধ্যেই তাঁর আদর্শ খুঁজলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে হাই রৌক *Macbeth* নাটকে *Macbeth* চরিত্র যে-স্তরে উদ্ভাবিত হয়েছে সেখানে এই কাব্যায় উক্তি ট্রাজেডীর প্যাটার্নের মধ্যে সৌভাগ্যের সঙ্গে খাপ খেয়েছে। এই নাটকেই দ্বিতীয় অর্ধে তৃতীয় দৃশ্বে *Macbeth* এর প্রাণাধার ঘারীর উক্তিকে সমসাময়িক সমালোচকগণ অস্থানে ভাড়াপি বলে নিশ্চয় করেছেন। অথচ স্থানী সমালোচকগণ হুকেছেন এই তথাকথিত ভাড়াপি ভাড়াপি তো নাই, বরং মৃগতয়ার বিভীষিকাকে আরও তীব্র করেছে। *The Doctor's Dilemma* নাটক একটি ট্রাজেডি এবং যে ট্রাজেডিপূর্ণ মগনের চিত্র শ এই নাটকে ধরেছেন তার স্রষ্টার সঙ্গে সাংবাদিকের উক্তি বেহুয়ো তো বাজেই নি বরং নাটকের প্রধান চরিত্রকে গভীর ব্যঙ্গনা দিয়েছে। শেক্সপীয়ার ছিলেন কবি, তাঁর নাট্যকল্পনা কাব্যের স্তরে, তাই তিনি মানবাত্মার কাব্যগান রচনা করে শ্রোতাকে অহঙ্কৃতির উচ্চতম এবং গভীরতম স্তরে নিয়ে গেছেন। শ'র প্রতিভা, হাস্যরসিক, চিত্তাশীল, কর্মেতীর প্রতিভা, জীবনটাকে তিনি 'সিরিয়স' কর্মেতির চোখে দেখেছেন, সেই দৃষ্টিতে তাঁর ব্যঙ্গকৌতুকমাথা ব্যক্তিব্যবহা ছাপ আছে। তাই শ'র কর্মেতির আবেদন এবং শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির আবেদন ভিন্ন প্রকারের হতে বাধ্য। শেক্সপীয়ার যেমন তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দ্বারা নিমিত্ত হয়েছেন, শ'ও তাই। সমালোচক বা জনসাধারণের মতামতের চাপে শ কখনও স্বর্ষ ত্যাগ করেন নি; শিল্পবিষয়ে তাঁর বিবেকবোধ অস্বল্প রেখেছিলেন।

সমালোচকদের সংস্কার শ'-নাটক উপভোগে যেমন বাধা হবে সেবা দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত মিলবে উইলিয়ম আর্চারের একটি মন্তব্যে। *Caesar and Cleopatra* নাটকে *Britannus* চরিত্রে ব্রিটিশ জাতির দুর্বলতার প্রতি রেখ করা হয়েছে, এটা বোধ হয় আর্চারের ভালো লাগে নি। *Caesar*, *Britannus* এবং *Apollodorus* এর কথোপকথন দীর্ঘ এক পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করে তিনি পাঠককে বলেছেন, 'I don't know whether you find this amusing'. তাঁর কাছে এটা নৈরাশ্রমক ('depressing') মনে হয়েছে। এই বিস্তৃত উদ্ধৃতির শেষ কয়েক পঙ্ক্তি এখানে তুলে দেওয়া হল—

স্থানী পাঠক আর্চারের কোথের হেতু বুঝবেন এবং তাঁর উক্তির অর্থ দেখবেন :

Apollodorus. Hail, great *Caesar*! I am *Apollodorus* the *Sicilian*, an artist.

Britannus. An artist! Why have they admitted this vagabond?

Caesar. Peace, man. *Apollodorus* is a famous patrician amateur.

Britannus. [disconcerted] I crave the gentleman's pardon, [To *Caesar*] I understood him to say that he was a professional.

'জন বুল' ছাড়া এই ব্যঙ্গিত কৌতুকরস উপভোগ করতে আর কারো বাধে না। দ্বিতীয় একজন সমালোচক আবায় কালব্যত্যয়বোধ (anachronism) দেখিয়ে বলেছেন, শিল্পারের সময়কার ইংরেজ-সমাজে amateur এবং professional ভেদেই ছিল না।

শ'র বিকল্প নাট্যকার হিসাবে বোধ হয় সন্দেহে বড় অভিযোগ হচ্ছে এই যে, তাঁর স্বষ্ট চরিত্রগুলি

বাস্তব নয়, তারা প্রাণহীন পুতুলমাত্র, শুধু শ'র মতামতের মূখপাত্র হিগাবে তাদের অস্তিত্ব। এর জবাবে সন্দেহে শ'র ভঙ্গিতে বলা চলে যে, সমালোচকরা একবার নিজেদের মতামত কতগুলি চরিত্রের মূখে বসিয়ে নাটক লিখে দেখুন, তাঁদের লেখা নাটকগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়ে শ'র নাটকের কাছাকাছিও পৌঁছায় কি না।

বাস্তবিক শ'র সৃষ্ট নরনারীরা যে জীবন্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট মতামত আছে, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাঁর নাট্যীয় অশক্যতা এ বিষয়ে অসাপারণ। বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত সমান জোরের সঙ্গে যুক্তিদৃষ্টি করে উপস্থিত করেছেন। চরিত্রগুলি যোটাই শ'র মতামতের মূখপাত্র নয়। বরং: কোন চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে তাঁর মতামত পাওনা থাকে তা বলা শক্ত। যে মত তাঁর নিজের নয় তাও অসাপারণ জোরের সঙ্গে তিনি তাঁর চরিত্রের মূখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। Mrs. Warren-এর মতামত নিচ্ছই শ'র মতামত বলা চলে না, Andrew Undershaft-এরও বহু উক্তি যুক্তিদৃষ্টি করে উপস্থিত করা হয়েছে বা শ'র নিজের মত বলে চালানো যায় না। আবার এ কথাও বলা চলে না যে, শ'র মতামত তাঁর কোনো চরিত্রের মূখ দিয়ে প্রকাশ হয় নি। বোটের উপর, শেক্সপীয়ারের সঙ্গে যেমন তাঁর সৃষ্ট কোনো একটি চরিত্রের সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গীণ মিল নাই, শ'র সঙ্গেও তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রের সম্পূর্ণ মিল নাই। তবে তাঁর চরিত্রগুলি এবং তাদের নাটকীয় অস্তিত্ব যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে, তাদের দৃষ্টি করে উঠেছে তর্কের মাধ্যমে, কিন্তু তাই বলে তারা প্রাণহীন নয় বা শ'র মতামতের মূখপাত্রও নয়। এ কথা ঠিক, Andrew Undershaft, John Tanner যে-ভাষায় কথা বলেছে একবার শ'ই তা বলতে পারেন, কিন্তু তাদের মতামত সর্বত্র শ'র মতামত নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে Othello, Hamlet, Macbeth, এমন কি Iago যে ভাষায় কথা বলেছে তা একমাত্র শেক্সপীয়ারের ভাষাই সম্ভব, অস্তের পক্ষে নয়—এই যুক্তিতে শেক্সপীয়ারের সৃষ্ট চরিত্রগুলি পুতুল হয়ে যায় নি। আসল কথা, নাটকীয় চরিত্র এবং তাদের ভাষা হুবহু জীবনের কপি হতে পারে না; নাট্যকারের কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্র অবিকল জীবন্ত মানুষের মত কথা বলে না। শেক্সপীয়ারের বিশেষ কল্পনায় তাঁর চরিত্রগুলি নতুন জীবন পেয়েছে। শ'র চরিত্রগুলিও তাঁর বিশেষ প্রকার (স্থিতি এবং কৌতুকবোলা) কল্পনায় নতুন জীবন লাভ করেছে—তাদের দ্বারা তারা শুধু বাস্তব নয়, জীবন্ত।

শ'র নাটকে সৃষ্ট চরিত্রগুলির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থের প্রাণের প্রকাশ। কত বিভিন্ন প্রকার নরনারীর সমাবেশ তাঁর নাটকে তাবলে তাঁর নাট্যশক্তির মূহু হতে হয়। Bloomfield Bonington (B. B.), Candida, Marchbanks, Walter (*You Never Can Tell*), John Tanner, Peter Keegan, Tom Broadbent, Andrew Undershaft, Dick Dudgeon, Captain Brassbound, Lady Cicely, Mrs. Warren, Bluntschli, Joan, Henry Higgins এরা প্রত্যেকেই শুধু জীবন্ত নয়, এরা সার্থক জীবনের যে দ্বারা তাদের কল্পনা করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। ইংরেজি নাটকের ইতিহাসে স্রেষ্ঠ অমর চরিত্রদের মধ্যে নিজেদের মহিমা এরা আপনাদের স্থান করে নিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতিনিচয় শ-বিরোধী সমালোচক বলবেন, শেক্সপীয়ার মানবজীবনের গভীরতম ভাবাবেগ নিয়ে নাটক লিখেছেন অতএব তিনি অমর এবং অমরতার এই অধিষ্ঠায় পদা। ভাবাবেগ

নিরে বহু নাট্যকার নাটক লিখেছেন কিন্তু শেক্সপীয়ার একটিই সম্ভব হয়েছে। আবার শ যে নাট্যবস্ত্র নিয়ে নূতন নাটক রচনায় সার্থকতা দেখিয়েছেন তা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি। আসল কথা নাট্যকর্মতা ঐ স্বেচ্ছাস্বক কবেডি লিখেও অন্যর হওয়া যায়। চোবের সামনে অ্যাবিস্টফ্যানিসের দৃষ্টান্ত রেখে বলা চলে না যে, সাময়িক সমাজব্যবস্থা নিয়ে স্বেচ্ছাস্বক কবেডি লিখলে অন্যর হওয়া যায় না, মানবজন্মের অবিমিশ্র ভাষাবোধ চাই। আর তা ছাড়া শুধু সমাজব্যবস্থা নয়, নবনারীর জীবনের গোড়ার কথাও তাঁর নাট্যবস্ত্র অন্তর্ভুক্ত; প্রেম এবং sexও তাঁর উপজীব্য। ভাবীকালে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সাধারণ লোকের আগ্রহ না জাগাতে পারে, যেমন শেক্সপীয়ারের সমস্বকরে থিয়েটারের অবস্থা সযত্নে বর্তমানে সাধারণ লোকের উৎসাহ নাই, কিন্তু *Hamlet* নাটকে তখনকার থিয়েটারের নিত্যস্থ অস্থায়ী সাময়িক তথ্যকে যে-নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে আরও তা অগণিত লোকের উৎসাহের বস্তু হয়ে আছে। এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শেক্সপীয়ার তাঁর যুগে যে কারণে অনগ্রীয় ছিলেন, আশা বিশেষ করে সেই কারণেই যে তিনি অনগ্রীয়, তাও নয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বহু বিচিত্র কারণে; তা কালের দীর্ঘা অতিক্রম করে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রত্যেক যুগ তার সংস্কৃতি এবং বৈমজ্ঞান্য পছন্দ দেয়। শ'র শ্রেষ্ঠত্বও ভাবী বিদগ্ধ সময়ে স্বীকৃত হবে।

নাট্যকার হিসাবে সার্থকতার একটা বড় পরীক্ষা হচ্ছে অভিনয়যোগ্যতা। শ'র নাটক যে অভিনয়-যোগ্য তার প্রমাণও প্রচুর ভাবেই পাওয়া গেছে। নাট্যকার হিসাবে প্রাণ্য সম্মান সমসাময়িক সমালোচকের কাছে তিনি উপযুক্তরূপে পান নি এ কথা সত্য। শেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক সমালোচনা হয়েছে তাঁদেরই হাতে দ্বারা তাঁর রচনার সাগরে প্রথমটা নিমেষের ভূমিতে লেপেছেন প্রম না করে। শেক্সপীয়ারের সাহিত্যই শেক্সপীয়ারের রসবিচার করতে শিখিয়েছে। এই সার্থক সমালোচকগোষ্ঠী অধিকাংশই তাঁর পরবর্তী যুগের। শ'র সার্থক সমালোচনার সৃষ্টি তাঁর সাহিত্য, তাঁর নাটকই করবে, ভাবীকাল তার আরোপন করছে। তবে শেক্সপীয়ারের মত শ'রও সাধনা এই যে, জীবদ্দশাতেই তিনি স্বীকৃত হয়েছেন, কারো কাছে সম্পূর্ণ অন্ধার সঙ্গে, কারো কাছে প্রত্যাশিত দীর্ঘ বিদগ্ধতার সঙ্গে, আবার কারো কারো কাছে ক্ষুদ্র নির্ভলা কটুভাষণে। শ'র কবেডিবস্টা প্রতিভা বোধ হয় শেখোক্ত প্রতিভাব্যকেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মেনে প্রভাবমূলক কৌতুকহাস্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

৫

Plays Unpleasant গ্রন্থের ভূমিকা প্রাগুক্তরূপে শ নিম্নের সযত্নে একটি ভাষ্যপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেছেন। চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ তাঁর এক ভক্তার বন্ধু একবার তাঁর চোখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন শ'র চোখ সযত্নে কোনো ভক্তার উৎসাহবোধ করবে না, কেননা তাঁর দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক। শ ভবেছিলেন এ কথার ভাষ্য এই যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি বেশির ভাগ লোকের মতই। কিন্তু ভক্তার বন্ধু তাঁর কুল ছেড়ে বলেছিলেন, এ কথার অর্থ ঠিক উলটে; অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিশক্তি চমৎকার, সমাজে শতকরা দশজনদের এমন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি আছে কি না সম্ভব, বাকি নব্বই জন লোকের দৃষ্টিশক্তি যোষদ্বই অস্বাভাবিক। ভেবে দেখলে বলতে হয়, যেখানে শতকরা নব্বই জনেরই চোখ ব্যাধা শেখানে চোখ ব্যাধা অবস্থায় স্বাভাবিক। অর্থাৎ শ'র দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিকতাটাই অস্বাভাবিক।

শ'র দৈহিক চোখের ভালোমন্দের সঙ্গে সবজের স্পর্শ খুব কমই কিন্তু তাঁর মনের চোখটা যে শতকরা নিরানব্বই জনের মত নয় তাই নিষেই গোলমাল বেধেছে। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং স্বীকৃত ব্যাচিট হচ্ছে হেটমুণ্ড উর্পার অবস্থার। অর্থাৎ শ'র মনের চোখ বা দেখে এবং বেড়াতে বেঁচে পড়কলা নকই জনের চোখ তার উলটো রকম দেখে। শেখোক্তাদের দৃষ্টিশক্তি যদি হয় স্বাভাবিক তবে শ'র দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। কার দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক, কার অস্বাভাবিক তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। সচরাচর অল্প শ'কেই অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তাঁর উক্তিকে paradox বলে উড়িয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ভাবীকালের বৃত্তিমান ব্যক্তিদা হয়েছে। Hamlet-এর ভাষায় বলবেন, 'This was sometimes a paradox but now the time gives it proof' John Bull's Other Island নাটকে Father Keeganও অনেকটা এই-ধাতীর একটা কথা বলেছেন 'Every jest is an earnest in the womb of time'.

সমাধে আর-একটা লোক বেড়াতে বেঁচে তিনি পেড়াতে বেগেন না, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকম স্বাভাবিক বলে সত্য তাঁর চোখে সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে এটাই তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। আরও একটা অত্যাশ্চর্য কথা হচ্ছে, তিনি এই সত্যকে শাস্ত্রোক্তে গোঁড়াহুতি বেগেন নি, সেখানে কমিক দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর দৃষ্টিতে সত্য কমিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। Back to Methuselahতে He-Ancient বলেছে: 'When a thing is funny, search it for a hidden truth'। একথা শ'র fun এবং jest সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে ঠাটে। তাঁর নাটকে যা funny তার অন্তরে গভীর সত্য আছে, সে সত্য বিশেষ প্রকাশের সত্য, শুধু যা ঘটে তা নয়। সাহিত্যশ্রী যে-সত্য প্রকাশ করেন তা কল্পনার প্রকৃতি এবং প্রকাশের ভঙ্গি অল্পশরে বিভিন্ন সত্যের হতে বাধ্য; Poetic truth-এর মত tragic এবং comic truthও সত্যেরই প্রকার-বিশেষ। তাঁর নাটকে যে হাসির ছড়াছড়ি তার গভীরতাও অবহেলার বস্তু নয়। Plays Pleasant-এর ভূমিকায় এক আশ্চর্য তিনি বলেছেন: 'When a comedy is performed any fool can make an audience laugh. I want to see how many of them, laughing or grave, are in the melting mood' সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ করে বলেছেন, 'And this result cannot be achieved, even by actors who thoroughly understand my purpose, except through an artistic beauty of execution unattainable without long and arduous practice and an intellectual effort which my plays do not seem serious enough to call forth.' ইতিপূর্বে The Doctor's Dilemma নাটকে সাংবাদিকের উদ্ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্তিতে নিহিত যে হাস্যরস রয়েছে তাই স্থগিক পাঠক এবং লক্ষকের মনে 'melting mood' এনে দেবে। যে-সমাধে নাট্যোজ্জ্বলিত রূপ সমস্ত ভাঙারের কাছে বেগা সে, যে-সমাধে সত্ত্বগুণবাক্তির বিধবাকে অল্পসম্বন্ধ সাংবাদিক প্রশ্ন করতে চায়, 'বিধবা হলে কেমন লাগে', সে সমাধের কথা কোঁকুরের সঙ্গে বললেও সেই হাস্যকৌতুক গভীরে আছে কান্না। রসিক ব্যক্তিদা একে ভাঙনি বলবেন না।

তুণু নাটকে নয়, জীবনে কথায় এবং কাছে তাঁর কৌতুকপরায়ণতা সাধারণের কাছে তাঁর গভীর এবং গভীর দিকটা দেখেছে। তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা হচ্ছে এই যে লোকটা ধর্মবিশ্বাসী, তরলমতি,

যোটেই সৌরিয়স নয়, স্থানে অস্থানে ঝাঁড়ানি করাই তার ব্যাবসা। শীর্ষায় বসে ধর্মবাহকের বক্তৃতার সময় যে ব্যক্তি খিল খিল করে হাসে তাকে ধর্মবিরোধী তরলনতি ভাবা হইত। অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এই হাসার হেতু যদি হয় এমন একটা দৃষ্টান্ত বা শীর্ষা এবং প্রচলিত ধর্ম আশ্রয় করে যে নীতিহীন চিন্তাহীন অধ্যায়িকতা প্রদর্শন পাচ্ছে এবং পৃষ্ঠে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ এবং প্রবল প্রতিবাদ ঘানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহলে দ্ব্যক বলা হয় levity বা তরলচিত্ততা, তাই হয়ে গাড়ায় অস্বাভাব্য সৌরিয়স। শ'র তথাকথিত তরলতা এবং ঝাঁড়ানি তার পাঠ্যকে গোপন রাখতে পারে তাঁদের কাছেই ধারা শ-মানসের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত নয়।^১ Daily Herald কাগজের পাঠকদের দ্বারা প্রকাশিত তার সম্পূর্ণ নাট্যগ্রন্থাবলীর ছবিয়ার তিনি পাঠকে বলেছেন, 'But please do not think you can take in the work of my long life time at one reading. You must make it your practice to read all my works at least twice over every year for ten years or so. That is why this edition is so substantially bound for you.' এই উক্তি ভবিষ্যৎবাহ্যে শ'-মার্ক। এতে বহু পাঠক শুধু কৌতুকের পরিচয় পাবেন, দুঃখের বিষয় কৌতুকের স্তর ছাড়িয়ে আরও গভীরে এই উক্তির বাস্তব্য বৃত্তবৈদ্য এমন পাঠকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। শেষোক্ত পাঠকের কেউ কেউ যদি এই উক্তিতে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত আছে বনে করেন তবে তা সত্যেরই অতিরিক্ত, শ-সনালোচকদের সমালোচনার মত তা ক্যাশনের অতিরিক্ত নয়।

শ যদি নাটক নাও লিখতেন তবু তাঁর বাচনভঙ্গি, তাঁর হস্তরঙ্গ এবং কৌতুকশ্রিয়তা, সর্বোপরি তাঁর ঠাইলের ভণে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকের স্বধায়া মিতে হত। তাঁর বাচনভঙ্গি তাঁর সরল ব্যক্তিত্বের ছাপে অভিনব; তাঁর কৌতুকশ্রিয়তা বক্তব্যের গভীরতাকে সরল এবং চিত্তাকর্ষক করেছে; ইংরেজি ভাষার শিল্প, প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের বলে তাঁর কন্ঠদ্বয়। নাটকে বেকথোপকথন তিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন তাঁর ঠাইল নাটকীয় কথোপকথন-শিল্পে অপূর্ব। ভাষাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর সত্য প্রকাশের উপযোগী করে তাঁর প্রতিভার বাহনে পরিণত করেছেন। শুধু ঠাইলের মিক মিয়েও ইংরেজি সাহিত্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবেন।

এই প্রবন্ধে বিস্তৃত দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি ছুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। প্রথমটি^২ 'উন্নতিশীল

১. দিলদার্ট বীথ্ ডেকারটন শ'র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন নি, কিন্তু শ'র প্রতিভার অকৃত্রিম বুঝলেন। এইজন্য আমি পূর্বে শ'র মধ্যে সেরা বই প্রকাশিত হয়েছে তার কথা গুলি বই দি। তিনি অবশ্য বেশির ভাগ বিষয়ে শ'র সঙ্গে একমত হন নি, কিন্তু তিনি শ'র অতিবিস্ময় সৌরিয়স অকৃত্রিম সত্যকে কোনো ভুল করেন নি। তাঁর George Bernard Shaw গ্রন্থের অন্য সমস্তরূপে ছবিয়ার আছে, 'Most people either say that they agree with Bernard Shaw or that they do not understand him. I am the only person who understands him, and I do not agree with him.' শ'র তরলচিত্ত তাঁর বিষয়ে এ ভুল ব্যক্তি শ'র স্রেষ্ঠ সমালোচক কখনো করেন নি। তিনি শ'কে বুঝার জন্য তাঁকে তিনটি বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করেছেন: The Irishman, The Puritan and The Progressive।

২. 'It is the desire of the President that nothing shall be said that might give pain to particular classes. I am about to refer to a modern class, burglars, and if there is a burglar present I beg him to believe that I cast no reflection upon his profession. I am not unmindful of his great skill and enterprise; his risks, so much greater than those of the most speculative capitalist, extending as they do to risk of liberty and life, or of his abstinence; nor do I overlook his value to the community as an employer on a large scale, in view of the criminal lawyers, policemen, turnkeys, gaol-builders and sometimes hangmen that owe their

বৎসর বয়সে Industrial Remuneration Conferenceএ একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে মিলবে শ'র বিশেষ প্রকার বাচনভঙ্গি যাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা, সনাঃস্বাভাব্য প্রতি তাঁর নার্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রাঞ্জল ভাষার সহস্রবোধভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'বিতীর্ণ' তাঁর ব্যঙ্গ-চৌধুরী বৎসর বয়সে লেখা *Back-to Methuselah* নাটক থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে; শেষ অক্ষর শেষ করা শাইন। উদ্দেশ্যের মধ্যে, চিত্তের পরিমিততা, চিন্তার গভীরতা এবং নিছক ইংরেজি গদ্য স্টাইলের আদর্শ হিসাবে লিখিত এই প্রশান্ত গভীর উক্তি অমর হয়ে থাকবে।

৬

শ'র নাট্যরচনা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে বলা হল। যদিও তাঁর প্রতিভা বহুমুখী এবং তাঁর ব্যক্তির ফেড একাধিক, তথাপি বর্তমান লেখকের বিদ্যাপ্রবীণতা যেন সর্বপ্রথম কবি বার্নার্ড শ'ও তেজি সর্বপ্রথম নাট্যকার।

নাটকগুলি প্রকাশিত হবার সময় বিদ্যুত ভূমিকাও তাঁর সঙ্গে তিনি ছুড়ে দিচ্ছেন। ভূমিকাসম্বলিত নাটক এই প্রথম নয়, ড্রাইডেনও ইতিপূর্বে এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। রচনার উৎকর্ষ হিসাবে এবং তাঁর বক্তব্য বিবরণের মৌলিকতা এবং প্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করে শ'র ভূমিকা সম্বন্ধে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ একমত হবেন, নাটক সম্বন্ধে বাই হৌক। নাটকগুলিকে ভূমিকার নাট্যরূপ বলার কুল বক্তব্য সম্ভাবনা আছে। এ কথা বলা ভুল হবে যে, নাটকের প্রয়োজনে ভূমিকার কোনো আবশ্যক ছিল। শ'র কাছে তাঁর মতামতের বতই দায় থাকে না কেন, এ কথা বলা আরও ভুল হবে যে ভূমিকা নাটকের স্থান পূরণ করতে পারে। ভূমিকাতে সোমাত্রি এবং মুখ্যভাবে আছে শ'র বক্তব্য এবং মতামত— শুধু তাঁর বা অন্তের নাটক সম্বন্ধে নয়, সমাজ এবং জীবন সম্বন্ধে— নাটকে আছে মুখ্যভাবে নাটক। শেকসপিয়ারের নাটক যেটো তাঁর জীবন-বর্ণন পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর নাটকের প্রকৃত মূল্য নাটক হিসাবেই, বর্ণন বা স্বতন্ত্র কিছু গোঁ? শ'র বেলাও এই কথাই সত্য। তাঁর জীবন-বর্ণন কুল হতে পারে, গ্রন্থযোগ্য না হতে পারে, তিনি নিজেই সর্বপ্রথম শিক্ষক মনে করতে পারেন, কিন্তু তাতে তাঁর নাটকের উৎকর্ষ খতিত হয় না।

শ বারংবার তাঁর মতামতের উপর তাঁর জীবন-বর্ণনের উপর জোর দিয়েছেন। জীবনের পেশির livelihoods to his daring undertakings. I hope any shareholders and landlords who may be present will accept my assurance that I have no more desire to hurt their feelings than to give pain to burglars: I merely wish to point out that all three inflict on the community an injury of precisely the same nature.'

১১ LILITH I am Lilith: I brought life into the whirlpool of force, and compelled my enemy, Matter, to obey a living soul. But in enslaving Life's enemy I made him Life's master; for that is the end of all slavery: and now I shall see the slave set free and the enemy reconciled, the whirlpool become all life and no matter. And because these infants that call themselves ancients are reaching out towards that, I will have patience with them still; though I know well that when they attain it they shall become one with me and supersede me, and Lilith will be only a legend and a lay that has lost its meaning. Of Life only is there no end; and though of its million stately mansions many are empty and many still unbuilt, and though its vast domain is as yet unbearably desert, my seed shall one day fill it and master its matter to its uttermost confines. And for what may be beyond, the eyesight of Lilith is too short. It is enough that there is a beyond. (She vanishes).

ভাগ সময়ই তিনি প্রচারকের কাৰ্য্য করেছেন বক্তৃতায় এবং পুস্তিকায়। নাটকেও তাঁর মতাবলম্বী এবং জীবন-দর্শনের পরিচয় মেলে। তাঁর কুর্যোদর্শন, প্রগতি, পাণ্ডিত্য, পরিষ্কার বুদ্ধি এবং মননশীলতার ফলে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা স্পষ্টভাবে প্রচার করে গেছেন। এইজন্য তাঁর চরিত্রে শিক্ষকের প্রচারকের দিকটাত্ত্ব অপ্রধান নয়। তাঁর তাঁর সমাজগচেতন বুদ্ধি সমাজকে বুদ্ধির পথে, বাঁচার পথে, উন্নতির পথে চালানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

যে-সব তিনি প্রচার করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের চিন্তার ফল নয়। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, পূর্ববর্তী জীবীদের চিন্তাকে তিনি নিজের মত করে গ্রহণ করে, আয়ত্ব করে, প্রয়োজনমত বরলে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করেছেন। পূর্বগামী যে-সে চিন্তাশীল মনীষীদের নিকট তিনি এইসমস্ত তত্ত্বের জন্য কষ্টী তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন স্যামুয়েল বাটলার, কার্ল মার্ক্স, ইব্‌সেন, নীচেসে এবং শোপেনহাউজার। একদিকে তিনি আদর্শ বুদ্ধিবাদী, অন্যদিকে যে স্বপ্নমূলক অভিব্যক্তিবাদের (Creative Evolution) তত্ত্ব তিনি তাঁর রচনার প্রচার করেছেন তাতে তাঁকে 'বিস্টিক' আখ্যাও দেওয়া চলে। তাঁর স্ট্রেট কমেডি *Candida* এবং স্ট্রেট ড্রামেডি *Saint Joan*— এই মত পোষণ করেও বলা চলে যে স্বপ্নমূলক অভিব্যক্তিবাদ তত্ত্বের দিক দিয়ে *Man and Superman* এবং *Back to Methuselah* তাৎপৰ্যপূর্ণ। এই তত্ত্বের প্রধান অংশ হচ্ছে তাঁর ভাবার Life Force বা জীবন-বিঘাত, এই জীবনবিঘাত, যদিও আয়ত্বগচেতন নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসম্পূর্ণ আয়ত্বগচেতন মানুষ থেকে Superman বা অভিব্যক্ত স্বপ্নী করা। আয়ত্বগচেতনতার দিক দিয়ে জীবজন্তু হীন প্রাণী, এই জন্তু ছাড়াই আয়ত্বগচেতন মানুষের স্বপ্নী করা হয়েছে, এখন জীবনবিঘাত মানুষ থেকে অভিব্যক্ত স্বপ্নীর জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছেন। অভিব্যক্তির কাৰ্য্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চলবে, মানুষ তাতে বাধাও দিতে পারবে না, সাহায্যও করতে পারবে না এই মতবাদের তিনি খোঁর বিরোধিতা করেছেন। মানুষ অবস্থার দ্বারা নয়, সে জীবনবিঘাতকে সাহায্য করতে পারে, অবস্থা পরিবর্তনে সে শুধু সক্ষম নয়, অবস্থা-পরিবর্তন-চেষ্টাই তার কর্তব্য।

মানসিক অচেতনতা থেকে সচেতনতার দিকেই জীবনের অগ্রযাত্রা, বা কিছু এই অভিব্যক্তি, এই অগ্রগতির কাছে সাহায্য করতে পারে তাই মহৎ। এইজন্যই আর্ট মহৎ, কেননা আর্ট সচেতনতার জন্য যেহে— তাই বুদ্ধি বুদ্ধি মননশীলতা না'র কাছে অমূল্য। *Man and Superman* নাটকে Don Juan বলেছে, 'To Life, the force behind the Man, intellect is a necessity because without it he blunders into death'. সত্যানুগ্রহনন মহৎ কেননা তা অভিব্যক্ত স্বপ্নীর সহায়। এইজন্যই যৌন ব্যাপারকে রোমান্সের দিখ্যা থেকে বাঁচিয়ে তার সত্যকার স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য তিনি জানাতে চেয়েছেন।

সবাত্মের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এবং অগ্রগতি সামাজিক ব্যাপারে তিনি যে অভিনবোদ্য বুদ্ধিবাদী এটা তাঁর জীবনব্যবস্থার বিস্তারী নয় এবং অগ্রসারিকও নয়। জীবনবিঘাতের পরীক্ষা চলছে নরনারীর স্বপ্নীর ভিতর দিয়ে। স্বপ্নীর কাৰ্য্য ব্যাহত হচ্ছে মানুষের দুৰ্ভতা এবং তার দ্বষ্ট সমাজব্যবস্থার জন্য। সমাজ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে স্বপ্নীর সম্পূর্ণ হ্রাসে থেকে বঞ্চিত করেছে। কলে কলকতির পরিবাণ বেড়ে গাচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে জীবনবিঘাতের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে বলে। তাই

শ ভবিষ্যৎভার বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, যদি মানুষ জীবনবিধাতার কাছে সহযোগিতা না করে, যদি অতিমাহুৎ সৃষ্টির গণ্ডি বাধা হয়ে ঠাড়াই তবে নির্ণয়ভাবে মানবজাতিরকে ধ্বংস করতে জীবনবিধাতার বাধ্যবে না। তিনি চেয়েছেন এমন সমাজব্যবস্থা দ্বারা ফলে নবন্যায়ী সর্গশ্রমকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত করে আরও বৃদ্ধিমান হয়ে, আরও স্বাভাবিক হয়ে পরস্পর পরস্পরকে বেছে নিতে পারবে এবং জীবনবিধাতার অভিব্যক্তির কাছে অতিমাহুৎ প্রায়নতঃ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এই হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা।

সমাজ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনি তাঁর সমালোচনা করেছেন মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিস্তোষণাবাদের উপকরণ সমস্ত সমাজের হাতে থাকবে, কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তার মালিক হয়ে বসতে পারবে না; শুধু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বাধীন একটা রাষ্ট্র গণতন্ত্রসম্বন্ধিত হয় না—তার ভাষায় প্রত্যেক মূর্খকে একটি করে ভোট দেবার অধিকার দিলেই গণতন্ত্র চালু হয় না; অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নাগরিককে দাস করে রেখে অস্ত্রব্যাপার ব্যক্তিবাধীনতা দেবার কোনো অর্থ হয় না—ইত্যাদি মন্তব্য তিনি বক্তৃতায় এবং লেখায় প্রচার করেছেন। এই-স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্তী সিন্ডিকেটের পছন্দ করতেন বেশি, কেননা সিন্ডিকেটের বা একমাসে করতে পারে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তা দীর্ঘকালেও করতে পারে না।

তার কৌতুকপ্রিয়তা, বিপুল স্বল্পনাশক্তি, জীবন সযত্নে তার অপরিসীম অভিজ্ঞতা, জীবনকে কর্মেভির দৃষ্টিতে দেখবার অসাধারণ ক্ষমতা এবং তাঁর ক্ষুধার ঠাইল যেমন তাঁকে প্রধানশ্রেণীর নাট্যকারে পরিণত করেছে তেমনি তাঁর বুদ্ধিবাহ, তাঁর সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তিবাদ, ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সযত্নে তাঁর মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দারিদ্র্য সযত্নে তাঁর বাউলারী মতবাদ, এইসবগুলি নিয়ে তাঁর জীবনদর্শন একটা সমগ্রতা লাভ করেছে। দ্বারা তাঁর মধ্যে অগংগতি পেয়েছেন তাঁরা তাঁকে অসম্পূর্ণভাবে মেনেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেই তাঁর বই 'substantially bound' হয়ে প্রকাশিত হয়েছে যাতে বছরে দুই তিন বার করে অন্ততঃ বছর বশেক পড়া চলে। প্রতিভা সর্বকালে সমান আবলচেতন হয় না। শ'র মত আত্মলচেতন প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। এই আত্মলচেতনতার প্রকাশ দার্শনিক মনে হলেও, এমনকি শ'র ব্যক্তিগত প্রকৃতি তাকে দার্শনিক বলে নির্দেশ করলেও, তা দার্শনিকতা নয়, বিশেষ ভঙ্গিতে সত্যের প্রকাশ মাত্র।

গ্রন্থপরিচয়

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী। সম্পাদক শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসতীকান্ত দাস।
বকীৰ-সাহিত্য-পরিষৎ। আবেণ ১৩৪৭। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৮।

হিন্দু এবং মনোবাহী বাক্যের বক্তা যেমন দুর্ভাগ্য, প্রেমজননে কোনো অসুখাধা কাজের অসুখোৎপাদনা-
কর্তাও তেমন দুর্ভাগ্য। কিন্তু এ হল অসুখোৎপাদনা সে অসুখা সাধনে সক্ষম হয়েছেন, কেননা শরৎকুমারী
চৌধুরাণীর রচনাবলী সমালোচনার তার আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি। তিনি এ সমালোচনা বাস্তব, এখন
স্বয়ং স্বীকৃত্যে তার ‘সত্যবিবাহ’ পড়ে বলেছেন, “এমন সত্যীত সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্পের বইয়ে
আমরা দেখি নাই।” সত্যীত ও সত্য। যে দুটি বিশেষণ তার লেখা সন্দেহে আমার ও সন্দেহতঃ অন্তর্গত
সমস্তর পাঠকের মনের কথা, একেবারে টেনে বের করেছে। এত সহজে ও সংক্ষেপে আসল মর্মে
পৌঁছে যেবার কি আশ্চর্য কথ্য আছে চাতালেরদের। তবু যে এই কথাটাই তেনিয়ে কাগজে বসবার
চেষ্টা ব্রতী হয়েছি, তার সাধারণ কারণ তার রচনাবলীর বহুকাল পরে মনোবাহীগ্রন্থ, এবং ব্যক্তিগত
কারণ তার সঙ্গে আমার বহুকাল আগেকার বন্ধুত্বের স্মৃতিস্মরণ।

মাত্র একলাই স্মরণ করে এবং একলাই স্মরণ করে এ শাস্ত্রবাক্য যেমন সত্য, তেমনই এও সত্য
যে, ইতিমধ্যে সে নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে নানা ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করে কতক পৈতৃক কতক
ব্যোপাধিত। শরৎকুমারীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ উত্তরাধিকারহুজুই প্রাপ্ত বলতে হয় ; কারণ খুব ছেলেবেলা
থেকেই তাঁকে আমার বাপের বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ হাতধাত করতে দেখেছি। সেই বয়সে একদিন মাকে
জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁকে কি বলে ডাকব, ও তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন— বল খুকি। সেই যে
‘খুকি’ বলে তাঁকে ডাকতে লাগলাম, সে ডাক বহুপাশ্চ কাল পর্যন্ত চলেছিল, এবং আরও অল্প কোনো নামে
তাঁকে উল্লেখ করতে বাধে। তাঁকে আমার বালাসতিনী বলে ডাকতাম, কারণ বয়সে বেশ কিছু তফাত
ছিল। সন ভারি ছাড়াও তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁদের সন্তানের রোভের বাড়িতে কতদিন নিয়ে
গিয়ে কত বয়ে নিয়ে নাইয়ে বাইয়ে নিয়েছেন ; বিশেষ হাঁসের ডিম ভাতে মাথাটা এখনো মনে পড়ে।
তার স্ত্রী মহাশয় অক্ষর চৌধুরীর কাছে সেই সময় Golden Treasury থেকে কখনো কখনো কবিতাও
পড়তাম ; বিশেষতঃ ‘One more unfortunate’ লাইনটা বৃত্তে না পেরে মনে মিলেছিল। করেছিলাম
বেশ মনে পড়ে। আমার দাদাকে ও আমাকে বহুকাল পরে ওখেলো পড়াতে গিয়ে অক্ষরবাবু নিয়েই
কেনে ভাসিয়ে নিতেন, তাও স্মৃতিতে গাঁথা আছে। কেবল কখন অ্যাটর্নিসির করতে নেইটে আরও
বৃত্তে পারি নি। কিন্তু তার কথা এখানে অবান্তর। কেবল উভয়ের নিকট আমারের হেঁদেও বাক্য
করবার অন্তই এটুকু বলা।

শরৎকুমারী যে ঠাকুরবাড়িতে ‘শাহোবিতী’ নামে ব্যাত ছিলেন, সে কথা এখন গ্রন্থের ভূমিকাতে
উল্লিখিত হয়েইছে, তখন আমি আর একটু হাতে ধাঁড়ি জেও বলে যিচ্ছি যে, শুধু ‘শাহোবিতী’ কেন,
অগ্নিসিয়ার তিনি ছিলেন ‘বিহতিনী’, আমার মায়ের ‘চান্দি’, নতুন-কাকিমার ‘জাশেন’, এবং আমার
‘খুকি’!—সেকালের অল্প অনেক অল্পর ব্যাপারের মত বেয়েদের মধ্যে পাতানো মিলিগটা আমারের কাল

থেকেই উঠে গেছে, কিন্তু তার অব্যবহিত আগেকার কালেও এই সরল মেয়েলি প্রথাটির বেশ চল ছিল, ও তার বেশ আমাদের কালেও এসে পৌঁছেছে। শেখবয়সের দিক থেকে দরলে শরৎকুমারী আমার বন্ধুই ছিলেন।

কিন্তু তাঁর মধ্যবয়সের লেখিকাত্ব সন্দেহ আমার কোনো ধারণা বা স্মৃতিই নেই। তার এক কারণ পূর্বোক্ত বয়সের পার্থক্য, আর-এক কারণ হতে পারে তাঁর নিজের সেখা সাহির করবার স্বাভাবিক অগ্রগতি,—সেটা তাঁর প্রকাশকরা উল্লেখ করেছেন। সেইটেই বোধহয় প্রধান, নয় তো ঐ বয়সেই অক্ষয়বাসুকে কবিতার (?) পর লিখে আমার অকালদৃষ্টিতার পরিচয় দিতে বাকি ছিল না। হুতরাং তাঁর আধুনিক পাঠকের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে নবীন দুই ভবি নিরেই এই নবীন রচনাবলীর আলোচনা করতে পারব।

চেহারার সঙ্গে রচনার কোনো যোগ সম্ভাব্যতঃ না থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমেই লেখিকার ছবি দিয়ে প্রকাশকরা ভাল কাজই করেছেন। কারণ স্মৃতিঃ এ স্থলে হুলেখার সঙ্গে হুচেহারার মনিকাকর যোগ ঘটেছে। প্রসঙ্গতঃ বলি, বইখানি আর-একটু বেঁটে ও ফলতঃ আর-একটু মোটা। হলে আমার স্বস্তিতির পক্ষে আর-একটু সুবিধের হত; কারণ তাঁরা বেশির ভাগ দুপুরবেলা শয়নাবস্থাতেই বই পড়ে থাকেন বলে আমার বিশ্বাস। আর যেমন কোনো কোনো কবিকে 'কবির কবি' বলা হবে থাকে, তেমনি এই লেখিকাকে 'প্যাটিকার লেখিকা' বলে গণ্য করাই উচিত। এত বেশতৃষ্ণার বর্ণনা, এত বাবারের গল্প কি পুরুষদের শোষণ?—মানি বে। অথচ আমরা সেগুলি শরৎ ভূপ্তিসহকারে গিলতে থাকি। অবশ্য বিবক্ষণ বই হোক না কেন, প্রকাশভবির গুণে জা সাহিত্য-পদবাচ্য হবে উঠলেই সাহিত্যোন্মাদী মাত্রই রস পাবেন।

বইখানি গোটা পঁচিশেক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা গল্পের সমষ্টি। কিন্তু এঁর বিষয়ও বলা যেতে পারে—যেমন আর একজন লেখক সন্দেহ সেদিন কে বলেছেন—বে, এঁর প্রবন্ধগুলি গল্পের এবং গল্পগুলি প্রবন্ধের আকার সহজেই ধারণ করে। স্বাভাবিক মধ্যে যোগস্বত্ববস্ত্র রয়েছে বাঙালি শ্রীগম্যের সরল বর্ণনা এবং সুহৃৎসমিত সমালোচনা। অথবা কোমর বেঁধে সমালোচনা করতে বসবার আবশ্যকও হয়নি, বর্ণনার সঙ্গেই সমালোচনা নিপুণভাবে গুডপ্রোড। কেবল দুই-চারিটি প্রবন্ধের বিষয় সত্যই স্বতন্ত্র, বলা ত্রিপুরার প্রসঙ্গ। তাও 'ত্রিপুরার গল্প'টি স্বীকৃতি নয় তো কি? ঐ দুটি পৃষ্ঠার মধ্যে কি হৃদয়ের একখানি নাটিকা নিহিত হয়েছে, যদি তেমন সিদ্ধান্তে কেউ ছুটিয়ে তুলতে পারেন। 'জীবনস্মরণ প্রতি অহুঃস্বপ্ন' ও ঐ শ্রেণীর আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। আমি নিজে পড়ে গুলিয়ে পরণ করে দেখেছি আবালবৃদ্ধবনিতা এই সরল হৃদয় বর্ণনার সমান তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। কবিতা রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা যেতে পারে? এত জীবন্ত বে সত্য বলেই মনে হয়, অর্থাৎ নিজের জীবনের কাহিনী। কিন্তু সত্যকেও কখন লেখক জীবন্ত করে তুলতে পারেন?—তাহলে তো ইতিহাস মাত্রই উপভাস হত।

ভৎসালীন, অর্থাৎ পকল বয়স পূর্বকার, বাঙালি শ্রীগম্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাকেই বেন শরৎকুমারী নিজের মানসের স্বাভাবিক বিচরণস্থিতি বুঝে পান এবং অভ্যন্তরস্থে নিশ্চিত ও নিশ্চিতভাবে নিপুণ তুলিকা সকলন করেন। আমার বিশ্বাস, তিনি কলকাতার ধনী কাছের সমাজের সঙ্গে নানা আত্মীয়তা ও সুইবিভাগসহে আবদ্ধ ছিলেন; তাঁর অগতঃ নিকট-স্বাত্মীয়দের কাছেও বেন সেইরূপ শুনেছি। যদিও

দুঃখের বিষয়, এমন এ সময়ে স্যাক্সি সেবার মত বড় কেউ ইহলোকে নেই। বর্ণনাগুলি এতই জীবন্ত (আবার সেই এক কথা) যে মনে হয় না কেউ সচক্ষে না দেখে এরকম লিখতে পারে। অবশ্য সেকালে গল্প শুনেছি George Eliot (জর্জ এলিয়ট) জীবনে কখনো tavernএর ভিতর না গিয়েও তার নিখুঁত বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কথাটা সত্য হলেও মন তা'তে লাগে বেশ না। তা ছাড়া একটা tavernএ জীবন হয় না, যেমন এক কোকিলে বসন্ত হয় না। অবশ্য ওমন থইয়াদের মত অল্পস্পর্শ।

আমাদের ঠিক এ সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কোনোকালে ছিল না বলেই তার বর্ণনা পড়তে এত ঊৎসাহ্য জাগে এবং কৌতুক লাগে। বেশভূষা, আহার-বিহার ও আচার-ব্যবহারে বঙ্গবহিলাসম্মান গত পকাশ বঙ্গের কি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে তার ইতিহাস ইচ্ছে করলে এই বই থেকে বেশ উদ্ধার করা যায়। 'চায়না কোট' পদার্থটি কি, এবং তা' যেহেতু কি করে পরত, পরলেই বা কি রকম সেবাও, আধুনিক বিদ্বান-মণ্ডলী সে বিষয় গবেষণা করে কোহুফল চরিতার্থ করতে পারেন এবং সেকালে জ্ঞান নি বলে নিজেদের ধন্ত মানতে পারেন। বলা যায় না, হয়তো ভবিষ্যতের বাঙালিনী তাঁদের বর্তমান পোশাক নিয়েও ঠাট্টাতামাশা করবেন। অবশ্য কালে কালে স্ত্রী ও বেশের পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞারী। কিন্তু আমাদের আধুনিক নারীবিশ এক জ্বলংগত, হুপ্রচলিত ও হুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ঠিকিয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাকে সেকালে মনে হলেও কোনোদিন হাস্যকর মনে হবে, তা তো বোধ হয়না। তবে পরের চোখে নিজেদের দেখবার ক্ষমতা থাকলে 'গোল ত মিটেই যেত'।

গল্প ও প্রবন্ধের মধ্যে যে বোণাবোণের কথা আগে বলেছি, তার বোধহুয়টি হচ্ছে প্রধানতঃ সেবিহার সুবিবেচক মন, উদার ও জীন্তু সৃষ্টিভঙ্গী এবং সরল হঠাৎ বাচনশৈলী। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, তাঁর গল্পে বৈশিষ্ট্য নেই। সমগ্র বইটির মধ্যে 'শুভবিবাহ' 'মৌচুক' ও 'সোনার ঝিহুক' নামে যে তিনটি বড় গল্প আছে, সেগুলি রীতিমত গল্পই। তার মধ্যে মূল গল্পাংশ, ঘটনাবৈচিত্র্য, চরিত্র-বিরেষণ এবং সংগত গতি ও পরিণতি প্রভৃতি ছোট গল্পের মালমসলা সবই রয়েছে। তবে সকলের ভিতরেই সামাজিক চিত্র আঁকাটাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। গল্পের পরিকল্পনাও গতাহুগতিক নয়, সবগুলিরই মধ্যে একটু স্বকীয়তা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে একটি গল্পকথার পরামর্শদাতা বললেও সে স্বকীয়তা খর্ব হয় না। প্রত্যেক গল্পেই নৃতন্য আছে।

এর মধ্যে একমাত্র প্রধান গল্প 'শুভবিবাহ'ই প্রকাশকরা পুস্তকাকারে পেয়েছেন সুনতে পাই। অল্প রচনাগুলি নানা বিকিষ্ট পত্রিকা থেকে সংকলন করে তাঁরা বঙ্গসাহিত্যের মহৎ উপকার সাধন করেছেন, এবং তাঁদের কষ্ট সার্থক হয়েছে। আনি তো নিজের তরফ থেকে এইটুকু বলতে পারি যে, একটানা পড়ে গিয়ে এমন অনাবিল আনন্দ আমি বহুকাল কোনো বই থেকে পাই নি ও কখনো একঘেয়ে লাগে নি। এবং আবার বিশ্বাস, অধিকাংশ পাঠিকাই আমার এই রায় সন্ধান করবেন। সকলের পড়বার মতন, সকলকে আনন্দ ও শিক্ষা দেবার মতন, হৃদয় নরম ও সরল বর্ণনাপূর্ণ সমবেদনা ও সমালোচনা মিশ্রিত এমন সৃষ্টিবৃত্ত ও সুসিখিত সর্বাঙ্গস্বন্দর একখানি বই যে আমাদের সম্রাতির হাত থেকে বেরিয়েছে, সেজন্য আমরা বঙ্গনারী নাজেই গর্বে উৎফুল্ল বোধ করছি। আশা করি বাংলার ঘরে ঘরে বইখানির বহল প্রচার হবে।

শ্রীমদ্রা দেবী

ধর্মবিজ্ঞানী অশোক। প্রবোধচন্দ্র সেন। পূর্বাশা লিমেটেড। ১৩২৪। দ্ব্য তিন টাকা।

বৌদ্ধধর্ম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পূর্বাশা লিমেটেড। ১৩২২। দ্ব্য তিন টাকা।

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম। শ্রীনন্দিনীনাথ দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং। ১৩২২। দ্ব্য সাড়ে চার টাকা।

আলোচ্য তিনখানি বইই বৌদ্ধধর্ম নিয়ে রচিত এবং প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট আলোচনা হয় নি। অত্যন্ত ভাগ্যবশত তাহার সে আলোচনা আরও কম। অথচ বাংলা দেশেই বৌদ্ধধর্মের মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হয় বিগত শতকের শেষ পক্ষে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরৎচন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানচূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক আলোচনায় যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের নাম আরও কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যগ্রন্থ ও রচনার মধ্য দিয়েও বৌদ্ধধর্মের নানা ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের বিরাট অবদান বাঙালীর মনে ঢোলা দিচ্ছেছিল অথচ বাংলা সাহিত্যে সে ধর্ম স্পষ্টতঃ মৌলিক আলোচনা যথেষ্ট স্থান অধিকার করে নি। আলোচ্য তিনখানি বই সে বিষয়ে পথপ্রদর্শক হবে আশা করা যায়।

প্রবোধবানু তাঁর বইয়ে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছেন, সে, ঘটনা হচ্ছে সম্রাট অশোকের 'ধর্মবিজ্ঞ'। এই ঘটনা অবলম্বনে তিনি দেশ-বিষয়ের আলোচনা করেছেন সেগুলি হচ্ছে: ভারতবর্ষে ইতিহাসে ধর্মবিজ্ঞ ও অহিংসানীতির স্থান, অহিংসা ও রাজনীতির মধ্যে অশোকের সামঞ্জস্যবিধান, অশোকের ধর্মনীতি এবং তার পরিধান। প্রবোধবানুর এইসব আলোচনার মধ্যে তুলনামূলক বিচার রয়েছে। অশোকের পূর্ববর্তী পারস্য সাম্রাজ্যে অস্বস্ত্য রাজনীতি, এবং আলেকজান্ডার ও তাঁর পরবর্তী গ্রীকরাজাদের অস্বস্ত্য নীতির সঙ্গে অশোকের অভিনব রাজনীতির তুলনা করে তিনি অশোকের মহৎ প্রতিপত্তি করেছেন।

অশোক ইতিহাসে একটি বিশ্রব ঘটয়েছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের আচরিত প্রথা পরিত্যাগ করে নতুন প্রথার প্রবর্তন করে। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকে কলিঙ্গদেশ জয় করতে গিয়ে অশোক বিধিবিজ্ঞের বীভৎস রূপ দেখেছিলেন। তাঁর নিজের কথা স্মৃতিস্তম্ভে না হলে বিশ্বাস করতে হয় যে এই যুদ্ধে 'সেই লক্ষ লোক বাতাস হয়েছিল, এক লক্ষ হয়েছিল নিহত এবং তার বয়স গড়ে বিনয়'। যুদ্ধের এই ভীষণ পরিণাম দেখে তিনি অস্বস্ত্য হন এবং বুদ্ধবিগ্রহ ও মৌর্যবংশে ছেড়ে সেন এবং বিজ্ঞান ছেড়ে গিয়ে 'ধর্মবিজ্ঞ' মনোনিবেশ করেন। মৈত্রেয়ী ও অহিংসার দ্বারা তিনি এ নতুন বিষয়ে ত্রুটি হন।

দেশ-দেশ অশোক মৈত্রেয়ী ও ধর্মের দ্বারা জয় করেছিলেন তার তালিকাও তাঁর শিলালিপিতে রয়েছে: সিরিয়া, মিশর, মাকিডোনিয়া, কাইরিনি ও কোরিথিয়া। এসব দেশ ছিল গ্রীকরাজাদের অধীন। যদ্যপে চোল, পাণ্ডা, গুপ্ত, কেরলপুর প্রভৃতি দক্ষিণের প্রভাবশ্রবণগুলি এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের যবন, কাম্বোজ, গন্ধার প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও তিনি এই একই সূত্র স্থাপন করেন। মৈত্রেয়ীকে আবদ্ধ দেশগুলিতে 'তিনি মাহুয় ও পশ্চিমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, মাহুয় ও পশ্চিমের চিকিৎসার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেষজ লতাগুল এবং ফলমূল যেখানে যা নেই সেখানে তা সংগ্রহ ও রোগ্য করিয়েছিলেন, তা ছাড়া মাহুয় ও পশ্চিম 'পরিভোগের' স্তম্ভ পথে পথে স্থাপন এবং বুদ্ধরোপণাদির ব্যবস্থাও করেছিলেন'।

অশোকের ধর্মবিষয়ের এই ছিল মূলনীতি। এই মূলনীতির দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রবোধবাবু ভারতের এবং সমগ্ৰাঞ্চলিক পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্দেশ করেছেন এবং সে চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন।

অশোক ব্যক্তিগতজগৎ বোদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি সকল ধর্মগম্ভ্যাদ্যকেই সম্মান করতেন। প্রজাদের মধ্যে যাতে প্রত্যেকে নিম্নতম ধর্মমত পোষণে কোনো বাধা না পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য তিনি ধর্মদ্বন্দ্ববাদবাদের উপর আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি শিলালিপিতে যেসব ধর্মনীতি পালন করবার জন্য প্রজাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি কোনো সম্ভাব্যমত নীতি নয় এ কথা বলাও চলে—‘পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বামীস্বামিনী বহুবাহুব ও দাসভৃত্যাদির প্রতি সম্মানসম্বোধন, প্রাণীর প্রতি অবিহিংসা, পরস্পর সহিষ্ণুতা, সংযম, ভাবগুহি, কৃতজ্ঞতা, দান, দয়া, অনালস্য, সত্যবচন ইত্যাদি’। এইসব সনাতন নীতির প্রচার সবচেয়ে অশোকের ধর্মবিষয়-নীতির পরিণাম হয়েছিল শোচনীয়। প্রবোধবাবু যেভাবেছেন যে, যেসে সে নীতি ব্রাহ্মণদের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে নি, বরঞ্চ তাবের বিরুদ্ধতাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। ব্রাহ্মণদের এই অসন্তোষই তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের একটি প্রধান কারণ।

এ অবস্থায় প্রবোধবাবুর প্রতিপাত্ত কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিতর্ক মতবাদ পোষণ করা চলে। অশোক যে বৌদ্ধধর্মের দিকে খুব দৃষ্টি পড়েছিলেন সে বিষয়ে সম্বন্ধেই অবকাশ নেই। অশোকাবল্যবানের কাহিনী বিবাস করলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বেশ ব্যাড়াবাড়ি করেছিলেন। সে কথা না বিবাস করলেও এ অস্থান অসম্ভব নয় যে, অশোকের কোনো কোনো ধর্মমতাম্বারা তাঁর অস্থবর্তির অশোক না দেখেই বৌদ্ধধর্ম নিয়ে ব্যাড়াবাড়ি করেছিল এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

এ কথা ঠিক যে অশোক লোক চারিত্র্যনীতির অস্থলগণ করবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রজাদের উপদেশ দিয়েছেন সেগুলি ভারতীয় ধর্মগুরুদের সনাতন নীতি। কিন্তু এ কথা অস্থলান করা অসম্ভব নয় যে, সাধারণের মধ্যে সে নীতিগুলির প্রচারে বৌদ্ধধর্মই প্রথম উত্তেজিত হয়, এবং অশোকও বৌদ্ধধর্মের প্রেরণাতেই সে কায়ে ব্রতী হন। অশোক তাঁর ভাষা অস্থলসনে জোর পলায় এই বৌদ্ধধর্মেরই প্রচার করেছেন—‘বিদিতং যে ভাঃতে আবতকে হন বুদ্ধমসি ধর্মমসি সংমসি তি পালবে চ প্রাসমে চ’ (বুদ্ধ ধর্ম ও সংমে আবার তক্তি ও শ্রদ্ধা সকলেই জানেন)। তার পর তিনি কয়েকখানি বুদ্ধভাষিত গ্রন্থের নাম করেছেন এবং তিস্থ-তিক্রমদের সেগুলি অস্থলান করতে বলেছেন। তিনি যে ‘বিহারবাস্তা’ ছেড়ে দিয়ে সুখিনী গয়া প্রভৃতি স্থানে ভীষণভাবে বেধিয়েছিলেন, তাতেও যেহেতু ধর্ম বৌদ্ধধর্মের তাঁর প্রগাঢ় অস্থলগণ ছিল, এবং সে অস্থলগণ তিনি প্রজাতন্ত্রই (হয়ত প্রজাদের শিক্ষার্থে) সেবাতেন।

আমায় বিবাস, অশোক সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধবিশ্বাসী নীতি ও অস্থিসন্যাসী অবলম্বন করেছিলেন। প্রবোধবাবু অস্থলগণ লৈলসিপির যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন তা সর্বব্যাপীমত নয়। ঐ শৈলসিপিতে আছে : ‘যো পি চ অগকসে তি ছমিতবিষমতে ব সেবনং প্রিয়সপ যঃ শকো ছমনয়ে ব পি চ অটথি(যো) সেবনং প্রিয়সপ বিজিতে ভোতি ত পি অস্থনেতি অস্থলগণেতি অস্থলগণে পি চ প্রভবে-সেবনং প্রিয়সপ বৃতি তেব কতি অবব্রণে ন চ হংকোরহ’।—‘কেউ যদি অস্থলকার করে তাহলে বহুবল শাণ্ড ‘সেবানাং-প্রিয়’ তত্বের তাকে ক্ষমা করবেন। সেবানাং-প্রিয় অটবির অস্থলসীকেও অস্থ করেছেন ও (নিজের ধর্মবস্তের) অস্থলগামী করেছেন। তাবের সুখির সেওয়া হয়েচে যে অস্থলগণ হওয়াই প্রধান(নীতি),

‘‘হুতরাং তারা বেন অহুতপু হয ও জীবনের অথবা নিজেদের হনন না করে’। অশোকের এই উক্তি থেকে অনুমান করা চলে না যে, অশোক এ কথা বলে শাসিয়েছেন যে ‘তার ও শৈব এবং কথায় একটি সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি অস্বাভাবিক করে তাদের শাস্তিবিধান করতে কুণ্ঠিত হবেন না’। হুতকার্যের ক্ষত অটবিরাক্ষের লোকেরা অহুতপু না হলে অশোক তাদের ‘হনন করবেন’ এর কথ্য ওখানে বলা হয় নি। অশোকের উক্তির ও-অর্থ করলে তাঁর জয়োবশ শৈললিপি সমস্ত মর্গাৎ সূত্র হয়ে যায়।

প্রবোধবাবু বলেছেন যে, বুদ্ধ আশ্রয়ক্ষামূলক বুদ্ধকে সমর্থন করতেন, এবং সে সম্পর্কে মহাপরিনির্গণ হুতের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। অম্মাতনত্র বৈশ্যসীল বুদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিধান করতে দমন করেন, যে সম্বন্ধে বুদ্ধের বতামত জানবার ক্ষত বর্ষকার নামক এক ভ্রাম্যকে বুদ্ধদেবের নিষ্কট পাঠান। বুদ্ধ তখন আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, বুদ্ধদের নিষেধের মধ্যে সম্প্রীতি আছে কি না, এবং তারা সন্দর্ভ পালন করে কি না। আনন্দের উত্তরে বৃশি হয়ে বুদ্ধদেব বর্ষকারকে বললেন যে, বুদ্ধরা বতমিন ঐভাবে জীবনধারণ করবে ও সন্দর্ভ পালন করবে ততদিন তাদের স্বপসমুদ্রি বুদ্ধিই পাবে। অতঃপর অম্মাতনত্র বুদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিধান বন্ধ করে দেন। হুতরাং দেবা যাচ্ছে যে, বুদ্ধ বুদ্ধদের সন্দর্ভ পালনের উপরই জোর দিয়েছিলেন আশ্রয়ক্ষামূলক বুদ্ধ করতে বলেন নি। শঙ্কাস্তরে কোশলের রাজা বিক্রয়ক দমন কপিলবস্তুর শাক্যদের দ্বারা অপমানিত হয়ে কপিলবস্তুর আক্রমণ করেন তখনও বুদ্ধদেব শাক্যদের বুদ্ধ না করতেই কলেশ্বিলেন। শাক্যেরা তাঁর শে পরামর্শ পালন করেছিল। চার জন শাক্যরাজপুত্র বুদ্ধের উপবেশ গ্রহণ না করে বুদ্ধ করেন বলে শাক্যেরা তাঁদের কপিলবস্তুর থেকে নির্বাসিত করেন।

অশোকের ধর্মনীতি সম্বন্ধে যে মতবৈধই থাকুন না কেন, সম্রাট হিসাবে তিনি ছিলেন অহুতকর্মী। তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাড়িবাড়ি করে থাকলেও কিছু অস্ত্রায় কায় করেন নি। তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর পরেই ধ্বংস হয়েছিল কিন্তু তার দ্বারা তাঁর অববানের মর্গাৎ সূত্র হয় নি। তাঁর চেতনাই বৌদ্ধধর্ম অগ্রগতি-সম্পন্ন হয়ে অম্মাতনত্রের মধ্যেই একটি মহামানবীয় সভ্যতার পর্ববসিত হয় এবং সমস্ত এশিয়াকে উদ্ভূত করে। প্রবোধবাবু তাঁর বহির্গে এইগুণ প্রবের বিশদ আলোচনা করেছেন। বেদব প্রবের তিনি সমাধান করেছেন তা আদর্য সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করি, না করি আলোচনা নুতন পথে চালিত করবার ক্ষত তাঁর নিষ্কট কুতজ থাকে উচিত।

হরপ্রণায় শাস্ত্রী মহাপণ্ডের প্রবন্ধগুলি বহুকাল পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিকে এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করার প্রকৃত উপকার হয়েছে। শাস্ত্রী মহাপণ্ড ছিলেন বাংলা ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনার অগ্রনৃত। নেপালের রাজকীয় পুঁথিখানায় বহুবার পুঁথির অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্বন্ধে যেমন পরিচয় লাভ করেছিলেন, নেপালে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর রচনাগুলিতে যেমন শাস্ত্রীয় কথা আছে তেমনি প্রচলিত বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথাও আছে। উপরন্তু তাঁর ভাষা যেমন সরল রচনারীতিও অপূর্ণ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত এখন আর গ্রহণযোগ্য মনে না হতে পারে। ধর্মগুরুদের পূজা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পর অনেক আলোচনা হয়েছে এবং ধারা সে আলোচনার অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা মনে করেন যে, ঐ পূজাপদ্ধতির উত্তর বৌদ্ধধর্ম থেকে নয়। উদ্ভিদ্ধার অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি শঙ্কসম্প্রদায়ের ধর্মমতের উপর

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তা ছাড়া মহিষাধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যে কোনো যোগ নাই সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কিন্তু এগল আলোচনা ঘোটেই অগ্রগতি লাভ করত না, যদি না শাস্ত্রী মহাশয় সে আলোচনা আরম্ভ করতেন।

এরূপকারে প্রকাশ করবার সময় প্রবন্ধগুলি আরও ভালোভাবে সাজানো চলত। ঐতিহাসিক দাঙ্গা বজায় রাখবার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। ১২, ৩৭, ৩৮, ৭১-৭৪ পৃষ্ঠায় বেশ অপরূপ ও প্রাচীন বাংলা পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার শুদ্ধ পাঠ এখন পাওয়া যায়, সেই শুদ্ধ পাঠগুলি পাঠদাতার কিংবা সংশোধনীতে দিলে পাঠকের উপকার হত।

মলিনীবাবু বাঙালার বৌদ্ধধর্ম নূতন ধরনের বই। তিনি মূলতঃ 'পাথুরে প্রমাণ' অর্থাৎ archaeological evidence-এর সাহায্যে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করেছেন। এই ইতিহাসে তিনি ভাগ করেছেন প্রাধানত চারভাগে : আদিযুগ, শুভ্র ও শুভ্রোত্তর যুগ, পালযুগ ও পাল-পর যুগ। বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলির ইতিহাস তিনি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন। এ বই বহুপরিমাণে ভট্টর রমেশচন্দ্র রত্নমহার মহাশয়ের সম্পাদনার বাংলাদেশের যে প্রাচীন ইতিহাস (History of Beangal I) বেরিয়েছে তার নিকট স্বত্বী, এ স্বপ্ন মলিনীবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে বই সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় নি। হুতরাং বাংলা ভাষার বৌদ্ধধর্মের এ রকম ধারাবাহিক ও প্রামাণিক ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল, মলিনীবাবু সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করেছেন বলে তাঁর নিকট সকলেই কৃতজ্ঞ থাকবেন। বই প্রামাণিক বলেই কয়েকটি ভুলত্রুটির বিধে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

পৃ ২৪ প্রজাপারমিতা নাগার্জুন প্রমুখ অচার্যদের রচনা নথ। নাগার্জুন ঐ গ্রন্থের 'প্রজাপারমিতাদেব-শাস্ত্র' নামক টীকা রচনা করেন। তা থেকেই বোকা যায় যে, মূল গ্রন্থ প্রাচীন।

পৃ ৩৪ পো-চি-পো পো-শি-পো হবে। চীনা পো-তো-মো-চি থেকে রক্তভিত্তি হয় না। রক্তমাটি হওয়াই বেশি সম্ভব।

পৃ ৪০ মহাবীর ৩০০ বৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয়েছিল এ অসুমান অশকত। মহাবীর মহালাংঘিক নিকায়ের শৌকসত্তরবারী সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের প্রথমভাগ, পালী মহাবগ্গের সঙ্গে ভুলনীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক ৩০০ বৃষ্টাব্দের বহু পূর্বেই রূপ নিয়েছিল।

পৃ ৭৬ চীনা নাম ছুটি প্রকৃত উচ্চারণ হু-চি এবং ফো-শি-নাই।

পৃ ৯৮ অশ্বের আগণে যে বহু আগর রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ কোথায় ?

পৃ ১০০ বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে যে বোগপদা দু রকমের ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই।

পৃ ১০৭ নন্দকল্পনাথ চন্দ্রবীণের ছিলেন বটে কিন্তু সে চন্দ্রবীণ যে বাথরণগে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

পৃ ১৪৬ উড়িষ্যান ও সোহোয়ের অবস্থান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। সে দুই স্থানকে বাংলা দেশে টেনে আনবার চেষ্টা করে পুনরায় প্রতিপাত বিষয়ের ষট্টিতাল না বাড়ালেই ভালো ছিল।

পৃ ১৪৮ সিলগা সেতির বহু 'গাহোর পোটা কিছুস্থান'—সেটি এ কথা কোথায় বলেছেন ?

ভিন্নভাষী বৌদ্ধ সাহিত্যের 'ভাঙ্ক' ও 'কাঙ্ক'কে 'তেহু' ও 'কেহু' না বলাই ভালো, উচ্চারণের দিক দিয়ে ও-ধরনের বানানের কোনো সমর্থন নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী



রবীন্দ্রনাথ কঙ্কর অঙ্কিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



[১৩০৮ সালের ৭ই শৌব শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়— তাহার আসল পকাশনবর্ষ-পুত্রির উৎসব উপলক্ষে ইহার আদি রূপ ও আদর্শ স্বরূপ ও আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে ।

সেদিন 'কী' কীণ আদর, কত তুচ্ছ আয়োজন । সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমেব শালবীড়িছায়ে বেধা মিথিছিল, আভকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারো কল্পনাতে ও আসতে পারত না । 'পাঁচ সাতটি ছেলেদে কে নিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করেছিলুম । এটি আমার মনে ছিল যে, বারা আসবে তাদের সঙ্গে আমার সেনাপা ওনার সঙ্গী না থাকে— বিদ্যালয়কে ব্যবসায় করে তুললে শিশুদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে সম্বন্ধের ঘটে ; ছাত্র মনে করে আমি কিছু দিক্তি তার পরিবর্তে কিছু পাতি । আমি প্রথম যখন আশ্রম আরম্ভ করেছিলুম তখন ছাত্রদের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি । আমি তখন একরূপ নিঃশব্দ, তার পর প্রকৃত শব্দ, তবুও রূপগতা করি নি— তখনকার ছোটো বিদ্যালয়ের তার সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলুম । সর্বদা সেটা সম্ভব হল না, বিদ্যালয়ের প্রকৃতি বদলালে— তবুও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, বিরপ্রকৃতির সঙ্গে একান্ততার আনন্দময় বোগরক্ষা করবার চেষ্টা করেছি । তার পর অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে এই বিদ্যালয় ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে ।'

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরবৎসরেই লিপিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র শ্রীকৃষ্ণকিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের সৌরভে আমাদের হৃদয়গত হইয়াছে ; 'রবীন্দ্রকীবনী'কার সম্মান করেন, 'ইহাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম Constitution বা বিধি' । এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকিত্তিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—'শান্তিনিকেতনের কাছে ১২০৮ সালে বোগ দিই । কী আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং কিভাবে তিনি ইহার পরিচালনা চাছেন এখানে আসিয়া তাহা জানিতে চাহিলে তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে সেন । পত্রখানি হুড়িগুড়িবাণী, এবং আশাযোগ্যতা নিম্নের হাতে লেখা । তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যগুলি রীতিমত হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা । তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব । তখনই যে তাহার অন্তরে শিক্ষাক্রমবাদের পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখা দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । পত্রখানি লেখা কবিগুরু পরীক্ষাযোগ্যতার ন্যায় নিবসনেক পূর্বে, খুব উদ্বেগের একটি সময়ে, পত্রমধ্যে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন । তবু এই পত্রে যে দৃষ্ট বিচার ও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি সেবি তাহাতে বিদ্বিত হইতে হয় ।'

বিনয়স্বাধীনমতঃ—

আশনার প্রতি আমি যে তার অর্পণ করিবাছি আপনি তাহা ব্রতবন্ধে গ্রহণ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দলাভ করিবাছি। একান্তমনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি বালকবিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতবাশনের কাল। মহুত্বকলাত বার্থ নহে পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মহুত্বকলাচের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাহার ব্রতচর্চাব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখ্য করা এবং পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংশ্লেষে দ্বারা তত্ত্বব্রতের দ্বারা শুচিতাচারে একাধ নিষ্ঠাচারে সংসারার্শ্বের ক্ষত্র এবং সংসারার্শ্বের অতীত ব্রতের সহিত অনন্ত বোগ লাভনের ক্ষত্র প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রতচর্চাব্রত।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই কেনাবেচার সামগ্রী বটে কিন্তু ধর্ম পণ্যবস্তু নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত তত্ত্বের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই ক্ষত্র প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যবস্তু ছিল না। এখন তাহার শিক্ষা মেন তাহার শিক্ষক, তখন তাহার শিক্ষা দিতেন তাহার। গুরু ছিলেন। তাহার শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিষ মিটেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বাতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শাস্ত্রনিকের্তন ব্রতবিদ্যালয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য বস্তু উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত উচ্চ ও দুর্লভ হইবে। এ সব কার্য ক্ষয়নাসমত চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায় গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এই ক্ষত্র বস্তুসম্বন্ধ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় বতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্বরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যাহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

বস্তুব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ অপাশ্রিত ক্ষত্র মনকে প্রস্তুত করিতে হয়— অনেক অত্যাঘ আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা কমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ বিদ্রবকে দূর করিতে হইবে।

ব্রতবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে তত্ত্বব্রতবানু করিতে চাই। পিতামাতার ক্ষেত্র বেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের ক্ষত্র ও শিক্ষাদানে বেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন সেবতা তেমনি স্বদেশও সেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্র অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা— এমনকি, অশ্রদ্ধা দেশের তুলনায় ছাত্রেরা বাহ্যতে বর্ধ করিতে না দেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ব ছিল সেই মহত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা স্বার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্তের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অন্তঃপ্রব, বরক্ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অঙ্গুণত হওয়া ভাল ভূগাপি মূঢ়ভাবে বিদেশীয় অস্বকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

অমূল্যব্রত ছাত্রদিগকে কাঠিন্দ্র অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও পলাতন পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের বন হইতে ধনের পোষণ একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে—এর পুত্র—এর পৌত্র—এর প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে—সেটা ধমন করিতে হইবে। বেশদূর লক্ষ্যে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ বাড়িহাকে যেন সম্মানজনক স্থাপনজনক না মনে করে। অন্তরে বসনেও সৌখিনতা ধূর করা চাই।

বিতীৰ্ণত নির্ভা। উঠা বসি পড়া দেখা ভ্রম আহার ও সর্গপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও তৃপ্তি লক্ষ্যে লবন নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যা বসনে ও শরীরে কোনপ্রকার মলিনতা প্রভ্রম দেখা না হয়। যেখানে কোন ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়চাচা সাবান দিয়া বহুতে প্রত্যহ নিষের কাপড় কাচে—ও ব্যবহার্য গাড়ু মালিছা পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রত্যহ ধোয়ায় যথা নিয়মে পরিষ্কার তত্ত্বকে করিয়া থাকে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের দরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভাল হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত তক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্মিত্যে তক্তি থাকা চাই। তাহারা অন্ত্রায় করিলেও তাহা বিনা বিতাহে নম্রভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কোন মতে তাহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় বোণ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি ঘূর্ণন হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের লব্ধি অল্প অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষপ্রকাশ না করেন সে বিবেক সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিস্তারিত থাকে।

বিলাসভাগ্য, আশ্রয়ঃ, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে তক্তি লক্ষ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অস্বল্প অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

ঐহায়া (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার ব্যবহার পালন করিতে চান তাহাদিগকে কোনপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিক্রম করা এ বিজ্ঞানের নিয়মবিরুদ্ধ। রত্নশালায় বা আহায়ায়ানে হিন্দুসমাজবিরুদ্ধ কোন অনিবার্যের দ্বারা কাহাকেও প্রেরণ দেওয়া হইবে না।

আহিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মন্ত্র করা ইয়া বৃষ্টিয়া দেওয়া হইবা থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিয়ে লিখিলাম :—ও তুর্ভবঃ যঃ—এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাধতি নামে ব্যাখ্যাত। চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাধতি। প্রথম ধ্যানকালে তুলোক তুর্ভবোক্ত ও তুলোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজনগণকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মত মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজনগণের মধ্যে ঐহায়ায়ি—আমি এখন কেবলমাত্র কোন বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজনগণের মধ্যে ঐহায়ায়ি বিশ্বজনগণের যিনি সবিভা যিনি সষ্টিকর্তা তাহায়াই বসন্তীয় জ্ঞান ও

শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বকণ এই মুহূর্ত্তে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাহার এই যে অসীম শক্তি বাহার দ্বারা ভূত্বুৎসর্গোক্ত অবিশ্রাম্য প্রকাশিত হইতেছে আমার সহিত তাহার অব্যবহিত সম্পর্ক কি হুত্রে ? কোন্ হুত্রে অংগন করিয়া তাহাকে ধ্যান করিব। যিরো বোন: প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই দীপ্তরেই তাহাকে ধ্যান করিব। হৃদয়ের প্রকাশ আমার প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি ? হৃদ্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বকণ্ডের সবিভা আমাদের মধ্যে অহরহ যে বীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিষয়াদ্যকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই বীশক্তি তাহারই শক্তি এবং সেই বীশক্তিদ্বারাই তাহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অস্তরের মধ্যে সর্বাঙ্গেকা অস্তরতন্ত্রপে অহুতব করিতে পারি। বাহিরে যেমন কৃত্ত্বংসর্গোক্তের সবিভাঙ্গপে তাহাকে অগুচ্ছগুচ্ছের মধ্যে উপলব্ধি করি, অস্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার বীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরিতা বলিয়া তাহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে অগুচ্ছ এবং আমার অস্তরে বী এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে অগুচ্ছের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সজ্জিবানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অহুতব করিয়া সঙ্গীর্ণতা হইতে বার্থ হইতে ভয় হইতে বিবাস হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীর বাহিরের সহিত অস্তরের— ও অস্তরের সহিত অস্তরতন্ত্রের যোগসাধন করে— এইঅন্তই আর্ধ্যলব্ধি এই মন্ত্রের এত গৌরব।

যো সেবোহুত্মো যোঃশু বো বিশ্বং কুশলমাবিবেশ

ব ওষধিষু বো বনস্পতিষু তঠৈশ্বে দেবায় নমোনমঃ —

অম্বাধারগার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকবয়স পক্ষে সর্বাঙ্গেকা সুরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন এই কথা মনে করিয়া তাহাকে প্রণাম করা শাস্তিনিকেতনের মিনস্তপ্রসাদিত নাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্ঘল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বকণ্ডের দ্বারা পরিপূর্ণ এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলের পক্ষেও কঠিন নহে। এইরূপ গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিখা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ জয়জয় করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহার বাবদ্য করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সম্মুখে “ও পিতানোহসি” উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার দ্বারা জান শিখা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যাহ স্বরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত্র কিন্তু বধার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাণ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়— সে জান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইকন্তই ঐ মন্ত্রে আছে

বিবানি য়েব সবিতর্ধুরিতানি পরাশ্রব—

বভুভঃ তন্ন আশ্রব !

“হে দেব, হে পিতা, আমাদের সমস্ত পাণ দূর কর, বাহা ভয় তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।”

অকচাৰীসেৱাৰ পক্ষে জীৱনেৰে প্ৰতিদিনকে সকল প্ৰকাৰ শাৰীৰিক মানসিক শাপ হ'ইতে নিৰ্ধৰল কৰিবাব
জন্ত মনুষ্যজাতিৰ জন্ত প্ৰস্তুত হ'ইবাব ইহাই প্ৰবৃত্তি ময়—

বৃহৎ২২ তম আশ্বিন।

বহুজানিত অনেক সময়েই চিত্ৰবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাক্ষপাণনয় ভাবাশ্বলেনেৰ মূলা সে অধিক
তাহা আমি মনে কৰি না। ভাবাবেশেৰ অভ্যাগ মানকসেবনেৰ জ্ঞান চিত্ৰসৌৰ্ণদ্যনক। গভীৰ তৰুগৰ্ত
সংক্ষিপ্ত প্ৰাচীন ময়েৰ জ্ঞায় ধ্যানেৰ সহায় কিছুই নাই। শাপনেৰ পথে বত অগ্ৰদৰ হওগা যয় এই সকল
ময়েৰ অন্তৰেৰ নথো ততই গভীৰতৰ ৰূপে প্ৰবেশ কৰা যয়— ইহাৰা কোথাও বেনে বাধা সেয় না। এইকন্ত
আৰি ছাত্ৰদিগকে উপনিষদেৰ ময়ে গীকিত কৰিয়া থাকি। ময় বাহাতে মুণ্ড কথায় মত না হইগা যয়
সেকন্ত তাহাদিগকে মাথো মাথো ব্যাখ্যা কৰিয়া স্মৰণ কৰাইগা দিয়া থাকি। কিছুকাল আমাৰ অহুগহিত-
বশতঃ নূতন ছাত্ৰদিগকে ময় বুঝাইগা দিবাব অবকাশ পাই নাই। আপনেৰ সকে সে ছাত্ৰদিগকে লইগা
থাইবেন তাহাদিগকে ধৰি আকিৰেৰ জন্ত উপনিষদেৰ কোন ময় বুঝাইগা বলিয়া বেন ত ভালই হয়।

এক্ষেপে, আপনাৰ কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ কথা বিবৃত কৰিয়া বলা যাক।

মনোৱজ্ঞানবাৰু, জগদানন্দবাৰু ও স্বৰোধাধবাৰুকে* লইগা একটী সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোৱজ্ঞানবাৰু
তাহাৰ সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতিৰ নিৰ্দেশমতে বিভাগদেৰ কাৰ্য্যসম্পাদন কৰিতে
থাকিবেন।

বিভাগদেৰ ছাত্ৰদেৰ শয্যা হইতে পাত্ৰোপান প্ৰান আকিৰ আহাৰ পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল
নিৰ্দ্ধাৰণ ঠাহাৰ কৰিয়া দিবেন— বাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই কৰিবেন।

বিভাগদেৰ ভূত্যানিৰোগ তাহাদেৰ বেতননিৰ্দ্ধাৰণ বা তাহাদিগকে অবদৰদান ঠাহাদেৰ পৰামৰ্শমত
আপনি কৰিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসেৰ একটী আত্মমানিক বাজেট সমিতিৰ নিকট হইতে পাল কৰাইগা লইবেন।
বাজেটেৰ অতিৰিক্ত ব্যয় কৰিতে হইলে ঠাহাদেৰ লিখিত সম্মতি লইবেন।

পাত্ৰয় প্ৰত্যহ ঠাহাদেৰ লহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তৰ সপ্তাহেৰ দিগাৰ ও মাসান্তে মাসকাৰাৰ ঠাহাদেৰ
সাক্ষৰদহ আমাকে বিতে হইবে।

সমিতিৰ প্ৰস্তাবিত কোনো নিয়মেৰ পৰিবৰ্তন পাত্ৰয় লিখিয়া লইগা আমাকে জনাইবেন।

সামাহে ছেলেদেৰ খেলা শেষ হইগা গেলে সমিতিৰ নিকট আপনাৰ সমস্ত মন্তব্য জনাইবেন ও পাত্ৰয়
লহি লইবেন।

তাগাৰেৰ জ্ঞান আপনাৰ উপৰ। জিনিবপন্ন ও গ্ৰন্থ প্ৰভৃতি সমস্ত আপনাৰ জিহ্মাৰ থাকিবে।
জিনিবপত্ৰেৰ ভালিকাৰ আপনি সমিতিৰ সাক্ষৰ লইবেন। কোন জিনিব নষ্ট হইলে হাৰাইলে বা ভাঙিলে
ঠাহাদেৰ সাক্ষৰদহ তাহা জমাখৰচ কৰিয়া লইবেন।

আহাৰেৰ সমস্ত উপস্থিত থাকিগা ছাত্ৰদেৰ ভোজন পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিবেন।

ছাত্ৰদেৰ শাস্ত্ৰেৰ প্ৰতি সৰ্ব্বগা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিষপত্রের পরিণাট, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র পক্ষে শ্বেতবসনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিতে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রাস্তায় ও তাহার চতুর্দিকে, পাদখানার কাছে কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতা না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গোবৃদ্ধি ও তাহাদের বাচ্চের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন স্থল ও তত্ত্বাবধান বাগান আপনাদের হাতে। সেমস্ত বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ, ও মধ্যে মধ্যে ঠিকালোক নিয়োগ সমিতিতে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আজন্মের সহিত বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রাণবীর্য নহে।^১ জিনিষপত্র ক্রয়, বাজার ক্রয়, ও বাগান তৈরির সহায়তার মাঝে মাঝে আজন্মের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে,— কিন্তু অস্ত্রাস্ত্র ভৃত্যদের সহিত যোগস্বাক্ষ না করাই শেষ।

ঠিকালোক প্রকৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, দ্বীপ্তসিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে যোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন।

ঔষধের বহন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি জানাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতনে আজন্মসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোন দুর্গবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোহির আহাঙ্গাদি ও সর্বপ্রকার অজ্ঞানতার দ্বারা আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাণু ও শিক্ষকদের বিনা অহুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি অভ্যাগতগণ স্থল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি বখাসত্ত্ব বিনয়ের সহিত তাহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অহুমতিবাতীত কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও বাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন— আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহাঙ্গাদির ব্যবহার অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোন আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন আপনি সমিতির নিকট তাহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্টদিনে ছাত্রগণ বাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোষ্টকার্ড লেগে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বহু চিঠি লেখা নিয়ন্ত্রণীয় ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোষ্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কোনাে হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া দ্বারা আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয় সঙ্ঘে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞানদীপ বিষয় বাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা আনাইবেন।

কোন বিশেষ ছাত্রসঙ্ঘে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিতে জানাইবা আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোন ছাত্রের অভিভাবক কোন বিশেষ বাস্তবায়নীয় পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না বিধা তাহা একজনকে বাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোকুমহিষ যে দুখ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইবা অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন এ নিয়ম আপনার অবগতির ক্ষমত লিখিলাম।

শাস্তিনিকেতন আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোন বই পড়িতে লইলে তাহা বণা সময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া বাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আনার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা গটিবাটি প্রভৃতি জিনিষপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবানুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশঃ আবশ্যিকমত ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়ের চাপনায় প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া শিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বতঃস্ফূর্তিত মনস ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্বেগ সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার স্বাধীন বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন ভাবস্থির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া দাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার ক্ষমতাই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোন অশুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুন্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধ বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই আমি বিদ্যালয়ের কর্তৃক যেমন আমার তেমনি তাঁহাদেরও কর্তৃক—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের ধৃষ্টি প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোন্মাদে প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্তৃক আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সম্প্রতি বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মহত্বজ্ঞানভের উপায় বলিয়া জানিয়া শাস্ত সনাতনভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরু নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা চূর্ণত ধনের দ্বারা গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র স্বাক্ষর উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্তরে মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আনার অকমতা ও দুর্ভাগ্য—অন্তকে সেক্ষত আমি ঘোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহাণী উপর চাপান যায় না—এবং এগুরু ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বশেষা হয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা আগিতেছে বলিয়া অস্বস্তিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্ত অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে ফলকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা ধীনতা সম্বন্ধে, ভাবের তুলনায় কর্মের ঘণ্টে অস্বস্তি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ত্রিবিধ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কান্নকে ঋণ খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিঘ্নে ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন তাহার উৎসাহ আশা সর্বদা সন্নাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারো কাছে বেশি কিছু দাবী করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্তরে বলপূর্ব্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না—কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলঙ্কা শক্তিতে বাহার বিকাশ হয় তাহাই স্বার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায় কতক লজ্জা, কতক ভাবাবেগ, কতক অহঙ্করণে বাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি, যে, অধ্যাপকগণ, আমার অহুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহায় বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের যৌবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাহার প্রত্যাহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আশ্চর্য্যময় ও আশ্চর্য্যময়ের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত উজ্জ্বল পাত্র করিয়া তুলিবেন। গুরুগত, অবিচার, অশ্রুতি, অস্বাভাবিক অকস্মাৎ রোগ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাগমন, এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্ন পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকটে তাহাদের সমস্ত উপদেশ নিফল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জলতা জান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে তপ্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রকৃতি কার্যে যথার দ্বারা বিভ্রাণে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত কার্যে স্বার্থ গোপন আছে, অবদান নাই এই কথা যেন ছাত্রদের মনে সুচিত্ত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগমদের অভিযান তাহাদের সহিত শিষ্টাঙ্গ ও তাহাদের প্রতি সমস্ত ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাগম করানো হয়। বিভ্রাণের নিকটে কোন আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন বিভ্রাণ করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহার পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে খবরদারী ও ঐশ্বর্য ও পথ সেবন করানো ও তাহার অন্তস্তত্ত্বের ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আগনি যদি সতত ও সুবিধাজনক যেন

করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে সহজে আহ্বানদিয়া বিরা গোশালায় লইতে পারে তবে ভাল হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পানী নাছ ও ছোট স্তম্ভ আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পানী খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যাহ আহ্বানদিয়া বিরা খেঁড়ের সহিত মূক্ত পানীদিগকে বশ করানই ভাল। শাস্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে যেটা করিলে ছাত্রেরা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ানাদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিশোধ রাখা, বাগানের দর করা এ সবই কাজের ভার দ্ব্যাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রবী প্রকৃতি কোন বিশেষ ছাত্রের উপর দিবে। এষ্টেল পত্নীকায় ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সম্বাভাব ঘটে তবে ঐক্য কোন ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বন্ধু ছাত্রদের উপর দিবে। তাহার্য যেন দ্ব্যাসমধ্যে সহজে হোরিকে পরিবেষণ করে। প্রত্যেককালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—দ্ব্যাসমধ্যে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে—নাবার ঘরে ভূত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কিনা পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই একদিন রবীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্ত ছাত্রেরা কোনপ্রকার সন্দেহ অনুভব করিবে না।

ছাত্রেরা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেষণ করিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেষণ না হইলে আপত্তিকর হইতে পারে। অন্তঃসে সন্দেহ বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চণ্ডিকাতি করিয়া ছেলেরা সহজে রত্নাদি করিলে ভাল হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি একজন সন্তান কথ্য ভাস্কর্য চিত্রা করিয়া লিখিতে পারিলান না। আপনি সেখানকার কায়ে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে তখন অধ্যাপকগণের সহিত যত্না করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানানইবেন।

আপনার প্রতি আশার কোন আবেশ নির্দেশ নাই আপনি সমবেদনার দ্বারা প্রভা ও প্রীতির দ্বারা আমার দৃষ্টির ভাব অনুভব করিবেন এবং অত্যন্তবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে থায়া দিবেন এবং

দ্ব্যং কর্তব্য প্রকৃর্তিত তত্ত্বাদি সমর্পণ্যে।

ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০২

ভবদীপ

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি কলকাতা যোগ মহাশয়কে লিখিত। 'স্বতি' গ্রন্থে মুদ্রিত (পৃ ১১), শাস্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বসোপাধ্যায় মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত, সমসাময়িক একটি পত্রে এই চিঠিখানির উল্লেখ আছে—

'কৃত্তবানু ঐশ্বরী বোলপুরে ঘাইবেন। আশা করিতেছি তাহার নিষ্কট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনা কার্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আভ্যন্তরিক প্রকার সহিত তিনি

এই কার্যে ততী হইতে উদ্ধত হইয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে বত সেকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

‘বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইহাকে লিখিয়াছিলাম। এই লেখা আপনাতঃ পড়িয়া দেখিবেন— বাহ্যতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনাতঃ ইহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন।

‘বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাতঃ তিন জনের উপর দিলাম— আগনি, অগণন্য ও হুবোথ। এই অধ্যক্ষসভার সভাপতি আগনি ও কার্যসম্পাদক হুজুবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাপ করাইয়া লইবেন এবং সকল কামেই আপনাদের নির্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাহাকে লিখিয়া দিয়াছি আপনাতঃ তাহা দেখিয়া লইবেন।’

১৩১০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তাইতে লিখিত একটি পত্রে হুজুবাবু যোষ মহাশয়ের পরিচয়-বৃত্তান্ত প্রবীক্ষনাৎ লিখিয়াছিলেন—

‘বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাস্থাপন একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপর্যাস হইতে পারে। ইহাই অস্বস্তি করিয়া হুজুবাবু হাতে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কাজের লোক — স্তব্ধতা ভাবের দিকে বেশি ফোক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াকড়ী করেন— তাহাতে তিনি লোকের কাছে প্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে একজন লোকের প্রয়োজন অস্বস্তি করি। আমার সঙ্গেও তাহার সত্যতার একা নাই— থাকিলে আনন্দ পাইতাম কারণ পাইতাম না।’

পরবর্তীতে হুজুবাবু যোষকে লিখিত ত্রিনির্বলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা অগ্রহণ করেন, তিনিই বর্তমানে সম্ভবোৎকৃষ্ট কলিত পত্র দুইখানির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

১ বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিনিকেতনের জন্মি পাটী লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে ‘নিরাকার প্রবন্ধের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে’ ও তাহার অগ্রদূত কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ইষ্টীশ্বরের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া যেন। ‘এই ইষ্টের উদ্ভিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ইষ্টীশ্বর শাস্ত্রিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।’ পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অসুস্থতাক্রমে তাহার ধর্মীকাব্যাবিকীতে দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্ষেত্রে ‘আশ্রম’ বলিতে উক্ত ইষ্ট অস্থায়ী পূর্ণাগত ব্যবস্থা, ও ‘বিদ্যালয়’ বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণতঃ সমার্থক হইয়াছে।— সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

মহারাষ্ট্রে ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনা

মূলমান-বিষয় হইতে ছত্রগতি শিবাজী-রূপ

ঐকালিকারজন কামুনগো

মহারাষ্ট্রসেনের মধ্যযুগীয় সামাজিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গরূপে আজ পর্যন্ত সংকলিত হয় নাই। মহানতি রানাডে, আচার্য বনুনাথ, রাওবাহাদুর সরসেশাই প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পটভূমি রচনায় প্রগতক্রমে প্রাক-শিবাজীকালীন সমাজ-সংহতি এবং জাতীয় জাগরণের উপর ধর্মের প্রভাব, তথা ধর্মসংস্কারক 'সন্ত'গণের মতবাদ সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যে রাষ্ট্রই মূল্য, সমাজ এবং ধর্ম গৌণ।

রাষ্ট্র-প্রধান ইতিহাসে যুদ্ধ, কূটনীতি ও শাসনই উপরে জাদিয়া থাকে, বানবাকী তলাইয়া দায়। এইজন্য সাময়িক ব্যক্তিগণ সম্প্রতি ইতিহাসের উপর কিংবা বিরূপ হইয়াছেন, কেননা পূর্বতন ইতিহাসের বিজিগীষা, বর্ণনাকার, বক্তৃতা, শাঠ্যের ঘাত-প্রতিঘাত, পতনজির স্রুতি, মানবতার অপমান মামুল্যকে আজ শব্দিত করিয়া তুলিয়াছে। আবহমানকাল হইতে ধর্মই সমাজকে ধারণ করিয়া আছে; অস্তিত্ব দিয়া বিচার করিলে, রাষ্ট্রই সমাজ ও ধর্মের বন্ধক এবং পরিশোধক। রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হইলে ধর্ম ও সমাজ ভুলপ্রায় হয়—মূল্যহীনে রাষ্ট্রই প্রধান; অথচ রাষ্ট্রের শক্তির মূল উৎস হইল সমাজ। সমাজের কঠি এবং প্রেরণন ধর্ম ও রাষ্ট্রকে রূপ প্রদান করিয়া থাকে। আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞান ইতিহাসকে নুতন ছাঁচে ঢালিয়া কালোপযোগী করিবার উপদেশ দিতেছেন; এইরূপ ইতিহাস হইবে শাস্ত মানবের ইতিহাস—শেষ, জাতি কিংবা ধর্মের ইতিহাস নহে। ইহা অতি দ্রুত কার্য, বিরাট প্রতিভা এবং বহুবৎসরের সাধন-গাপেক্ষ। আশাভেদে পক্ষে ইহা আদা-ব্যাপারীর জাহাজের ববরের সস্ত্র ব্যস্ততার মতই বটে।

মহারাষ্ট্রের সামাজিক ইতিহাসের বহুমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন রাজবাহে এবং সরসেশাই প্রমুখ মারাঠা ঐতিহাসিকগণ। পেশবাকালীন ধর্ম ও সমাজের সস্ত্র পেশবা-পন্থর, পেশবা ভায়েরী একেবারে কাঁচামাল।

এই প্রবন্ধে দাক্ষিণাত্যে মূলমান অধিকারের সময় হইতে ছত্রগতি শিবাজীর 'বরাদ' স্থাপন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পটভূমিকার ধর্ম ও সমাজের বিবর্তন এবং ধর্মসংস্কারের প্রভাব গৌণভাবে আলোচিত হইতেছে।

ঐষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত দিল্লীর তুর্কী সাম্রাজ্য আধাবর্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরভারতে তখন বিধর্মী অদি ও ধর্মোন্মাদনায় তাত্ত্বলীনা; হিন্দুধর্মাবিনাশ বিদ্যা-মহারাজী গিরিশ, গজীর অরণ্যানী, রাজপুতানায় বক-প্রান্তর, লাট-ওয়ার্ড ভূমি সদ্ভূত-বৈশকতে আশ্রয়গোপন করিয়া

ভবিষ্যৎব্যবস্থার রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বিরাট সমাধ-স্নেহ নবদায় উত্তরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অপরূপ উল্লাসী অথচ অখণ্ড ঘোষনীপতির অভাব নাই। হর্ষধ্বনি অপেক্ষা বিগুণ দুর্ধর্ষ শত্রু দক্ষিণাত্যের ছুড়রে হানা নিবার সস্ত্র প্রস্তুত; কিন্তু বীর দ্বিতীয়-পুলকেশ্বী নাই, উৎসাহ রক্ষা করিবে কে? ত্রি-কলিঙ্গের কাকতীয় বংশ, মহারাষ্ট্রের দানবকুল, দ্বারগমুহুরের বৈবহ, কুমাদিকার পাণ্ডা মুহু বিজিতীনা এবং আত্ম-কলহে লিপ্ত; সামরিক শক্তি আছে, রাজনৈতিক দৃষ্টি-প্রণায় নাই। দক্ষিণাত্যের দ্বার-প্রতীহার মহারাষ্ট্র তখন উত্তরদিকে সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া বিশ্রীতদিকে ডাহিয়াই যেন দক্ষিণদিকের চেউ গণিতেছিল। বৈবহিবিদ্রাঘ রানচন্দ্র দ্বিতীয়-পুলকেশ্বীর কুমিকার নামিয়া প্রতিবেশী হিন্দুরাষ্য সমুদকে শঙ্কাহুল করিয়া তুলিলেন। দানববংশের চাপকা-প্রতিদ বিচক্ষণ মন্ত্রী স্থপতিত হেমাতি শেখ বহাদে ধর্ম ও কাম-কে উপেক্ষা করিয়া ধর্মসংকারে মনোযোগী হইলেন। পৌরাণিক আত্মদ্য ধর্মকে সমাধে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার সস্ত্র তিনি পণ্ডিতগণের সাহায্যে ‘চতুর্বর্ষ চিত্তামনি’ নামক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। তৎকালে সমস্ত দক্ষিণাত্যে হেমাতি শংকরাচার্যের দ্বার অস্বস্ত শাহুটাক্রমে পুণ্ডিত ধর্মসংকারক। এই সময়ে তাঁহার প্রতিস্পর্ষী হইয়া আবির্ভূত হইলেন ‘মানভব’ [সংস্কৃত মহাভব ?] সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শাহু চক্রবর্তী। চক্রবর্তীর আচারমূলক নৈতিক আত্মদ্য ধর্মের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহী। সমাজের মধ্যে ও নিয়ন্ত্রণ সর্বকালে বিদ্রোহীর কর্মক্ষেত্র; মহারাষ্ট্রেও উহাই হইল। চক্রবর্তী শংকরের ‘অষ্টভব’ বঙ্কন করিয়া দ্বৈতবাদের প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপাস্ত-দেবতা শংকরের ‘বিষ্ণু’ নহেন—জড়ের ভগবান ঐক্য। এই পরম ভাগবত ক্রমশঃ আত্মদ্য ধর্মের এবং বেদের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিলেন। বেদের অস্বাস্ততা, বহুদেবতার দেবত্ব, সৃষ্টিপূজার ধর্মশাস্ত্র, অবতারবাদে বিভাগ এই ‘মানভব’ সম্প্রদায়ের তর্কের আঘাত লক্ষ্য করিতে পারিল না; চাতুর্ঘর্ষ ও ক্ষতিভেদমূলক সমাজবাদী কীর্ণিয়া উঠিল। চক্রবর্তী উরুকাঠে প্রচার করিলেন মাছুবমাজই স্রষ্টার দৃষ্টিতে সনান, মাছুবের মধ্যে উচ্চবর্ণ হীনবর্ণ নাই, কেহ অপবিত্র অস্পৃশ্য নহে। ‘মানভব’ সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কথা মারাত্মকভাবে ধর্মশিক্ষা দিতেন। ইহার মারাত্মক পত্তনসাহিত্যের স্রষ্টা। নিরাসিধ-ভোজন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম ‘মানভব’ধর্মের অপরিসংখ্য অঙ্গ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের সম্মানে অধিকার আছে; উপাসনার সস্ত্র শাহু ও গৃহধারণ একত্র সমবেত হই। ‘মানভব’ সম্মানীগণ বৌদ্ধবিগের মত পরিভ্রমণা এবং প্রচারে আগ্রহশীল; সমস্ত ভারতবর্ষ ছিল ইহার প্রচারের ক্ষেত্র।

ধর্ম ও সমাধে প্রচ্ছন্নবোধ চক্রবর্তী এই অনবর্ষদৃষ্টি হেমাতি লক্ষ্য করিলেন না; তাঁহার পচাতে ছিল রাজশক্তি। চক্রবর্তী হেমাতির ভয়ে আত্মগোপন করিলেন। হেমাতির চরমপন সন্ধান পাইয়া চক্রবর্তীকে হত্যা করিল (১২৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বটে; কিন্তু ‘মানভব’ ধর্ম আজও মহারাষ্ট্রে বাচিয়া আছে। রাজা রানচন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনীগণ চক্রবর্তীর কৃষ্ণগ্রন্থে বীক্যাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় দুর্বলচেতা রানচন্দ্র বৃদ্ধ মন্ত্রীকে অপসারিত এবং প্রাপবরও দণ্ডিত করিলেন। হেমাতির স্মৃতিবহন করিয়া মহারাষ্ট্রে আজও বাচিয়া আছে গরীব মারাঠা এবং তাহার প্রাণন ধাতু বাত্মা—ধাতা হেমাতি উত্তরভারত হইতে দক্ষিণে লইয়া গিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রে এই ধর্ম ও সমাধ-বিমলবের সন্ধিক্ষণে ইসলামের প্রচণ্ড আঘাতে দানবরাষ্য বিলসিত হইল।

১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বাভাৱিক না হইতেই দক্ষিণাত্য ইসলামের বহুসংস্কারে কাঁপিয়া উঠে। ছলপন্নায়ণ তুর্কী অখারোহী কখন নব্বা অতিক্রম করিল—আলাউদ্দীন খিলজী যাদবেনে উপস্থিত হইবার পূর্বে এই সংবাদ রাজা রামচন্দ্র জানিতে পাবেন নাই; অথচ, বিজ্ঞান অপর পারে থাকিতেই আলাউদ্দীন খবর লইয়াছিলেন সেবগিরি অরক্ষিত, দুয়ার শংকরসেবের অগীর্ষে দামবাহিনী বহু ঘুরে নব্বিগে মুক্তে ব্যাপৃত। যুধ অস্ত্র ঠেকিয়া শিবে; কিন্তু বেই জাতি গ্রীক-আক্রমণ হইতে দুই দ্বারের বংসর পর্বত ঠেকিয়া এক ঠেকিয়াও সতর্ক হইতে পারে নাই তাহাদের ভাগ্যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই বিধিলিপি। ইচ্ছাশক্তি ব্যাপারে eternal vigilance বা নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা বোধশাস্ত্রজ্ঞের পতনের পর ভাবতবর্গের ইতিহাসে হিন্দু মণ্ডা কেব সেগে নাই।

রাজা হউক, রাজা রামচন্দ্র হউক সেবগিরি দুর্গে কিছুদিন আশ্রয়লা করিয়া প্রতিবেশী হিন্দুসংগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেবগিরির উপস্থিত সর্বাঙ্গ বেগিয়া তাহার প্রত্যেকেই নিজের ভাবী পৌষবাসের আশায় বং উৎসাহ হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আগ্র পরাধর ও বন্দিত যুগ্মে ছায়ায় রাত্রিপুতের শংকায়ী নির্বন কর্তব্যতা সারায়া ছিল না; ব্রোহ্মের অগ্নিশিখা অংশে উঠিল না, সেবগিরির দুর্গের উন্মুক্ত করিয়া কোনো পুরুষ বীরগতি কামনা করিল না। দুর্গের বাহিরে শত্রুর উপর প্রবন আক্রমণ বার্থ হওয়ার পর কুমার শংকরসেব আর বৃদ্ধ করিলেন না; মহারাজা-স্বাধীনতার পরবর্ত্ত কৃষ্ণাঙ্গা আগিল। আলাউদ্দীনের রাজ্যারোহনের পর অর্ধশতাব্দীকাল ইসলামের সাম্রাজ্য-লিপ্সা দক্ষিণাত্যের উপর দিয়া ঘূর্ণীবাত্যার মত বহিয়া গেল, কোনো স্বাধীন হিন্দুসংগ অবাধিত রহিল না, ভরমন্দির ও চূর্ণাকৃত পাথর-বেতন হিন্দু ধর্মকে উপহাস করিতে লাগিল।

দক্ষিণাত্যের এই সংকটমুহূর্ত্তে মাধব ও শায়নাচার্যের আবির্ভাব হয়। তাহাদের বুদ্ধিমত্তা এবং হরিদ্র বৃদ্ধারদের শৌর্বে ভূতভার্যার দক্ষিণাত্য হইতে কুমারিকা পর্বত ভূভাগ ইসলামের কবলমুক্ত হইল। বিজয়নগর প্রাচ দুইশত বংসর পর্বত প্রথমে বাহ্যমনী এবং পরে আদিলশাহী গ্রন্থ মুসলমান রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল; অথচ মহারাজা ও তেলিঙ্গনার হিন্দুগণ অসার ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল, ইহার কারণ কি? প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়াও কুমারসেব রাবের মত সম্মতি কেনই বা দক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দুগণকে মুক্ত করিতে পারিলেন না? ইহার মূল্যগত কারণ হিন্দুধর্ম এবং সনাতনের সহিত ইসলাম ও মুসলমান সমাজের মৌলিক পার্থক্য। জাতি, বর্ণ এবং শ্রেণীর স্বত্তা বহু-খণ্ডিত সমাজ, প্রচারে বিশ্ব কীৰ্ত্তন ধর্ম, রাজতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র, রাষ্ট্র চেষ্টনান্ত্র উদাসীন জনসাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইলেও সর্ববিধয়ে সাম্রাজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ধর্ম, একনাথক শাসিত সাম্রাজ্যতন্ত্র, বর্ষব্যপ্রেবে উচ্চ সর্বাঙ্গপ্রভ অক্রমশাস্ত্রক যনোত্তিসম্পন্ন সাংখ্যলিখিত জাতির বিরুদ্ধে আশ্রয়লা করিতে পারে না। ইসলামের অনুসরণকাল হইতে কয়ালী-বিদ্রব পর্বত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ইহার প্রমাণ। ইসলামে মাহুদের কিছুই নাই,—রাষ্ট্র, দৈত্য, রাজকোষ সমস্তই আত্মার, যোদ্ধা সকল মুসলমানকে সমান অধিকার দিয়াছেন, দুনিয়ার লোকজনীয় বস্ত্র ও ধনদৌলত 'বিদ্যাসী'র ভোগের জন্তই তিনি স্বষ্টি করিয়াছেন। ইসলাম-প্রচার

এবং কাকেরের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য,—সে কালের যোদ্ধা-নিঃশ্রিত ইসলামের ইহাই ছিল শিক্ষা; রাজনৈতিক আবহাওয়ার ক্ষেত্র ও প্রয়োজন অনুসারে উহা ভারতবর্ষে কিঞ্চিৎ উৎসাহেই পরিণত হইয়াছিল মাত্র।

শতবর্ষব্যাপী বিষয়নগর-বাহাদুরী সংঘর্ষ উভয় রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী হিন্দুগণের সর্বনাশ ঘটাঁইয়াছিল। হিন্দু হিন্দুকে লুট করিবে না—এমন কোনো বিধান হিন্দুশাস্ত্রে নাই; হুতরাং কুরুক্ষেত্রের হইতে শিবাজী-বাহাদুরাও পর্যন্ত কোনো হিন্দু বিদ্বেষতা মুসলমান-রাজ্যের আশ্রয় ব্যতীত অন্য হিন্দুকে দেহাই ঘেন নাই। বিষয়নগর-সন্ন্যাসীরা রাজনীতির এই দুল সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত অংশে হিন্দু স্বাধীন ও সংহতিবদ্ধ না হইলে একমাত্র হিন্দুস্বাধা বিষয়নগরের পতন নিশ্চিত। বাহাদুরী এবং পরবর্তী শাহী সুলতানগণ তাঁহাদের স্বাধীন হিন্দুগণের কর্তৃত্বশক্তি ও বাহুবল বিষয়নগরের বিরুদ্ধে পূর্ণ-ভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুর মজাগত 'স্বাধীনতা' বা নিম্নকহালালী কালক্রমে সেবে এবং দুর্বলতার পরিণত হইয়াছিল। তীক্ষ্ণ শিতামহ অসহ্যতা দুর্বেধন কর্তৃক সৌহার্দ্যের অগমান সঙ্ঘ করিয়াছিলেন, বিরাটরাজ্যের গোদন হরণ করিতে গিয়াছিলেন, একমাত্র দুর্বেধন প্রবৃত্ত 'প্রাণ' বা ক্রুরিত প্রতিনিবেশ। এই ভ্রাতৃ-অভ্রাতৃ বার্থ-পরার্থ-বিচারশূন্য, ভূতীত্বক্ মনোবৃত্তি হিন্দু স্বাধীনতা ও ধর্মের পরিপন্থী হইয়া পড়াইয়াছিল। মুসলমান সুলতানগণ হিন্দুকে কখনও কখনও 'হাতে' মারিতেন, কিন্তু 'ভাতে' মারিতেন না; এই অজ্ঞই স্বাধীন হিন্দু প্রভাগণ 'পেটে বাইলে গিটে নয়' এই আশঙ্ক্য মানিয়া লইয়া বিবর্তভাবে মুসলমান-সরকারে চাপুরী করিত, হিন্দুই বিরুদ্ধে হুঁড় করিত, অস্ত্রায় অস্ত্রাঙ্গার সঙ্ঘ করিত। পরবর্তী যুগে ধর্ম পুনঃস্থাপনের কথা বিয়া এই ভাষ্যগ্রন্থ হিন্দু-সমাজে নূতন চিন্তাধারা, কর্মপ্রেরণা আনিয়াছিল।

আমরা সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রের সতীজনীমহনাতা 'শত'গণের ধর্মমত এবং সমাজের উপর উহার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিব।

৫

মহারাষ্ট্রদেশ বাহাদুরী সাম্রাজ্যের পশ্চিম 'তরক' বা স্থাবর অন্তর্গত ছিল; পরে উহা বিজাপুরের আদিলশাহী ও আহমদনগরের নিবাসশাহী রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বেংগিরির দ্বাদশবৎসরের পতন এবং ছত্রপতি শিবাজীর আবির্ভাবের নব্যবর্তী দুইশত পঞ্চাশ বৎসর কালে মারাঠী জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের অল্প কোনো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে নাই; কিন্তু এই সময়ে মহারাষ্ট্রে মারাঠী লোক-সাহিত্য এবং ধর্মের নব্যআগমন সমাজের মনকে বিদ্রোহের অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছিল, নেতা তখনও অসংগঠন করে নাই।

ঐতিহাসিক সরমেশাই লিখিবাছেন, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্ত সম্ভ্রায়ের শিক্ষা এবং চিন্তাধারার ভিত্তি বিনিষ্ট কাল ও মতবাদ দৃষ্ট হয় : জ্ঞানেশ্বর-নামদেব যুগ (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী), একনাথ-ভূকায়ার যুগ (পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী), এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিবাজীর গুরু শ্যামদাসের যুগ। এই সময়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণে হুতকার যের প্রভৃতি শ্রেণী হইতেও সর্বজনপূজিত একাধিক মহাপুরুষের

আবির্ভাব হয়। ইহাদের মোটামুটি বিবরণ সরবরাহই তাঁহার 'মাত্রাটি-রিলাস' গ্রন্থের প্রথমভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উক্ত তিনটি গুণগণ্যতার মধ্যে একটি যোগবৃত্ত রহিয়াছে। এই যোগবৃত্ত হইল নাম, ভক্তি, সমাচার এবং কীর্তনের মাহাত্ম্য। এই ভক্তির স্তম্ভ পাণ্ডুরূপের 'বিঠোবা' অর্থাৎ বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানেশ্বর-নামদেবের উপর হেমাদ্রি-চন্দ্রধরের প্রভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু উভয়ের মতবাদের এবং শিক্ষার মধ্যে পূর্ববর্তীগণের আত্মমাতী বিরোধ দেখা যায় না। মহারাষ্ট্র তথা সমগ্র ভারতজুনি খ্রীষ্টভক্তগণকর্তৃকই আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে শাস্ত্র এবং কর্মের প্রেরণা পাইয়াছে। শীতার বেই প্রয়োজন ও প্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া জ্ঞানদেব শীতার ভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' লিপিয়াছিলেন, দ্বায়ীনতার পূজারী মহামতি তিলক এবং মহাদেবী শ্রীমদ্বিষ্ণু-কৃত ভাস্কর্যের মধ্যেও ইতিহাস অস্বরূপ প্রয়োজন দেখিতে পার। জ্ঞানদেবের শিক্ষার মধ্যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনের সমন্বয় ছিল। নামদেব জ্ঞান ও কর্মের দুইই মার্গ ছাড়িয়া একমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাস্ত দেবতা নাম-রূপ-জ্ঞানের অতীত স্বয়ং 'হরি'। তাঁহার সময় হইতে বৈষ্ণবগণ মহারাষ্ট্রে প্রবেশে 'হরিবাদ' নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। ইসলামের শুদ্ধ একেশ্বরবাদ এবং মূর্তি-পূজার প্রতি বিদ্বেষ মুসলমান রাজত্বে হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করে নাই, এমন কথা বলা যায় না। নামদেব মূর্তিপূজার প্রোক্ত বিরোধী না হইলেও তিনি 'রূপ' অপেক্ষ 'নাম'-কে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই নাম-মাহাত্ম্য উত্তরভারতে সম্বলীবন সফল করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রের বিঠোবা, খ্রীষ্টভক্তের কৃষ্ণ, রামানন্দ-কবীরের রামায়ণ-নিরপেক্ষ রাম এবং শুদ্ধ নামকের নিরাকার অলঙ্ঘ-নিরঞ্জন—ইহাদের অভ্যাসে রহিয়াছেন নামদেব-প্রচারিত ভক্তির সেবতা 'হরি'।

পরবর্তী যুগে মহারাষ্ট্রের ধর্মজাগৃতি, ভাবা ও সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব স্বপ্নবিচ্ছূট। জ্ঞানদেবের গ্রন্থসমূহে বেশি আরবী-কারশি শব্দের প্রয়োগ নাই; কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে মারাঠী ভাষায় আরবী-কারশি শব্দ প্রচুর দেখা যায়। একনাথ-এর ভাষা ও ভাবে মুসলমান-প্রভাব সুস্পষ্ট। পঞ্চদশ শতাব্দীর কারশি-মিশ্রিত 'প্রাচীন মারাঠী' পঞ্চরচনামণ্ডলী প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে মারাঠী ভাষাকে স্বেচ্ছ-মোহ মুক্ত করিয়া সংস্কৃত-মূলক করিবার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্য উত্তরভারতে বিস্তারলাভ করিবার দক্ষণ এই 'গুড়ি'প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। একনাথ পাশাপ-সেবতার উপাসনাকে গলায় পাথর ঝাঁঝা শীতার দেওয়ার মত মূর্ততা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ভাবে ও ভাষায় একনাথের প্রচারণা ছিল কবীরদাম্পত্যের মত আকর্ষণীয়। একনাথের মূর্তিবিদ্বেষ মহারাষ্ট্রসমগ্র গ্রহণ করে নাই; কিন্তু তাঁহার কীর্তনের ভরসে আভির মন হইতে অস্পৃশ্যতার মিথ্যা সংস্কার ও শুদ্ধ আচারের বালুকাস্তম্ভ ভাসাইয়া লইয়া গেল। তুকারামের শিক্ষা অধিকতর গঠনমূলক। তুকারামের শিক্ষার এক উপায় পরমন্তহিন্দু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সমস্তগণ মহারাষ্ট্রে আধ্যাত্মিক-চেতনা স্বয়ংপ্রীতি ও সমাচার পুনরুদ্ধারিত করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ও বর্ণের মধ্যে মিথ্যা সংস্কার ও সনাতনী আচারের বাধা এবং অস্পৃশ্যতাব্যাপি ইহাদের শিক্ষায় বহুলাংশে দূর হইয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর এবং ষোড়শের প্রথমার্ধে উক্ত তথা দক্ষিণভারতে ভক্তি ও কীর্তনের ভরা জোয়ার। এই দুইয়ের সমাধ এবং হিন্দুর রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একনাথের হিন্দু-কীর্তন এবং মহাপ্রভুর

নাম-সংকীর্ণনের নিকট বহুল পরিমাণে কণী। নির্জনে একচিত্ত হইয়া গায়ত্রী কিংবা মালাভঙ্গ সাধকেরই চতুর্বার সাধনের পন্থা; কীর্তন সমষ্টগত উপাসনা। আবালবৃদ্ধবনিতা অস্ত্রাশ্রয়-চণ্ডাল স্ত্রী-পুং-অস্ত্র সকলেরই চিত্ত কীর্তনের ধনিত্তে এক হুদে বাজিয়া উঠে। প্রতি কীর্তন-প্রাঙ্গণ একটি হুহু শ্রীক্ষেত্র, উদ্যতে উচ্ছিন্ন নাই, স্পর্শগোচর নাই, উজ্জ্বল নীচ নাই; অশ্রুত সাময়িকভাবে উহা মহামানবের মিলনক্ষেত্র। ইতিহাসের দৃষ্টিতে সমাধ-সংস্কার ও জাতিগঠনের পক্ষে কীর্তন, নমস্কা বা সমবেত প্রার্থনার তুল্য শক্তি আর নাই। কীর্তনের দ্বারা mass attitude সৃষ্টি হয়, যাঁহি সমষ্টের শক্তিতে উৎকৃষ্ট হয়। ইহা না হইলে সমাজের সংহতি-শক্তিক্লাস্ত হয় না, কোনো 'রাষ্ট্র' কার্যকরী হয় না, ধর্ম মূর্খ গণমাঝে প্রাণের স্পন্দন আনিত পারে না। সেকালের নাম-কীর্তন এবং এই যুগের রাষ্ট্রপথে শোভাযাত্রা ও সমবেত চীংকারের পশ্চাতে রহিয়াছে একই মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ mass attitude সৃষ্টি। 'সত্ত্ব'গণ ধর্ম বে mass attitude সৃষ্টি করেন হুচকুর শিবাজী উহার মোড় কিরাইয়া স্বাধীনতার খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তাও সৃষ্টি হইল মারাঠা জাতি (Nation), মহারাষ্ট্রের স্বরাজ্য। শিবাজী এই mass attitude-এর মোড় একাকী কিংবা হঠাৎ কিরাইতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রে ধর্মোন্মোহনের সঙ্গে সঙ্গে যে মারাঠা লোকশিক্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল, যে গান মারাঠা 'গদ্যলী' বা চারণ আশ্রয় গাহিয়া বেড়াই, উহার ফলের মধ্যে সংকীর্ণ হইত জাতির মর্ববেশনা, নূতন অবতারের আগমন প্রতীক্ষার অসহিষ্ণুতা। Mass attitude সৃষ্টি করিতে পারিলে mass action সহজ হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সাহিত্য শিবাজীর মত mass action-এর ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়াছিল। এই ক্ষমতাই ছত্রপতি শিবাজী পূর্ববর্তী যুগের সৃষ্টি এবং পরবর্তী যুগের স্রোতও বটেন।

৬

মারাঠা সত্ত্বপন্থের শিক্ষা স্বরাজ্য-স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়াছিল; কিংবা তাঁহার বুদ্ধপ্রবণ মারাঠা জাতিতে বৈষ্ণবী ধীনতা, ভোগের অসারতা নিরুত্তি-মার্গে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইবার উপদেশ দিয়া দুর্বল, অশনান-সহিষ্ণু, কর্মবিশুদ্ধ করিয়াছিলেন—এই মতভঙ্গ অধুনা দেখা দিয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এইপ্রকার শাস্ত-বৈষ্ণব বিরোধ নূতন নহে। ইহার একটা বীমাংসা প্রয়োজন। বৌদ্ধ জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের অধিঃসাক্ষ্য একদল ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের কারণ বলিয়া মনে করেন—তুল্যদৃষ্টিতে ইহা সত্য বলিয়াও মনে হয়; কিন্তু হৃদয়ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় প্রকৃত প্রত্যয়ে জাতির ধোঁস-গুণ কোনো ধর্মের উপর আরোপ করা যায় না। আধ্যাত্মিক ও তব হিসাবে সমস্ত ধর্মই মূলত এক, এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে সাধনার পন্থা বিভিন্ন এবং উহা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। বিস্ময় মনের মত ধর্মেরও কোনো বর্ণ নাই। মানবগোষ্ঠীর রঙিন পায়ে ঢালা হইলেই ধর্ম রূপ-ভ্রান্তি ঘটাইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম ইসলাম শিবধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম আসলে এক; যথা, খ্রীষ্টানের justification by faith; ইহাও 'রাষ্ট্র'র প্রতি বুদ্ধিনিরপেক্ষ উগ্রবিশ্বাসী মনস্তত্ত্ব-বিন্-হাস্যাত্মক telepathic বাণী—'Say unto the Devil that God exists, and exists without proof'; গৌরব মহাপ্রভুর উপদেশ—'বিশ্বাসে মিলিয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'। শুক নামক ধর্মও বিশ্বাস এবং ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত ধর্মচতুষ্টয়ের আর-একটি ভিত্তি—self

surrender—‘সর্গঃ স্রীকৃষ্ণে সর্পর্ণবস্ত’। খাদীন দ্বন্দ্বগ্রন্থ ইহদী জাতির মধ্যে আদিরাহিল তেরীত (Old Testament)। উহার বহু শতাব্দী পরে পরখীন ও নিরিত ইহদীর নিকট দীত লইয়া আসিলেন ইব্রিসের (New Testament) বৈকদী নীনজ। খ্রীষ্টধর্মের ‘দশপদ’ বর্ষ টিউটন-গথ-দনকে পরাশ্রিত করিয়া পরবর্তী যুগে ইয়োয়োগে কি দৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল, লকশেই জানেন। জ্বাভিবানী, রক্ত-পিপাত লুঠনপ্রিয় আরব-সাম্রাজ্যের মধ্যে ইসলামের বেই রূপ দৃষ্টিমা উঠিয়াছিল; উহা Old Testament এর মত লম্বল, বিদ্রোহিত, কুলতন্ত্রপ্রভী ধর্ম। হুম্মরত মদ্বদ বাংলাসেপে জয়গ্রহণ করিলে তিনিও একজন মহাপ্রভু হইতেন, কারণ বাঙালী আরব-বেদ্বইন ছিল না। বাঙালী বৈকদকে একটা অকাদী শিখ করিবার সাধ্য শুভ গোবিন্দ সিংহেরও ছিল কি না সম্ভেদ। ধর্মের ব্যাধারে বীম অশেপা ক্ষেত্রই প্রধান। সেপের দ্যটি জাতির মনের গড়ন (mental make-up), সভ্যতার স্তর, সামাজ্যব্যবস্থার ধাতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এই কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈকদ হইলেও নোখীন হয় না; বীরাবাসির ভ্রাতৃপুত্র চিতোর-রমক রাঠোর জয়ল ‘রংছোড়কী’র মত ভরাসাম্রাজ্যে সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নাই। ইহা জাতির ধর্ম, বৈকদের নহে। বাহা ইউক, তুকারাম ইত্যাদির শাস্তি ও মৈত্রীর বাণী মহারাষ্ট্র সমাজকে দুর্বল কিংবা দৃঢ়বিন্দু করিবার লক্ষ্যে আনয়্য সমসাময়িক মার্যঠা ইতিহাসে দেখিতে পাই না। ভূতিহুক সাংলী ঘোষার অজ্ঞাব মহারাষ্ট্রে স্বখনও হয় নাই। সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ও সাম্রাজ্য-নিবাহী সম্বন্ধীয় বহুবিধ অদীক কিসদ্বী পূর্ববর্তী সম্বন্ধের মাহাত্ম্যকে বর্তমানে চাশা দিতে সক্ষম। ইতিহাসের শিবাজী, মার্যঠা চারণশীতিকা কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ‘প্রতিনিধি’ ঠিক নহেন। খরাম্যাম্যপনা শিবাজীর নৌলিক-কল্পন, শুক রামদাসের প্রেরণা নহে।

শিবাজীর জয়-ভারিখ এখনও অবিসংবাদীভাবে স্মৃতিত হয় নাই। ১৬২১-৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জয়। শিবাজীর জয়ের সুড়ি-বাইশ বৎসর পূর্বে রামদাস জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস মংলার ভাগ্য করেন। নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রে কিরিয়া কৃষ্ণানদীর তীরে অশ্রম স্থাপন করেন এবং এই সময় হইতে তিনি ধর্মশিক্ষাননে ব্রতী হইলেন। ঐ বৎসর শিবাজী কোওনা বা সিংহগড় দুর্গ অধিকার করেন। রামদাসের আবির্ভাব এবং শিবাজীর সিংহগড় অধিকার কিছু কাকভালীয় ঘটনাও নহে। ১৬৩৪ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশে শিবাজী এবং রামদাসের কীর্তিসুধার কর্মক্ষেত্র; অথচ শিবাজীর গোষ্ঠাবীর পরে পাওয়া যায় ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই রামদাস ও শিবাজীর প্রদব সাক্ষাৎকার ঘটয়াছিল। ইহার পূর্বে শিবাজী রামদাসের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। উক্ত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রামদাস তাঁহার অপূর্বগ্রন্থ ‘দাস-বোধ’ রচনা করিয়াছিলেন; উহা মহারাষ্ট্রের নববিধান (New dispensation) তুল্য। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ রামদাসের মহারাষ্ট্রে আশ্রম স্থাপন করিবার মাসো বৎসর পরে, মহারাষ্ট্র-কেশরী আকল্প খা-বংশের শেখ রাহমুত ভাখেরের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিলেন; মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের ইহাই ঘটনা। ঐতিহাসিক সন্দেশনই সম্ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রামদাস শিবাজীকে প্রভাবিত করেন নাই, বরং পুত্র-নারক (hero as a king) শিবাজীর কৃতিত্বই সম্যঙ্গী রামদাসকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই লম্বই রামদাসের দাস-বোধ গ্রন্থে এবং তাঁহার পরবর্তী ধর্মশিক্ষার মধ্যে অজ্ঞাতে ছন্দগতি শিবাজীর ছায়া পড়িয়াছে। দাস-বোধ বর্ণিত ‘উত্তমপুত্র’, যিনি বীর,

ধর্মের স্বকণ্ঠ, সমাজের পরিভ্রাতা তিনি শিবাজীর আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছেন—এই অস্বাভাবিক অংশ নহে। রামদাস অশ্রুত ‘সন্ত’গণের স্রাব আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উপদেশ বিবাহী কান্ত ছিলেন না। বৈবাহিক জীবনে সফলতা অর্জনের উপদেশ তাঁহার শিক্ষার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। রামদাসের গঠনমূলক কার্য হৃদয়প্রসারী ছিল। মহারাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি রামদাসী-মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইসময় মঠে শরীফচাঁদা ধর্মপ্রাণের অপরিসংখ্য অর্থ ছিল। রামদাসের উপাশ্রিত দেবতা ছিলেন মাকড়সি হস্তমানজী। হস্তমানজীর কৃপা বাতীত রামভক্তি লাভ হয় না, কেহ সৈনিক বলের অধিকারী হইতে পারে না, সাধনাও সিদ্ধি দুর্বলের ক্ষম নহে—‘নাথনাচা বলহীনেন লভা’। সেই রূপে হস্তমানজী ছিলেন কাল ও সমাজ উপযোগী দেবতা, হস্তমান না হইলে রামগণও হয় না, গীতা-উদ্ধার হয় না।

আধুনিক উৎকট রাজনীতি-ব্যবসায়ীগণ রামদাস কঠোর সপনের সর্বত্র মাকড়সি-মঠ স্থাপনের পশ্চাতে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং শিবাজীর ক্ষম শয়নোচ্চ ‘শঙ্করবাহিনী’স্বস্তির প্রকাশ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সরোশাই ইয়ার্থই বলিয়াছেন, এইরূপ অস্বাভাবিক ভিত্তিহীন; উহা রামদাসীর ধর্মের নিচক বিংশ-শতাব্দী-কল্পিত রাজনৈতিক ভাঙ্গ। কর্ণাটক জীবনের অপরূপে ছত্রপতি শিবাজী রামদাসের উপর পাপপুণ্যের বোঝা চাপাইয়া খালি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবনের ব্যস্তপ্রতিভা-বহল দীর্ঘসংগ্রামে ‘সমর্থ’ রামদাসের উপদেশে শিবাজী সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস কিরিয়া পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালীন পেশবা বাজীরাও-র গুরু ব্রহ্মক্স স্বামীর স্রাব রামদাস কিন্তু শিবাজীর রাজনৈতিক উপদেশে ছিলেন না, তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অঙ্কিত হইয়া পড়েন নাই। ঐতিহাসিক চরিত্রের হিগবে শিবাজী ও রামদাস পরস্পরের পরিপূরক (complement), আদর্শ ও প্রতিবিম্ব নহেন; জাতিগঠনকার্যে রামদাসের দান প্রায় শিবাজীর সমতুল্য। শিবাজীর স্বাভাৱ্য প্রায় হওয়ার পর মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণা জোগাইয়াছিল রামদাসের দান-বোধ। এই ক্ষমই শিবাজীর পরে দেখা বিয়াছিলেন ‘দান-বোধ’কল্পিত অস্ত্রতম ‘উত্তম পুরুষ’ পেশবা প্রথম বাজীরাও।

৭

সাময়িক মুসলমান ইতিহাস বলিয়া থাকে ‘শিবা’ দম্ভা, পরাধীনতারী তত্ত্ব। স্বাভাৱ্য ইতিহাসে দেখা যায় শিবাজী ছিলেন সন্তোষ সন্তান, ভাবপ্রবণ দুঃখান্দী বালক, হরিকীর্তন এবং মহাভারতের কথা—বিশেষতঃ ‘বৃন্দাবন’—স্বপ্নাই ছিল তাঁহার শিক্ষা। তিনি বুদ্ধি বহিঃস্রবের ঘরে অগ্রগ্রহণ করেন নাই; পিতা শাহাজী আদিলশাহী দরবারে বিশিষ্ট সানন্ত ও জাহাজীরদার। হরিকীর্তন কিংবা মহাভারত শুনিয়া কেহ ভাষাত হয় না, ভীম অভিনয় হইতে পারে; নেবারের মহাবীর সত্যপ্রসাদী পিতৃভক্ত ‘চুণা’ এবং জিতোদ-রক্ষক কিশোর বালক ‘পত্নী’ ইহার প্রমাণ। ধর্মের বাণী বিপরীত কলগ্রন্থ হইয়াছে, ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। সন্ত উগ্রবিশ্বাসী চরম সাম্যবাদী ইসলামের ‘খারিজী’ সম্প্রদায় কোরাণ পরীক্ষের বোঝাই দিয়া স্বস্তী মুসলমানের প্রাণনাশ এবং সম্পত্তি স্টুট করা মহাপুণ্যের কাম ‘জোহাদ’ বলে করিত; ক্রমশঃ ‘জোহাদ’এ পাইয়াছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের মাথা কাটিবার নজীর। ওনা দায় বদমশের বিপ্লববাহীগণ বোনা-বিলম্বার লইয়া মারাত্মক দেখাভাঙ্গা করিবার পূর্বে ‘পিতা’র বিত্তীয় অধ্যায় নিবর্তি মনে পাঠ করিতেন। তাবের বীম ক্ষেত্র এবং সমগ্রাঙ্গুলারে বিভিন্ন প্রকার কল দান করিয়া থাকে।

সরদেশাই লিখিয়াছেন, ইব্রাহিম আদিলশাহর মৃত্যুর পর ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদ আদিলশাহর ক্রায়ে স্থলভান বিজ্ঞাপন-যশস্কন্দ বলবিত্ত না করিলে শিবাজী হয়তো আনৌ বাণীন মহারাষ্ট্ররাজ্য স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেন না। মহম্মদ আদিলশাহর পিতা ইব্রাহিম আদিলশাহ, তাঁহার পূর্বতন স্থলভানগণের ধর্মভিত্তা এবং পরদর্ম-নির্ধাতন নীতি পরিভ্রাণ করিয়া মহামতি আকবরের উদার ধর্মনীতি এবং অসংকপাত মানন দাক্ষিণ্যতো প্রবর্তন করিয়া আকবর জাহাঙ্গীরের মত 'গগন-গুরু' আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিলশাহ ছিলেন আলমশীর বাদশাহর আদি সংস্কার। হিন্দু সমাজকে দুর্বল এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কখনও লাভ দেখাইয়া কখনও বল-প্রয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধ মারাঠা সামন্তবংশের সাহসী সন্তানগণকে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং ইসলাম শাসনানুসারে ইহাদের উপর কার্য করিবার জন্য সম্রাট মুসলমানবংশীরা কস্তার সহিত বিবাহ বিয়া নিশ্চিত হইতেন। এই ধর্মভিত্তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাজে গভীর অশান্ততার সৃষ্টি করিল; শিবাজীর সমকালীন সাহিত্য ইহার প্রমাণ। হিন্দু বেগতিক সেবিগেই একটা অবতারণার আশায় বসিয়া থাকে। এই কারণেই মুসলমান-নির্মিত 'দহা' ও 'তত্ত্ব' শিবাজী মহারাষ্ট্রে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়া 'অবতারত্ব' লাভ করিবার হযোগ পাইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্ররাজ্যের লিখিয়াছেন : 'প্রাকৃত' অর্থাৎ সাধারণ নহুত 'স্বা'কে সেবা করিয়া থাকেন; থাহারা 'অপ্রাকৃত' তাঁহার 'অস্বা'সেবা। 'অপ্রাকৃত' ব্যক্তির স্থান হয় সকলের নীচে, না হয় সকলের উপরে। 'অপ্রাকৃত' জন অকৃতকার্য হইলে সমাজে শাপল এবং ইতিহাসে বিদ্রোহী ডাকাত-রাউটার হইয়া পড়েন; কিন্তু স্বাভীষ্টলাভ হইলে তিনিই স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ সর্বাধি সম্মান ও প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। শিবাজী প্রাকৃত মানব হইলে বিজ্ঞাপনে ব্যাপমাচার জাহাঙ্গীর কিংবা বেগল দরবারে পাঁচ হাজারী মনদব লইয়াই সম্মত থাকিতেন। মহারাষ্ট্রের বীর সম্মান 'দাসত্ব হ'তে দহা'য় উত্তর। এই পদ্য অবলম্বন করিয়া জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই আতি দাশত্ব অপেক্ষা দহা'য়ই উত্তর মনে করিতাছে তাহারাই স্বাধীনতা বলা করিতে পারিয়াছে, বাদবাকী গোলাম হইয়া পড়িয়াছে। চট্টলকবি নবীনচন্দ্র 'দহা' শিবাজীর মনস্তত্ত্ব শিবাজীর মুখেই শুনাইয়াছেন—'ভারত দহা'য়বলে লজ্জিত হইল। কি শাপ দহা'য়ে উহা করিতে ছরৎ।' কবি ও ঐতিহাসিক এইভাবে একমত।

দহা হইয়াও শিবাজী 'দহা'বর্ষ' পালন করিয়াছিলেন; হুতরাং অতি বাস্তববাহী স্বয়ং বেদব্যাস বৈষ্ণব থাকিলে তিনিও শিবাজীকে 'ইন্দ্র' গোঁরব হইতে বিমুখ করিতেন না—অন্ততঃ মহাভারতে এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শিবাজী দিল্লী-বিজ্ঞাপনের শত্রু ছিলেন, ইসলাম ধর্ম কিংবা মুসলমান প্রজা-বিষেই ছিলেন না। এইরূপ হইলে তাঁহার রাজধানী পুণা নগরীর বৃক্কে বেগ সম্রাট 'মজার' বা পীঠস্থান 'আর' পর্যন্ত মাটির উপরে থাকিত না, পেশবা-আদম পর্যন্ত উহার জন্য 'ধরাত-বরত' বরাদ্দ থাকিত না। তিনি কোনো কাজী ককিরের বৃত্তি বন্ধ কিংবা নিরুপ ধর্মোত্তর বাধেগ্রাস করেন নাই। সর্বধর্ম-প্রীতি এবং ধর্মের ব্যাপারে সকলের সহিত আপোষ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার নীতি। বিশ্বদমনের সাম্রাজ্যে বিনোদী মুসলমানগণের যে মাতব্বী ভাব (superiority complex) হিন্দুগণ লক্ষ্য করিত শিবাজীর 'স্বা'য় আনন্দে তাহার কিকিং পরিবর্তন হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার দরবারে কোনো উচ্চপদে কিংবা দায়িত্বপূর্ণ কার্যে মুসলমান নিযুক্ত

হইত না অল্প কারণে। তাঁহার শৈশবকালে, বিশেষতঃ ভোপখানা-বিভাগে, মুসলমান খোদাবাজ সিপাহীর ভ্রম্ভে সরকার হইতে 'টাররাডি-খরচ' বরাদ্দ ছিল। মুসলমানের কোনো ধর্মোচরণ কিংবা তামিষা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না : কিন্তু গো-কোরবানি নিষেধ ছিল, কারণ গোহত্যা মুসলমান ধর্মের অঙ্গ নয়।

শিবাজী ধর্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠাতা, গো-ব্রাহ্মণ সরকার নিষিদ্ধ তিনি অস্বপারণ করিয়াছিলেন— ইহাই মারাত্মক ঐতিহাসিকগণের মত। আচার্য বহুনাথ বলিগাছেন, দাক্ষিণাত্যে আলমগীরশাহী আমলে বাবান হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা যেন আহাঙ্গীর বামশাহ্ কঠক কঠিত কুকের মত এবং উত্তর লৌহকটাহ-বড় কাওমুল হইতে অক্ষরবটের নতুন শাখা-উলমের মত অলৌকিক বৈবৰ্ঘ্যনা। শিবাজীর অস্বাধারে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছিল; মুসলমান বৃত্তিতে পারিল, হিন্দুধর্ম মরিখাও মরিবার নয়। শিবাজীর সভা-কবি ভূষণ তাঁহার 'শিবরাজকৃষ্ণ' কাব্যে এই হিন্দু-রাষ্ট্রের স্বরূপ চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

কেহ রাখে বিধিত পূরণ রাখে সার স্মৃত
রান নান রাখে অতি রচনা হুসর বৈ।
হিন্দুর কী চোটি রোটি রাখি হৈ সিপাহীর কী
কাখে বৈ কনক রাখে বালা রাখে পর বৈ।
হিন্দুর কী হুস রাখি তেজ বস দিব-রাধ
সেব রাখে সেবন কর রাখে যু বৈ।

অর্থাৎ, শিবরাজ কেহ একমিত, এক পূরণ সারস্মৃত রাখিযাছেন। দিগন্তে হুবহু রান নাম, হিন্দুর মাগার টাকি, রাখে উপনীত, গলায় বালা, বোড়ার লৌকিক তিবিই রক্ষা করিয়াছেন। হিন্দুর রাজা মথিরে সেবমুর্তি, এতি করে কর্ষ অসি-বলে শিবরাজ স্থাপন করিয়াছেন।

৮

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক রাক্ষসীতি ধর্ম ও সমাজের দৃষ্টিতে এক অপূর্ণ বহুবর্ণ বিরাট ব্যাপার; সেই দুগের এক রাক্ষসদেহ। এই অমৃতাণে কাম্বী-প্রয়াগ-কাণী-পুরুষোত্তম(পুরী)-বাসী পণ্ডিতগণ আনন্ডিত হইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রের 'সেশব' কিংবা 'কোষণব' ব্রাহ্মণ কেহই বাধ পড়েন নাই। শিবাজীর ব্যাতি, শিবাজীর ঐশ্বর্য, হিন্দুশাসিত হিন্দুরাজ্য, হিন্দুধর্মের অস্থান এতদিন পর্যন্ত উত্তরভারতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল; বাহ্যিক লোকমুখে কিছু শুনিয়াছিলেন এই পাড়বর রাজ্যাভিষেক ঘটকে বেবিরা তাঁহাদের চক্ষুর্কণের বিবাহ ঘূড়িয়া গেল। দাক্ষিণ ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট দূরদেশাগত পণ্ডিত-বঙলী এক নতুন প্রেমাণ ও আশার বাণী লইয়া সেপে কিরিয়াছিলেন এবং উহা হিন্দুসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের প্রচারমূলক মূল্য (propaganda value) শিবাজীর অর্থব্যয়-সার্থক করিয়া তুলিল; উত্তরভারতে হিন্দুধর্মপ্রণয় ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। এই হিঁসাংবে শিবাজী বিজয়নগর সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় অপেক্ষা অধিক রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রে এই রাজ্যাভিষেকের শেষ পরিণাম কিন্তু স্তম্ভ হইয়া নাই। এই ব্যাপারে প্রধান উত্তোলা ছিলেন শিবাজীর কায়দা মন্ত্রী চিটনীস। তিনি এই অভিষেকের কথা শুনিবামাত্র মহারাষ্ট্রে আত্মপূর্ণ বোরস্তর আগতি হুছিলেন, যেহেতু শিবাজী শূত্র—একমাত্র কত্রিই রাজ্যাভিষেকের অধিকারী। মহারাষ্ট্র পরতরামের রাজ্য, যিনি একবিংশ বার পৃথিবীকে নিঃকত্রিয়া করিয়াছিলেন। উহার রাজ্যে কত্রিই দূরের কথা বৈভববর্ণও লোপ পাইয়াছিল। শান্ত রতুনন্দন-পালিত বাংলায় হিন্দু সখাঘরের মত মহারাষ্ট্রদেশে তৎকালে আত্মপূর্ণ এবং শূত্র স্বাভাবিক তৃতীয় বর্ষের অন্তিম স্বীকৃত হইত না। পণ্ডিতগণের বিচারে শিবাজীর কত্রিইদেবের পাবি প্রমাণভাবে অগ্রাঘ্য হইল। দূর্ত কাহন্য চিটনীস সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি শিবাজীর বংশতুল্যী আবিষ্কার করিবার স্তম্ভ উদয়পুর চলিলেন, এবং এক বসিল আবিষ্কার কিংবা প্রস্তুত করিয়া কাকিধাঘের পণ্ডিতসমাজের মুখপাত্র গাণা ভাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর কত্রিইদেব দাবির বপকে ঐতিহাসিক বুদ্ধি না থাকিলেও উহার সঙ্গে ষোড়ী বকমের দক্ষিণা ছিল। শিবাজীর স্বাধঃস্বীয় ভৈরবসিংহ হইতে তৌল্লা বংশের উৎপত্তি, এই কথা বহু শিবাজী কিংবা কবি ভূষণ কেহই জানিতেন না। বাহা ইউক, গাণা ভাটের ব্যবস্থা ও অভিষেক পৌরোহিত্য করিবার সম্মতি লইয়া চিটনীস দেশে ফিরিলেন, মহাদুর্ভাগ্যে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পূর্বে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের সহিত গাণা ভাটের বিচার আরম্ভ হইল। বেশ-কোচনয় আত্মপূর্ণগণের বিরোচিত্য গাণা ভাট স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন কত্রিই হইলেও শিবাজী আচারবিহীন হইয়া ‘আতা’ হইয়াছেন স্তম্ভরাজ অভিষেকের পূর্বে বেবতা-বর্ষন এবং প্রারম্ভিক আবস্তক—সর্বপ্রথম কত্রতুল্যক পরতরামের মসিদমর্শন, পরে অস্ত্রাধ বসির; ইহার পর, আতাপ্রারম্ভিক ও মজোনবীত-গ্রহণ (২৮ বে, ১৬৭৪ ঐক্কা)। গাণা ভাট শিবাজীকে বস্ত্রহরিলেন; কিন্তু উহার পরে মস্ত্রাণ লইয়া বিবম পতঙ্গোল উপস্থিত হইল। শিবাজী দাবি করিলেন স্বীকা-বিষয়ক সমস্ত বৈধিক মস্ত্র তিনি পরিষ্কারভাবে শুনিতে পারেন এইভাবে পাঠ করিতে হইবে। আত্মপূর্ণা মনে করিয়াছিলেন শুধু ট্রাট নাড়িয়া এবং রামাকে ‘নমো নমঃ’ করিতে বলিরাই কায দাখিবেন। শিবাজী স্মিৎ ছাড়িলেন না; আত্মপূর্ণা টীংকাপ আরম্ভ করিলেন কলিযুগে কোনো প্রস্তুত কত্রিই নাই, বেবে একমাত্র আত্মপূর্ণই অধিকার। গাণা ভাট তড়বাইয়া গেলেন। তিনি ময়ে কোনোবাকন গোমাছিল দিয়া অধ্যাহতি পাইলেন; শিবাজীর পরাঘ্য হইল, বিস্তার লাভ করিয়াও আত্মপূর্ণের একথাপ নীচে রহিয়া গেলেন। আত্মপূর্ণের বস্ত্রবে পড়িলে রামারও নিস্তার নাই; শুধন শিবাজীর মানসিক অবস্থা পাণ্ডার কবলগ্রস্ত মুক্তকচ্ছ ডকেন্দ মত—বস্ত্র তর দান ও দণ্ড। মস্ত্রীকার গরের দিন জাত ও অজাত পাণ্ডের প্রারম্ভিক, স্ববর্ণাদি সপ্তদাহুর ‘তুলা-দান’। উহাতেও অধ্যাহতি নাই। দুইজন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন, দুট করিবার এবং লহর পোড়াইবার সময় হুদত গো-আত্মপূর্ণ নারী-পিত্ত বধের অনিচ্ছাকৃত পাণ শিবাজী নিকটই করিয়াছেন; ইহার স্তম্ভ ‘দণ্ডদান’ আবস্তক। শিবাজীর মাত্র আট হাজার টাকা ‘দণ্ড’ সাব্যস্ত হইল। পোক বারিহা স্তম্ভদান করিলে পাণমুক্ত হওয়া যায়, মহারাষ্ট্রীয় আত্মপূর্ণগণের ইহাই বেন অস্থান। শিবাজী এই ‘দণ্ড’ বিপ্র-সাত করিয়া নিকৃতি পাইলেন। এইভাবে মহারাষ্ট্রে ‘দণ্ড’প্রচারিত একতা ও সাম্য আত্মপূর্ণার্থের প্রতিক্রিয়ার স্রোতে ভাসিয়া গেল। এই প্রতিক্রিয়ার ভরা মোয়ার বেধা গিয়াছিল পেশবা ক্যালীন মহারাষ্ট্র সখাঘর এবং দূর্ধ্ব।

ছত্রপতি শিবাজী আত্মপূর্ণগণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কথকিং প্রতিক্রিয়া লইয়াছিলেন। তিনি

ঘোষণা করিলেন, ত্রাশ্বপেরা শাস্ত্রচর্চা এবং পুস্তা-অর্থনাই করিবেন. 'হাম-সেবা' ত্রাশ্বপের ধর্ম নহে। এই ওজ্জ্বলত্রে তিনি শাসন ও সেনাবিভাগের উচ্চপদ হইতে ত্রাশ্বপগণকে অপসারিত করিয়া 'প্রত্ন' (কাছ) নিযুক্ত করিলেন; ত্রাশ্বপ-সময়ে হাফাকার পড়িয়া গেল। যোয়ো পত্ত হুহুয়েত অনেক কাহুতি-মিনতি করিয়া শিবাজীর ক্রোধ শান্ত করিলেন; কিন্তু ত্রাশ্বপ-মারাঠা বিবাদ ছুটিল না। এই সর্বনাশা বিবাদ বিংশ-শতাব্দীতেও শান্ত না হইয়া বহু উৎকট হইয়াছে।

ছত্রপতি শিবাজী দরবারে মুসলমান দরবারী পোশাক নিষিদ্ধ করিয়া খুঁটি-চাবর প্রবর্তন করেন নাই। ধর্ম প্রতিষ্ঠার হাশ তিনি শক্তভাবে টানিয়া না রাখিলে ত্রাশ্বপেরা মহাশয়িত বর্ষ ও সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের ক্ষত্র পেশবা বালাজী বাজীরাও-র সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিত না।

৯

প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধারান যাদুকে প্রথম দাক্ষ্য সনাতন-পুরাতনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই ক্ষত্রই স্থনিয়ন্ত্রিত না হইলে প্রতিক্রিয়া উচ্চতির পরিণতী হইয়া থাকে, অনুস্থান অধঃপতনের কারণ হইয়া পড়ে। প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি সামান্ত লক্ষণ আছে, যথা, পুস্তাতনকে কিয়দ্বিহা আনিবার উদ্ভাটনা, প্রতিস্থিৎসার মনোভাব, গরের ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি স্থপার ভাব, ক্ষুদ্র আস্থাত্তিবান। এই প্রতিক্রিয়া বায়ু প্রকাশের ত্রাষ ভাতির সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাইয়া থাকে : যথা, বঙ্গালী অধীনতামুক্ত ইটালীয়গণ নেপোলিয়ন-কর্তৃক আনীত ফ্রান্সী প্যাসালা উত্তান হইতে উৎপটন করিয়া মুক্তি-উৎসব উদ্ভাটন। হালে, স্বাধীনতা লাভের পর বেশ দাগলের হাতে পড়িলে বিভ্রমবদী হিন্দুগণ হুত চোগা-চাপকান কোট-পাতশূর ছিঁড়িয়া কেদিত, চেয়ার টেবিল ভাঙিত।

মারাঠা ভাতির পুনরুদ্ধারানের এবং ত্রাশ্বপাশ্বর্ষের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সামান্ত লক্ষণের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, ইহার কারণ শিবাজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ছত্রপতি শিবাজীর সর্বাশেক্ষা বড় গুণ ছিল মাজাজান, যথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কিংবা ভাতির কর্ণধারগণ প্রায়শ হারাইয়া ফেলেন। তিনি যদি 'শ্রেষ্ঠ-নিবন্ধ-নিধনে গুত করবাল' বকী অবতার সাজিয়া গোলকুণ্ড-বিভাপুর মুসলমানপুত্র করিবার উদ্ভব করিতেন, উহার পরিণাম কি হইত না বলাই ভালো। আফমল ধার ভবানী-স্থির-কংগের যে ব্যাভাবিক প্রতিক্রিয়া মারাঠাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল শিবাজী উহা যারা বিচলিত হইয়া মসজিদ ধ্বংস করিতে থাকিলে পরিণাম গুত হইত না; উহার অপর্যাপ্তি আওরঙ্গজেবের মত পরধর্ম-নির্ধাতনের দ্বারা কন্মুচিত হয় নাই। মহারাষ্ট্র সম্রাটের মনের তিক্ততা এবং প্রতিস্থিৎসাত্তিকে ছত্রপতি শিবাজী হুৎকোপনে গঠন-মূলক কার্যের বাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। স্বাধীন হিন্দুগণের অস্ত্রাঘরে ইসলাম বিপন্ন, মুসলমান-প্রাধাত্ত রাষ্ট্রমন্ত্র—মুসলমানের এই আততায়নিত প্রতিক্রিয়াকে শিবাজী তাঁহার বিকৃতে কেন্দ্রীভূত হইতে সেন নাই; মাসিক অম্বরের মত তিনি ধোপলগাম্বাচার বিকৃতে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মুসলমানের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বের সৌর্য লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহা শিবাজীর অকৃত্তম প্রাণন কৃত্তিব।

তাঁহার রাক্ষবে হিন্দু-প্রতিক্রিয়া অকৃৎসে পত্রিচ্ছট হইয়াছিল। সেই হুংগ হিন্দুর মনে স্বাধীনতা, ত্রাশ্বপাশ্বর্ষ এবং সংস্কৃতভাষা এক সূত্রে প্রবিত ছিল। ইহার প্রথম উদ্যোগ অষ্ট-প্রধানের শুভি—ফারশি পদবী পরিত্যাগ এবং প্রাচীন ভারতীয় 'গতিব' 'অমাত্য' 'মন্ত্রী' ইত্যাদি উপাধির প্রবর্তন; ঐ একই

মনস্বয় ভারতবর্ষে বর্তমানে 'রাজ্যশাল' 'রাষ্ট্রশাল' স্রষ্টা করিয়াছেন। মারাত্মি ভাষাকে আরবী-কারশি বর্জিত করিয়া 'বিশুদ্ধ' করিবার আন্দোলন শিবাজীর সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল। মারাত্মি ভাষায় তখন শাসনপঞ্জীকায় বিষয়ে ব্যবহার-উপযোগী শব্দ অতি কম ছিল; অথচ ধর্মবাহ, শাসন-ব্যবস্থা, পোশাক সবই মূলধারায়। একালের মত সেকালেও সংস্কৃত বাতীত শব্দসম্পদ বৃদ্ধির অস্ত্র তাহার ছিল না; ছত্রপতি শিবাজী সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার আমোদে অমাত্য বসুনাথপন্থ হুহুযন্তে সংস্কৃত ভাষায় তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত আরবী-কারশি-হিন্দুস্থানী শব্দের এক পরিভাষা লিখিয়াছিলেন— নাম 'রাস্তাব্যবহারকোশঃ'। গীহার দ্বিতীয় পরিভাষা সংকলনে নিবৃত্ত আছেন, এই পুস্তক তাঁহাদের কার্যে প্রব্র লায়ব করিবে। একটি উদাহরণ—

ধূমপান: জড়ভরী তথ্যঃ পুশস্বক্

আবোশহার-পাত্রঃ কৃ তবকন্' পরিবীর্জিতঃ।

ভাষার উপর অবদানশীল চলে না। চেষ্টা করিয়া কোনো ভাষায় শব্দ-বিতাড়ন সম্ভব হইলে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে হিন্দু বংশাধিকারিক 'গোতদার' 'বজ্রনর' পদবী থাকিত না; 'পেশবা' চিরকাল সোকেস হুবে 'পেশবা' রহিয়া গেল, 'শম্ভুপ্রধান' শুধু কাগজপত্রে। হাং হউক শিবাজীর সময় হইতে ভাষার যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল এমনকাল মার্জিত বিশুদ্ধ এবং সংস্কৃতবহুল মারাত্মি ভাষা উহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

মহারাজাষ্ট্র-স্বাধীনতায মহিলার দান কম নহে। শিবাজীর মাতামহ নিজামশাহ কর্তৃক প্রকৃত্তে নিহৃত্তভাবে নিহত হইয়াছিলেন; শিবাজীর 'স্বরাজ্য' প্রতিষ্ঠা পোকসমস্ত মাতামহ প্রতিহিংসা-তর্পণ। জীঝাবাই কান্টনের মূলদান ধর্ম্যে দীক্ষিত পরাক্রান্ত নিমলকার পরিবারের শুভিবাবস্থা করিয়া উহার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। শিবাজীর রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার দক্ষিণস্থ বরুণ সেনাপতি নেভারী পল্কার (Palkar) আগ্রহস্বয়ে কর্তৃক মূলদান ধর্ম্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; পরে অতৃপ্ত হইয়া তিনি জীঝাবাইর আশ্রয় চিচ্চ করেন। জীঝাবাই নেভারীর শুভি সম্পাদন করিয়া সবাত্রে গ্রহণ করেন। এইরূপ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং নৈতিক সংসাহসের দৃষ্টান্ত হিন্দু-ইতিহাসে বিদ্য। জীঝাবাই হাং করিয়াছিলেন শুচিবাহুগ্রন্থ পেশবাগণের উহা করিবার সাহস হয় নাই। তাঁহার দৃষ্টান্তে এইরূপ শুভি অন্ন-বিত্ত চলিয়াছিল।

ছত্রপতি শিবাজী তাঁহার সমগামিক হিন্দুস্বাণুভিদ্ধ ঐতিহাসিক 'প্রতিক্রিয়া'র সন্ধান; তিনিই আবার ধূমপাত্র, ভারতবাসী এক বৃহত্তর প্রতিক্রিয়ার মূল উৎস। তাঁহার প্রেরণায় ছত্রপাল ধূমেশা ধূমেশধেও হিন্দু-স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। মরোভাঙশক্তি মহারাজা ধূমেশবন্ত সিংহ শিবাজীর বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিতে আদিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারই গোপন সহায়তায় শিবাজী পুণা-দুর্গ অধিকার করেন। ইংরাজশাসকের গকে নিছক বিবাসবাভকতা নয়, বিবেকের ধংসন। এই বিবেকবুদ্ধি শিবাজীর আদর্শই আগাইয়া তুলিয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যবধান দূতাইয়া ভাং, প্রেরণা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া আর্গ্যবতে' যে স্বাধীনতার সম্মেশ প্রেরিত হইয়াছিল, সেই 'প্রতিক্রিয়া'র প্রতীক শিবাজী। তাঁহার দূরদৃষ্টি মারাঠার হিন্দুধর্ম-পাত্যসাহার-র প্রথম স্বপ্ন দেখিয়াছিল। হিন্দুধর্মকে বন্ধনমুক্ত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; কিন্তু যে বুদ্ধাভরী মারাঠা জাতি তিনি স্রষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জাতি অধঃপতাবী কাল মধ্যে তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়াছিল।

বাংলার বাউল

শ্রীকৃতিমোহন সেন

৩

বৈদিক যুগ ও মধ্যযুগের সাধকদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যুগে যুগে নানা সাধনার মরহী-বাণী দেখা গিয়াছে। এইবার বাংলার বাউলদের আপন কথা বলা যাইতে পারে। বাউলদের ভাবের ও সাধনার পুরাতন স্বরূপের কথা আগেও কিছু কিছু বলা হইয়াছে, এইবার বাউলদের নিঃস্ব স্ব কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। সকলেই জানেন, বাউলেরা শাস্ত্রাচার ও লোকাত্মার মানেন না, মানেন শুধু বাহ্যবৈ মর্যাদা। পণ্ডিতেরা সত্য খোঁজেন গ্রন্থের মধ্যে, বাউলেরা খোঁজেন বাস্তবের মধ্যে। তাঁহারা 'মনবদমণী' পতিত রাখেন না।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের' মধ্যে স্বর্গীয় মন্মথকুমার দত্ত মহাশয় এই প্রেরণ ও রাগের সন্ধানে দ্বাদশ-পাণ্ডা কতকগুলি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানী দুই সম্প্রদায়ের ভাবই আছে। বাউলিয়া মধ্যে এই দুইই আছে মথ্য ভাষা এই দুই হইতেই স্বতন্ত্র। অধিকাংশ বাউলই নিরাকার মুসলমান বা হিন্দু নিরাকার লোক। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে প্রেরিত এই কয়টি মধ্যে মুসলমানী বাহ্যরূপ ও প্রকাশভঙ্গি একটু স্পষ্টতর ভাবে দেখা যায় বরবেষ্ট (প্রথম ভাগ, ১৮৭ পৃ) মধ্যে। ইহারা উপাসনা হইলেও প্রকৃতি রাখেন। বরবেষ্টেরা বিগ্রহ-সেবা করেন না। তাঁহাদের ডেব ও ভাষা অনেকটা মুসলমানী ভাবে। তাঁহারা ব্রত উপবাসও করেন না।

গাই (প্রথম, ১৮২ পৃ) সম্প্রদায়ও প্রায় সেইরূপই। সামান্য আচারে গাইরা আরও বেশি পরিমাণে মুসলমানী ভাব মানেন। 'জৈব-ভাব'ও ইহারা বেশি মুসলমানী।

খুশি-বিদ্যালী (ঐ, ২০৪ পৃ) সাধনা মুসলমানের প্রেরিত হইলেও তাহা চৈতন্যমতের সঙ্গে বেশি মিলে। চৈতন্যমতের নিকটে দেবপ্রানের কাছে ভাগ্যপ্রাণে এই সম্প্রদায়ের মূল স্থান।

চৈতন্যমত ভক্তিপন্থী, কার্যেই শাস্ত্রাত্মক হইতে অনেকটা মুক্ত। চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বীরভদ্র নাকি আরও বেশি দ্বাদশ ও 'প্রেরামুগ্য' সাধনা প্রেরিত করেন। তাহারা ক্রমবিকাশে গোবিন্দাচার্য রামানন্দ পাশ কর্তৃক সম্প্রদায় (ঐ, ১৮৬ পৃ) প্রেরিত করেন। এই মতের আদিত্য আউলচাঁদ। আউলচাঁদের মতকে রামানন্দই ভালো করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে আউলচাঁদ স্বয়ংগত করেন। তাঁহার বাইশ জন শিষ্য, সবাই নিরাকার। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন রামানন্দ। পরে অনেক ভক্তলোকও রামানন্দের শিষ্য হইলেন। ইহাদের সম্প্রদায়কে কর্তৃত্বা বলে। ইহারা ভক্তি-পণ্ডিত-সম্প্রদায়-ভেদ মানেন না। ইহারা মনে করেন আউলচাঁদ চৈতন্যমত-প্রবর্তক অবতার। হিন্দা লোভ ও কাঞ্চকে ইহারা নৈতিক পাশ মনে করেন। মন বাক্য ও কার্যে এইসব দুর্নীতি পরিহার করা চাই। নীতিভক্তি হইলেই প্রেমের পথ মুক্ত হয়। তখন প্রেমই সাধককে পথ দেখায়।

সহজ-কর্তৃত্ব বা আউল নামেও এক সম্প্রদায় আছে (ঐ, ২০৪ পৃ)। আর একদল লোক কর্তৃত্বা

সম্রাট হইতে বিজয় হইয়া ঐশ্বর্য্যশ্রীতে রামবল্লভী সম্রাট (ঐ, ২০১ পৃ) স্থাপন করেন। ইহার। সর্ব্বদেব শাস্ত্রকে সন্মান দাখ্য বলিয়া বানেন। ইহাদের সাধনাবেদিস নাম সত্য। সাধনাবেদিস কাছে থাকিলে ইহার। সমাজবিধান অবীকার করেন।

কৃষ্ণনগর জেলায় যোগাছিয়া শালিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এক উদাসীন-সাধক-প্রবর্তিত সাহেবদনী সম্রাট (ঐ, ২০২ পৃ) চলে। ইহার। বিগ্রহ বানেন না। গুরু আসনকে সমুখে রাখিয়া ইহার। উপাসনা করেন। কৃষ্ণাভিব্যাস ইহাদের সমবেত উপাসনার দিন।

বলরামী সম্রাটের (২১৮ পৃ) গুরু নাম বলরাম। তিনি জাতিতে হাড়ি। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে নালোপাড়ার তাঁহার জন্ম হয়। বলরামকে শ্রীহরের অবতার মনে করা হয়। তাঁহার মতে বিশ্বব্রহ্মাও হইল ভগবানের শরীর। ইহার। জাতিভেদ মানেন না। ইহার। বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন এবং বিস্তৃত নৈতিকনীতি প্রচার করেন। শাস্ত্র বা বিগ্রহ ইহার। বানেন না।

ভাড়া সম্রাটের (১৭৭ পৃ) প্রবর্তক নাকি নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র। ঢাকা ও বীরভূম জেলায় ইহাদের স্থান আছে। বাউলদের মত ইহাদেরও প্রকৃতিসাধনা আছে। ইহার।ও বিগ্রহ বানেন না এবং কায়াকর্ষণ করেন না। ইহার। কায়যোগ সাধনাও করেন। বাহু ভেঙ্গে বৈষ্ণবদের সঙ্গে ইহাদের কিছু মিল আছে। ককিলের মত ক্ষটিকমালাও ইহার। ধারণ করেন ও ককিলী আলখালা পরিধান করেন। ভাড়ার। হরিবোল ও বীর-অবধূত ঘোষণা যেন। ইহাদের আলখালা নানা বর্ণের বস্ত্রও প্রস্তুত। তুলি লাঠি ও কিণ্ডী (পরিধাই নারিকেল) লইয়া ইহার। ভিক্ষা করেন ও মাথায় টুপি পরেন।

সতী মতে (১৮৮ পৃ) গুরুই শ্রীকৃষ্ণ। শিলায়া রাখিকা। গুরু বিবি। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। সহস্রীমতে নাম-ময়-ভাব-গ্রেম-রস এই পঞ্চবিধ আশ্রয়। গ্রেম ও রসের আশ্রয়ই হইল প্রধান পন্থা।

জগমোহনী (২১০ পৃ) সম্রাটের বিষয়ে অক্ষরবান্ধু খুব বেশি খবর দিতে পারেন নাই। শ্রীহট্টের ইতিহাসে প্রদেয় অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও বৈষ্ণবনাথ যে ইহাদের অনেক খবর বিবরণে দেন।

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে বাঘাওয়া গ্রামে জগমোহনের জন্ম হয়। ইহাদের আদিস্থান মাছুপিয়া, দ্বিতীয় স্থান জলহা, তৃতীয় স্থান বিখল, চতুর্থ স্থান ঢাকা করিবাবাদ। ইহাদের আরও আটটি ঘর আছে। জগমোহনের গুরু নাম মুরারি। তিনি ছিলেন রামানন্দের ধারার। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রাবীণে জগমোহনের জন্ম। শ্রীহট্ট জেলায় এই ঘরের প্রচার চলে।

ইহার। বিগ্রহ বানেন না, গুরু বানেন। ইহার। তুলসী ও গোময়কে পবিত্র মনে করেন না। নরসেনাক্রম এবং ব্রহ্মচর্য ইহার। পালন করেন। লোকের সেবাই ইহাদের ধর্ম। জগমোহনী সম্রাটের শাস্ত্র (গত) গোঁসাইয়ের শিষ্য রামকৃষ্ণ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই জগমোহনী সম্রাটকে হুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্র (গত) গোঁসাই হইতে রামকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে নাবীশূণ্ডির রামকৃষ্ণ সেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ গুরুর আখ্যায় নানা তীর্থে সাধু-সন্তদের পরশনে বাহির হন। তাহাতে তত্ক্ষণাৎ কপালানন্দ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। কপালের কপাল তখনকার তীর্থেযানের অনেক কথা জানা যায়। তখনকার দিনের বহু স্থানের বিবরণ কপাল রাখিয়া রাখিছেন। এই সম্রাটের কবীর দাস ও লবনী দাস প্রভৃতির লেখাতেও সেই যুগের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

কুলহারা নদীতীরে বিখ্যাত স্থানটি দেখিয়া রামকৃষ্ণ মুগ্ধ হন। বিশাল নদী এবং সীমাহীন প্রান্তরের কাছেই বাউলিয়া মতের বেশি প্রভাব দেখা যায়। বিখ্যাত অলমহাশয়ের তিনি অংশে আনেন ও কহ আলিককে দীক্ষা দেন। পরে চারিদিকে ঘুরে বিগত দুর্গতমের রক্ষা করাও তাঁহারের ধর্ম হয়। ইহাদের নির্বাণ সংস্কৃত অসীম অশার পরব্রহ্মেরই মহিমাকীর্তন।

জগন্মোহন ও রামকৃষ্ণের সাধনার ঐক্য এক সাধনাত্মকিতে পরিণত হয়। পরে রত্নিনগরে ভোলাশাহ কল্পগ্রন্থ করিয়া এই ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহার সাধনা রাখিয়া গান। করণেশ্বর অন্তর্গত মন্দির এনে রমজান মওল বাউলিয়া মতের সাক্ষক ছিলেন। খোশা জাতীয় রাখালশাহ বাউল-সাধনার সিদ্ধ হইয়া শাহ উপাধি লাভ করেন। হুসমানদীর তীরে কানাইঘাটে তাঁহার স্থান ছিল। জগন্মোহনের সাধনার সঙ্গে ইহাদের যোগ আছে বলিয়া ইহাদের নাম করা গেল।

বাউলিয়া মতের তত্ত্ব বা ধর্মের বিকৃতি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'Philosophy of Our People' এবং 'The Religion of Man' (Hibbert Lectures) চমৎকার বলিয়াছেন। সেগুলির পুনরুৎপাদন নিঃসন্দেহ। তাহা ছাড়া বাউলিয়ার মত বিধি আদর্শ-কিন্তু বাহ্য বলিলে ভালো হয় তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' আছে (১৭১ পৃ) বাউলমতের আদিগুরু মহাপ্রভু চৈতন্য। কিন্তু মহাপ্রভুর বহু পুত্রই বাউলিয়া মত ও বাউল নাম পাই। বাউল মতে মেহেই সর্ব বিশ্ব অবস্থিত। বিশ্বনাথ এই মেহমন্দিরের দেবতা। তাই কথা আছে—

যা আছে তাও

তা আছে ত্রাতাও।

সর্বভীষ সর্বসাধনা এই মেহেরই মধ্যে। এই পথের পথিক লোকসমাজে লোকধর্মকে মানিলেও অন্তরে তাহা মানেন না।

লোকমুখে লোকচার

সদৃশমুখে একাচার।

ইহার দ্বিমুখ-মূলমন্ত্র দুই সম্প্রদায়েরই বেশবাস পরিধান করেন। কুলি লাঠি ও কিশুড়ী (ঘরিয়াই নারিকেলের তিক্কাশাও) লইয়া বাউলগণ বাহির হন ও সর্বক্ষেপ রক্ষা করেন। বিগ্রহ ইহার মানেন না বা উপবাস ত্রতাদি করেন না এবং পূজাপাদি শাস্ত্রও মানেন না। সেহতমের গান ইহার করেন। ইহাদের মেহসাধনার চারি চক্র ভেদ 'অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং তাহা অতি বীতম্ম'। তাঁহার বলেন—

কারে বোলবো কে করবে বা প্রভা।

আছে এই বাহুয়ে সত্য সত্য জিন্দগন্য।

কিন্তু এই চারি চক্র ভেদও তো কারিক ব্যাপার। তাহা হইতেও উচ্চতর ভাবসাধনা ওয়ালা বাউলও আছেন। বাউলমতের মেহমতের পানের কিছু নদুনীও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে আছে। যথা—

১.

লক্ষ বাহুয়ে আলেকলতা।

আলেক বিদ্যায় করে,

বাহিরে খুঁজলে পাবি কোথা।

আলেকের প্রেমের কোলে পেতেছে বাক্য নলে
 ত্রিবেদীর দল উজ্জল চলে, বহিষে নর্যনা ।
 আগনি চলে নলের পাশে, সে নল কেউ নাহি চিন্তে
 জনতে করে তিনে চিন্তাধনি চিন্তাধাতা ।
 আলেক দুনিয়ায় বীজে, আলেক স্নাই বিহাতে
 আলেক দিতে ধন, আলেক কর কর্ণা ।
 আলেক গাহে দুল ফুটরে, সৌরভ জনং মেতরে
 আলেক হয় গানের গোড়া, ভাল ধাঁড়া তার আছে পাড়া ।
 আলেক বাহুরের দল, সবাতনে লতা তালে,
 খাউল জোর লাগলে বিশে, বেতে নারবি তথা ।
 তুমি সবাই বেড়াও রিপূর গারে
 বাহুর চিনি কেমন করে,
 বেশনে ধরবে তোরে, হুগুর দিতে হেঁচবে বাণা ।
 • অঙ্গপেতে দল নেহার করি, বাস কর্ণে ধরি,
 দস্তানবন্ধে দ্বিতল করি, মনলে ছেপেছে পায়ে ।
 গোলাই দ্বক চাঁদে কলে, ছুব বাক মন লিখুকলে,
 (কিছ) সে কলে গল হলে, শুকনোও ছুবদি ভরা ।

জাড়া সহস্রিধা কর্তৃত্বা প্রকৃতি সবাই আপনাদের বাউল বলেন । আবার বাউলদের মধ্যেও বহু ভাগ-বিভাগ আছে । তাঁহাদের সবারই আদি বীরভদ্র বা চৈতন্যমহাপ্রভু বলা চলে না । নানা আকারে বাউলমতের অনুরূপ সাধনার ধারা এ দেশে যে চলিয়া আসিতেছে তাহা পূর্ব ও পশ্চিমে গিয়াছে । মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গীরা অনেক সময় বাউল বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিয়াছেন । কারণই বৃদ্ধা দায়, বাউলদের তাঁহারাও জানিতেন ।

বাউলদের বাহিরেও বহু মত এবং সাধনা বাউলিয়া মতের আছে । তাঁহাদের বাগ্মিতে গানে ও রচনায় তাহা দেখা যায় । আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল অনেক আছেন । বাউল ভাব হইল অন্তরের সত্য । বাহিরের এই ভাগ-বিভাগে ইহার পরিচয় বেওয়া চলে না ।

বাউলিয়া প্রেমভবের পরিচয় চাহিতে গেলে একবার এক বাউল সাধু বলিয়াছিলেন, “এইমব ব্যাকরণ ও পরম হইল বাহুগরীসের, আবারের ক্ষেত্রে ইহা চলিবে কেন ?” তিনি তাই গান করিয়াছিলেন—

হুলের মনে কে হুলেছে যে সোনার মহরী
 নিকরে বসনে কবল আঁরি ঘরি ঘরি ।

মিশনারীরা যেমন ভারতীয় ধর্মের মহমততা বুঝেনও নাই এবং বুঝাইতে ও পারেন নাই, তেমনি গ্রন্থাঙ্গরী পণ্ডিতের দল ঠিক বাউলিয়া ভাব ও ধর্ম ধরিতেও পারেন নাই এবং তাহার পরিচয়ও দিতে পারেন নাই । বাহুরা নিগ্রহ তাঁহাদের পরিচয় গ্রহে কেমন করিয়া মিলিবে । এরা বাউলেরাই নিজেদের পরিচয় গ্রহে রাখিয়া গিয়াছেন । কিন্তু আসল বাউলের পরিচয় গ্রহে হুর্লভ ।

তাহা হইলেও শ্রীমুক্ত মণিগ্রন্থবোহন বহু তাঁহার *Post-Chaitanya Sahajiya Culi of Bengal*

এষে দেশে পরিচয় নানা পুঁথিতে পাইয়াছেন তাহা বহু দূরে সাঝাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১২৩০ সালে তাহা বাহির হয়। সহস্র মতের গ্রন্থসভা পরিচয়ের ক্ষুদ্র এই গ্রন্থখানি সকলকে গড়িতে বলি, ইহাতে বহু ধরন মিলিবে।

আঙ্গল বাউলেরা নিরক্ষর। পুঁথির ধার তাঁহারা ধারেন না। শিকারাবাসায় আমরা তো পুঁথিই পড়ি, তাই আমরা পুঁথি-আশ্রয়ী; পুঁথিতে পাইলেই আমাদের সুবিধা হয়। তাহাতে 'পুঁথি' সহস্রবিধের অনেক কথা জানা গেলেন ও 'অপুঁথি'দের মহান পাণ্ডা কঠিন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পুঁথি যেথায় ও অনেক কিছু ধরন বেলে। আবার পুঁথির বাহিরের ধরন খোঁজ করিতে হইলে মাহুদের সন্ধানই করিতে হয়।

সহস্রবিধ ও বাউল মত অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরে দৃঢ়। তবে এইসব গ্রন্থে সহস্রবিধের কথা জানিতে সবাই চাহিবেন। কিন্তু এইসব সহস্রবিধের পথ বিভক্ত বাউলদের অনেকের মতে নীতিবিগর্হিত। উচ্চভাষ্যের বাউলেরা লোকাচার বেদাচার না মানিলেও মানব-নীতি বানেন।

বাউলিয়া মতেও জীব ব্রহ্মরূপ। ইহা উপনিষদে বেদান্তেও পাই। বেদান্তজ্ঞান বিনা এই জীব ব্রহ্ম থাকে, জ্ঞান হইলেই মূঢ় হয়।

বাউলিয়া সাধক ধর্মের সুখ চাহেন না, চাহেন মুক্তির পরমানন্দ। বাউলেরা বলেন, মুক্তি হইল প্রেমের চিত্র প্রকাশ। এই মুক্তি লাভ করিলে ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য সাধক আপনিই পায়, যদিও কিছুই পাইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। বাউলেরা মাহুবই জ্ঞানেন, আর চাহেন প্রেমেরই মুক্তি। তাঁহাদের মতে ধর্মের অন্তরের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমবস্ত্র মহত্তর। তাই প্রেমাত্মকপ্রার্থী দেবতারও পৃথিবীতে জরিয়া মাহুব হইতে চান—

প্রেম আবার পরমপদি তারে হুইলে যে কাম হয় রে দেখ।

তাই খোলোক চার যে কুলোক হতে মাহুব হৈতে চার যে দেখ।

আমাদের প্রেম সীমাবদ্ধ। ভগবৎপ্রেম বিশ্বব্যাপী। আমাদের প্রেম বধন বিশ্বব্যাপী হইবে শুধুই প্রেম হইবে শুদ্ধ ও তাগবত। শুধু সাধকও ভগবানের নতই প্রেমেরই হইয়া যাইবেন।

জ্ঞান হইতে প্রেম মহত্তর। তাই শুদ্ধ জ্ঞানে ও কর্মে মাতিয়া নারী-বর্জনে লাভ কি? চাই প্রেম। প্রেমহীন শুণু নর বা নারী তো সত্যের আংশিক প্রকাশ নাই। প্রেমে দৃঢ় হইলেই নরনারী পূর্ণরূপ হইতে পারে। তবে কবে সেই যোগ ঘটে না। বুদ্ধিকৃত কার অস্ত্রকে গ্রাস করিতে চায়।

এক অস্ত্রকে গ্রাস করিলে আর যোগ হইল কৈ? এক অস্ত্রকে যে বিভক্ত প্রেমে পরিপূরণ করিলে তাহা কামের স্রোতের কথা নহে। তাহার অস্ত্র চাই নরনারী উভয়েরই অস্ত্রের দৃঢ় ভাব। এই দৃঢ়ভাব সমাজের বাহু বিধিতে খেলেন না, তাই বিধিবার্গে বাউলিয়াদের আস্থা নাই। লোকাচার বা শাস্ত্রাচার কিছুই এই পথে কোনো সাহায্য করিতে অক্ষম।

বেদশাস্ত্র হইতে প্রেম মহত্তর। বেদের পরোক্ষা বালাপেশ কমই করিয়াছে। তাই বাংলার পণ্ডিতের বাণীতেও দেখি, সর্বজনকর্তৃত্ব বেদবাণী তো বেদ্যের নহে—

কহে কেন বুড়া কপ: ন হুতু কাম বেদ্যদেব এতি:।

— হলায়ুধের ব্রাহ্মণধর্ম। উপনিষদিকা

শাস্ত্রের চেয়ে বাউলের নিঃশব্দ মরনকথা মহত্তর। প্রাণহীন শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম হইতে মানবীয় প্রেম অনেক বেশি সত্য।

বাউল-মতে তীর্থ-ব্রত কিগ্রহ-মন্দির বাগবজ-উপবাস কিছুতেই কিছু হয় না। কাহারো ক্রেশ দিয়াও লাভ নাই; বরং কাহারো শ্রদ্ধা করিলেই সর্বলভ্যের সাক্ষাৎ মেলে। কাহার তব অঙ্কভরে সন্ধান করিতে হয়।

সমাজের নিরনে মরনাত্মী পরম্পরকে আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু কেহ কাহারও 'মর্ম' জানি না। কাজেই সমাজবিধি মানিয়া লাভ নাই। মরনাত্মীর বন্ধনের মধ্যে প্রেমের অধ্যাত্মযোগ ছাড়া আর কোনো বন্ধন থাকিলে তাহা সত্য নহে। সেই অধ্যাত্মযোগেরই প্রকাশ হইল আমাদের প্রেমে।

অধ্যাত্ম সত্যের দীক্ষা মিলিতে পারে সঙ্কটকর কাছে। কিন্তু শুভ তো একজন নহেন। চিরদিনই বত জনই বতভাবে আমাদের চেষ্টনা বেন তত জনই শুভ। এক দিনে তো জীবনের দীক্ষা সমাপ্ত হয় না; দিনের পর দিন দীক্ষা চলে। দিনের পর দিন যেমন জীবন অগ্রসর হয় তেমনি দীক্ষাও অগ্রসর হয়। জন্মও চিরন্তন দীক্ষা, তাহা একদিনে সিদ্ধ হয় নাই। অধর্ববেদ বলেন, দিনের পর দিন তোমার জন্মদীক্ষা অগ্রসর হউক—

নরো নরো জপি জামান।

উচ্চসরের বাউলেরা বলেন, জীবনের সার অমৃত হইল তাহার প্রেম ও প্রেমের ব্যাকুলতা। প্রেম কোনো ভক্তবাদ নহে। তাহারই বাহু (physical) পথ হইল কায়লাখন। চারিদিকের জেলে প্রকৃতি মূল কার্যলাখনও সেই চিরম পথ নহে। আসলে আপনার মধ্যে বিশ্বের পরিচয় এবং যোগও এক চিরম ব্যাপার। ইহাকে বাহু রূপে পরিণত করিতে গেলেই বিপদ। চারিদিকের চেহ হইল তবের ও যোগশাস্ত্রের দাসত্ব। তাহাতে অমুদ্রাগ-পথের কি আছে?

ধ্বন সত্য পথ পাওরা ঘাইবে তখন সর্ব জ্ঞান সর্ব সম্প্রদায়কে ডাক দিতে পারা যাইবে। তখন হিন্দু-মুসলমান কাহারও কোনো বাধা থাকিবে না। ভক্তি স্নেহ প্রেম অমুদ্রাগ তো সবাই বুঝে। ইহা তো সার বা সোকাচারের পথ নয়, তাই সকল সম্প্রদায়কেই বাউলেরা গ্রহণ করেন। এই পথে হিন্দুর শিষ্য মুসলমান ও মুসলমানের শিষ্য হিন্দু বিত্তর আছেন। এগার ইহারা মনেন না। কুণে বতকণ মল না এঠে তখন বুঝা অমুদ্রকে ভাঙ্গাতাকি করিয়া লাভ কি? মল ধ্বন উঠিবে তখন সেই মলই সকলকে ডাক দিয়া আনিবে।

চৈতন্যচরিতামৃত ভক্তিকে বৈধী ও রাগানুগা এই দুই ভাগ করিয়াছেন (মধ্য, ২২ অধ্যায়)। ভক্তির এইরূপ শাস্ত্রীয় ভাগও 'মূলের বনে অহরী'র পরধের মত। প্রেমের ক্ষেত্রেও বরবধু সখে বা মধ্যে আর কেহ ব্যবধান ইহা থাকিতে পারে না। বাসরঘরে সখীদেরও প্রবেশ নাই।

নরী যেমন তিন রূপ : প্রথম হইল পর্বতে পার্বতী, দ্বিতীয় হইল সমতলে গঙ্গা, তৃতীয় হইল সাগরে সন্মিলিতা; তেমনি শাশনার প্রথমে প্রবর্ত, দ্বিতীয়ে সাধক, তৃতীয়ে সিদ্ধ। ইহাষের আশ্রয়ও ত্রিবিধ : প্রথম অবস্থায় নান-সম, দ্বিতীয় অবস্থায় ভাব-প্রেম, তৃতীয় অবস্থায় মূক্ত রূপ।

ভক্তিকে বুঝাইতে গিয়া ভারতীয় সাধনা যে পথ ধরিয়াছেন তাহাতে অতিশয় সাহসের পরিচয় পাই। ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার কোনো না কোনো স্বরূপ তো মনের মধ্যে আসা চাই। তাঁহাকে আমরা কখনো গ্রহু ভাবে, কখনো শিতাবাতা ভাবে, কখনো বদ্ধ ভাবে বা শ্রিষ ভাবে বৃত্তিতে পারি।

মানবীকরণ বা Anthropomorphism বলিয়া পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইলেও তাঁহারা সাহসের সহিত বলিবেন, এইসব মানবীয় ভাবে ছাড়া তাহাকে আর ভাবিব কোন ভাবে ?

ভগবানের হৃদতো অনন্ত ঐশ্বর্য ও স্বরূপ । কিন্তু আমাদের তো পাঁচটি মাত্র ইন্দ্রিয় । তাই হয় তাহাকে চক্ষু দিয়া, না হয় কর্ণ দিয়া, নয় তো নাসা দিয়া, নয় তোঃ স্পর্শ দিয়া, নহিলে রসনা দিয়া নানাভাবে তাহাকে পাইতে হয় । রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-রূপে ছাড়া আর তো অহুত্বের কোনো পথ নাই । ভগবানকেও ঠিক তেমনিই শাস্ত্র দান্ত লম্বা ব্যাংসলা মধুর এই পথ ভাবে ছাড়া পাই কেমনে ? মানবীকরণ বা Anthropomorphism-এর ভয় না করিয়া এই কথা ভারতীয় সাধনা সাহসের সহিত বলিয়াছে । তবে সব ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ ভাব হইল মধুর ভাব ।

মধুর বা প্রেমের ভাবেও মিলন হইতে বিরহেই চিন্তা ভাবের বেশি প্রকাশ হয় । কারণ সমুদ্রে থাকিলে আশ্রয় অনেক সময় কাহারও মর্ম্ম বৃত্তি নহে, ইহাতে অথর্বের সেই কথা মনে পড়ে—

অতি সন্তঃ ন জহতি অতি সন্তঃ ন গমতি ।

অর্থাৎ বস্তুকণ নিকটের রতন না হারাই ততক্ষণ তাহাকে অহুত্ব করা বা ‘বেথা’ যায় না । বৃত্তিতে হইলে একটু দূরত্ব দরকার । তাই পূর্ণরূপে আপনায় মধ্যে আপনি পূর্ণ হইলেও আত্মগরিষ্ঠতা পান নাই । ভগবান আপনাকেও সৃষ্টির পূর্বে আপনি স্বার্থভাবে পান নাই । নিষেকে নিজে পাওয়া যায় না । আপনাকে একবার পর বা বাহ্য করিয়া (objective) আবার ‘আপন’ করিতে হয় । তাই একত্বত্বকে বাধ্য হইয়াই প্রথমে দুই হইতে হয় । পরে সাধনায় সেই দুইকে বৃদ্ধ করিয়া এক করিতে হয় । ইহাতেই কেহ সেধেন অবৈত, কেহ সেধেন বৈত । জ্ঞানে এই বৈতাবৈতবিরোধ ঘোচে না, ঘোচে প্রেমে । কারণ প্রেমে দুইকেই চার এবং দুইকে এক করে ।

বাউলেরাও বলেন—

বিতা দৈত নিত্য ঐক্য কেম তার নাম ।

এইজন্যই প্রেমেই ভগবান আমাকে রূপ দিলেন কারণ প্রেমেই সেই অরূপ ভূবিদ্য রূপ হইবে সব রূপের মধ্যে ।

পরকে আপন করিতে পারে এবং ভেদের মধ্যে মধুর অভেদকে সাধনা করে বলিয়াই প্রেমের মহত্ব । আপন হইতে ভিন্নকে স্বীকার করিবার শক্তি একমাত্র আছে প্রেমের । যেখানে পূর্বেই লৌকিক অধিকার আছে সেখানে স্বীকার করার মধ্যে প্রেমের মহত্ব কিছুই বৃদ্ধা যায় না । যে ‘আমার’ নয় তাহাকে ‘আমার’ বা আপন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই তো প্রেমের প্রেমত্ব । এই কারণেই সমাজ বাহ্যকে আমার নিজস্ব অধিকার (possession) করিয়া বিদ্যাদিল তাহাকে গ্রহণ করার মধ্যে প্রেমের গৌরব কি ? যে-জন আমার নয়, সমাজবিধি অঙ্গশাস্ত্রে বাহ্যিক করিতে পারি না, তাহাকে পাইতে পারিলেই প্রেম । সেইরূপ আমার অধিকারের বাহিরে অথচ আমার প্রার্থনীয় হইল পরকীয়া । সে আমার অধিকারের বিপর্য (possession) নয় বলিয়াই সাধনা দিয়া তাহাকে পাইতে হয় । নামে সম্বন্ধ হইলেও সেই সাধনা সম্বন্ধ নয় ।

আমলে সমাজের সহিত বিরোধ-ঘোষণার ক্ষমতা বা সমাজনীতিক দলনের ক্ষমতা বাউলদের ‘পরকীয়া’কে প্রার্থনা করা নহে । তাহাকে চাওয়া হয় শুধু প্রেমের মহত্ব বৃত্তিতে । আপনায় বস্তুকে আপন করার মধ্যে

প্রেমের কৈ ? সোনাকে নহে, সোহাকে সোনা করিলেই তবে পরশমণি। পরকে আপন করিতে পারিলেই তবে প্রেম। প্রেমের বুকের প্রমাণ করিতে হইলেই চাই 'পরকীয়া'। স্বকীয়ের উপর তো অধিকারই আছে। প্রেমের সেখানে আর কি রহিল করিবার ? সমাজবিদ্যায় অত্যাচারেই সে আবার অধিকৃত (possession); আমার কাছে ধরা দিতে সে বাধ্য। ঘরের পাখি শিকার করিয়া যেমন শিকার (sport) হয় না, তেমনি শৌকিকতাবন্ধকে গ্রহণ করিয়া প্রেমের প্রেমের প্রকাশ হয় না।

প্রেম হইবে দুই জনের মধ্যে। এই উভয়ের মধ্যে সখ্য এবং সমান মুক্ত ভাব চাই। তাই প্রেমের মধ্যে উভয় পক্ষের স্বাধীনতা দরকার। মুসলমান বাদশাহদেরও নিয়ম ছিল দাস-ভক্তকে প্রেম করিলেও সে তৎক্ষণাৎ দাস হইতে মুক্ত হইত, তাহার পর সে স্বাধীনভাবে প্রেমে লাড়া দিত বা না দিত। দাসকে প্রেম করার অর্থ কিছু নাই। সমাজের বিধির উপরে প্রেমের মহত্ব তো তাহাতে বুঝা যায় না। দাসত্বের মধ্যে প্রেম (?) তো একটা জুলুম মাত্র। তাই ভগবান প্রেমের ক্ষেত্রে মানবকে অপর মুক্তি দিয়েছেন। এইখানেই মানবের free-willএর সার্বিকতা।

প্রেমের অশ্রুপথ্যই হইল তাহার অনিন্দিত্য। পাইব কি না পাইব এই জন্ম-মোলা না থাকিলে আর পাইয়া আনন্দ কিসের ? করতলগত বস্ত্র পাইয়া তো আনন্দ নাই। অনিন্দিত্যের মধ্যে প্রেমের পাওয়াই পরম মাধুর্য। তাই চৈতন্যচরিতামৃত দেখি—

স্বকীয় পরকীয়া ভাবে বিবিধ লস্কান

পরকীয়া ভাবে অতি দূরে উদাস।—আত্ম, চতুর্থ

সেই প্রেমের ক্ষেত্রে নর-নারী লবাই লমান। ভগবানও সেখানে আমার চেয়ে বড় নহেন। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বা ঈশ্বরত্বের সর্বশক্তিমান জুলুম চলে না। ঈশ্বরত্বের অর্থাৎ অধিকারের জুলুম থাকিলেই প্রেমের মহত্ব হয় নাই। তাই ভগবান বলেন—

ঈক্ষ-নিমিল মেয়ে নাহি ঘোর ঈত। ঐ

প্রেমরসিকরূপে তিনি বলেন, “আমার ঈশ্বরত্বই যে মানে সে তো আমার স্বকীয়া। তাহাকে আর পাইব কি ? যে আমার ঈশ্বরত্ব ও প্রভুত্ব এখনও স্বীকার করে নাই, প্রেমের দ্বারা আমি তাহাকেই চাই। তাহার প্রেমই আমার কাম্য”—

আবারে ঈশ্বর হানে আপনারে হীন।

তায় প্রেমে কল আমি না হই অধীন। ঐ

ভগবান বলেন, যে আমার অধীন তাহাকে পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে তফাত কি ? যদি সে মুক্তকণ্ঠে আমাকে স্বীকার করে তবেই তো সেই পাওয়া হইল পাওয়া। শক্তির ক্ষেত্রে আমি উচ্চ বা ঈশ্বর হইলেও প্রেমের ক্ষেত্রে সে আমারই লমান বা আত্ম হইতেও উচ্চ। সেখানে আমি তো তাহার অপেক্ষা বড় নহি, হয়তো বা হীনই হইব, তবেই তো প্রেম। এখানে বাউল-সাধকদের লাহসের অস্ত্র নাই। বাউলদের পানে তাই প্রেমের এক ঘোর। চৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

আপনাকে বড় হানে, আপনাকে দম, হীন।

সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। ঐ

যকীয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাভর-অনিভ প্রেমের সার্থকতা নাই। সেই সার্থকতা আছে পরকীয়ার ক্ষেত্রে। দর্প ও সম্মান তো অনিশ্চয়তার স্থান রাখে নাই, তাই প্রেমের সব সম্ভাবনা সে চুকাইয়া দিয়াছে।—

করু হাড়ি মাগে মোহে তরুর মিলন।

করু মিলে করু না মিলে সৈবের মিলন। এ

তাই পরকীয়া না হইলে প্রেমের কোনো অর্থই থাকে না। যেখানে সমাজবিধির সূত্রে প্রেমসাধনার একটা বড় বিরোধ আছে, বাড়িলেও সেখানে প্রেমের রাই নীকার করিয়াছেন। অথচ দর্প ও সম্মানবিধি না থাকিলে পার্হিয়া চলে না।

সাধারণতঃ ককীয়া হইলেও বহু বাড়ল-বৃহৎও আছে। সমাজবিধি না মানিলে গৃহস্থনীতি কেমনভাবে চলে? তাই মিথ্যাতা করিয়াছি, “তোমরা তখন কর কি?” বাড়ল-বৃহৎ বলেন, “বিধি বা মন্ত্রের দ্বারা আমরা মরমের অধিকার সত্য্য করি না। বিধিকে সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া অথবা ঘেহের কাছে সেহ রাখিয়া সত্য্যবাত্রা চালাইয়া যাই। তার পর যদি কখনও ভগবানের কৃপায় তাহাকে প্রেমযেতেও পাই তবেই জীবনকে ধর মনে করি। সে সৌভাগ্য মন্ত্রের জোরে বা সমাজবিধিতে হয় না। ভগবানের বিশেষ রূপা থাকিলে সে সৌভাগ্য খুটে—হয়তো সারাজীবন তাহা না ঘটতেও পারে। তখন মনে করিতে হইবে জীবন বুখাই গেল।”—

করু মিলে করু না মিলে সৈবের মিলন। এ

‘যকীয়া’ অর্থাৎ বিধিধর্ম পাওয়া স্বীকেও প্রেম আপন করা গেলে তাহাতেও পরকীয়া-সাধনা দৃষ্ট হয়। কারণ এতদিন সে তো ভিন্নই ছিল। এইখানেই বাড়লদের এক বড় তথ্যের কথা বলা গেল। আর-এক তথ্য হইল তাহাদের প্রকৃতি-ভাবে, সখী-ভাবে আরাধনা।

প্রকৃতি-ভাবে অর্থ কি? জ্ঞান কর্তৃ ও প্রেম এই তিন পথে সাধনা। জ্ঞান ও কর্তে আবার মনের পরে মিলে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে শিক্ষা পাই এবং স্বীকারকে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকার করি, অর্থাৎ ইহা দ্রোণশযা। প্রেমে হঠাৎ একদিনে একেবারে স্বীকার করিতে হয়। যখন অন্তরাত্ম জাগে তখন একদিনে আপনাকে উৎসর্গ (surrender) করিতে হয়। পুরুষের পথ জানে ও কর্তে এইরূপ ‘ক্রমে ক্রমে’। নারীর পথ প্রেমের; তাহাতে ‘ক্রম’ নাই—একেবারে তৎক্ষণাৎ (immediate)। পুরুষ বিবাহ করিয়া ক্রমে স্বীকে চলে। নারীকে বিবাহের সঙ্গেসঙ্গেই সব ছাড়িয়া পতির ন্তন সঙ্গারে র’গাইয়া পড়িতে হয়। শিশু সন্তানকে ক্রমে ভালবাসিলেও ক্ষতি নাই; ছয় মাসও তিনি প্রতীক্ষা করিতেও পারেন। কিন্তু না তাঁহার সন্তানকে ধন্যবাত্রে স্বীকার না করিলে সৃষ্টি অচল হয়। জীববর্ষ (biologically) নারীকে সন্তান করিবার সময় বিধাতা দেন নাই। তাই নারীদের এই ‘বেসব্রী’র মধ্যে অনেক কুলদ্রাব্ধি আশ্রিত পড়ে। তবুও নারীর এর ‘বেসব্রী’কে না মানিয়া লইলে চলিবে কেন? ইহাই যে তাহার জীববর্ষ (biological fact)।

পুরুষ যখন তাহার জানে ও কর্তে ‘ক্রমে ক্রমে’ অনন্ত অসীমের দিকে অগ্রসর হয় তখন পরমা সন্নাইতে সন্নাইতে হুতো তাহার মানবকল্পই শেষ হইয়া যায়। পরবার তবু আর শেখই হয় না। ইহাই কার্ণাহিল সেখাইবাছেন তাঁহার *Savior Resartus* জুড়ে। অনন্ত অসীমের কত পরমা সন্নাইবা তাঁহার স্বরূপ পাইবে? তাই প্রান্ত সাধক অন্তশেষে নারীর নভই প্রেমে সন্তবে এক মুহুর্তে র’গ দিয়া পড়িতে চায়।

ভাড়া সত্ত্ব হয় শুধু প্রেমে। নারীর হইল সেই প্রেমের ধর্ম। তাই মহাপ্রভুর বড় লোকও আপনায় এইখানেও অপর জ্ঞানে অকৃতার্থ ও হরবার হইয়া সখী-ভাবে নারী-ভাবে প্রকৃতি-ভাবে রূপ দিয়া পড়িলেন। বাউলদের একটা বড় ভাব।

বাউলদের মধ্যে পুখা (পুখিয়া) ও তখা (real) এই দুই বকব সাধনা আছে। পূর্বেই পুখিয়া বাউলদের পরিচয় পাইয়াছি *Post-Chaitanya Sahajiga Cult* পুথকে। যার অনুসারা বাউলদের সবচেয়ে ভালো পরিচয় দিচ্ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন মহাসভার (১৮ ডিসেম্বর ১৯২৫) অভিভাষণের এবং হিবার্ট বকৃত্যার (১৯৯০) কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে।

এই বকৃত্যায় তিনি সবচেয়ে বেশি বাণী ব্যবহার করিয়াছিলেন ঈশ্বরের বাউলকবি হাসন রজা জৌহুরীর গান। হাসন রজার অল্প লক্ষ্যপত্রের বেওয়ার-বংশে। ইহার পিতার নাম আলি রজা জৌহুরী। আলি রজার পূর্বপুরুষ কার্য ছিলেন। হাসন রজার পুত্র প্রখ্যাত একলামুর রক্তার কাছে ডিনিয়াছি ইহার। ডরমাঙ্গাগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভকত বয়সেই বাউলদের সঙ্গে পরিচিত হন; তাঁহার লেখা 'বোটেমীর' কথা গীতাদ্য পড়িয়াছেন তাঁহারাই ইহা জানেন। তাঁহার অনিয়ারি শিলাইন পদগণার কাছেই লালন ককীরের স্থান। লালনের অসুত একটি প্রতিভা ছিল। তাঁহারেরই শিষ্য কংকাল হরিনাথ নন্দনবার বা ককিরচাঁচন বাউল। হরিনাথের শিষ্যরা সকলে বাউল না হইলেও সবাই কৃতী, তাঁহাদের মধ্যে রামসাহীর অক্ষয়কুমার বৈষ্ণবের নাম প্রশংসিত। যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তত্ত্বাবধি অল্পবয়সে করিয়া আর্জার এডেলশন পদ হইলেন, সেই বিদ্যার্ণবও হরিনাথের অল্পবয়সী। বাংলাদেশে সংবাদপত্র-ভক্তস্থানীয় কলকাতা গেনও হরিনাথেরই আপন জন। লালনের শিষ্যতার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইনহে এক ভাকহরকরা। তাঁহার নাম ছিল গগন। তাঁহার গান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হিবার্ট বকৃত্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আমার মনের মানুষ কে রে
আমি কোথায় গাব তবের। -

লালনের স্থান ছিল কৃত্যার নিকট। তিনি অল্পতঃ ছিলেন হিন্দু, পরে দেখা যায় দিয়াম সাই নরেন মুসলমান ককীরের কাছে তিনি বীক্ষা নেন। তাঁহার সাধনাতে দুই ধর্মেরই যোগ দেখা যায়। এই যারার সঙ্গেও কবিত্তক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল।

কৃত্যার কাছে ঐ দিকেই পাছ ককীরও একজন বাউল ছিলেন। তাঁহার সীমা ছাড়াইয়া আরও পূর্বদিকে গেলে রামবাড়ীর কাছে বোচ্ছল চাঁদ ককীরের গানের প্রচলন। তাঁহার পর ঢাকা জেলায় ছিলেন শাহনাল ককীর। ধর্মরাই টাঙাইল প্রকৃতি স্থানে পাগল চাঁদের গান চলে। পাগল চাঁদ একজন সমর্থ বাউল ছিলেন।

আমি নিজে প্রথম বাউল দেখি কান্দিতে নিতাই বাউলকে। তাঁহার বাড়ি ঠাকুরা বা তাহারও পশ্চিমে ছিল। বেশে আলিবার পর ঢাকা জেলার রামবাড়ীর আশ্চর্য মাও বাউলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁহার আশ্চর্য দুলিত ও বন্ধের সঙ্গে পরিচয় হইলে দেখা গেল তাঁহার আরও গভীর ভাবের বাউল। তাঁহাদের কাছেই আমি বড় বড় দুইটি বাউল-খারা ও বহু গানের সন্ধান পাই। সেই খারা খরিয়া বহু প্রাচীন রূপে উপস্থিত হওয়া যায়।

বাংলাভাষার আরম্ভ হইতেই বাউলের পরিচয় মেলে। তবে একবার খোঁজ করিয়া (১৮২৮ সাল) বারো-ভেড়া পুঙ্খ পৰ্শস্ত কোনোমতে পাইয়াছিলাম।

এক খারাতে মন বাউল জন্মত: ছিলেন মুলমান। তাঁহার গুরু ছিলেন ঈশান, জাতিতে হুই। ঈশানের গুরু দীনা বা দীননাথ জাতিতে ছিলেন নয় বা বাস্তকর। দীনার গুরু নবম্পুত্রবংশীয় হারাই। হারাইর গুরু কালাচাঁদ ছিলেন জাতিতে বাচই বা হুত্বর, নবম্পুত্র-হুত্বরই হইবার কথা। কালাচাঁদের গুরু নিত্যানাথ; নিত্যানাথের গুরু মুলনাথ; মুলনাথের গুরু আদিনাথ। নিত্যানাথের বন্ধু ও গুরুতাই ছিলেন হনাই ককীয়। হনাই জন্মত: মুলমান। এই তিন তিন জন 'নাথ' বাউল নামে যেখিয়া নাথ-শব্দের সঙ্গে বাউল মতের প্রাচীন যোগের কথা মনে আসে।

নিত্যানাথের এক শিষ্য কালাচাঁদ, সেই খারাতে মন। মনের বন্ধু ছিলেন গঙ্গাবাস, জাতিতে নবম্পুত্র। গঙ্গাবাস মনের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বহুতা খুব গাঢ় ছিল। গঙ্গাবাসের গুরু ছিলেন কৈবর্ত অগাইর শিষ্য বাধা। নিত্যানাথের আর-এক শিষ্য ছিলেন বলা বা বলরাম। তিনিও জাতিতে কৈবর্ত। বলাকে নিত্যানাথ নাকি দীক্ষা দেন নাই। দীক্ষা তাঁহার একটি ঘটনা হইতে ঘটে। ঘটনাটি বলা ঘটক।

বলা ছিলেন কৈবর্তদের মধ্যে রামার মত। সমস্ত বেঘনার উপর ছিল তাঁহার এলাকা। মারহুলির কাছাকাছি তাঁহার জলকর ছিল। তাঁহার প্রথম যৌবনেই ব্রীষ্যোগ ঘটে। উদাসমনে তিনি একদিন নৌকায় বাইতেছেন এমন সময় বিবাহাস্ত্রে এক কস্তাঙ্কে মাতা বিদায় দিতেছেন সেই দৃশ্য দেখেন। কস্তার নৌকা সরিয়া গেলে কস্তা গাউমারিদের অহুনয় করিতেছেন, বাস্তকরদের অহুনয় করিতেছেন নিশ্চয় হইতে, কারও বা রহিয়াছেন ঘাটে পড়িয়া, তাঁর কান্নার শব্দ শোনা বাইতেছে বাস্তভাণ্ডের গোলমালে, ক্রমে মায়ের কান্নার শব্দ চাপা পড়িয়া আসিতেছে—

বাইও রে ঢোল ঢুলী জাই গনির জন্মনি।

দীরে দীরে বাইও রে মারি যেন মায়ের কান দনি।

তাঁহার মনে হইল তিনিও যেন অগজ্ঞানবীর নিকট হইতে এইভাবেই যিবের পর দিন দূরে সরিয়া বাইতেছেন। যেন এইজন্ত চলিয়াছে বিখচরাচরে মাগের কান্না। দূর হইতে শু শু কান্না শোনা বাইত। কিন্তু সংসারের নানা কোলাহলে আশ্রয়িত্রিণ সেই কান্না চাপা দিতে চাই। আশ্রয়িত্রিণ মনের মধ্যে ব্যাকুলতা ও বৈষাণ্যই মায়ের কান্নার স্বর। তাহাকে প্রতিদিন আশ্রয়িত্রিণ কত ভাবেই চাপা দিয়া রাখিতে পারি?

এই অন্তরবেধনার বর্ষ বৃষ্টিতে শাখক নিত্যানাথের কাছে বলা গেলেন এবং দীক্ষা চাহিলেন। সব শুনিয়া নিত্যানাথ বলিলেন, "তোমাকে আর দীক্ষা কি দিব? অগজ্ঞানবীর আপনাই সেই মাতৃবিচ্ছেদ-ব্যাকুল। কস্তারূপে আসিয়া তোমার দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তোমার অন্তরের বেদনাই সেই দীক্ষার মর।"

তবু বলরাম বা বলা নিত্যানাথের 'অহুঁরাষ্ট্র' হইয়া রহিলেন এবং পরে খুব বড় শাখক হইলেন। কানেই বলার গুরু একহিগাবে নিত্যানাথ আর-এক হিগাবে সেই কস্তা।

বাউলেরা নানা ঝানেই গুরুকে পান এবং নানাতাবেই গুরুর দীক্ষা দেন। আবার পূর্ব-কথিত ঢাকা-রামাবাড়ীর বাউল দাগুর শিষ্য বল্লভ ও দুর্দভের কথা বলিয়াছি। দুর্দভ ছিলেন অতিশয় মরনী ভাবে

লোক। দুর্গভের বখন অল্প বয়স তখন তাঁহার আট-নয় বছরের এক কন্যা পৃথিবী হইতে বিদায় নিলেন। এই বিদায় নিবার সময় সেই কন্যাই যেন পরকালের দ্বার খুলিয়া পিতাকে চিরায় আলোক দেখাইয়া গেলেন। তাই দুর্গভ বখন দাণ্ড বাউলের কাছে লীকা চাহেন তখন দাণ্ড বলেন, “তোমার কন্যাই তোমার গুরু। তুমি দণ্ড। তুমি লীকিত। বরং তুমিই আমার কাছে থাকিবা আমারকে সেই পথ দেখাও।”

কান্নার নিতাই বাউল বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবতেই তাঁহার বিষয়ে বলা গড়িত—“সেহের কাছে বেহ রাগিয়াছিলান কিন্তু তাঁহাকে পাই নাই। মধ্যে কামনার বাধা ছিল কি না! এমনভাবে বারো-তেরো বৎসর গেল, পাওয়া হইল না। তাহার পর তিনি আমাদের ছাড়িয়া পরলোকে গেলেন। তখন ডগবানকে কহিলাম, ‘এইবার তো কামনা আর নাই। এইবার তাঁহাকে পাইতে দাও।’ এমন ভাবেও বারো-তেরো বছর দাও। একদিন হঠাৎ অপর্যেগের স্ত্রী তাঁহাকে পাইলান; আমার সব বীজ হইয়া গেল।” তাই বাউলদের গানে আছে—

গুরু বলে কারে প্রণাম করিব নন ?

তোর অধিক গুরু পণ্ডিত গুরু, গুরু অমরন।

গুরু যে তোমার বলাচালা, গুরু যে তোর বলামালা

গুরু যে তোর ভলমবাধা, (গে) গুরার দু'বন।

কারে প্রণাম করিব নন ?

বাক আমার বলদানের বাউল-খারার কথায় ফিরিয়া আশা হাউক। বলার শিল্প বিশা, জ্ঞানিতে সুজ্জ্বলী। তাঁহার শিল্প মগা কৈবর্ত, তাঁহার শিল্প মাধা বা মাধব পাটিয়াল বা পাটি-নির্ভতা; কেহ কেহ বলেন, বলা কাপালী। কাপালীরা চৌ বুনিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। মাধার শিল্প গদ্যায়ন নমঃসুত।

ইহারা সবাই নিরস্ত্রের নিরস্ত্র লোক। কিন্তু গৃহের গভীরতায় ও প্রকাশের অপূর্বতার অসুলনীয় ইহাদের শক্তি। রবীন্দ্রনাথ পর্বত ইহাদের গান দেখিয়া বলেন, “এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজা-স্মি সত্য এত অল্পকথায় এমন অপূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমার তো ইহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।” তিনি নিঃসংকোচে ইহাদের গান তাঁহার বর্ণন-গভীর অভিভাবধে এবং অস্বকোচে হিট-বক্তৃতায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং মন্তব্যে তাহা পীকার করিয়াছেন। নানা স্থানে নানাভাবে এইসব বাউলের প্রতি তিনি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সর্বদা প্রকাশ করিয়াছেন। গুটীনের কদর করিতে তাঁহার মত লোক জীবনে দেখি নাই।

এই গল্পারামের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের মধ্যে বাইনখাড়া গ্রামের কাছে। এখন সেইসব স্থান পল্লভগে। ইনি আমার সমবয়সী সব বাউল হইতে পাচ ‘পিতা’ বা গুরুশরম্পরা উপরে। কারণে ইনি প্রায় দুই শত বছরের পূর্বকার, কারণ এই হিসাবও প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে করা। মন বাউল ছিলেন গদ্যায়নের অতিশয় প্রিয়জন। মননের গুরু ছিলেন গদ্যায়নের বন্ধু, যদিও বয়সে একটু বড়। গুরু ইশান এবং শিল্প মন উভয়েই গদ্যায়নের বন্ধু ছিলেন।

সেই সময়ে বিক্রমপুরের দলদল, তপঠা, দামারগ, রামাবাড়ি প্রভৃতি স্থানে বাউলদের খুব বড় বড়

আজ্ঞা ছিল। বলছ হইতে এক শাখা পরে আবতলাপুরে, আর-এক শাখা দক্ষিণ সাহাবাঙ্গপুরে গিয়া আশ্রয় করে।

ঐহট্টে বিশ্ববলের মগমোহিনী নামনার প্রভাবে ও বলার প্রভাবে মেঘনার তীরে বহু বাউল-আশ্রয় স্থাপিত উঠে। তাহাদের মধ্যে ভিত্তি ভরসা প্রকৃতি নষ্টকৈ অষ্টগ্রামী-সমাজ বলে। এই সমাজেরই এক শাখা পরে স্থান করে ঢাকা জেলার পাচন্দোনার নিকটে নরসিংদী গ্রামে। বিশাল মেঘনা নদীর তীরে এই নরসিংদী আশ্রয় প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে নব্বেরটাস নামে এক বাউল আসেন; তিনি খুব সমর্থ সাধক ছিলেন। তাহার শিষ্য বেহুগা বাউল ও বেহুগার শিষ্য দ্বীন বাউলকে আমি জানি। নব্বের টাসের কথাও আমি শুনিয়াছি। নদীর তীরে ও বিশাল মাঠের পারেই বাউলিয়া ভাব ক্ষমে। সেখানে প্রকৃতিও ইহাদের উদার ও উদাস করে।

উত্তরবঙ্গে নীলকামারীর কাছে কলকামারী নামবাকী মধ্যমা প্রকৃতি কয়েকটি বাউল-সম্প্রদায় আছে। গোড়া মূলশ্রমদায়ের উৎপত্তিও তাহাদের অনেককে পরে সম্প্রদায়ী মূলশ্রমদায় করা হইয়াছে। উৎপত্তি যে ক্ষিপ্র গাছা 'বাউল বিক্রমস ফতোয়া' দেখিলেই বুঝা যায়। তবু উত্তরবঙ্গের বাউলদের অনেক ধর আদি নীলকামারীর কবিরাজ বলকামারী সাহিত্যীর কাছে পাইয়াছি। তিনি যদি এখনও জীবিত থাকেন তবে কিছু ধর দিতে পারেন।

বাউল সমাজের প্রভাবে মেঘনার তীরে ত্রিশূরা জেলায় ওয়াইলের আশ্রয়র কাছে রাণীদিয়া গ্রামে আশ্রয় আলি প্রকৃতি সমর্থ বাউল সাধকের অত্মদায় ঘটে। আশ্রয় আলির উপরও বহু অভ্যাসের গিয়াছে। কিন্তু তিনি নির্ভীক পুরুষ। তাহার শিষ্য হইতে হইলে সব সম্পত্তি বিতরণ করিয়া আসিতে হইত। মূলশ্রমদায় সাধনাতীকৈ দীকার পূর্বে সাতদিন নিম্ন গ্রামের জুয়া-বসতিতে, সাতদিন গ্রামের হাটে, সাতদিন গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া যোবনা করিতে হইত 'আমি সরা (মূলশ্রমদায় শাস্ত্রবিধি) মানি না'। এমনভাবে বাদ্যই-করা নির্দাতনে-মটল সাধনাতীকৈ না হইলে তিনি সাধনা দিতেন না।

এইসব অভ্যাসের সাধকদের উপরে ঘটে বলিয়াই আমি এককাল বাউলদের স্থান ও আশ্রয়র ধর সম্বন্ধে দিতে পারি নাই। আমি এই বাউলদের ধর কোথাও কোথাও বলার পরে ইহাদের উপরে অনেক অভ্যাসেরও গিয়াছে। তবু কেহ কেহ যে কয়টি বাউল-স্থানের সন্ধান দিয়াছেন, সবই আশ্রয় বেহুগা ধর হইতে। কারণ না বুঝিয়া ঘটনাক্রমে পূর্বে কিছু কিছু ধর আদি দিয়াছিলাম।

আর-একটি বিপদও আছে। বীরভূম জেলার কেন্দুলী এককাল বাউলদের একটি বিলনের স্থান ছিল। এখনো গোবদ্যাক্রান্তিতে জগদেবের স্মরণার্থ এক বেলা বসে, তাহাতে বহু বাউল আসিতেন। তাহার কেন্দুলীতে স্থানির বা তীর্থস্থানে স্নান-পূজা করেন না, তবে নিকেরা খিলিয়া খুব উৎসব করেন। সেখানে নিত্যনাম দাস নামে এক বাউল আসিতেন। তাহার সহিত আশ্রয় খুব স্নিতি ছিল। তাহার ভক ছিলেন মদিমোহন। মদিমোহনের আশ্রয় ছিল খানা জগদেবের নিকট কেতনা গ্রামে। এইরূপে দীহাটে গোপীনাথের মেলাতেও বহু বাউল একত্র হইতেন। বাউল সোনাধুরী এবং মানভূমের খাত্তা প্রকৃতি স্থানেরও বাউল-সমাজ আছে। এইসব 'ঘা-স্থান' পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের। উত্তরবঙ্গে রাজসাহীর নিকট প্রেমভল্লা বা খেতুরের বার্ষিক মহোৎসব-মেলাতেও বহু বাউলের সমাগম ঘটে।

এইসব স্থানের ধর পাইয়া বহু 'পবেষণা'-রত বিশ্বজনের সেখানে ভীষণ সমাগম ঘটে। তাহাদের

শেলিল-খাতার অভ্যাচারে অনেক বাউল বিব্রত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় নিত্যানন্দ দাস তো একদিন আমাকে বলেন, “বাবা, বৎসরান্তে এখানে আসিতাম। কিন্তু তোমাদের শিশুদের মত শেলিল ওঁচানো সেখান হানটা ছাড়িতে হইল।” আসলে বীরভূমে ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া ইহাদের জীবন ও বাণী নিঃশেষে সংগ্রহ করাই আমাদের উচিত। আমরা চাই সব সংক্ষেপে সাহিত্যে, এইজন্য অত সময় দিতে আমরা পারা না। তাই আমরা হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া গড়ি, প্রের-প্রেরে তাঁহাদের বাকুল করি। তাহাতে সাধকদের সাধনার ব্যাঘাত ঘটে।

এই প্রদর্শে একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিয়া লই। আমার সংগৃহীত বাউল-বাণী আমি প্রকাশ করি নাই, ইহা লইয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। আমারও কিছু বলিবার আছে। আমি তো সাহিত্যিক হিসাবে এই বাউলগান-সংগ্রহে প্রস্তুত হই নাই। আমার প্রণয় প্রয়োজন ছিল আমার নিজের অধ্যাত্ম অভাব ও ক্ষুধা। এই সংগ্রহের কারণে আমি কোনো সাহিত্যিক বা বিখ্যাতব্যক্তির কোনো সহায়তাও লই নাই, তাই আমার সেই মিক হইতে বাহিরও হয়। আমি দেশবাসিকদের কাছে সংগ্রহ করি তাঁহারাও চাহেন এইসব বাণী লইয়া সাধকের সাধনাই চলে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচার তাঁহারাও চাহেন না। আমি একজন বাউলকে তাঁহাদের এই গোপনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “বাচ্ছ, ইহা তো সাহিত্য নয়, ইহা আমাদের অন্তরঙ্গ প্রণবন্ধ, আগুন আত্মজ। যদি কেহ আমার কল্মকে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে ‘তাঁহাকে লইয়া আমি পুতী হইব’, তবে সে ক্ষেত্রে আমার সেওয়াই উচিত। সেই সেওয়াতে আমি ধস্ত, তিনি ধস্ত, আমার আত্মজাও ধস্ত। কিন্তু কোনো লোক শুধু স্বদিক রসাবাদন-মুগের মত যদি আমার আত্মজাকে গাধিয়া বেঁধিতে চাহে তবে প্রার্থনিতাও অশস্ত, আমিও অশস্ত, আত্মজাও অশস্ত। এইসব বাণী সাহিত্যরসের আবাসনের মত নহে। ইহা সাধনের স্তম্ভ। হয়তো ইহাতে সাহিত্যরসও আছে, কিন্তু তাহা তো খুব লক্ষ্য নহে। তাই ইহা আমরা প্রচার করি না। তবে সাধনার্থী জন সাধনার মন্ত্র চাহিলে কখনো প্রত্যাহ্বান করি না। কিন্তু বেঁধিয়া লই যে ইহার এই প্রার্থনা সাক্ষাৎ কি না।”

এইসব কারণে বহু স্থানে সংগ্রহ করিলেও আমার গুরুদ্বারীয় বাউল সাধকদের কাছে আমি বাণীগুলি প্রকাশের অস্বস্তি পাই নাই। তবু যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল তখন বন্ধুর চাকচক্ষ্য বন্যোপাখ্যায় আমার এইসব সংগ্রহের খবর কবিরুদ্ধক দিলেন। তিনি সাহসে ধরিলে তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি সব দেখিয়া অনেকদিন ধরিয়া নানাভাবে ভাবিয়া দেখিলেন, পরে আমাকে বলিলেন, “দেহন, বেগুলি প্রকাশে বাধা নাই অন্ততঃ সেগুলি আগে বাহির করন। পরে অন্তগুলির মত প্রকাশের অস্বস্তি লইবার চেষ্টা করিবেন।”

প্রবাসীতে ‘হারামণি’ নামে দুই-একটি করিয়া গান তখন (১৯২২ সাল) হইতে বাহির হইতে লাগিল। হঠাৎ তুলিনার কেহ কেহ বলিতেছেন, এইগুলি এত ভালো যে তাহা নিবন্ধনমের রচনা হইতে পারে না। ইহা এখনকার শিক্ষিত লোকের রচনা। রবীন্দ্রনাথ তুমিরা গুণ্ডিত হইলেন। তিনি বলিলেন, “শিক্ষিত লোকের কর্মতা তো আমার অভ্যাস নাই। এইসব জিনিষ যে তাঁহাদের রচনার শক্তির বাহিরে তাহা আমি বুঝি বৃষ্টি। একটা গান পাইলে হয়তো তাঁহারা কতক অম্লরূপ আর-একটা নকল করিতে পারেন : কিন্তু মূলটা রচনা করা কোনো শিক্ষিত লোকের কর্ম নয়। অন্ততঃ আমার তো তাহার কান্দাকাছি শক্তিও নাই।”

ইহার পর আমি নিজে আর বাউল বাগী বাহির করি নাই, যদিও তাহা সাজাইয়া দিখিয়া রাখিয়াছিলাম ।^১ প্রায় চল্লিশ বৎসর এগুলি শুধু নিভের কাছেই রাখিয়া নিজেই আলোচনা করিয়াছি, কখনো বন্ধুবান্ধবদের দেখাইয়াছি এবং আমার অন্তরেই প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছি, যে ক্ষত্র আমার এই সংগ্রহ । পরে রবীন্দ্রনাথ ও চাকচক্ষুকে তাঁহাদের দায়িত্বে দুই-একটি বাগী প্রকাশ করিবার জন্য আমার খাতাগুলি দিয়াছি । রবীন্দ্রনাথ দর্শন-সভায় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে (Philosophy of Our People) তাহা ব্যবহার করিয়াছেন । চাকচক্ষু তাঁহার বঙ্গবীণাতে^২ আমার সংগ্রহ হইতে কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ধন আমি ধাঁপিতে তোর আশায় নুনের ছুঁক (৭৮নং) ; নিষ্ঠুর গরজী, তুই কি বলন-দুহুদ তাহদি আঙনে (১২০নং) ; আমি মজ্জছি মনে (১০১নং) ; পরাণ আমার গোতের গীত (১০২নং) ; আমি বেগুন না নরন (১০৬নং) ; তোমার পথ চাইকাছে হনিরে মঙ্গলদে (১০৮নং) ; জোখে বেখে গায়ে ঠেকে (১০৯নং) ; আমার ভুবন নরন রনের তিথিরে (১৪২নং) ; জয়কমল চন্দ্রেছে ফুটে (১৪৪নং) ।

এই নয়টি গানের মধ্যে বঙ্গবীণার ‘আমি মেলুম না নরন’ গানটি আমার খাতায় বাহা আছে তাহা হইতে একটু পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত । ইহার মূল-গানটি নমঃশূত্র গঙ্গারামের এক শিল্পের রচনা । হৃদতো রচয়িতা কৃষ্ণকান্ত পাঠক । কৃষ্ণকান্ত মহাশয়িত্ত ব্রাহ্মণ এবং কথক ছিলেন । গঙ্গারামের কাছেই অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য পাইয়া কথকতাকে তিনি মহাশক্তিলালী হইয়া ওঠেন । কৃষ্ণকান্তের শিল্প গুণকথা ও চন্দ্রকুমারও কথক ব্রাহ্মণশ্রুতি ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যেও বাউলিয়া ভাবের লক্ষ্য ছিল । গঙ্গারামের প্রভাবে পরে রায়দানাথ গোপা মত্ত কীর্তনীয়া হন । তাহারই প্রভাবে গোবিন্দ কীর্তনীয়াও কীর্তন গভীর শক্তিস্নাত করেন । তিনিই ছিলেন লালনের প্রভাবেই নাকি কীর্তনীয়া শিবরূপে এত শক্তি হইয়াছিল ।

নিরজ্যতির বাউলদের দুই-একজন ব্রাহ্মণ শিল্পও দেখা গিয়াছে । কানীতে ছবু ঠাকুর নামে একজনকে দেখিয়াছি, তিনি বেদব গান করিতেন তাহার কিছু অসুখ্যে হিবার্ট-লেকচারে গিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ ছবু ঠাকুরের গানের অতিশয় সমাদর করিতেন ।

বঙ্গবীণার ‘ধন আমি ধাঁপিতে’ (৭৮নং) এবং ‘আমি মজ্জছি মনে’ (১০১নং) ঈশান হুটীর রচনা । তিনিই মদন বাউলের গুণক । জাতিতে ঈশান ছিলেন হুটী । ‘নিষ্ঠুর গরজী’ (১২০নং) ও ‘তোমার পথ চাইকাছে হনিরে মঙ্গলদে’ (১০৮নং) গান দুইটি মদনের । অপূর্ব তাঁহার রচনা ।

মদনের জন্ম মূলময়ান বংশে । ঈশানের তিনি শিল্প, নমঃশূত্র গঙ্গারামের তিনি বন্ধু । ‘পরান আমার’ (১০২নং), ‘জোখে বেখে গায়ে ঠেকে’ (১০৯নং) এই গান দুইটি গঙ্গারামের রচনা । গঙ্গারাম নমঃশূত্র ঘাতীর অতি সমর্থ সাথক ছিলেন । ‘আমার ভুবনো নরন রনের তিথিরে’ (১৪২নং) গানটি কেঁদুলীতে পাওয়া । গায়ক বাউলটি ছিলেন মেদিনীপুরের ; পরটি পদ্মলোচনের । পদ্মলোচন ছিলেন নরহরি বা গোসাঞিদের শিল্প । ‘জয়কমল চন্দ্রেছে ফুটে’ (১৪৪নং), ঢাকা জেলার রাঙ্গাবাড়ির দাণ্ড বাউলের আখ্যায় দ্রুত হইতে পাওয়া । ইহার রচয়িতা বিশালু ইমালী ; বিশা হইলেন কৈবর্ত বলরাম বাউলের শিল্প ।

প্রচুরেই ক্ষত্র বাউলদেরও কোনো আশ্রয় নাই । তাহার কিছু কারণ পুঁথিই বলা হইয়াছে । এইসব

পদ সাধনার মন্ত্র, সাহিত্যের মন্ত্র নহে। সাহিত্য অর্থই পুরাতন সব সংগ্রহ। এই সংগ্রহের উৎসাহ বাউলদের নাই। পুরাতনের সংগ্রহ পুঁথির চেয়ে নতুন দীর্ঘতম সত্যকে বাউলেরা বিশ্বাস করেন। তাই তাঁহারা শাস্ত্রাদির সংগ্রহকে মান্য করেন না। তাঁহারা বলেন, “পুরাতন সেসব উৎসব গিয়াছে এইসব শায় তো তাহার উল্লিষ্ট নাই। আদ্য কি কুহু, যে এই এঁটো পাতা চাটবে? প্রয়োজন হয় নতুন নতুন উৎসব করিবে। ভগবানের কৃপায় নতুন নতুন অঙ্গ আসিবে।” সত্য সত্যই ঐহ্যবের বিশ্বাস যে, হতদিন বাণীর প্রয়োজন ততদিনই যুগতে নব নব বাণী আসিবে, অভাব হইবে না। এই বিশ্বাস হাইহাই নাই। কুকুরের মত এঁটো পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখে। কুকুরেরাও পুরাতন পাতা একদিন-না-একদিন ছাড়বে। মাহুদ আরও অধম। এঁটো পাতার কোনটা কত পুরাতন তাই দেখাইয়াই তাহাদের গর্ব। বাউলদের গানে আছে— ‘বাসি মিছা হয় না সাতা’।

বাউলদের কাছে কোনো গ্রন্থ করিলে তাঁহারা সাতা কথায় বড় একটা উত্তর দেন না। উত্তর দেন গানে। কত গানের ভাওয়ারই যে তাঁদের আছে! আর ঠিক-মত তাহা তাঁহাদের নদেও আসে। গান কেন করেন, কথায় কেন বলেন না মিচ্চাশা করিলে বলেন—

আমরা পবীর দ্বার।

আমরা এঁটে চলার তাও মানি না, আবারে টুটে চলার দ্বার।

এইসব বহু গানে ভণিতা পাই। অনেক রচয়িতার নামও মানি নাই। একবার আমি এক বৃদ্ধ বাউলকে মিচ্চাশা করিলাম, “এতদূর ভাবে রচয়িতাদের ভুলিয়া যাওয়া কি ভালো?”

তিনি তখন কিছু বলিলেন না। একটু পরে ধান ও নদীর দিকে দেখাইলেন। তখন তাঁটা। বলে মল ছিল কম, কাদায় সব নৌকা ঠেকিয়া আছে। দুই একবানা ঠেকা-নাও ঠেলিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। অথচ তখন পদ্মাব বৃক্ষ বিরাটরামলে ভরাপালে নৌকা চলিয়াছে।

আমাকে দেখাইয়া মিচ্চাশা করিলেন, “এই যে নদীর নাও ভরাপালে চলিয়াছে, ইহাদের কি পথচিহ্ন কিছু আছে? আর ঐ ঠেকা-নাওয়ের পথই কদায় কদায় আঁকা রহিল। ইহার কোনটি সহস্র ও আভাবিক? আমরা সহস্র পথের পথিক, আমরা এই কৃত্রিম পথচিহ্ন রাখিয়া যাওয়ার বড় মনে করি না।”

ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের ইতিহাসই বা কি? মানবসমাজ-রচয়িতাদের আমরা মানি না, আশ্চর্য বড় বড় নরহত্যাদের পথচিহ্ন। আমাদের শাস্ত্র ও জ্ঞান সবই কৃত্রিম, সহস্র সত্য তাহাতে ধর পড়িলে কেন?

সহস্রের কথা বলিতে বলিতেই বাউলদের বিষয়ে আলোচনা এখনকার মত সমাপ্ত হউক। বাউল-তত্ত্বের বড় বড় মর্ম হইল, কাব্যযোগ পূর্যোগ অহংগর্ভের সহস্রতত্ত্ব প্রকৃতি। তাহার মধ্যে সহস্রের কথা প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতায় কিছু কিছু বলিবাছি। এই বক্তৃতায়ও কিছু বলা গেল। তবু আরও দুই-একটা কথা বলা দরকার।

বাউলেরা মনে করেন সহস্রই হইল শাস্ত্র ও আভাবিক। বড় উটিলে কতকণ প্রকৃতি তাহা সহিতে পারে? সহস্র শাস্ত্র ও সর্বগত শক্তিই শাস্ত্র। কাম হইল কৃত্রিম ও অশাস্ত্র, তাই কদিক। সহস্রই হইল নিষ্কাম শাস্ত্র ও চিরন্তন। ভগবান সহস্র তাই তাঁহার শব্দ নাই প্রকাশ নাই।



বৃদ্ধ ঈশান বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি ? ঈশান গাহিলেন—

আমার সাঁই নামতো তাম্বা ঢাকা যে কলসে কণে কণে ।

যম নীরব গুফ সাঁই, কোব সাধনে বাহির হলে ঐক্য কলস পাই ?

(সঙ্গে) চক্রভাঙ্গা, বিক্রভাঙ্গা, কোনো দশ নাই ।

বিশ্বব্রহ্মের বিরাট আকাশে গ্রহচক্রভাঙ্গার প্রতিফলনের দ্বারাও কোথাও শব্দ নাই, ঘোষণা নাই। অথচ গো-গাড়ির 'ভাঙা-চাকা' বলে কণে কণে। বিশাল প্রকৃতির এই নীরবতাই ইহার স্বাভাৱ্য ও সহস্র শক্তির পরিচয়। বেহের মধ্যে প্রাণও তেননি সহস্র, তাহার কোনো ঘোষণা বা বেদনা নাই। বেদনার অর্থ প্রকাশ, প্রকাশ মাত্রই কৃত্রিম, তাই বেদনায় বা বহনায় ভয়া। বেহের মধ্যেও প্রাণ হইল সহস্র, তাহার কোথাও বেদনা নাই। বেদনা হইলেই অধ্যাত্ম সূচিত হয়। তাহা সহস্র নহে।

এই সহস্র বৃত্তিতে পাখি না বলিয়া ইহার মূল্য কন নহে। মিস্রা বা স্মৃতিও তো আমরা বৃত্তিতেই পারি না, অথচ তাহাই আমাদের ঐচ্ছিকতা রাখে। আমার স্মৃতিই মতো আমার সহস্রও চিরদিনই আমার জ্ঞানের অতীত, অথচ তাহাই আমার নিত্য ও শাস্ত জীবনের অন্তর্ভুক্ত। এই চলি সহস্রের, এই শাস্ত অন্তর্ভুক্ত বাউলের সাধনার ধন।

[সমাপ্ত]

সন্ধান আমার মোতের দীয়া— আমার ভাসাইলে কোন্ খাটে ।

আপে আছার পাছে আছার আছার নিশ্চইত ঢালা—

আছার রাতে কেবল বাজে লহরিরি মালা গো ।

তার জলেতে কেবল চলে নিশ্চইত রাতের ধারা ;

সাধের সাঁই চলে বাতি নাই গো কুল-কিনারা ।—

বিবরাতি চলে গো— বাতি জলে সাথে সাথে গো ।

ধরিয়ার সাগর ওগো অকুলের কুল-গথা

আর কর বাক্যে, কেমন ডাকে, পাইবু গো বেথা ।

তোমার কোলে শইবা তুলে জুড়াইবু জালা ।

তোমার বুকে নিবু বুঝে জুড়াইবু জালা ।

—বাউল গুহারাম

বান্ধীকি ও কালিদাস

ত্রিবিজ্ঞপদ ভট্টাচার্য

পূর্ব এক প্রবন্ধে^১ কালিদাসের উপহার সহিত মহর্ষি বান্ধীকির উপহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু উপহার মন্তাই কালিদাস বান্ধীকির নিকট ভগ্নী নহেন। বর্ণনা এবং ভাব—এই উভয়ের মন্তও কালিদাস বান্ধীকির ভ্রাতৃত্বের নিকট কি পরিমাণে ভগ্নী ছিলেন, তাহা একটু তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা প্রধানতঃ যেযদ্বয়ের বিষয়েই আলোচনা করিব।

যেযদ্বত কালিদাসের এক অপরূপ সৃষ্টি—ইহা বিশ্বের পতিতম ও সৌন্দর্য্য একবারো কবিতা লইয়াছেন। কালিদাসের পূর্বে, মনুপ্রকৃতির নিকট দোষের আবেদন লইয়া যে কোনও মতেই প্রাণী উপস্থিত হইতে পারে, এবং সেই দোষ লইয়া যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যাইতে পারে—ইহা হইতে কোনও কবির কল্পনায় উৎপত্তি হয় নাই। কালিদাসই 'দূতকাব্য'র অসমতন প্রাথমিক আবিষ্কার এবং বহু খ্যাতিমান কবি, যিনিও তাঁহারই প্রদর্শিত সুরগি অমূল্যরূপে করিয়া শত শত দূতকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি কালিদাসের 'যেযদ্বত'র কাব্যস্বাদা ও রসসম্ভার আশ্রয় ও পর্বস্ব অতুলনীয় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কালিদাস যে পরোক্ষভাবে এই দোষের পরিকল্পনা 'রামায়ণ' হইতেই পাইয়াছিলেন, তাহা নক্ষিপাবর্তনায় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সকল চীনাধিকারী উল্লেখ করিয়াছেন।^২ এমন কি, নক্ষিপাবর্তনায় এই ইন্দ্রিও করিয়াছেন যে বিরহী বন্ধ এবং অলসকাবাসিনী বন্ধপত্নী রামচন্দ্র এবং সীতানন্দীরই কবিকল্পিত প্রতিবিম্ব!—

ইহা শুদ্ধ কবি: সীতা: এতি হনুমতা হারিতা: সন্দেহ: ক্ষমেন

সদৃশত্বং তদ্ব্যবহারিক্যাকাঙ্ক্ষাংপালয়েন সন্দেহ: করোতি।।^৩ —যেযদ্বত-চীতা: ১১, ১

যেযদ্বতের পরিবেশটি কেমন? প্রথমেই দেখি, বিরহী বন্ধ রামসিঁরি পর্বতের শৃঙ্গবর্শে ঝড়োইয়া রহিয়াছে, বর্ষাকাল সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, উপরে ঘনকুক্ষ যেযদ্বাশি গিরিশাশ্রুসেপে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, মনে হইতেছে যেন মনমত হস্তী বজ্রকৌড়ায় মাতিয়াছে। শিগরের চকুপার্শ্বে হৃৎক-বৃক পুষ্পসম্মার

১ বিদ্যাসরসী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

২ ভূতবীর: 'সীতা: এতি রামত হনুমতসন্দেহ: মনসি বিধায় সন্দেহসন্দেহ: কবি: কৃতবান্—ইত্যাহা:।' —হরিশংখ, চীতা,

১১। কালিদাস বস: হনুমতসন্দেহের উল্লেখ করিয়াছেন—'ইত্যাহাতে পদনন্দন: বৈবিকীবোধুদী সা'—ইত্যাহা।

৩ পরবর্তী চীনাধিকার পুণ্ডরীকী তাঁহার 'বিদ্যাসরসী' চীতার নক্ষিপাবর্তনায়ের এই অভিমতের প্রতি চীতা করিয়া বলিয়াছেন—'কবিকল্পনাত্তে সীতারামবৃত্তান্তসংবাদিগীতি: কেতিং, ততঃ পরমর-সন্দেহ:বাহার: এতদ্ব্যবহার:কবিতা: কবিতা: 'অনন্তরমায়ান—' ইতি 'হৃৎকপীতঃ'—' ইতি ৩ অস্তরতটীকায়: প্রতিপাদিতব্যং, উপরি ৫ 'ইত্যাহাতে পদনন্দন: বৈবিকীবোধুদী সা' ইত্যাহ উপনন্দন: প্রতিপাদিতব্যং, উপনন্দন: অর্থ:কব: কবিতা: ইতি।' —শু. ৭ (বান্ধীকির সন্দেহ সংকলন)।

সমুদ্র। বন্ধ একাকী সেই প্রভাত প্রুণরাজি চরন করিয়া বেঘের প্রতি অঙ্কলি নিবদ্ধ করিয়া ডাহার কাছে দোত্যা প্রার্থনা করিতেছে। পরিবেশটি কালিযানের প্রতিভারই অম্লরূপ সৃষ্টি।—

স সত্যঃ হুটমহুঃ কলিতার্থ্য তৈঃ

ঐতঃ ঐতিহ্যবৎসনঃ আশ্রয়ঃ ব্যাঘ্রায়।

কিন্তু রামায়ণে কি আশ্রয় অম্লরূপ চিত্রই দেখিতে পাই না? বালিবধের পর রামচন্দ্র লক্ষণ সমভিযাহারে পর্বতগুহার কালবাণন করিতেছেন, শূন্য হইতে শূন্যেরে ঘূর্ণিয়া বেড়াইতেছেন—কখনও প্রভবগগিরির শিখরে, কখনও বা মাল্যবানু পর্বতের সাগুমেখে। বর্ষাকাল সমাগত, চতুর্দিকে হুটমহুঃ প্রসূতিত, কক্কততরুপংক্তি পর্বতশিখর যুগিত করিয়া রাখিয়াছে। রামচন্দ্র লক্ষণকে বলিতেছেন—

কতিং বাশান্তিঃ ক্কাং বর্ষামদনমুৎথকান্।

পতঃ সন্মবুৎথাং পতীঃ হুহুচিরা ইব।

হুটমহুঃ পতঃ পৌষিঃ। পুশিতাং দিক্সিমহুঃ।

কক্কতাবাক বৃক্কতঃ কবসৈবোদিতঃ সমুৎ।*

মব শোকান্তিহুতঃ কাশকলীপানঃ দিতান্।*

—কিঞ্চিদা ২৭, ২৪

—কিঞ্চিদা ২৮, ১৪

রামচন্দ্র বলিতেছেন—“লক্ষণ! দেখ দেখ! বর্ষার নববারিধারা-স্পর্শক বশতঃ নিবোধনসত্তা তুমি উৎকর্ষাণ ভাগ্য করিতেছে”—

এবা কল-পরিজ্ঞিতা নববারিশক্তিভা।

সীতের শোকসরগা ময়ী বাক্য বিবৃতিঃ।—কি*, ২৮, ৭

দেখমুতেও বন্ধ বেঞ্চকে সাধোধন করিয়া বলিতেছে—

আপুচ্ছ মিলনবহুঃ বুদ্ধবাসিরা শৈলঃ

কালে কালে কবতি ভবতো যদ্য সাধোধনভো

বৈশ্যঃ পুংসাঃ রমুশিতিসমরজিতঃ বেধনাহ।

সেহেবাশ্রিত্যবিরহঃ মুক্কতো বাপমহুৎ।*

রামচন্দ্র লক্ষণকে বলিতেছেন—“দেখ দেখ! মানসবাসনু চক্রবাকসমুৎ প্রিয়াশমভিযাহারে উড়িয়া চলিয়াছে!”—

সমুদিতা মানসবাসনুঃ

মিহাশ্রিতাঃ সন্মতি চক্রবাক্যঃ। —কি*, ২৮, ১৬

দেখমুতে বন্ধও বলিতেছে—“হে দেব! মানসোৎক রাশ্রহঃসমালা গগনপথে তোমার সহায় হইবে”—

তচ্ছ যাতে প্রলাবল্যঃ পলিতঃ মানসোৎকঃ।

সমুৎক্রে কতিপাশ্রিত্যবিরহঃ বর্ণনাঃ।

আন্তক্যাসাং দিক্সিমহুঃ কক্কততরুপংক্তিঃ

—পূর্বে ১১

৬. আশ্রয় : “শক্যমহুঃসমুৎ বেধনোপাশ্রিত্যঃ।

হুটমহুঃবসান্ধিত্যঃ কক্কতঃ দিক্সিমহুঃ। —কিঞ্চিদা, ২৮, ৪

৭. ‘দেখমুতে’ ও সেই কক্কততরুপংক্তি—উৎপাদিত্যঃ কক্কতঃ সন্মতিঃ কক্কতঃ দিক্সিমহুঃ

কক্কতঃ কক্কতঃ কক্কতঃ পর্বতঃ পর্বতঃ তে। —পূর্ববেধ ২২

৮. হুয়াসমুৎক্রে ৪৪ সর্গে পার্বতীর তপস্কার বর্ণনাও এই আশ্রয় পূর্ববৃত্তি দেখিতে পাই—

দিক্সিমহুঃ দিক্সিমহুঃ দিক্সিমহুঃ দিক্সিমহুঃ দিক্সিমহুঃ দিক্সিমহুঃ দিক্সিমহুঃ দিক্সিমহুঃ

তপ্যাত্যে বাহিত্যিকিয়া নৈব-সুখাঃ সন্মতিঃসমুৎক্রে পূর্বে।

আবার, রামায়েণে রামচন্দ্র বলিতেছেন—“মেঘনসুং সলিলাভিভারবশতঃ বেন পবিত্রাশ্চ হইয়া গর্জন করতঃ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শূদ্রাত্তরে লগ্ন হইয়া বিজ্ঞান করিতে করিতে আকাশপথ অতিক্রম করিতেছে”—

সম্বন্ধকঃ সলিলাভিভারঃ

বরংগে সুসেই ঘরীয়াগাঃ

বলাকিনো বাহিরেয়া বনতঃ ।

বিত্রয়া বিত্রয়া পুনঃ প্রয়াগি ।

—কি’, ২৮. ২২

কালিদাস ‘মেঘনুত্বে’ রামায়ণশ্লোকের ভাবটুকু হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন—

জিহ্বাঃ বিহঃ নিবহিষ্ণু পলঃ স্তম্ভ পত্নানি ধর ।— পূর্ব’ ১১

আবার—

হ্যামান্যরমণিতরমণপ্রকঃ সাধু হৃৎ ।

বহুতরমণরমণিতরমণঃ সাধুহ্যামান্যরমণঃ । — পূর্ব’ ১৭

‘কনুভহুত্রি’ প্রত্যেক পর্বতপূর্বে মেঘের কালক্ষেপ হইবে—

উৎপত্তানি স্তম্ভানি লগ্নে বংগিয়ার্ঘ্যঃ দিগাসোঃ

কালক্ষেপঃ কনুভহুত্রী পর্বতে পর্বতে তে ।— পূর্ব’ ২২

‘নীচাধ্য’ গিরিকূটে বেধ বিজ্ঞান লাভ করিবে—

বীচেরাধ্যঃ গিরিবিকসেস্তরঃ দিগান্তিহেতোঃ—পূর্ব’ ২০

মেঘনুত্বে বক্ষ মেঘকে বলিতেছে : “গগনপথে ভুমি যখন অলকাভিমুখে বাহ্য করিবে, তখন বলাকাপংক্তি আবদ্ধমালা হইয়া তোমার সহিত গমন করিবে”—

গর্ভাধানক্ষপরিভ্রমঃ ন্যাবদ্ধমালাঃ

সেবিহন্তে বচনহস্তকঃ খে ভবতঃ বলাকাঃ । —পূর্ব’ ২০

রামায়েণে ইহারই অল্পতপ বর্ণনা দেখিতে পাই—

মেঘাতিকান। পরিলম্পতরী

যাতাব্যুদ্রা বরগৌড়রী

সম্প্রদিত্য ভাতি বলাকপংক্তিঃ ।

লক্ষ্যেব যামা। স্তম্ভরাধরতঃ ।

উভয় বর্ণনাই হুবহু এক ।

কতুলঃহারে বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনার সহিত পূর্বমেঘের বর্ণনার যদি তুলনা করা হয়, তবে একটি বিবরণ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয় । উভয় বর্ণনাই রামায়ণের ত্রিবিজ্ঞানকাণ্ডে বর্ষাঋতুগণনে বিরহবির রামচন্দ্রের বিশাগকে উপলব্ধি করিয়া রচিত হইয়াছে । তবে কতুলঃহারের কবি এখনও নবীন, এখনও ‘পরিণতপ্রাজ্ঞ’ হইয়া উঠেন নাই, তাই রামায়ণের ভাব, ভাষা এবং ছন্দঃ পর্বস্ব’ অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন ; কোনও কোনও স্থলে শ্লোকগুলিও প্রায়ই অভিন্ন, দুই একটি পংক্তির পরিবৃতিসাধন করা হইয়াছে মাত্র । পূর্বমেঘের কবির শিল্পপ্রতিভা পূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাই রামায়ণের বর্ণনাকে তিনি স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাহার সমকালীন আধাব্যবর্ত্তভাগের বাস্তবজ্ঞানের বিচিত্র

১ রামায়ণও দেখিতে পাই যেখানে বনবাহিরায়বর্ষণে লাবাঙ্গিগ্ন পর্বতনিবনসুং দিগ্ন করিতেছে—“বীলেনু ধীলা বনবাহির্যুগাঃ । ক্ষেপু মেঘাঃ প্রতিভাতি সফাঃ । দ্যবাপিন্ধে দ্যবাপিন্ধাঃ । ষগেনু ষগা ইব বহুতুলঃ ।”—কি’, ২৮. ৪০.

২ কতুলঃ : কতুলঃহারঃ, ২. ২৭

৩ লক্ষ্যেবিলম্বতঃ ।

অভিজ্ঞতার সহিত বেথের কায়নিক দৌত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পূর্বমেথের কল্পনা ও বাস্তবের এক অপূর্ব শীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছেন।

দক্ষিণাবর্তন্য হইতে আরম্ভ করিয়া মল্লিনাথ প্রভৃতি পরবর্তী টীকাকারগণ পূর্বমেথের দ্বিতীয় শ্লোকের 'আষাঢ় প্রথম নিবসে' পাঠিট লইয়া বহু গবেষণা ও বৈভূতিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাহারা তারিখ লইয়া বিবাদ করিতে গিয়া কালিদাসের মূল উপলব্ধি অর্থ টুকুই বিস্মৃত হইয়াছেন। দশ দিন বেশী হইল, কি তুড়ি দিন কম হইল, ইহা লইয়া কালিদাস যে খুব বেশী বিব্রত ছিলেন, তাহাতো মনে হয় না।^{১০} টীকাকারগণের এই শূন্যগর্ত বিবাদ বেশিয়া মল্লিনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

ইত্যাহো মূলমন্তো পাণ্ডিত্যকর্কঃ।

ডবে, কালিদাস দ্বয়ের এই 'বর্ষভোগ্য' শাণের অবশিষ্ট চারি মাসের কথা কেন তাহার কাব্যে উল্লেখ করিতে গেলেন, এবং আষাঢ়ের 'প্রথম' দিবসেই বা কেন দ্বক বেথের প্রতি তাহার সন্দেশ নিবেদন করিতে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর রামায়ণের কিচ্ছাটাকাও রামচন্দ্রের বিলাপোক্তিতে পাওয়া যাইবে।

বালিবধের পর রামচন্দ্র শ্রুতীরেব সহায়তায় সীতাবেশের ভ্রম, রাবণবধের ভ্রম আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আকুল হইলে কি হয়? বর্ষাকাল আগত, বর্ষাকালে মৃত্যুভায়া অসম্ভব, আবার শরৎকাল দতক্ষণ না কিরিয়া আসিতেছে, ততক্ষণ তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবেই। তাই যেমি, বালিবধের পর রামচন্দ্র হনুমানকে বলিতেছেন—

পূর্বেহঃ বার্ষিকো বাসঃ শ্রাবকঃ সলিলাসবঃ।
অত্রাঃ সৌম্য চন্দ্রায়ে বাসো বার্ষিকশক্তিভ্যঃ।
নামমুক্তোদগমঃ অধিগমঃ পূর্বাঃ শুভম্।
অনিম্নং বৎসাত্যাহঃ সৌম্যং গর্ভেতঃ সহসম্ভাঃ।

ইহঃ দিগন্তহা ইয়া বিপাশা মূলমন্তোঃ।
অকুলমলিা সৌম্যং অকৃতকমলোৎপলাঃ।
কার্ষিক্যে সমুদ্রাণ্ডে হঃ শ্রাবণকঃ বতঃ।
এমঃ সমগ্রঃ সৌম্যং অধিগমঃ বসাসম্ভাঃ। —কি', ২০, ১৪-১৭

আবার, রামচন্দ্র এখন সীতাসেবীর কথা স্মরণ করিয়া, উদীয়মান চন্দ্রবিষের দর্শনে পীড়িত হইয়া বীতশ্রিত্ত অবস্থায় বর্ষারম্ভী অতিবাহিত করিতেছেন, তখন লক্ষণ তাহাকে স্যান্ধ্যাক্ষলে বলিতেছেন—

শরৎকালঃ প্রতীক্ষ্যঃ আয়ুটুক্যোদগমঃ।

নিরম্য কোপঃ পরিপাশ্যতাঃ পরঃ।

ততঃ বহাতিঃ দশকঃ বাধ্যঃ যঃ বহিষ্তসি।

—কি' ২৭-২৯

কবয়ঃ সাল্যঃ-তুহোঃ যম্যঃ সহঃ। —কি' ২৭-৩০

১০. যমজ তাহার টীকা 'এশবদিসে' এই পাঠিট গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে 'এশবদিসে' পাঠিটির উল্লেখ মূল আশে 'ব'-কার ও 'প'-কারের সিগিলাসুত্। তুলসীর: "কোড়িৎ মকার-ধকারো-সিগিলাসুত্‌সোহাং 'এশ'-ইত্য়াহু:। কং কথমপি চৈতন্যবর্গঃ প্রতিপ্তাঃ। বর্ষাকালতঃ অন্ততঃ আদিমিন্দু-ইত্যেতৎ অতীত বিলম্বঃ।" মল্লিনাথ 'এশবদিসে' পাঠের বিলম্ব হুতি দেখাইতেছেন: "কং: তর্হি 'শাশাতো যে তুলসীমল্যাহুতঃ শাস্ত্রপাদো'—ইত্যাদি। তখনং প্রবোধাবিকৃত পাশতঃ মসেচুইয়াবশিত্ত উচিতঃ। ঐশবদিস্যাবিক্যামিতি চেৎ। স্বাক্ষেৎসি কং: সঃ বিশেতি-দিবসে-নুনিবাৎ ইতি সন্তোদয়ৎ। তস্মাদীশবদৈবমাত্মবিকল্পিতং ইতি নষ্টকং: 'এশবদিসে' ইতি।"—পরবর্তী টীকাকার পূর্ববর্তী তারিখপত্র লইয়া কোনও বিবাদের অবতারণা না করিয়া নিজের দৃষ্ট কল্যোকেই পরিচয় দিয়াছেন। টীকাকারে পূর্ববর্তী টীকাকারগণের প্রতি পূর্ববর্তী বিলম্বপূর্ণ প্রোক্ত উক্তি করিবার যোগা—"দ্বকবিভাগি পাঠ্যবাক্যতঃ সোহাৎ। রামচন্দ্রবৎ শ্রৌতব্যঃ বিহাৎ। বিদ্যুৎবদনামো যাক্ষিক্যাকাশাণাঃ। তস্মাদ্ভবিন্দুনাঃ গুটীতঃ নমোহং।"—পৃ. ১১৪

লক্ষণের বাক্যে রামচন্দ্র আশ্রিত হইয়া বলিতেছেন—

এব শোকঃ পরিত্যক্তঃ সর্বকর্ষাধ্যাক্ষকঃ ।

পর্যকালঃ প্রতীক্ষিতে বিতোহসি ধ্বজে নবঃ ।

বিক্রমঃ প্রতিহতঃ তেনঃ শ্রোতব্যঃ সারথী ।

—কি' ২১-১৩-৪৪

“এই আমি শোক পরিত্যাগ করতঃ বিক্রম অবলম্বন করিয়ায় ; তোমার কণাৎত আমি পরংকালেরই প্রতীক্ষা করিব ।”

কিছু পরেই, আবার রামচন্দ্র লক্ষণকে বলিতেছেন—

যসি শ্রৌষ্টপদঃ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাঃ বিবক্ষতান্ ।

নিবৃদ্ধকর্ষাধ্বজেনা নুনঃ সঙ্কিতসকরাঃ ।

অমর্যাদলনঃ সারথীনাং হৃদিতাঃ ।

আযাচীনভূষণতো ভরতঃ কোশলাধিপাঃ । —কি' ২৮-৪৪

“শ্রৌষ্টপদব্রাহ্মণে (ভাত্রব্রাহ্মণে) বেদাধ্যয়নেচ্ছা সারগত্ৰাঅগণ্যের অধ্যয়ন সময় আগত প্রায়।^{১১} মনে হয়, কোশলাধিপতি ভরতও তাঁহার সকল ব্রাহ্মকর্ম সম্পূর্ণ করিয়া, ব্রাহ্মসংগ্রহ করতঃ ‘আযাচী’ অহুষ্ঠান করিয়াছেন ।”

কিছু প্রায় হইতে পারে, রামচন্দ্র একই উক্তিভেদে কি করিয়া ‘আবশ্যাস’ (‘পূর্বাংগং বাবিকো বাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ’) এবং ‘আযাচী’র সময়ের স্থাপন করিলেন? এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই মেঘদূতের স্রোতের প্রকৃত পাঠনির্ধারণ নির্ভর করিতেছে—কেননা, মেঘদূতেও সেই অসামঞ্জস্যই আগত্যমুগ্ধিতে প্রকট হইয়া ওঠে—‘আযাচ্য প্রথমদিবসে’ এবং ‘প্রত্যাহরে নভসি’ এই উক্তিযুগ্মে মধ্যে বিরোধ এবং অসামঞ্জস্য যন্ত্রিনাথের মুক্তিপরম্পরাগবেও আরও পণ্ডিত অস্বীকার্য্যমিতই গ্রহিয়া গিয়াছে। ইহার মীমাংসা কি?

দ্রামাঙ্গণের উদ্ধৃত স্রোকে—“আযাচীনভূষণতো ভরতঃ কোশলাধিপাঃ” এই পংক্তিটির প্রকৃত তাৎপৰ্য্য-নির্ণয় প্রথমে কর্তব্য। ‘আযাচী’ এই শব্দটির অর্থ ‘আযাচী পৌর্ণমাসী’, এবং এই ‘আযাচী পৌর্ণমাসী’-হুক্ত বাক্যকে ‘আযাচ্যমাস’ বলা হইয়া থাকে।^{১২} এক্ষণে, একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রদর্শনযোগ্য—তাহা হইতেছে, মাসগণনার বিভিন্ন পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতে পক্ষ, বাস, শুক্ল এবং বর্ষগণনা বিভিন্ন ধরনের ছিল, এবং যুগ্মসং বিভিন্ন পদ্ধতিতে কালবিভাগ করা হইত।^{১৩} পৌষ, শিখা (বা মুখ্য চান্দ্রমাস) এবং পৌষ চান্দ্রমাস—কালবিভাগের এই তিনটি মুখ্য পদ্ধতির প্রচলন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে। খৃঃ ১১শ শতকের খ্যাতনামা কবি ও আলংকারিক রামশেখর তাঁহার ‘কাব্য-

১১ শ্রুত্বাঃ বহুকালিহিতাঃ অথবা ৪. শ্রৌক ২৭

১২ তুলসীঃ : পূর্বমুখ্য পৌর্ণমাসী পৌষী মাসে শুক্ল পর লা।

বাসা ন পৌষো দ্বাদশমাসঃ কাল্যাপ্যন্তঃ—অমরকোষ, ১.৫.১৪

“অযাচী বসন্তের সহিত হুক্ত মাসি (পৌর্ণমাসী)” এই অর্থ ‘বসন্তের হুক্তঃ কালঃ’ (‘পা. হু. ৪.২.১০’) বুঝাইবারে ‘অযাচী’ শব্দের উত্তর ‘অ’ প্রত্যয় যোগে ‘আযাচী’ (‘পৌর্ণমাসী মাসি’) দশ হইবে এবং ‘অযাচী পৌর্ণমাসী যে মাসে’ এই অর্থ ‘পুনরায়’ ‘সাহিত্যি পৌর্ণমাসীতি লজ্জাত্য’ (‘পা. হু. ৪.২.২১’) বুঝাইবারে ‘আযাচী’ শব্দের উত্তর অ’ প্রত্যয় যোগে দ্বাদশমাসী ‘আযাচ’ শব্দ নিস্পন্ন হইয়া থাকে। ‘কাব্যিকাব্যুত্তি’ শ্রুত্বা।

১৩ এবিধের বিবৃত আলোচনার ব্রহ্ম খণ্ডাবলম্বার তিলক এন্টী The Orion গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় (Agrahayana) শ্রুত্বা।

মীমাংসা' গ্রন্থের ১৮শ অধ্যায়ে 'কালবিভাগ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।^{১৫} নিম্নে উপরি-উক্ত ত্রিবিধ কালবিভাগ সম্বন্ধে হামশেখরের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

রাশিতো হ্যাত্তরসংক্রমণকৃত্যাসো মাসঃ, বর্ষাদি দক্ষিণায়নম্, শিবিরাশিক্তরায়াঃ, ছাত্রাঃ সংবৎসরঃ—ইতি পৌরঃ মাসঃ। পঞ্চম্যাহোরাত্র পক্ষঃ। বর্ষমাসসৌম্যত্রিবিধ পক্ষঃ, বর্ষমাসসৌম্যত্রিবিধ পক্ষ ইতি শিরাঃ মাসবান্। অত্র চ যেনোদিতঃ কৃৎস্নোদপি ত্রিষাংকপাঃ। শিরাঃসেব যাত্রাশিক্তপক্ষঃ চাত্রবান্। ইবদ্যার্থ্যবর্ষনিবাসিনস্ত কক্ষতঃ মাসমাত্রিতাঃ। একঃ চ পৌ পক্ষো মাসঃ। যৌ মাসৌ ঋতুঃ। যাত্রাভূতানাং পরিবর্তঃ সংবৎসরঃ। স চ চৈত্র্যাদিগিহিতি বৈবজ্যাঃ, শ্রাব্দাদিগিহিতি লোকসাম্রাট্যনিঃ। তত্র নভা নভস্তত্র বর্ষাঃ, ইষ উর্জস্ত পথঃ, নহাঃ নহস্তত্র হেমন্তঃ, তপ্তপথস্তত্র শিবিরাঃ, বহু-বর্ষস্তত্র বসন্তঃ, পক্ষঃ চ ত্তি চৈত্র্যঃ।^{১৬}

অর্থাৎ দুর্ব্বের এক রাশি হইতে অন্ত রাশিতে সংক্রমণের মধ্যবর্তী কালব্যবধানকে মাস বলা হয়। বর্ষা ঋতু হইতে দক্ষিণায়নের আরম্ভ, এবং শিবির ঋতু (ঋতু ঋতু) হইতে উত্তরাংশের প্রবৃতি। দক্ষিণায়ন এবং উত্তরাংশ উভয়ের সম্মিলিত পরিমাণ 'সংবৎসর'। ইহাকে পৌর মাস বলা হইয়া থাকে। পঞ্চম অহোরাত্রের সমষ্টি একটি পক্ষ। চন্দ্রের প্ত্রিবা বে পক্ষে বৃদ্ধি পায় তাহা চত্রপক্ষ; এবং চন্দ্রের কৃৎস্না বে পক্ষে বৃদ্ধি পায় তাহাকে কৃৎস্নপক্ষ কহে। এই উভয়পক্ষ মিলিয়া একমাস হইয়া থাকে। ইহাই শিরা মাসের পরিমাণ। এবং এই শিরা মাসাত্ত্বসংগ্ৰহই সকল বৈদিক ত্রিষাংকপাৎ অল্পবৃত্ত হইয়া থাকে।

শিরা মাসমানের পক্ষদ্বয়ের ক্রম বিপরীত হইলে (অর্থাৎ মাসগণনা যদি কৃৎস্নপক্ষের প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ হইয়া চত্রপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হয়) তাহা (গৌণ) চাত্রমাস মানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। আর্ধ্যবর্ত জনপদের অধিবাসিগণ এবং কবিসম্প্রদায় এই (গৌণ চাত্রমাস) মানই আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপে দুই পক্ষ মিলিয়া মাস। দুই মাস মিলিয়া এক ঋতু। চতুষ্টি ঋতু মিলিয়া সংবৎসর গণনা করা হইয়া থাকে। বৈবজ্ঞপথের (অর্থাৎ শ্রোতিবিশ্বপথের) মতে চৈত্র্যমাস হইতে সংবৎসরের আরম্ভ। কিন্তু লোকব্যবহারে শ্রাবণ হইতে সংবৎসর গণনা করা হয়। এই মতে নভঃ (শ্রাবণ) এবং নভস্ত (ভাদ্র) এই দুইমাস লইয়া বর্ষা ঋতু, ইষ (আশ্বিন) এবং উর্জ (কাতিক); পথঃ, নহাঃ (অগ্রহায়ণ) এবং নহস্ত (পৌষ)—হেমন্ত, তপ্তাঃ (মাঘ) এবং তপ্তপ্ত (ফাল্গুন)—শিবির, বহু (চৈত্র্য) এবং মাসব (বৈশাখ)—বসন্ত, পক্ষ (মৌঠ) এবং চ্তি (আষাঢ়)—গ্রীষ্ম।

কাব্যমীমাংসার উপরি-উদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে এবং তাহা এই যে আর্ধ্যবর্তনিবাসিগণ লোকব্যবহারে এবং কবিসম্প্রদায় তাহাদের কাব্যে গৌণ চাত্র মাস এবং শ্রাবণাদিসংবৎসরই আশ্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং এই মতাত্ত্বগারে 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী'র পরবর্তী 'শ্রাবী কৃষ্ণা প্রতিপৎ' হইতে আরম্ভ হইয়া 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী' তিথিতে বর্ষশেষ হইত—ইহা নিঃসন্দিক্তরূপে সিত হইতেছে। অন্তঃপ্রবাসীরা 'আষাঢ়ী' শব্দের দ্বারা যে গৌণ চাত্র সংবৎসরের অন্ত্যাবিসম্বাদ আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাতে কোনও সংশয়ই থাকিতে পারে না। তাহার পর দিবস হইতেই গৌণ চাত্র শ্রাবণ মাসের হুচনা। অন্তঃপ্রবাসীরা

১৫ অধ্যায়সময়ে তিনি বলিতেছেন : ইতি কালবিভাগঃ দক্ষিণায়নঃ।

কবিত্বিঃ বহাৎ মোহ ইহ দিষ্টো মাসকতিঃ।—পৃ. ১১২ (GOS. Edn.)

১৬ কাব্যমীমাংসা, পৃ ১৮—১৯। 'তুলনীয়া কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ২.২.১.১৬ (পৃ. ১৮৮-১৮৯)। মহাবীর কবিত্ব।

রামায়ণে ‘পূর্বেহিঃ বাদিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ’ এই উক্তির দ্বারা রামচন্দ্র নববর্ষায়ত্তে গৌণ চান্দ্র শ্রাবণ মাসেরই পুণ্যনার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহা তো দৃষ্টিশূন্যই বটে !

রামায়ণলোকে রামচন্দ্র বলিতেছেন— “মনে হু, কোশলাধিপ ভরতঃ ত্বাহার সকল রাজকর্ম সম্পূর্ণ করিষ্য রাজসংগ্রহ করতঃ ‘আবাটী’ (পৌর্ণমাসী) অহুষ্ঠান করিতেছেন।”—এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রাজসংগ্রহের সহিত আবাটী অহুষ্ঠানের সম্বন্ধ কি ? পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে গৌণ চান্দ্র সংবৎসর শেষ হইত ‘আবাটী পৌর্ণমাসী’ তিথিতে। সুতরাং আবাটী পৌর্ণমাসীই ছিল গৌণ চান্দ্রসংবৎসরের অন্তিমদিবস। কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ দেখিতে পাই— সেই দিন গাণনিকবৃন্দ (accountants) রাষ্ট্রের বার্ষিক আয়ব্যয়ের আখেরী হিসাব মিটাইয়া দিতেন। কোটিল্য বলিতেছেন—

গাণনিকানি আব্যাটীমাসকন্দ্—অর্থশাস্ত্র. ২৪ অবিকল্প. ১৪ অথবা.

২৪শ একশ (“অশপটমে গাণনিকানিকশা”)

তাঃ ক্রামশাস্ত্রী ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

Accounts shall be submitted at the close of the month of Āśāḍhā.^{১০}

ইহার পর দিন, অর্থাৎ নববর্ষের আদিদিবস শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপদ ‘হুঠ’ এই মানে পরিচিত। অর্থশাস্ত্রে কোটিল্য ‘হুঠ’ এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ—

রাজকর্ম মাসঃ পক্ষো দিবসঃ হুঠব্—ইতি কালম্—অর্থশাস্ত্র ২. ৬. ২৪

উপর-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রদর্শিত হইতেছে যে, রামায়ণের কিছুকাল্যাকাণ্ডের যে বর্ষাবর্ণনা আছে, গৌণ চান্দ্র শ্রাবণ হইতেই তাহার আরম্ভ। অতএব শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে চারি মাস গণনা করিলে ‘কান্তিকী পৌর্ণমাসী’ তিথিতেই তাহার অবসান হয়। তাই রামায়ণে সেবি, বর্ষাকতুর চাতুর্মাস অন্তীত হইলে, রামচন্দ্র লক্ষণকে বলিতেছেন—

“ত্বাহার বারিকা মাসা দ্বতা বর্ণগতোপমাঃ।

নব পোকাতিভুতত তথা নীতানশততঃ।”—কি, ৩১. ৪৪

একদা, মেঘদূতে আমরা কি সেবি ? মেঘদূতেও বঙ্গ গ্রন্থিকে দাবনা দিতেছে—

পাণ্ডায়ে যে ভূপদগন্যাহুখিতঃ শাস্ত্রপাণ্ডো

সেবাং মাসদ্বং দধত চতুয়ো সোমেন মীলহিতাঃ।

পঞ্চাশায়াঃ বিবহুখিতাঃ তাঃ ত্রয়স্বাস্ত্রিহিতাঃ

নির্বোকায়াঃ পলিতলকতত্রিকিতাঃ কশাহ।

কালিদাস এই চাতুর্মাসের কল্পনা যে কিছুকাল্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের বিলাপ হইতেই পাইয়াছিলেন, তাহাতে

১০ Kautilya's *Arthashastra* (Translation, Third Edn., 1929) p. 63, পাণ্ডীকায় তাঃ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন : “I, e. the end of the year. On Vyusha, the new year's day, the first day of Śrāvaṇa, the examination of accounts begins.” অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ড. ব. কপতি শাস্ত্রিহরণ ‘আবাটী’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন “আবাটমাসি” (ঐক্যঃ অর্থশাস্ত্র. ১৪ ভাগ. পৃ. ১০৭. ত্রিভাষ্য সংকলন)। কিন্তু ইহা ভুল। কেননা, ‘আবাটী’ শব্দ ‘আবাটী পৌর্ণমাসী’ অর্থেই প্রযুক্ত হয়, এবং পূর্বেও ত পানিনীয় ব্যাকরণসংগ্রহে এই প্রয়োগই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ “ক্লিপতঃ চতুঃপক্ষাং চাহোমাসাণাং কর্মসংকল্পতঃ। তথাশাস্ত্রীপদবদানকূঃ পূর্বা বা বজ্জাৎ”—অর্থশাস্ত্র. পৃ ৬০। এখানেও তাঃ শাস্ত্রী ‘আবাটীপদবদানকূ’ এই পদের অনুবাদ করিয়াছেন : “at the end of the month Āśāḍhā”.

কোনও দৃষ্টান্তই নাই। এবং রামায়ণে মহাকবি বাণীকি যেমন শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে (অর্থাৎ নবম বর্ষ হইতে) কাটিকী পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত চাতুর্থাস্ত্র বর্ষাকাল গণনা করিয়াছেন, কালিঙ্গাণ্ডে সেইরূপ করিয়াছেন। ইত্যং, মেঘদূতের প্রথম স্লোকে 'আষাঢ় প্রথমদিবসে' পাঠ অপেক্ষা 'আষাঢ় প্রথমদিবসে'—এই পাঠই চাতুর্থাস্ত্র গণনার ঠিক দিরা যুক্তিসূক্ত, এবং পরবর্তী স্লোকের 'প্রভাত্যসরে নভসি' এই উক্তির সহিতও বিরোধশূন্য। যৎকৈ 'বর্ষভোগ্য' বিরহের অবদান কাটিকী শুক্ল একাদশী তিথিতে—

শাণক্যো বৈ তুঙ্গপদ্মাদুখিতে শার্দ'পাতৌ।

অতএব আষাঢ়ী শুক্লকালীন তিথিতে চাতুর্থাস্ত্রের প্রথমদিন পড়ে। বৎ 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী'তে ('আষাঢ় প্রথমদিবসে') মেঘের প্রতি সন্দেশ নিবেদন করিতেছে। অতএব তাহার চাতুর্থাস্ত্রের চারিদিন অতীতই হইয়াছে। ১৭ কাটিকী শুক্লকালীনতে যৎকৈ বিরহের অবদান; ইত্যং শুক্লপক্ষের অবশিষ্ট চারিটি রজনীর (খাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা) মাত্র বৎ উৎকর্ষভরে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে—

পশ্চাৎ: বিরহোদিত: ত: তমাস্তিহাং:

নির্বেকাং: পশ্চিমপশ্চিমিকাহৃৎসাহ।

—উত্তর মেঘ, ১১৬

মেঘদূতের এই উক্ত স্লোকের ব্যাখ্যাত্তেও মন্নিমাথ অনাবশ্যক বিবাদের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা আলোচনার মাত্র প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

অনু কৈচিৎ 'নভো-নভস্তয়োঃ বার্ষিকং বৎসব্যাপ্যাদিত্যুদয়ঃ বার্ষিকবৃত্তমিতি' ত্যাদিহা শুক্লমঙ্গলাসম্মতবিরোধ ইতি পর্য্যায়:। তৎসর্ববৎসবত্। অন সতসব্যাপ্যায়ো যাসা ইত্যুক্তং কবিন, নহু তে বার্ষিকা ইতি। তমাস্তিহাংসোপাংগঃ এ। বৎস ন্যাবেনোবত্। 'বৎসব্যাপ্যাদিত্যুদয়ঃ পর: পরংকাল:' ইতি ত্যমপি আকার্তিক-সমাপ্তে: পরংকালোদয়ভে: পশ্চিম-পশ্চিমিকাহৃৎসাহ ইত্যুক্তং। নহু তেব পরংকালোদয় উক্ত ইতি বিরোধঃ এ।

কিন্তু মন্নিমাথের এই যুক্তি কি নিসঙ্গ নহে? মন্নিমাথ যেভাবে 'প্রথমদিবসে' এবং 'প্রথমদিবসে' এই উভয়বিধ পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্ততঃ পাঠ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও হেতুই নাই। উভয় পক্ষেই সমান সোৎসাহ, পরিহারও সমান—ইত্যং 'প্রথমদিবসে' পাঠ ত্যাগ করিয়া 'প্রথমদিবসে' পাঠ গ্রহণ করিবার পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে? ১৮ কিন্তু রামায়ণ; কৌটিলীর 'অর্থশাস্ত্র,' শাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী' এবং শাশপেরকৃত 'কাব্যমীমাংসা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল সাক্ষ্য আমরা সংগৃহীত করিলাম তাহাতে ইহাই নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়, যে কালিদাস তাঁহার 'মেঘদূতের' চাতুর্থাস্ত্র পরিকল্পনার মাত্র রামায়ণের নিকট ভ্রমী, এবং রামায়ণের স্ত্রাব গোপীজ্ঞানসংগুন্যাদ্বয়ী সৌগ চাত্র স্রাবণের প্রথমদিবস হইতেই চাতুর্থাস্ত্রগণনা করিতে হইবে। মন্নিমাথ সৌম্যসংগুন্যাদ্বয়ী 'প্রথমদিবসে' পাঠের বিশেষ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনবধানভাবশূন্য।

১৭ মন্নিমাথ বেঙ্গল দিও অর্থাৎ সৌর আঘাতের প্রথম দিন হইতে চাতুর্থাস্ত্র গণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতে যে 'অনামমতঃ, অর্থাৎ যশ দিনের আদিকা, অমিত্ত হয়, তাহা তিনি কোনও যুক্তি বা দেখাইয়া উড়াইয়া দিয়াছেন: "সেবান-বিশিষ্টান্ চতুরাঃ হাসান্। বেঙ্গল-প্রভৃতি-বহিঃসাময়িকানিভ্যাস্তি।" লক্ষ্যদায়িকা: কুঃ ন বিধিক্তি-বিশুদ্ধবৎ।"—বেঙ্গল-
(K. B. Pathak's Edition)

১৮ তুলসীর: কবিতাভাষ্য: সমাঃ সোৎসাহঃপরিহারঃপাঃ বা সম:।

দৈক: পর্য্যায়ভাষ্য: স্রাবঃ স্রাবঃপরিহারঃপাঃ।

কিন্তু চাতুৰ্য্য-পরিকল্পনার কথা (এবং পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ আলোচিত উপমাও কথা) ছাড়িয়া দিলেও, যেসমূহের বিবরণ বহুপরিমাণে রানারণ হইতেই সমাহৃত। কালিদাস পূর্বমেঘে অলকাভিমুখী মেঘের উত্তরবাহী গতিপথ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের জনপদ, গিরি-নদী-উপত্যকা, গ্রাম-নগর-সেবায়তন, অরণ্য ও প্রান্তর, রাজপ্রাসাদ ও উদ্যানকথা-কোবির গ্রানবৃত্তগণের পৌত্তিরহ, —পূর্বমেঘে কালিদাস বেড়াইবে এইসকল বস্তুর সমাবেশ ও বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সত্যই অসৌন্দর্য্য কবিত্বপূর্ণ ও বিশ্বকর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উত্তরগামী পথের সন্ধান কালিদাস কোথা হইতে পাইলেন? বর্ষাকালীন মেঘের ঘাভাবিক গতিপথের সহিত সানন্ত-রক্ষা করিয়া কালিদাস বেড়াইবে মেঘের অলকাভিমুখী সৌত্যের সংযোগ ঘটাইয়াছেন—‘তু সু সেইটুইই কালিদাসের প্রতিভার অনন্তসাধারণত্বের নিবন্ধরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।’^{১১} কিন্তু, এই পরিকল্পনার মূল অঙ্গসম্বন্ধন করিলে, ‘অনরা রানার্ষী কথা’র দিগ্বাই পৌছিব।

কিচ্ছিক্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের আবেশে হৃদ্রীষ গীতঃসেধনের ভ্রত অনন্ত বানর-অকৌহিলী সমাবেশ করিয়াছেন। সেই বিশাল বানরসেনাকে হৃদ্রীষ চতুর্গা বিভক্ত করিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর—এই চতুর্দিকে প্রেরণ করিতেছেন। স্বাক্ষমে, বিনত, অমর, সুসেন, এবং শতবল নামক বৃথপতি গীতাপরিদারগোংহুক চতুর্গবিভক্ত সেই বানরসেনার বেড়ন্তে নিয়োজিত হইয়াছেন। হৃদ্রীষ এক একজন বৃথপতিতে এক এক দিকে প্রেরণ করিতেছেন, এবং সেই সেই দিকে অবস্থিত বিভিন্ন সমুদ্রের বর্ণনা করিতেছেন—

যে কেন লম্বেপাশতঃ বিনি হৃদ্রীষাঃ।

কশীপঃ কশিরাধাঃ স যোঃ লম্বাহবঃ। কিং ৪১.০.০*

পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে অবস্থিত গিরি-নদী-জনপদ-অরণ্যাদি একে একে হৃদ্রীষ বর্ণনা করিতে লাগিলেন—প্রাচীন ভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ভৌগোলিক চিত্র।^{১২} পূর্বে উদ্যানপর্বত, দক্ষিণে স্বতপর্বত, পশ্চিমে অম্বাচল মেঘ, উত্তরে সোমগিরি—এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত গিরি-নদী-সম্বিত জনপদের একখানি আলেশা হৃদ্রীষের বর্ণনার মধ্যে জুটিয়া উঠিয়াছে। কালিদাস তাহার পূর্বমেঘে মেঘের গতিপথ অঙ্গুরণ করিয়া প্রাচীন ভারতের যে সংক্ষিপ্ত জনপদ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা রামাঙ্গীর বর্ণনা হইতে বহুগুণে চমৎকারী ও কবিত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্বমেঘে দলকতৃক এই জনপদ-পরিচয় যে রামাঙ্গণে বানরসেনার প্রতি হৃদ্রীষের নির্দেশবাণীর দ্বারাই অঙ্গপ্রাণিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। রানার্ষণে দক্ষিণাংশের বর্ণনার মধ্যে প্রথমেই বিদ্যা, নর্য্যা, গোদাবরী, দশার্ণ জনপদ এবং অবন্তীনগরীর উল্লেখ দেখিতে পাই।^{১৩} রামগিরি হইতে

১১ এই বিষয়ে ডাঃ এল্. এল্. সেন লিখিত ‘মেঘমুক্ত আবহবৃত্ত’ শিরীক প্রচলিত গ্রন্থে উক্ত্য : ভারতবর্ষ, ১:১২, অধ্যায়

২০ তুলনীয় : ‘মার্সি ভাবম্ ১.১ বহরতৎপ্ৰাণায়ায়তনঃ’

সম্পদে যে তদন্ত জন। দ্রোণি দ্রোণেন্দ্র ১—মেঘমুক্ত, ১০

১২ রাজসরযজের প্রাক্কালে অর্জুন, ভীষ্মেন, সহস্রের এবং নম্রা কতৃক স্বাক্ষমে উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম এবং পশ্চিম-ভারতীয় জনপদ-বিষয় এই গ্রন্থে তুলনীয়। উক্ত্য : মহাভারত, সভাপর্ব. ২৪ অধ্যায়, শ্লোক. ২০-২২।—অর্জুন

২২ কিচ্ছিক্য, ৪১, ৮-১০

উত্তরাভিহী মেঘের ব্যাঘ্রাণের বর্ণনা—কালিদাস এইসকল গিহি-নবী-জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন।
স্বগ্রীব উত্তরাশথগামী বানরযুগ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

ক্লৌক্য গিহিমাশ্রিত বিলঃ তত্ত্ব হৃদয়ম্ ।

অমরোঃ প্রবেষ্টব্যঃ হুস্ত্রাকৈঃ হি তৎ কৃত্ব ॥—কি' ৪০, ২৫

কিঃ ধনপত-শ্রিয়ন্তঃ পাকশাসনিঃ ।

যাওবদ্যমবগাহ্যে বর্ন্যাজো দুর্ভীকঃ ।

ভীমসেনবদ্য ঐরাটঃ নহসবতঃ বশিষ্ঠাৎ ।

আসীং পথবঃ লম্বাঃ হৃদয়ংগতঃ শতুঃ ।

ঐতীতীঃ বহুলো হ্যহনুঃ শিপঃ বাক্যভাষ্যনিঃ ।

—সভা, ২৫, ২-১১ (বাক্যবলী সংগ্রহ),

পূর্বমেঘেও সেই ক্লৌক্যরূপ—তাহারই মধ্য দিয়া মেঘকে অলংকার পৌছিতে হইবে—

প্রাণোচ্চেষ্টপটমিত্রিক্যং তাত্ত্বান্ বিবেশান্

ভেনোদীতীঃ শিববদ্যমবগাহ্যে বর্ন্যাজো দুর্ভীকঃ ।

হাস্যবঃ কৃতপতিশোভনঃ ৭ং ক্লৌক্যরূপঃ ।

ভাবাঃ শাবো বহির্নির্মলানুভূতক্বেব বিকোঃ ॥ —পূর্বমেঘ, ৬০.

তারপর, মেঘমুখের কবি অলংকার যে কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদস্বরূপ। কুবেরনগরীর রমণীগণের দেহযুগ্মে বিচিত্র পুষ্পসজ্জারের দ্বারা অলঙ্কৃত—সেখানে সর্বকালে সর্বকালের যুগশব্দ সমবায়; অলংকার বৃক্ষশব্দ নিত্যপুঞ্জিত, সরোবররাজি নিত্যপ্রফুল্লিত পদ্মবনের দ্বারা শোভিত, প্রসাদসমূহ নিত্যভোজ্যাস্বাদমুচ্ছল। সেখানে শুধু আনন্দময়িত অঙ্গ, অমৃতগভ্রনিত সজ্জা, প্রণয়কলহনিত বিরহ, এবং যৌবনই একমাত্র বয়স। সেখানে বিচিত্রবাস, চিত্র-বিভ্রমকারী বসিরা, চরণের অলঙ্কারগণ—সকলই কল্পবৃক্ষ প্রসব করিয়া থাকে। যকের প্রাসাদমধ্যস্থ সরোবরে সিদ্ধিবৈদূর্ন্যালসময়িত হৈমকমল সর্বদাই প্রফুল্লিত। কালিদাস পার্বতীর বর্ণনাগ্রসবে স্নান-সম্বন্ধে একটি শ্লোকে বলিয়াছিলেন—

সর্বাংশাঃস্নানমুচ্ছন্তে বধাংগেণাঃ বিনির্দেশিতেন ।

—বিখ্যাত বেন বিশ্বের সর্ববিধ সৌন্দর্য একত্র গর্ভনের লালসায় সর্ববিধ উপমা প্রবোধ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বধাবধ বিভ্রাস পূর্ব পার্বতীর নেহুগুণে নির্মাণ করিয়াছিলেন।

অলংকার বর্ণনাগ্রসবেও আমরা সেই একই কথা বলিতে পারি। অলংকার বেন সর্বজাতীয় ঐশ্বর্য, সর্বজাতীয় সৌন্দর্যের সমবায়-কেন্দ্র। প্রবীজনাথের ভাষায়—

এইমত সেক্ষেপে কিরি যেন সেল

হলর ভাসিগা সেল, উতরিত সেল

কাখনার সৌন্দর্য্য অলংকার হাথে,

বিরহিণী শ্রিয়তরা বেধায় বিরাধে

সৌন্দর্যের আদিপট্ট ।

এইস্থলে হানাদ্বয়ের কিত্তিছায়াও ক্লৌক্যরূপের পরশারবর্তী 'উত্তরকূক' জনপদের বর্ণনার তুলনায় করিলে, কালিদাসের অলংকারনার বুল প্রেরণার সন্ধান আবার পাইব। স্বগ্রীব উত্তরাশথ দ্বারী শতবল-নামক বানরাধিপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

উত্তরাঃ কৃতব্রতঃ কৃতশুভ্রাঃপ্রতিভ্রাঃ ।

বিতাপুষ্পলম্বাঃ নদাঃ পদ্মবাহুলাঃ ।

ভতঃ কাল্পন্যপ্রাতিঃ গন্ধিবীতিঃ কুস্তোমকাঃ ।

বিষাধকলসপর্ণাঃ সর্বকামানু প্রব্রুতি চ ।

নীলবৈদূর্ঘ্যপম্বাঃ নভস্তম্র সহস্রাঃ ।

নানাকাল্পানি বাসাসি ফলভ্যন্তে নখোদধাঃ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବିତାଃ ନାମ୍ନାଃ । ଆତ୍ମି ତଥା ଗୁଣାବିତାଃ ।
 ସହାର୍ଦ୍ଦିକମୈତ୍ତ୍ୱଂ କାବ୍ୟମସ୍ତେଷବିତଃ ।
 ନିଶାଂଶେନସବିଚିତ୍ତଃ ନ ଶେଷଃ ସର୍ବତୋ ବୃତ୍ତଃ ।
 ବିଦ୍ୟାସାଞ୍ଚିତ୍ତଂ ବୃଦ୍ଧାଭିନିବିଚିତ୍ତଂ ସହାର୍ଦ୍ଦବିତଃ ।
 ଉଚ୍ଚତ୍ୱମ୍ଭିନାମତଃ କାବ୍ୟତମୈତ୍ତଂ ବିଦ୍ୟାମ୍ନାଃ ।
 ସର୍ବବ୍ରହ୍ମତମୈତ୍ତ୍ୱିୟେନସଂସାଞ୍ଚିତ୍ତଂ ନିଶାଂଶବିତଃ ।
 କାବ୍ୟତମୈତ୍ତାଞ୍ଚିତ୍ତଂ ସହାର୍ଦ୍ଦବିତଃ ।

১। পূৰ্ণচন্দ্রাণি পূৰ্ণানি তেজস ৫।
 ২। বীৰ্য্যং বাক্তবৃত্তান্তানি পূৰ্ণবান্যঃ কতেষ ৫।
 ৩। সৰ্ব্বৰ্ণং বৃন্দেযবানি যন্তব্রাহ্মণে ন্যেত্যতঃ।
 ৪। মহাৰ্ষিণিচিহ্নানি যন্তব্রাহ্মণে ন্যেত্যতঃ।
 ৫। পশুবানি অশ্বব্রাহ্মণে চিহ্নান্তব্রাহ্মণি ৫।
 ৬। বনকাক্ৰান্তানি বাণানি যন্তব্রাহ্মণে ত্রযাঃ।

অলকার জ্যোৎস্নালোকিত হর্ষাচূড়ায় ব্রহ্মসিঁহিত বক্ষগণ মধুশাননত হইয়া বনন পুংগবে আঘাত করিতে থাকে, তখন বেঘনির্দোষদশ গম্ভীর ধ্বনি উদ্ভিত হইতে থাকে—

दत्ताः दद्याः सितमभिरुद्राक्षैस्त हर्षाह्वलानि
श्रोतिश्चाङ्गकप्रथमरुडिताम्बरेयहीसहायाः ।

আসেবলং মনু রতিফল্যঃ অকুৎসিতমুতঃ
 গুণমসীমানমি। শব্দৈঃ পুণ্যবোধহতে।—মেঘনত

ସାଧାରଣେ ଇହାଦୈ ଅନୁରୂପ ଚିତ୍ର ଦେଖିତେ ପାଈ—

ਸਰਬੰਸਾ: ਕਿਮੁਰਾ: ਸਿਧਾ ਨਾਥਵਿਸ਼ਾਯੋਸਾਧਨਾ ।
 ਰਿਸਾਨੇ ਸਹਿਤਾਸੁਤ੍ਰ ਨਾਰੀਤਿ-ਰੰਘਰ-ਸੁਭਾ: ।
 ਸਰਬੰ ਸੁਕੁਤਕਰ੍ਧਾਯ: ਸਰਬੰ ਰਹਿਤਪਰਾਧਨਾ: ।

সর্বে কাৰ্য্যার্থসিদ্ধিঃ কস্মিন্ মহামোদিতঃ ।
 শীতষাট্ৰিনির্বোধঃ সোংকৃষ্টহৃদিতকৈঃ ।
 প্রসূতে সত্যতঃ তন্ম সৰ্বকৃতমবোধমঃ ।

উত্তরযেথে বর্ণিত কুবেলপুরীর অস্থান দৃষ্টের পাশাপাশি রামায়ণে 'উত্তরকুক'র চিত্রটি সহস্রের চিত্রে ভাসিয়া উঠে। একটি ঘন আর একটির প্রতিবিম্ব। কিন্তু প্রতিবিম্ব হইলেও কত চমৎকারী!

তুং অলংকার বর্ণনার জড়ই নহে, বিরহিণী দৃষ্ণপটীর যে চিত্র কালিদাস উত্তরমেঘে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মূল প্রেরণার জড়ও বেদমন্ত্রের কবি প্রামাণ্যের নিকট ঋণী। অশোকবনে থাকসী নদিতৃতা। সীতাবেশীর বিরহমান সেহুষ্টির যে অল্পশব্দ চিত্র বানাদেবের হৃদয়রূপে (খ° ১৫) আভিকবি নিবন্ধ করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের কবিচিত্তে অবিশদগ্নীকরণে মূর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাই বিরহিণী দৃষ্ণপটীর বর্ণনায় কবিচিত্তে আপনার অজ্ঞাতসারেই যেন উহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল—

पुर्णिमाः शुक्ल चतुर्थ्यां च ।

ହୃଦୟୋଃ ଅନ୍ତରା ଶେଷୋ ନରୀଃ ବିଚ୍ଛିନ୍ନିବା ନିଧଃ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

मीठा: पचनलाभाको: मयनसु तति: यथा ।—२' २१. २४-२५.

এই রামাবৈষ্ণৱ শ্লোকটোৱেই কি মেঘনুতৰ 'তৰী জামা শিখৰিপদনা পকবিধাৰোষ্ঠী' এই শ্লোকটিৰ মূল প্ৰেৰণা
জোগায় নাই ?

ঘোটকখা, মেঘদূতের সমগ্র প্রেরণা মহাকবি গাইয়াছিলেন বাঙ্গালীকীৰ্ত্তন রামায়ণ হইতে। কালিদাসের
সদকাঙ্গীন কোনও কোনও আচার্য এই ধ্বংসের উদ্দেশ্য করিয়া কালিদাসের কবিত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

২০ 'কিচ্চিদ্দা' ৪০. ৩৭-৪৭। স্বাধাভাষ্যে বহুতলেই এইরূপ চিত্রের বর্ণনা দেহিতে পাওয়া যায়। দেখা—হুন্দরকাও. অ.
৩৪-৩৪। তুলনীয় : 'হোইসেন্দ্রা বিকচকমলৈঃ ত্রিভুবনধন্যনৈঃ' 'বাগচিত্রঃ মধু নন্দনো-বিস্ত্রম্বাধোবহবঃ' ইত্যাদি—যেদন্ত।

করিতে স্তুতি হন নাই। সেই জন্তই কি মহাকবি তাঁহার মেঘদূতকে ‘দ্বন্দ্বলিপ্যেন্দ্র’ পরিহার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন?—

হানাস্তস্য সননিনীদ্রাভ্যুৎপত্তোঃ সূর্যঃ যঃ

দিঃ, নাপান্যঃ পথি পরিত্রহন্ পুলাহত্যাবলোপান্।—মেঘ’, ১৪

—এই স্লোকের ব্যাখ্যায় মন্নিনাথ একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন—

অন্যেদ্যপার্যন্তঃ ক্ষয়তি—রসিকা নিচুলো বাব মহাকবি: কালিদাসস্ত মহাভাষ্য: পরাশরিতাবা: কালিদাসপ্রবক্তৃদ্ব্যনামা: পরিহৃত্য বহিন্ হ্যনে, তন্মাৎ হান্যঃ উৎ, সূর্য: নির্দোষবাহুরতদ্ব্য: সন্ পথি দারবতবার্ণে। দিঃ, নাপান্যঃ—পূজায়াঃ বহুচন্দ্র:। দিঃ, নাপান্যাত্যত কালিদাসপ্রতিপত্তঃ হস্তাবলোপান্ হস্তবিভাস-পূর্বকানি দ্ব্যনামি পরিত্রহন্।—বহুংগত উচ্চৈর্জবেতি বহুবচনবাহন: বা শ্রুতি কথোক্তিরিতি।

মন্নিনাথের মতে কালিদাসের প্রীতিবন্দী দিঃ, নাপান্যার্থে মেঘদূতের নানাপ্রকার (সাহিত্যিক) দোষ উদ্ভাবন করিতেন। তাই, কালিদাস উপরি-উক্ত স্লোকে ব্যক্তনার সাহায্যে মেঘদূতকে দিঃ, নাপান্যের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য বলিতেছেন।

কিন্তু মন্নিনাথের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। বহু প্রথিতবশ্য: আলংকারিক কালিদাসের মেঘদূত কাব্য হইতে উদাহরণস্বরূপ বহু স্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যিক দৃষ্ট উদ্ভাবনের কোনও চেষ্টাই করেন নাই। ‘মেঘদূত’ কালিদাসের কবিপ্রীতিভার চরম উৎকর্ষের পরিণত ফলস্বরূপ—ইহার প্রতিটি স্লোক হীরকখণ্ডের দ্বারা উজ্জ্বল, সাহিত্যিক দৃষ্টের অবসর কোথায়? তবে দিঃ, নাপান্যার্থে এই দৃষ্টপ্রচেষ্টার হেতু কি? মন্নিনাথের ব্যাখ্যা কি তবে নিতাই অমূলক, স্বপ্নোল-কল্পিত?—তাহাও মনে হয় না। মন্নিনাথ তাঁহার কালিদাসকাব্যের টীকারচর্চায় যে পূর্ববর্তী টীকাকারগণের ব্যাখ্যাকেই বহুদূরপরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আশ্রয় আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাচীন বহু টীকা আশ্রয় প্রকাশিত হইয়াছে। মন্নিনাথের টীকার সহিত উহাদের তুলনা করিলেই প্রাচীনের নিকট মন্নিনাথের অপরিশোধনীয় স্বপ্ন ধরা পড়িবে। মন্নিনাথও তাঁহার ‘সঞ্জীবনী’ টীকার অবতরণিকান্নোকে প্রাচীন ব্যাখ্যাত্তরণের নিকট তাঁহার অধর্মণ্য বীকার করিয়াছেন—

তথাপি দক্ষিণাবর্তনাপাতঃ কুবজমি।

যত: ৫ কালিদাসোক্তিবচনং লভতেহি।

দক্ষিণাবর্ত-রচিত ‘মেঘলেন্দ্রেশ্বর’ টীকা আশ্রয় প্রকাশিত হইয়াছে।** মন্নিনাথের ব্যাখ্যা তাহাই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। পূর্বমেঘের ‘দিঃ, নাপান্যঃ পথি পরিত্রহন্ পুলাহত্যাবলোপান্’ এই স্লোকের ব্যাখ্যায় দক্ষিণাবর্তনাথ যে প্রাচীন কিংবদন্তী উল্লেখ করিয়াছেন, মন্নিনাথ উহাই বহু উদ্ধার করিয়াছেন—তথু খেটুই অংশে দিঃ, নাপান্যার্থে দৃষ্টপ্রচেষ্টার প্রকৃত কারণটির উল্লেখ আছে, মন্নিনাথ সেই অংশটুকুই বাব দিয়াছেন! নিজে ‘মেঘলেন্দ্রেশ্বর’ দক্ষিণাবর্তনাথের ব্যাখ্যা হইতে প্রোহোজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত হইল—

অনন্তমিত্যাহঃ—দিঃ, নাপান্ ইতি কোদপি আচাৰ্য: কালিদাসপ্রবক্তাণ্ ‘অন্তর্য উল্লেখ্যবর্ষণঃ’—ইতি দৃষ্টপ্রচেষ্টা—সূত্রমিতি। তদ্যচাৰ্য: বহুবচনং অপূৰ্ব্বাৰ্থাভিগম্যবিস্ত্রিত্য মেঘোপদেশব্যাঙ্গল কবিরূপালভতে।

মন্নিনাথের উদ্ধৃত ব্যাখ্যায় সহিত দক্ষিণাবর্তনাথের এই উক্তির তুলনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়

যে, মলিনাথ নিঃসঙ্গাচার্য সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল স্বাক্ষরবর্তনাত্মক চীক। দক্ষিণাবর্তনাত্মক যে সম্ভাব্যক্রমেই এই কিংবদন্তীর সম্ভান পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। কিন্তু এখানে নিঃসঙ্গাচার্য কালিদাসকাব্যের দৃষ্টদোষভাবনের কারণ অন্তরঙ্গ—

অন্তর উল্লেখ্য ইতি।

“অন্ত স্থলে তো এই একই অর্থ বলা হইয়াছে—তুমি তো তাহা হইতে চুড়ি করিয়াছ, তোমার সবার কৃত্তি কি? তুমি তো চৌরকবি?” সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিঃসঙ্গাচার্যের মতে কালিদাসের প্রথম সাহিত্যিক অপরাধ ছিল—চৌর্য্যাপরাধ (plagiarism)!^{১১} এবং ইহার দ্বারা নিঃসঙ্গা যে বান্দ্রীকীর দ্বায্যপণের নিকটই কালিদাসের রচণার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে।

কিন্তু কোন্ কবির চৌর্য্যের অপরাধে অপরাধী? রসগতের যে কোনও মহাকবি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের সায়স্বত সম্পদের উত্তরাধিকারী। শাক্যভার্য্যগতের শেক্ষসীতের মিস্ট্রন প্রভৃতি প্রথিতযশা কবিগণও তাঁহাদের পূর্বগামিগণের রচনাসম্পদের নিকট অপরিণেব রণে আবদ্ধ। এই প্রণেব রাজেশ্বের তাঁহার ‘কাব্যবীমাংসা’ গ্রন্থে কয়েকটি স্থলর স্নোক উদ্ধার করিয়াছেন—

মাত্যচৌরঃ কলিনো মাত্যচৌরো যদিঃ সনঃ।

আত্মাবকরণা চাত্তরণা সাক্ষ্যকোংসনঃ।

স নবধি বিদ্য বাচঃ যো ভাষাতি বিগুহিহুঃ।

পথ্যার্থোক্তিঃ বা পততিব কিম্ব নূতনঃ।

উপদেশকঃ কবিঃ কলিঃ কলিঃ পথিবকঃ।

উলিখেং কিম্ব প্রাচ্যঃ মন্যতাঃ স মহাকবিঃ।^{১২}

মিস্ট্রন হোমর ভরিল আরিওষ্টো শেক্ষসীত প্রভৃতি প্রাচীন কবিরের নিকট বহুলশরিরাণে স্বী। অনেক উৎসাহী সমালোচক সেইরূপ মিস্ট্রনের কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও অপূর্ব্ব অধীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই মত কি সত্য? হোমর, ভরিল প্রভৃতির কাব্য থাকেও প্যারাডাইস লস্ট, কাব্য ছিল না। মিস্ট্রন ছাড়া আরও অনেক কবি সেই সেই পূর্বকবিগণের কাব্যসম্পদের সৃহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ই বা কেন আর একখানি প্যারাডাইস লস্ট রচনা করিতে পারিলেন না? এই প্রশ্নে আমরা বিখ্যাত সমালোচক অপ্যাপক লর্ড ওয়াল্টার স্নালের স্মৃতিপূর্ণ মন্তব্য, কিংবা বীর্ষ হইলেও, উদ্ধার না করিয়া পারিলাম না—

In one sense, of course, and that not the least important, the great works of Milton were the product of the history and literatures of the world. Cycles ferried his cradle. Generations guided him. All forces were steadily employed to complete him.

But when we attempt to separate the single strands of his complex genealogy, to identify and arrange the influences that made him, the essential somehow escapes us. The genealogical method in literary history is both interesting and valuable, but we are too apt, in our

১১ কালিদাসের পূর্বও কি অন্যান্য বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছিল? তাহাও তাঁহার ‘কাব্যবীমাংসা’ গ্রন্থে মেন, বাহু, চন্দ্র প্রভৃতি অচেন পথ্যার্থের বৃত্তাক্রমবাক্যে ‘অহুহিহুং’ নাম কাব্যলোচের উল্লেখ রূপে পরিগণনা করিয়াছেন। দেখা—“অহুহিহুং যথা বৃত্তা কলকৃত্যকিতমবঃ। তথা ব্রহ্ম-হারীত-চৈবাক-ওকাবঃ। অব্যচোংস্বাক্যচক দূরমণিচাকিঃ। কথং বৃত্তাঃ প্রপত্নেরপ্রতি বৃত্তাঃ ম বৃত্তান্তঃ। যদি চোংকট্যা বৃত্তম্বত ইয ভাষতে। তথা কবতু কুচঃ দূরোক্তিঃ প্রভূতঃ।”—কাব্যলোকার, ১, ৪২-৪৪। তাঁহাদের প্রীতিবাক্য আত্মবানিক ধঃ ৪ম শতক।

১২ কাব্যবীমাংসা, পৃঃ ৪১-৪২।

admiration for its lucid procedure, to forget that there is one thing which it will never explain, and that thing is poetry. Books beget books, but the mystery of conception still evades us. We display, as if in a museum, all the bits of thought and fragments of expression that Milton may have borrowed from Homer and Virgil, from Ariosto and Shakespeare. Here is a far-fetched conceit, and there is an elaborately jointed comparison. But these choice fragments and samples were to be had by any one for the taking; what it baffles us to explain is how they came to be of so much more use to Milton than ever they were to us. In any dictionary of quotations you may find great thoughts and happy expressions as plentiful and as cheap as sand, and for the most part, quite as useless. These are dead thoughts: to catalogue, compare, and arrange them is within the power of any competent literary workman; but to raise them to blood-heat again, to breathe upon them and vitalise them is the sign that proclaims a poet. The *ledger school of criticism*, which deals only with borrowing and lending, ingeniously traced and accurately recorded, looks foolish enough in the presence of this miracle. There is a sort of critics who, in effect, decry poetry, by fixing their attention solely on the possessions that poetry inherits. They are like Mammon—

the least erected Spirit that fell

From Heaven; for even in Heaven his looks and thoughts
Were always downward bent, admiring more
The riches of Heaven's pavement, trodden gold,
Than aught divine or holy else enjoyed
In vision beatific.

With curious finger and thumb they pick holes in the mosaic; and whenever there is wealth they are always ready to cry "Thief". "



আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রাণনত: কালিদাসের মেঘদূত ও রত্নবর্ণ এই কাব্যদ্বয়ের উপর বাস্তবিকই রামায়ণের দূতপ্রসারী প্রভাবের কথাই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের নিকটও কালিদাসের সাহিত্যিক ভণ নিতান্ত হংসামাত্র নহে। কিন্তু কালিদাসের এই অধর্মণ্য স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার প্রতিভার দিব্যোজ্বলি: কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। কালিদাস, পূর্বগামিণের কাব্য হইতে বাহ্য লইয়াছেন, তাহা শতগুণে কিরায়িতা দিয়াছেন। রমায়ণের কিছুকিছুকাণ্ডেও হনুবানের সৌভা ও রামজন্মের বিলাসোক্তি এবং মেঘদূতে মেঘের সৌভা ও নির্বাসিত স্বর্ষের বিলাসবাক্য—একটি অপরটির মূল হটে। কিন্তু মেঘদূতের কাব্যস্থলনা ও রূপস্বার্থ রসায়ণকে শতগুণে অতিক্রম করিয়াছে। এ বেন—

সহস্রবর্ণপ্রোদ্ধান্তে হি রস: যবি:।

"স্বর্ষ পৃথিবী হইতে যে রস আহরণ করেন তাহা সহস্রগুণে কিরায়িতা দিবার ক্ষমতাই।" কালিদাস কাহার

নিকট হইতে কি কি লইয়াছেন, তাহার পরিমাণই বা কত—কালিদাসের কাব্যালোচনার, প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচন। কিন্তু কালিদাসের দিব্যপ্রতিভার স্পর্শে সেই সকল প্রাথমিক উপাদান কি অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া, কি রসসিদ্ধ হইয়া বিশদিলভ হইয়াছে, তাহাই মুখ্যভাবে বিচার্য। রামায়ণে রামবিশাখসম্বন্ধেও কালিদাসের বেদান্ত তাহারই বার্ষ পুনরুক্তি নহে। বিভিন্ন প্রতিভাব্যক্তির (individual genius) মধ্যে পদসম্পন্ন সংবাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। আচার্য আনন্দবর্ণন তাহার ‘প্রনিকারিকা’র চতুর্থ উচ্ছোভে এই লব্ধে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

সংবাদান্তে ভবন্তোর বাহনেন যুগ্মেদান্ ।

বৈকল্পপত্যা সর্বে তে বহবা বিপদিতা ।

মিতঃ স্তেভং সংবাদিতো হি বহাযনাঃ বৃদ্ধাঃ ।

—অম্বালোক, ১.১১

‘সাদৃশ্য’ বাক্যই পরিহার্য নহে। সাদৃশ্য বা সংবাদ আচার্য আনন্দবর্ণনের মতে তিন প্রকারের হইতে পারে। ১. প্রতিবিম্বকল্প, ২. আলোধ্যপ্রণা, এবং ৩. তুল্যাবেহিতুল্যা।—

সংবাদো হ্যনাসাদৃশ্যঃ তৎ পুনঃ প্রতিবিম্বকঃ ।

আলোধ্যপ্রণাৎ তুল্যাবেহিত্যঃ পরীক্ষিতাঃ ।

প্রথমজাতীয় সাদৃশ্য—অর্থাৎ প্রতিবিম্বকল্পে, মূল এবং অঙ্কুরের মধ্যে লব্ধ বেন ত্রিক বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব। মূলটি (original) বেন বিষয়বাহী এবং অঙ্কুরটি তাহারই বেন ছায়া বা প্রতিবিম্ব। আকাশস্থিত পূর্ণচন্দ্রের সহিত সরোবরকণ্ঠে প্রতিফলিত চন্দ্রবিম্বের যেরূপ সঙ্কট—ত্রিক সেইরূপ। বিম্ব বনি না থাকে প্রতিবিম্বের সত্তা কোথায়? গগনের চন্দ্র যদি মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, জলচন্দ্রের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে? স্তত্র্যঃ বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও, তবদৃষ্টিতে তো অভিন্নই বটে। দ্বিতীয় প্রকার সাদৃশ্য—অর্থাৎ আলোধ্য-প্রণা সাদৃশ্য প্রথমটি হইতে কিয়দংশে প্রাণসমীয়া। ইহাতে কবিপ্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপযোগিতা আছে, কবিশক্তির স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ কিছুটা আছে। তাই ‘আলোধ্য-প্রণা’ নামটিও সার্থক। চিত্রকর বখন আলোধ্য করেন, তখন সে মূলেরই হবৎ অঙ্কুরণ করে না। চিত্রের সংশ্লিষ্ট পরিসরের মধ্যে মূল আকৃতিটিরই অন্তর্নিহিত স্বরূপ ধোবৎভাবে ফুটাইয়া তুলিবার অস্ত্র কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়। মহাকবি কালিদাস ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলের’ ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রাধরেন এই তত্ত্বটুকু মহারাজ চক্রেণের মুখে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

স্ববৎ সাধুং চিত্রং তাতং ক্রিয়তে তত্ত্বনায়া ।

তত্ত্বাপি তত্ত্বাঃ কাল্যাঃ কেবো ক্রিয়ন্তিহিত্ ।

স্তত্র্যঃ চিত্রকরের স্বাধীনতা আছে। ‘আলোধ্যপ্রণা’-কাব্যেও কবি মূল হইতে সমাজিত বস্তুর সংকারসাধন করেন—স্বকীয় প্রতিভাশক্তির সাহায্যে। এই সংকারের ফলে মূল ও অঙ্কুরের মধ্যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়—কিন্তু সাদৃশ্য অবলুপ্ত হয় না।** পারমার্থিক দৃষ্টিতে এখানেও বস্তুদ্বয় একই—যদিও প্রতিভার দ্বারা কিছু সংকারসাধন করা হইয়াছে বটে। কেননা, আলোধ্য বেবিয়া মূলকেই মনে পড়ে, আলোধ্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও উপকরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রাথমিকভাবে নিবদ্ধ হইতে

পরে না।^{২১} চিত্রের চিত্র আচ্ছাদিত করিয়া তাহার মূলটিকে পরিপূর্ণভাবে হুটাইয়া তুলাই চিত্রকরের প্রাণ লক্ষ্য। যে চিত্রকর হত নিপুণভাবে এই বিষয় (illusion) ব্যুৎপন্ন করিতে পারিবেন, তিনি ততই প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গেও অভিজ্ঞানশত্ৰুঘ্নেরই ঘট্টাঘট্টের কথা মনে পড়ে। শত্ৰুঘ্নলার স্বচিত্রিত আলেখ্যধর্মেই বিষাক্তদৃষ্টি মহারাজ হুত্বের প্রতি বিদূষকের সেই প্রতিবোধবাক্য—

তো। চিত্রঃ যৎ এতঃ।

“মহারাজ এ তো চিত্র!” এবং তৎপ্রসঙ্গে বিদূষকের প্রতি দ্রুতত্বের সেই অপরটির নির্বেদোক্তি!—

বচনঃ! কিমিবনমুষ্টিতঃ সৌভাগ্যবান্—

স্বতিকালা বহু মে পুনরপি চিত্রীকৃতঃ।

২১ শত্ৰুঘ্নবচনঃ সাক্ষীঃ।

“বচনঃ! একি করিলে? এতক্ষণ তুমি হইয়া আমি সাক্ষ্য দেন প্রিয়াকে বর্ণন করিতেছিলাম, আমার প্রতিবোধ জন্মাইয়া আমার স্বীয় শত্ৰুঘ্নলাকে চিত্রে পরিণত করিলে!”

শত্ৰুঘ্নের তৃতীয় প্রকার—‘তুলানেহিতুলা’। মহুত্বলোকে কমনীয় আকৃতিত্বের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, একটি দেন অপরটিরই প্রতিচ্ছবি,—একটিকে দেখিয়া অপরটির কথা মনে পড়ে—

এবমিতো লীপ ইব ক্রীণাং!

কিন্তু, তাই বলিয়া কোনটিরই সৌন্দর্য, কোনটিরই চমৎকারিতা কি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়?—যেটাই নহে। রামবিষ্মক বাস্তবিকর আশ্রয়মগ্নে অপরচিত্রিত ভাষণবেশধারী কুমার লবকে দেখিয়া দমন মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন—

বসোৎসবঃ সপ্তমহাভারতঃ

স্বাশ্রয়ঃ সপ্তমহাভারতঃ

সম্পূর্ণপ্রতিবিম্বিতঃ সপ্তমহাভারতঃ

স্বাশ্রয়ঃ সপ্তমহাভারতঃ

—তখন রামচন্দ্র ও সীতামহাবীর লাভ্যা ও সন্ন্যাস কুমার লবের শরীরের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়া, লবের সৌন্দর্য বিষয়ে তাহার মনে পৌনঃপুন্যবৃত্তির উদয় হয় নাই। বরং প্রতি মুহূর্তে তাহার বিশ্বব্যবস্থায় দৃষ্টির সম্যক লবের বেহুত্বা নব নব বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল! কারণ, কমনীয় আকৃতিত্বের অন্তরালে দুইটি প্রাণবন্ত পৃথক পৃথক রূপে স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণেরই পরিপূর্ণ শাস্ত্রের মধ্যেও বৈচিত্র্যের স্ফূর্তি করিতেছে, একটিকে কেবলমাত্র অপরটির প্রাণবন্ত অঙ্গ পৌনঃপুন্য পরিণত হইতে দেয় নাই। স্বন্দরী রমণীর মুগ্ধাচার আর। পূর্ণচন্দ্রের স্বন্দা দেখিতে পাই,—কিন্তু, তাই বলিয়া কি স্বন্দরীর মুগ্ধাচার পূর্ণচন্দ্রেরই নিম্নলিখিত পুনরুজ্জ্বলিত?—তাহা নহে। কেননা সেই শশিচ্ছায়ে মুগ্ধাচারের অন্তরালে রহিয়াছে চেতন আশ্রয় চিত্রনবীন লীলা! সেইরূপ সাহিত্যেও দুইটি রচনার মধ্যে পরস্পরসংবাদ সর্বত্র দেখা যায় আকৃতিগত কমনীয়তা ও সামান্য অভিন্নতা করিয়া কাব্যের আশ্রয় রসের বিভিন্ন পরিপূর্ণতানিত নবীনতা ভাসমান, সেখানে একজন কবি আর একজনের নিছক ‘অনুবাদক’ (imitator) নহেন।—দুইজনই সমানভাবে নতুন মন। অপরতের গীতের স্বরধ্বনীর মহাকবি তাহারও ত’ বিশ্বজ্ঞান বিবাহ—উপনিষদের যিনি “কবির্বিবীচী পরিতুঃ স্বরভুঃ” রূপে অভিহিত, তাহারই রচিত এই অনন্ত

২১ তুলনীঃ : অনুকারে হি অনুকার্যমুচ্চিবে চিত্রপুণ্ডাঃ ইব ন তু সিংহমুচ্চিবে স্বরভিঃ।

সাপি ন চাক্ষর্যমতি তাকঃ।—অভিনবভণ্ডঃ : সৌভাগ্যবান্।

বিশেষতঃ মহাকাব্যেরই অক্ষয়তাওয়ার হইতে একই উপাধান সংগ্রহ করিয়াছেন—একই স্বর্ষ, একই চন্দ্র, একই নভস্তল, বহুত্বসম্বিত সেই একই সংবৎসরের নিবন্ধিত পর্বাণ, একই বৈশাখ্যৈশী এবং সমুদ্রমেঘলা। চিরপুয়াতনী অথচ চিরনবীনা এই পরিত্রীক সেই একই রূপ মহাকাব্যগণের কাব্যের উপাধান আঁগাইয়াছে! কই, সেজন্য ত মহর্ষি ব্যাস মহাকবি হোমরের অমূল্য নহেন, 'উত্তর-রামচরিত' নাটকের ষষ্ঠা ভবকৃতি আদিকবি রত্নাকরের নিছক অমূল্য নহেন, 'কাদম্বরী' ষষ্ঠা ভাইবাণ 'বৃহৎকথা' প্রণেতা গুণাগোর অমূল্য নহেন! সেইজন্যই শঙ্কর চক্রবর্তী আচার্য আনন্দবর্ধন এই ত্রিবিধ সাহিত্যের পরস্পর তাত্ত্বিকতা বিচার প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া বথার্থই বলিয়াছেন—

তদ্বৎসরভাষ্য কৃষ্ণায় তববসন্ত।

কৃত্যঃ তু অসিদ্ধায় নামদাস্যঃ ভ্রাতোঃ কবিঃ।

কেননা,—

আজ্ঞানোক্তং সত্যমে পুংসিত্যুবাখ্যাপি।

যন্ত ভাতিতঃ তথাঃ পদিস্থায়নিবানবন্।

—কৃত্যলোকে, ৪, ১১:

"প্রথম প্রতিবিষয়ক প্রকারটি বিষয়ের সহিত অভিন্ন; দ্বিতীয় আলোখ্যপ্রাণ প্রকারে কিংবা বস্তুর অভিন্ন থাকিলেও চমৎকারিতার অভাবে তাহা নিভায়েই ফুট; কিন্তু তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ তুল্যবৈহিত্য প্রকারে বস্তুর সত্তার সূত্র প্রসিদ্ধ;—সেইজন্য কবির পক্ষে সর্বথা অস্তিত্বাত্মক পরিদৃশ্যই নহে। কেননা,—পৃথক্ আস্থায় অস্তিত্ব যদি সংবেদনগোচর হয়, তবে পূর্ববর্ণনার অসুযোগী হইলেও কাব্যবস্তুর নিবর্তিত শৌন্দর্য লাভ করিয়া থাকে। যেমন তরী রমণীর শশিচ্ছায় মুখনগল আস্থায় সূত্রের কলে অনির্বচনীয় সুখমার অবিকারী হয়, সেইরূপ।" সেইজন্যই রামশেখর 'প্রতিবিষয়ক' কাব্যবস্তুর পরিকল্পনাকে 'অকবিশ্বাসী' বলিয়াছেন—স্বকবির পক্ষে ইহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়—

"সোহম কক-রকবিশ্বাসী সর্বা প্রতিবিষয়কঃ পরিবর্তিতঃ।" *

অপরপক্ষে, আলোখ্যপ্রাণ ও তুল্যবৈহিত্য ত্রয়স্বরূপ কবিরূপের গ্রহণীয় মার্গ।* এই তৃতীয় 'তুল্যবৈহিত্য' ভেদকেই 'কক্কেজিরীবিভ'-কার কৃষ্ণকের অভিন্ন প্রবন্ধবন্ধতার সত্ততম প্রকাররূপে পরিগণনা করা যাইতে পারে। একই মূলবস্তুর বিভিন্ন মহাকবির লেখনীতে বিভিন্নরূপে অভিযুক্ত হইয়া নবনবরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে—সদ্বয়চিত্রিত তখন তাহাদের বাহ্যসাহিত্যের পরিমিত উত্তীর্ণ হইয়া আস্তে আস্তে বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। একই রামায়ণকথা অবলম্বন করিয়া কত কবিই না তাহাদের কাব্য ও নাট্য

১০. কুলদায়: "তদ্বৎসরভাষ্য কৃষ্ণায় তববসন্ত। পরিত্রীকায় ভাষিকবীরপুত্রং। তদনুগত-
বালোখ্যমহাকব্যম্। পরিত্রীকায়পুত্রং। কৃষ্ণায় তববসন্ত। স্তম্ভঃ তু বিভক্তকবীরপুত্রায়ৈব সতি লবংসনি কাব্যম্
ন জ্ঞান্যঃ কবিঃ। ন হি পরিত্রীকায়পুত্রায়ৈব সত্যোপেক্ষ্যে এবেতি নকতে বক্তব্যং।—অনন্দবর্ধন: কৃত্যলোকে, ৪, ১১।

১১. কাব্যবিশ্বাস, পৃ. ৬৭

১২. কুলদায়: তা ইহা আলোখ্যমহাকব্যম্। সোহমকৃষ্ণায়। মার্গ:—পৃ. ১১। অপি চ তা ইহাকবীরপুত্রায়ৈব
পদিস্থায়া:। 'সোহমকৃষ্ণায়মহাকব্যম্' ইতি মহাকব্যম্।—ই, পৃ. ১১।

রচনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহাদের 'বহুতা' সম্পাদনের অলৌকিক প্রতিভাশক্তি প্রত্যেকটির মধ্যেই এক অভিন্ন প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছে। তাই কৃতকাচার্য বলিয়াছেন—

অশোককক্ষাঃ বহুতাঃ কাব্যবহুতাঃ কবীকরোঃ।

কণ্ঠাস্বাসবাসেনপি বসুধীষ নিঃসৃতঃ সৈঃ।

পুরুষনন্দমহোদয়বৈদ্যকগোপন বহুতাতঃ।

এবম্বাঃ প্রাণিন ইব এতানন্তে পৃথক্ পৃথক্ ৷**

—হস্তাক্ষি স্মৃতিত, পৃ. ২৪৪-৪

হৃদের স্পর্শেই সুসজ্জিত হৃদয়ের হইয়া উঠে, বাহ্য। সৌকিক তাহা অলৌকিকের পর্বাণে উত্তীত হয়, বাহ্য নির্জীব তাহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে, এবং বাহ্য চিরপুরাতন তাহাই চিরনবীন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সদৃশদ্বারে অবতীর্ণ হয়। কেননা, হৃদেই অশ্বনিহিত আত্মবস্ত, তাহাই কাব্যের রণাঘনবস্তর। আচার্য আনন্দবর্ননের সেই সুপ্রসিদ্ধ উপমাটি এপ্রসঙ্গে অরণীয়—

দুইদুই অশি ধ্বনি কানে রসপরিগ্রহাৎ।

সবের নবা ইত্যাক্ষি মন্থান ইব জনাঃ।—কল্কালোক, ৪. ৪

কিন্তু একই বস্তু বিভিন্ন কবিকর্তৃক বর্ণিত হইলেও পুনরুৎপন্ন হয়না কিন্ত ? ইহার দার্শনিক ভিত্তি কি ? আমাদের প্রাচীন সাহিত্যমীমাংসকগণ এই প্রশ্নেরও গূঢ় রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই বিষয়ের অঙ্গগত প্রত্যেক পদার্থের দুইটি রূপ (aspect) আছে—একটি তাহার 'সামান্য' (universal) রূপ, এবং আর একটি তাহার 'স্বকীয়' রূপ, তাহার যে 'বস্তুত্ব' বস্তুত্ব, যে বস্তুগতত্ব তথু তাহারই নিম্নে, বাহ্যের ক্ষুদ্র বিষয়ের অন্তর সর্বল বস্তু হইতে তাহা বস্তুত্ব—সেই বিশিষ্ট রূপটুকু তথু মহাকবিগণের প্রাতিভূষ্টি (intuition)ই গোচর হইয়া থাকে, মহাকবিগণই অল্পও পথ প্রয়োণের দ্বারা তাহার সেই অনন্তসাধারণ বস্তুগতত্ব লোকলোচনের সমক্ষে উৎখাতিত করিয়া দিতে পারেন। আমরা দেখানে কোনও বস্তুর সন্নিবেশের খাতিয়াক্স (outline) দেখিতে পাই তখন কবির তথবেখী প্রাতিভূষ্টির সম্মুখে সেই বস্তুর মূলীভূত উপাদান পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া উঠে। প্রস্তুতকনের সৌকিক দৃষ্টি বস্তুর বাহ্য আবরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু কবির প্রাতিভূষণ সেই বস্তুর বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া গভীর অন্তরাল পর্যন্ত বিস্তর করিয়া থাকে। তাই সৌকিক দ্বারা দেখানে অথক্স, নিবিশেষ, সামান্যগর্ববসারী, কবিদ্বারা দেখানে অক্স ও বিশেষগর্ববসারী। কাদ্মীরায় সাহিত্যমীমাংসক আচার্য নহিবভট্ট তাহার ব্যক্তিবিশেষ গ্রন্থে প্রতিভার এই রূপটি নিম্নোক্ত কয়েকটি কারিকায় অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

[উক্তে] বস্তু-প্রাণ বৈজ্ঞান্যবিদ বিজ্ঞেত।

অন্তঃপ্রাণিকঃ তে সামান্যঃ বোধভ্রামন্।

ভৈরবকন্য সামান্যঃ ধ্বং বিকল্পকণোচ্যত।

বিশিষ্টমাত্র বস্তুত্বঃ তৎ অভ্যন্তরঃ খোচ্যত।

স এষ সর্বকালোঃ বিবর্তঃ পরিকীৰ্তিতঃ।

স এষ সংকল্পবিদ্যাঃ পোচ্যতঃ প্রতিভাত্বোদ্য।

৩৩ এইবাঃ ইবম্বাঃ ভাগ্যপর্ণ—একাসে কালপি কল্পনিতকালবীক্ষকঃ কণাঃ নির্বহন্তি-বহুভিরাপি কবিতুলিত-বিষয়ানো বহুবাঃ এবম্বাঃ অন্যাক্তরসঃবাব্যবহৃতঃ সজ্ঞঃসজ্ঞালোকঃ কালপি বহুবিধাব্যবহতি। ৭৭। রাসাহুসম-উদাত্তাঃবহু-বীর্যরিত-বাসন্তরানল-কৃত্যাব্যবহা-ব্যাগ্যপূর্ণক-প্রভুতঃ। তেহি এবম্বাঃসবোঃ হেবোঃ কণাঃপর্ণে নির্বলসমাসারলসনো প্রতিপদঃ প্রতিবাক্যঃ প্রতিপ্রকল্পক প্রকাশদানাদিবহতীঃপ্রাঃ...প্রাক্ষিকো নববোধোদিতান্যকল্পণোৎকণ্ঠোৎকণ্ঠোঃ প্রাতিভূঃকল্পনকণোৎকণ্ঠোৎকণ্ঠোঃ সৎপাণ্যরিত সজ্ঞান্যাব্যঃ—৩৫. কৃতকরিতবৃত্তি, পৃ. ২৪৪

বক্তা:—

স্বাভূতপদার্থবিদ্যাভিধিততঃ ।

কথং বক্তব্যপদার্থো জ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞা কথং ।

না হি চক্ষু-ঊগততত্ত্বভীতিভিঃ সীমিতঃ ।

যেন স্বাভাংকুরোভোঃ ভাবাঃ প্রকলোভিনঃ ।**

'কাদম্বরী' কথায় প্রায়শ্ছেই শব্দবৃথকর্ষক নিহত স্তম্ভশাবকগণের বর্ণনাম্বার সেই স্বপ্নময় বর্ণনাদি এপ্রশ্নে উপাহরণরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারে—

কিহি হি দ্বন্দ্ববকল্যাবান্ । বক্তা স তমেনেকটালকুসুমকণগণাশিখরমণি সোপানৈরিয়াংগৈরেন পালশাকক
তানমুপাতোংগতবনভীন্ কাশিম্বরনিসম্রাতান্ পর্ভক্খিণটিনান্ শাশনীদৃশকশামুসরবরতঃ কাশিম্বরিত্তিবনপকটল
নদিনসবর্ভিকাহুকাহিকঃ কাশিম্বরকবনমুখান্ কাশিম্বরোহিতায়মানচক্ষুকাটান্ দ্বন্দ্ববিপটিত-বস্তুপটিপটিমবনোঃ কবনমুখানান্
সিদ্ধমুখতঃ কাশিম্বরবরতশিরঃকম্পাতেন বিধায়ত ইহ শ্রীকায়ানবর্ভান্ একততল কলারীং তস্ত বনশতে পাবাগ্রতঃ
কোটঃকালং শুক্যাবকানশ্রীং—অপগতাংসু কৃষা কিতাবগাতঃ ।

একই বর্ণের সূক্ষ্ম তারতম্যটুকু ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কবির কি আবেগ! বর্ণদ্র (colour-blind) প্রাকৃতজনের দৃষ্টিতে সূক্ষ্মভেদব্রজিত বর্ণের এই উৎকর্ষটুকু কি দূর পড়িত? যাবাবর কবি রাসশেখর সভাই বলিয়াছেন—

কল্পরূপে কর্ণ বহাকবলো ভাষাভাঃ তথিগীতে সু বিদ্যুৎ ।

—অন্তে বস্তুর যে রূপ দেখিতে পায় মহাকবিগণ তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃই স্নাতাত্ম; কিন্তু বস্তুর যে দৃশ্যটি প্রাকৃতজনের অবাঞ্ছনসংগোচর, কবির সারস্বত চক্ষুর দিব্যদৃষ্টি তদ্বিষয়েই প্রস্তুত হয়। এ বেন—

য নিশা বর্ষকামাঃ তস্তাঃ ভাগতিঃ সখ্যৌ ।

বস্তাঃ ভাগতিঃ সূত্রনি সা নিশা পল্লভাঃ দুযেঃ ।

কিন্তু শুধু অর্ধদৃষ্টিই কবিরের একমাত্র উপাদান নয়, সেই অর্ধই তাহার মগ্ন দিয়া 'বর্ণন' কহিবার শক্তিও তাহার পরিপূরকরূপে অশেক্ষিত। 'দর্শন' এবং 'বর্ণন'—intuition এবং expression— এই উভয়ের সম্বন্ধেই কবিরের পূর্ণ বিকাশ।** কিন্তু কবিরের পক্ষে এই উভয়বিধ উপাদানের অপেক্ষা থাকিলেও, কোনও যুগে 'বর্ণন' (intuition) উপরই অধিকতর অভিনিবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, কোনও যুগে বা কবিরের expression সৌষ্টব্যকেই প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যেতিহাসের প্রাথমিক পর্ষায় 'দর্শন'র অপরোক্ষতা (immediacy) ও তীব্রতাই কবিরের মানবরূপে পরিগণিত হইতে বলিয়া মনে হয়। 'বর্ণন'-সৌষ্টব্য ছিল তেন অহুৎসবিক, অবলীলাসম্পন্ন। সেই যুগের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। কিন্তু কালক্রমে তপত্তা ও সমাধির ক্রমিক অবনতির ফলে যখন কবিগণের প্রাতিভদর্শন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন 'দর্শন' ছাড়িয়া 'বর্ণন' রূপ বিস্তীর্ণ উপাদানের উপরই প্রাধান্য আরোপিত হইতে লাগিল। এই যুগের মহাকবিগণ কাব্যবস্তুর পরিকল্পনার জন্য য য প্রাতিভদর্শনের উপর নির্ভর না করিয়া পূর্ণগুণের তপোনিষ্ঠ, সমাধিনিরত মহাকবিগণের সারস্বত চক্ষুর দ্বারা উদ্দীপিত অর্বের অস্পৃ, অক্ষর ভাঙার হইতেই তাহা আহরণ করিতে লাগিলেন। এই যুগে কবিরের মানসও হইল তাহার অস্পৃ কাকর্ষ, শব্দভ্রমের অনন্তসমারণ নৈপুণ্য, নির্বাচিত শব্দের

০৪ ব্যাক্তিবক পৃ. ৩৩-৩১ (কবি সত্যল)

০৫ দর্শন বর্ণনাদি জ্ঞা লোকে কবিরিত্য—ভট্টভট্ট : কাব্যকৌতুক।

সম্বন্ধের বিচিত্র কৌশল। অর্থগুণি হইতে শব্দশিল্পের দিকে, matter হইতে form-এর দিকে, কবিগণের দৃষ্টি সঞ্চারিত হইল। অর্থাহরণের ক্ষত্র তাঁহারা নির্ভর করিতেন পূর্বদৃষ্ট কবিগণের কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, পরম্পরায়ত্ত, সকল কবিসম্প্রদায়ের সাধারণ নীতি—(capital) স্থানীয়** 'কবিসম্ম' (poetic conventions) শাস্ত্রের উপর। রাস্ত্রপেথর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে 'কবিসম্ম'ের আলোচনাশ্রমকে এই ঐতিহাসিক ভ্রমের প্রতিই যেন গৃহভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন—

পূর্বে হি বিখ্যাতঃ সন্ততঃশব্দঃ শব্দঃ চ বৈদ্যপদ্যঃ, শব্দানি চাষদ্যুঃ, যোগ্যানি বীণায়দ্যনি চ পরিদ্রব্য, ধানবাঁহুশলাজ্ঞা এইতদন্ত
—সেবাঃ কেশকানান্তর্যমেনে অন্তর্যাহুশংপি তথাযেবোপনিষদাঃ বা স কবিসম্মঃ। কবিসম্মশব্দকথাঃ হৃদমগতঃ প্রায়োগমাত্রনিষ্ঠিঃ
প্রজ্ঞা জ্ঞাতঃ।**

পূর্বদৃষ্টের কবিগণ ছিলেন 'অর্থোনি' কবি, পরবর্তী দৃষ্টের কবিগণ নিম্নমতঃই 'অন্তর্থোনি'। এইদৃষ্টে অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্ভব। 'বর্ণনে'র সৌষ্ঠবসম্পাদনের ক্ষত্র কত বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল, কত বিভিন্ন প্রস্থান, কত সংখ্যাতীত বিধিনিষেধ! কবিসম্ম-প্রার্থী লেখকগণের শুধু অর্থদৃষ্টিবিষয়েই নহে, বর্ণনবিষয়েও নিরক্ষর হাতছের আর অবসর রহিল না। মহাকবি ভাগ, মহাকবি কালিদাস, মহাকবি অশ্বঘোষ এই দৃষ্টের প্রতিনিধি। তাঁহাদের লেখনী তখন অলঙ্কারশাস্ত্রের অসংখ্য বিধিনিষেধের ছুস্বেচ্ছ শৃঙ্খলের দ্বারা নিগড়িত—“চীনানারীসম পর ভব লৌহ কাশে”। আর্থদৃষ্টের মহাকবিগণের কাব্যবস্ত্র চিত্তাসমকালেই রসদ্রিয় হইয়া প্রবৃত্ত হইত—স্বন্দর ও ক্লান্তিত, ক্লম ও ক্লম, জীব ও মৃত, ভীষণ ও রমণীয়—সকলই তাঁহাদের চিত্তায় ও লেখনীতে তুল্যভাবে রূপপ্রিয়গ্রহ করিয়া ধ্রু হইয়াছে—একটি হইতে অপরদিকে পৃথক করিবার ক্ষত্র তাঁহাদের কোনও প্রবৃত্তি যেন ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারত যেন প্রাকৃতিক আরম্ভাবলী—সেখানে একদিকে যেমন ফলপুষ্পবিশোভিত বনস্পতির অনির্বচনীয় গুণি-বিশোভিত রমণীয়তা অপরদিকে সেইরূপ ভরদ্বন্দ্বল, গ্রাহবিকোভিত শ্রোতবতীর ত্রাসজনক, তিরিক্ কটাক; একদিকে যেমন তুহারমৌলি পর্বতের গগনলোমি তুহতা, অপরদিকে সেইরূপ নির্জন, নিতম্ব পর্বতকন্দের নিলীম গভীরতা, একদিকে যেমন লতাপাদপদ্মামল বিশাল রমণীয় প্রান্তর, অপরদিকে সেইরূপ শম্মলেশবিবর্জিত দূর মরুভূমি। ভবভূতির সেই প্রসিদ্ধ মনস্থান বর্ণনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে—

নিচুঃপরিমিতাঃ কচিং কচিংশি প্রোক্তগুণদ্বন্দ্বাঃ

যেদ্বাঃ প্রসঙ্গভোগ্যকুলসমগ্রসীতারদ্বাঃ।

সীমানাঃ প্রায়োগমাত্রঃ বিদ্যৎকোমলো বাসকঃ

তুষ্টিঃ প্রতিপূর্বকরদশরকেশবঃ পিতৃতঃ।—উত্তরভিত ১, ১০

এ যেন—

অকৃতজ্ঞভিষ্যত যাবোক্তৈরুদ্বিবার্ণ্যঃ।

রামায়ণ ও মহাভারত প্রকৃতির মতই নৈসর্গিক সৃষ্টি।** এই কাব্যক্ষেত্রে ভাব ও বীতি, পরবর্তী

* তুলনীয় : সর্বক-সংকবিসাধ-সাধারণী পথিঃ বাণীকীজ হৃদ্যবিতনীনী।—দুর্যোজিতঃ 'অনর্থাধারক', গণ্ডাবল্য।

** কাব্যমীমাংসা, পৃ. ৭৮। এইদৃষ্টে কবিগণ যদি এমন কিছু বর্ণনা করিতেন বাহা কবিসম্মবিরুদ্ধ, তবে তাহা সাহিত্যিক যোগে (‘ব্যক্তিবিবর্তন’) মধ্যে পরিণত হইত।

হৃদের অলঙ্কারশাস্ত্রের স্বকীর্ণ বিধিনিষেধের দ্বারা নিরস্ত্রিত নহে—বর্ণনীয় বস্তুর মত ভাষাও কেন নৈসর্গিক সারস্বতনিঃস্রব !**

অপরদিকে মহাকবি কালিদাসের কাব্য কেন নিপুণ শিল্পিকত্বক স্বরূপ-পরিচয়িত লীলোচ্ছান। কালিদাস সম্ভার্যক্রমাগত কবিসময়ের অলঙ্কারীয় বর্ণনপদ্ধতি, অলংকারশাস্ত্রের হুপ্রতিষ্ঠিত ও সংকবিসম্মত সঙ্গ্রহ বিধিনিষেধ কেন প্রসরণচিত্তে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও বিধিনিষেধের সঙ্গ্রহ শৃঙ্খলের দ্বারা নিপুণিত হইয়াও তাঁহার সারস্বতপ্রতিভা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, পীড়িত হয় নাই। তাঁহার সারস্বতপ্রতিভার প্রতি শৃঙ্খলিত পক্ষক্ষেপে মণিনুগৃহের তানলম্বপরিপোষিত, প্রাগপরিবাহী শিক্তিতপ্তনি উদগত হইয়াছে, শৃঙ্খলের প্রবণকটু ছন্দোহীন রক্ষ স্বচ্যায় প্রোভার চিত্তকে নিপীড়িত করে নাই। অস্ত্র কবির পক্ষে দ্বাধা বন্ধনবন্ধন কালিদাস কেন তাহাকেই স্বকীর প্রতিভার মুক্তির উপায়রূপে পরিণত করিয়াছেন !—

অসংখ্য বন্ধন দ্বাৰে মহানবময়

গতিঃ মুক্তির দ্বার !

শব্দচয়নের ও শব্দবিন্যাসরীতির যে নৈসর্গিক প্রতিভা লইয়া কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার বলেই পূর্বকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে আশ্রিত অৰ্ণবস্তারও তাঁহার লেখনীতে অপরূপ রূপনা ও কমলীকতা পরিগ্রহ করিয়া এক অনির্বচনীয় রসমত্ততা লাভ করিয়াছে। কালিদাসের প্রতিটি পদ অপরিবর্তনীয়, প্রতিটি বিস্তার আরাবচনের মতই অগ্রকম্প্য। আচার্য আনন্দবর্ণনের ভাষায় কালিদাস-কব্যের প্রতিটি শ্লোকই 'উল্লেখ্যভ্রামক-চাক্ষুঃহেতু'। ইহাই পর্বতী আচার্যগণের মতে পদশাকের লক্ষণ।** মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' স্বাধো সেই 'পদশাক' চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।

৩০ Shakespeare-এর দাঁটা লম্বে Ben Jonson-এই উক্তি এই অঙ্গের সহপীর :

Nature herself was proud of his designs,

And joy'd to wear the dressing of his lines.

অশ্লিষ্ট—"Shakespeare, with whom quick Nature died."—Stratford Church-এ মহাকবির কৃতকলক উৎকীর্ণ বিপি।

৩১ তুলসী : The dogmatic grammarians, a race not yet extinct, make rules for language as the Aristotelians made rules for the Epic poem, and impose their chill models on submissive decadence. Much of Shakespeare's language is language hot from the mind and only partially hardened into grammar. It cannot be judged save by those whose ease of apprehension goes some way to meet his ease of expression.—Sir Walter Raleigh : Shakespeare (English men of Letters Series, Macmillan & Co.) p. 28

১০ উল্লেখ : "পদনিবেশবিকল্পতা পাক" ইত্যাদিগণ :। তদাঃ :

"আবাসোদ্ধারঃ তাম্ব দাব্যঃ সোদায়তে মনঃ।

পান্যঃ স্থাপিতে হৈর্দো হস্ত দিদ্ধা সন্বতী।"

"আগ্রহপরিগ্রহাশপি পরিত্যক্তাংবদ্যঃ-কৃত্যঃ পান্যঃ পরিত্যক্তাংবদ্যঃ পাকঃ।" ইতি বামলীলাঃ। তদাঃ :—

"কণ্ঠ্যাবি ভাস্কর্যঃ পরিত্যক্তাংবদ্যঃ।

তঃ পদভাবনিকাতাঃ পদশাকঃ প্রচলতে।"

—কাব্যদীপিকা, পৃ. ২০।

কালিদাস রামায়ণ হইতে মেঘদূতের কাব্যবস্ত, প্রেরণা, এমন কি অনেকস্থলে পদ ও ডাবার্থ ব্যবহৃত আদ্যরণ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের কবিপ্রতিভার উত্তাপে সেই সকল প্রাথমিক উপাদান, অগ্নির উত্তাপে স্বর্ণশিঙের দ্বারা, গলিত ও দ্রুত হইয়া, তাহাদের বস্তুকিছু 'প্রামিকা' (alloy) সমস্ত পরিভাষা করিয়া অশ্রুণ উজ্জ্বল ও পরিভক্তি লাভ করিয়াছে। রামায়ণে বাহা ছিল বিক্ষিপ্ত, মেঘদূতে তাহাই সংহত আকার ধারণ করিয়াছে, বাহা ছিল বিস্তীর্ণ তাহাই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, বাহা ছিল অর্থাত্তরসমিশ্র তাহাই অবিভিন্ন পরিভক্তি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন আশংকারিকগণের পরিভাষায় কালিদাস দ্ব্যর্থই 'শ্রাবক' কবি।—

শ্রাবকশব্দকঃ তিক্ত করুণঃ শ্রাবকঃ সঃ।

অমৃতভিজ্ঞেরতাঃ শ্রাবকো নবতাঃ নভেৎ।

স কবি-মৌক্তিকো হস্তস্ত চিত্তাধিন-মৌক্তিকঃ।

যে শ্রাবকিবা মূল্যার্থঃ শ্রাবকঃ স কবি-মর্ত্যঃ।

—কালদীপাঙ্গ, পৃ. ৩৩-৪

বিশ্বমদিনপর্ণে প্রতিকল্পিত চক্রকিরণ যেন সংহত হইয়া অপূর্ব কাণ্ডি ও উজ্জ্বল লাভ করে, সেইরূপ কালিদাসের প্রতিভার বিন্দু আদর্শে আসিকবির বিক্ষিপ্ত সৃষ্টি ও অর্থসম্ভার প্রতিকল্পিত হইয়া অনাদ্যসিতপূর্ব চন্দ্রকাদিত্য ও রসসৌষ্ঠবে স্তম্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই নেবৃত্তকে আমরা কালিদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দানরূপে পরিগণনা করিবা থাকি, তাই মেঘদূত পাঠকালে আমরা রানচন্দ্রের বিলাসোক্তি বিদ্বত হইয়া থাকি।—তখন 'করুণবিপ্রলভ'-রসদ্বারায় আগ্রত সন্দেহ-চিত্ত নিঃশব্দ, স্থির; কালিদাসের অধর্মণ্য লইয়া বিত্রত হইবার সামর্থ্য বা অবসর তাহার কোথায়? প্রাচীন ভারতের প্রতিভানা। মহিলাকবি বিম্বকার স্বচরিত্র সৃষ্টি উদ্ভার করিয়া আমরা রসভারময়, রোমান্তিক-কলেশ্বর সন্দেহের সেই নির্বাক, ধ্যানগম্যের স্তম্ভিত উদ্দেশ্যেই আনন্দের অন্ধাঙ্কলি নিবদ্ধ করি, সমালোচকের বুদ্ধিদীপ্ত সুরত। দ্বার্য্যের নিকট মান—

কমে-রচিত্রাচ-মদনগোচরঃ

বদন্তি-কমে: স্তুতরোম-বিস্মিত-

স্বরস্বতীর্থে পদবু-ক্ষেপলম্।

ঐশত কুসীককতাহরমল্লগি।

দ্রব-কমল চন্দ্রেতে ছুটে কত গুণ ধবি।

তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা— উপায় কী করি।

ছুটে ছুটে কমল ফুটায় না হয় শেষ।

এই কহলের যে এক রঙ রস যে তার বিশেষ।

ছেড়ে রেখে সোভী ভ্রমর পারে না যে তাই।

তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা— সৃষ্টি কোথাও নাই।

—বিশা কৃত্তিমালী

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

১৮৫১ - ১৯০৩

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জন্ম : শিক্ষা : বিবাহ

১২৫৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৫১) মুলনা ফেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন কপোতাক্ষী-ভীরবতী সারঙ্গা গ্রামে ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নবকুমার মুখোপাধ্যায়। সারঙ্গারই পরগণায়ে লাগরখাড়ি, মাইকেল বধুদেবনের জন্মভূমি।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাসের পাঠারম্ভ হয়। তিনি ২৪পরগণা গোবরভাঙ্গার ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কৃতী ছাত্র হিগাবে স্কুলে তাঁহার স্থানম ছিল। এনট্রান্স পরীক্ষা বিবাহ সময় তাঁহার শিশুবিয়োগ হয়, ফলে তাঁহার পরীক্ষাও বেওয়া হয় নাই, পরীক্ষনাও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও ঠাকুরদাসের অধ্যয়ন-শ্রম চিরদিন বলবতী ছিল। তিনি বলিভেন, 'পাদ্যাত্য পণ্ডিত ও কবিগণের মধ্যে আমি বেকলে কার্ণাইল এমার্শন ব্যারন ও স্টট এবং সেনিগণের মধ্যে মুকুন্দরাম মাইকেল হেনড্রস গীনবন্ধু কেশব বন্ডিন কালীপ্রসন্ন এবং অক্ষয়চন্দ্রের নিখট স্বামী।'

পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। সংসারের গুরুভার নিয়ে ঠাকুরদাসের স্বপ্নে আশিরা পড়ে, অমচিন্দ্রায় তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়।

অগ্রসংস্থান

ঠাকুরদাসের প্রথম চাকরি—ব্রহ্মানন্দ মাইনর-স্কুলের হেডমাস্টারি; ইহা বোধ্য হয় ১৮৭১ সনের কথা। কিছু দিন পরে বাহালাভের আশায়—কতকটা কাম্ববর্ধের চেষ্টাতেও বটে—তাঁহাকে বিহার অফলে গমন করিতে হয়। তথায় অবস্থানকালে তিনি ছাত্রা স্কুলের শিক্ষকের পর লাভ করেন। অবশেষে ১৮৭৬ সনে ভারতাসী মহারাজের কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীনে তাঁহার একটি ভাল চাকরি ছুটিয়া যায়। এই পদে তিনি ১৮৯১ সনের শেষ পর্যন্ত বাহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেন।^১ আড়াই বৎসর কৃতিত্বের সহিত সহকারী সম্পাদকের কার্য করিবার পর 'বঙ্গবাসী'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। আনুমানিক ১৮৯৮ সনে তিনি স্কোডার্সকো ঠাকুর-বাড়ীতে স্বাক্ষরনাথ ঠাকুরের

১ ১৮৯২, ২০এ ডিসেম্বর তারিখে নবীনচন্দ্র সেন একবারি পরে ঠাকুরদাসকে লেখেন: 'I am indeed sorry to hear that you have left your late service and turned on a new leaf place. On which paper staff are you serving now and what are your prospects?' ঠাকুরদাসকে পিঠিত নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী—অ. 'ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক ১৩২৫।

ঠেটে একটি চাকরি লাভ করেন, কিন্তু সে অতি অল্প দিনের ক্ষত।^১ ঠাকুরদাস কিছু দিন ‘বকসিয়ারী’ সাম্প্রদায়িক শব্দের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ চাকরি—বশোহর চৌগাছায় ঘোষাবাহুদের বাড়িতে ম্যানেজার।

মৃত্যু

বশোহরে কর্মকালে ঠাকুরদাস পীড়াক্রান্ত হন। চিকিৎসার ক্ষত কলিকাতায় আসিয়া কাটাপুস্তক্রে সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। এইখানেই ১০১০ সালের ১১ই কাতিক (২৮ অক্টোবর ১৯০০) তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

প্রকাশনী

ঠাকুরদাসের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নহে। আমরা যে কথ্যানির সন্ধান করিতে পারিয়াছি, সেগুলির একটি কালামুখিক তালিকা দিলাম। বহুদূর-দূরে ইংরেজি প্রকাশকাল বেকল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকামির তালিকা হইতে গৃহীত :

১। **দুর্গোৎসব** ;—উড়টাকা। ১২০ পাত (৩০-২-১৮৮৩)। পৃ. ৪৬।

ইহা “বদানন্দ শর্মা প্রণীত সহস্র ভাষায়, সরল কথায়, সতেজ গাথায়, বশোর দুর্গোৎসব-বর্ণন।” পরবর্তী কালে ঠাকুরদাসের ‘শারদীয় সাহিত্যে’ প্রধানতঃ যখন অবলম্বন ইহা গৃহীত হইয়াছে।

২। **সাহিত্যমঞ্জলি** (সম্বর্ত)। ১২০৪ পাত (৫-১২-১৮৮৮)। পৃ. ৮৮।

এই মৌলিক প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয়—কেশবচন্দ্র ও বসিষদ্বৈতের প্রভিভা এবং সাহিত্য ও ধর্মমত-বিবৃতি।

৩। **সাত-নরী** (বঙকাব্য)। ৮ (ইং ১৮৮৮)^{*}। পৃ. ৩৬।

ইহা “প্রবীণ কাবিরক কব্জক বিনির্মিত ও অদোষনাথ কুমার কব্জক প্রকাশিত।”

৪। **শারদীয় সাহিত্য**। ১৩০০ পাত (২-২-১৮৯৬)। পৃ. ২০২।

“শরদ মহোৎসবের সর্বাঙ্গীণ চিত্র ;—সাময়িক ও সামাজিক ‘কটো’। পদ্ম ও গগন কবিতাময় ও কোমল গল্পময় ১৪টি অধ্যায় সম্পূর্ণ।”

৫। **সহস্র-চিত্র** (কৌতুক চিত্রাবলী—১)। ১০০৮ পাত (১৪-৭-১৯০১)। পৃ. ৭০।

সূচী : ঈদুলহদী, বিজ্ঞান, কাল্পনিক হাওয়া, বদাশ বিলাপ, শৈবাল বিধবা, সহর-বধু ও গ্রাম্য-বধু।

২ ১০০৮, ৭ই কাতিক তারিখে স্বীকৃতব্য একখানি পত্রে ঠাকুরদাসকে লেখেন : ‘আমাদের সমস্ত পরিচায়ে পর হইতে আমাদের আর কোনও চিঠির পাই নাই।’ ১০০০ সালের চৈত্র-মাসে ‘কলকলি’ (পৃ: ১১৭) পাত্রে জানা যায়, ঠাকুরদাস তখন বেকার। তিনি সম্ভবতঃ ১০০৫ সালে স্বীকৃতব্যেয় চৌরায় ঠাকুরদাসীতে একটি কব পান। ঠাকুরদাসকে লিখিত স্বীকৃতব্যের পরাবলী—ত্র: ‘ভারতবর্ষ’ বৈশাখ ও কাতিক ১০২৪ ; শ্রীমদবীকৃত্যায় ভক্ত-সম্পাদিত ‘কবি-প্রণাম’ (ই: ১২৫১)।

৩ ১২২২-২৩ সালের মধ্যে যে ‘সাত-নরী’ প্রকাশিত, সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চয় নহি। পুত্রিকার অন্তর্ভুক্ত ‘স্বপ্নাশ্রয়ী’ কবিতাটি ১২২২ সালের জ্যৈষ্ঠ-মাসে ‘নবরীকবে’ প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছিল, হুতরাং ইহার পরে—কিন্তু ১২২৩ সালের পৌষ মাসের পূর্বে যে পুত্রিকাখানি প্রকাশিত তাহার প্রমাণ, ১২২৪ সালের পৌষ-মাসে ‘মাসিক’ ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে। ১২২৬ সালের শ্রাবণ-মাসে ‘কবিতা’ পুত্রিকাখানি সম্বোধিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম ও তৃতীয়টি ১০০০ সালের শৌর্য ও চৈত্র সংখ্যা 'অমৃতমুখিত্তে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৬। সোহাগ-চিত্র (কৌতুক চিত্রাবলী—২)। ১৩৮৮ সাল (১৪-১-১৯০১)। পৃ. ৪৬।

হঠাৎ : হুইট হাট, শেকালি-বালা, মাসে—রশবতী, দামার-হুট, বড়মিনে—বিরহিণী, নহর গুল্জার, সোহাগ-সাহিত্য।

সাময়িকপত্র-সম্পাদন

স্বাভাবিক অবস্থানকালে পত্রিকা-সম্পাদন-কার্যে ঠাকুরদাসের হাতে বড়ি হয়। তাঁহার অবসরকালটুকু মাতৃভাষার অমৃতমুখিত্তে ব্যয়িত হইত। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি।

‘পাদিক সমালোচক’ : ইহা একখানি “সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থব্যবহার, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি বিবিধবিধকে পাদিক পত্র ও সমালোচন।” প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কান্তন, প্রথম পক্ষ, ১২২০ (ইং ১৮৮৭)। ইহা বরষেণ হইতে বহু দূর স্বাভাবিক হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথম কয়েক সংখ্যা কলিকাতার মুদ্রিত হইবার পর ‘পাদিক সমালোচক’ স্বাভাবিক ট্রেডিং কোম্পানির ইউনিয়ন বহু হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (ডাকমাস্তল সমেত) ছিল ৪ টাকা।

১০২০ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ‘সাহিত্যে’ মুদ্রিত ঠাকুরদাসের ‘পাদিক সমালোচক’ প্রবন্ধে পত্রিকাবানির বিস্তৃত পরিচয় আছে; * উহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :

‘১৮৮৭-৮৮ খ্রিঃ মাসে আমরা জিঃ জিঃ আপিসের কয়েকটি কেরানী মিলিয়া এক কেরানীদল করি কয়েক হাত নিবাহিলাম। সে বড়ই দুঃখবাদের কাহ্ন,—কারণ। আমরা বঙ্গদেশের বহিঃভাগে বিশেষে বলিয়া এক মাসোকা কাগজ বাহির করিয়াছিলাম। ঐ কাগজে কেরানী ও শক্তিতে পদবী হইলেও, সাহিত্যে ‘হেট নভ’ ছিল না। সদস্যসাহসিক কাব্য,—আমরা বাহির করিয়াছিলাম এক বৃহৎ কাগজ, সাহিত্যাদি সমালোচনা বিষয়ক এক পাদিক পত্রিকা। সেজন্য আকৃতির এবং প্রকৃতির পাদিক পত্র এ দেশে তাহার পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই; তাহার পরেও অভাববিধ হয় নাই। সামাজ্য ও ন্যায় কেরানী-কুলে প্রভিষাও আমাদের ঐ পাদিক সাহিত্য পত্র কি জানি সৌভাগ্যের কি সিদ্ধিযোগে বা অমৃতমুখ নবম, যেহেতু কেরানী-কলমেব পরিচয় দেয় নাই। উহা মুদ্রিত সর্বদীর্ঘ যোক্তক গ্রন্থ ও সাহিত্যাদি-সংগ্রহের সমস্ত বসোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভবনকার লবণ-পত্র ও সাবয়িক-পত্র-বিভাগে উহা উচ্চ শ্রেণীর সমস্ত বলিয়া দীক্ষিত ও সমালোচিত হইয়াছিল। আমাদের ঐ পাদিক পত্র বেশ চলিয়াছিল; বহুকাল যেন চলিতক যোগ হয়। কিন্তু, অমৃতমুখিত্তের মধ্যে বাসান্দীদল একটা আশ্চর্যকর উপস্থিত হইয়া উহার ভারী অধিকার উপর আঘাত করে। আট মাস কাল পরেই এ লন্ডনের সহিত চলিয়া, সাহিত্যের দু-আধাংশ অজায়ে উহা এক বৎসর পরে এ দেশে অবকাশক পত্রিকায়ই বসে পিতৃলোক বিলীন হয়। পিতৃলোক-গ্রন্থাবলি পক্ষে উহার পূর্বেই আমি উহার সমস্ত ভাগ করিয়াছিলাম। অতিকষ্টেই সে কাটটা কঠিতে হইয়াছিল। এখন আট মাসের অধিক কাল উহার সঙ্গে আমার লেখনীর ও সম্পাদকীয় কর্তব্যের সম্বন্ধ ছিল না।

বর্ষীয় ১২২০ সালের কান্তন মাসে ঐ পাদিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং প্রতি পক্ষ দুইখর বঙ্গিন-বলাটুকু বহুবৎ পুত্রিকাকার প্রকাশিত হইতে থাকে। ঐ পাদিক প্রকাশিত হইবার পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে ‘নবজীবন’ ও ‘এগার’ প্রকাশিত হয়।

* ১০২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা ‘নবজীবন’ মুদ্রিত ঠাকুরদাসের ‘বর্ষীয় বঙ্গিনচন্দ্র’ প্রবন্ধেও ‘পাদিক সমালোচক’র একটি সাক্ষিগত বিবরণ আছে।

সাহিত্যে পরিচিত বা ইংরাজ সৌভাগ্যবশে আমরা তাহার সমালোচনার্থ কিম্বদন্তিরাশে প্রবৃত্ত হিলাম। সমালোচনা বলিয়াছিলো প্রচুর; এবং সে সমালোচনা বেহাত প্রেম-বোনাও হয় নাই। আশাঘের তখনকার সম্পাদকীয় ইচ্ছায় হুসে একটি অগ্রগণিত উদ্বেগ বিহিত হিল। সে উদ্বেগ যাহালা তাহার একটি সর্বস্বত্বসম্পন্ন সমালোচন-সাহিত্যের পুষ্টি করা। ইংরেজিতে যাহাকে Critical Literature বলে, তাহারই মন্ত আদর। তখন বাতিয়া উঠিয়াছিলো, এবং 'সমালোচক'র অনুষ্ঠানে অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হইয়া আদি তাহাতে যোগ দিয়াছিলো।

পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার উন্মোচন হইতে বিলম্বিত পঠ্য (এক পেনা ব্যতীত) আরই নাই আশায় করিতে হইত। পত্র-পরিচালনার পথ কোণিত করা হয় তাহ পাইয়াছিলো; কাণ্ডে তাহার সম্পাদক করিতাম। কিন্তু সম্পাদকীয় আর পাপ, ও মটান তাহে আশার উপর নির্ভর হয় নাই। অবতরণিকা নিমিত্ত হইয়াছিল,—সম্পাদকীয় সাধ মিটাইবার ভর আদি নিম্নেই নির্দিষ্টাছিলো।—

'* * এই পত্রের সম্পাদকীয় কার্যের ভার কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অর্পিত নহে। সম্পূর্ণ সাধারণ-ভর প্রাণীতে একটি সমিতি কর্তৃক 'সমালোচক' সম্পাদিত হইবে।'

বলা বাহুল্য, সমিতি ধারা 'সম্পাদন' সম্বন্ধে হয় নাই। তাহে তাহার মন্ত আশাকে সময়ে সময়ে বিলম্বিত ভাবে ও কর্তব্যে করিতে হইয়াছিল।

'পাদিক'ই যোগে হয়, আবার এবং লেখার প্রথম 'হাতে-পড়ি'। ইহার পূর্বে আর কখনও বড় কিছু লিখিয়াছিলো বলিয়া যেন হয় না। তবে যথা যথা ইংরেজী কথায় কিছু কিছু ব্যয় করিতাম বটে। যাহালা এবং উহার পূর্বে আর কখনও লিখি নাই। পত্র লেখা সহজ লিখা বালাকাল হইতে বুঝা যেন পঠ্য আদি তাহার মন্ত আশা করি নাই। পূর্বাভাস আদি পত্র ঠাকুরাণী ক্রিয়াক্রমে গড়িয়াছিলো। ক্রমাগতের কার্য হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব পাইলেই কাগজ পেরিয়ে কবিতা দেবীর দৃষ্টি আকর্ষিত হইতাম।

একই বসিতে ইচ্ছা হইতেন, 'পাদিক'কে আবার কি প্রকৃতির পত্র করিয়াছিলো। সে এক পাঁচ বিশালি রকমের প্রকৃতি। এবং, এবং। সচরাচর সাধারণ পত্র যে হাতের এবং বাহির হইয়া থাকে, সেই রকমেরই। সকল বিষয়েই দক্ষ ও সমালোচনা। পত্র সমালোচকের একটি অগ্র উদ্বেগে লক্ষ্য করা হইয়াছিল। সেটা রাস্তাভিত্তিক আলোচনা। যাদের প্রথম পক্ষে 'সম-সমালোচনা' বলিয়া একটি মন্ত চক্র প্রবৃত্ত থাকিত। তাহাতে সাময়িক সাময়িক ব্যাপারে বিবিধ কথা থাকিত। পুস্তক, দ্বিতীয় পক্ষে 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিষয় কতকগুলি 'পাত্র'র সাময়িকের কথা লিখিত হইত। ইংরেজী পত্রের অনুকরণ (এখনো তাৎকালিক 'ম্যাকমিলান' ম্যাগাজিন ও ইতিহাসে দ্বিবিট) আবার 'সম-সমালোচনা' প্রবর্তিত করিয়াছিলো। যেন তাহাতে একই অভিব্যক্তি বা আনন্ড ছিল এই সে, 'সম-সমালোচনা'র প্রত্যেক প্রকৃতির সাধারণ নিয়মিত একটি করিয়া সেটি থাকিত।—

'সম-সমালোচক'র দ্ব্যর্থমতে মন্ত এই পত্রের সম্পাদক-সমিতি দ্বারা করেন। 'সম-সমালোচনা' জির জির ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইবে; অতএব একই বিষয়ে জির জির মন্ত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

'পাদিক সমালোচক'র প্রাথমিক-প্রতিপদে যথা লিখি সর্বপ্রধান ছিলো, সাময়িকের বিষয়ে তখন তাহার সমিতির প্রাথমিক ছিল, এবং তিনি নিম্নে ঐ সকল কথাই লিখিত অভিমত হইলেন। এই কারণেই ঐ পত্র সাময়িকের অতটা লক্ষ্য যান লিখিয়াছিল। নইলে আবার তখন ততটা সাময়িকের প্রমাণ হয় নাই; সেটা বরং এই বৃদ্ধ বয়সে কিছু কিছু হইয়াছে।

'পাদিক সমালোচক' দ্বিতীয় বর্ষে বিলুপ্ত হয়। প্রথম বর্ষে ঠাকুরদাস 'বড়ানন্দ'—এই ছদ্ম নামে 'বড়ানন্দের বোধনামতা,' 'ঈ:' প্রাক্করে 'সমালোচনা ও সমালোচক' এবং 'ঈ: দ:' প্রাক্করে 'সেবী চৌধুরাণী (সমালোচনা)' লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামদাস সেনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'হৃদ,' নবকক ভট্টাচার্যের কবিতা; কালীদাস বোসাবাণ্ণ, চন্দ্রশেখর বসু ও বীরেন্দ্র পাণ্ডে প্রকৃতির সম্বন্ধে 'পাদিক সমালোচক'র পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়াছিল।

‘মালক’ : ‘শাক্তিক সমালোচক’র প্রকাশ রহিত হইবার তিন বৎসর পরে ঠাকুরদাস কনকারণ্যপুত্র (জিহ্ম ষ্টেট হেলথের) অধ্যয়নকালে ‘মালক’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ; উহা কলিকাতার নবাবীঘর ঘর হইতে আচার্যনাথ কুমার স্বত্বক্ৰমে প্রকাশিত হইত ; অগ্রিম বার্ষিক দ্বীপ ছিল দুই টাকা ।

‘মালকে’র ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—শৌব ১২৩৫ ; এই সংখ্যার ‘অস্থির’ শিরোনামে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক বাহা লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

“বঙ্গ-সাহিত্যে শতাব্দেক বিত্তর আছে । সেগুলি সারবান্ শতেরই কেহ ;—হুজুর শতেরও কেহ । বিধি শতের বিপরীত কেহ । রাখার বিষয়, সম্বন্ধ নাই । তবে অন্যদৃষ্টি বা অভিনুষ্ঠিতে, আবারের অনুষ্ঠি-বংশ বা বাটর কোল,—সে তারগণেই হউক,—কোনু কাঁচের টুক জাদি না,—কতক দিন হইতে সাহিত্যের হৃদয় কেনে পুস্তক প্রায়শ পাঠ্য আভ্যন্তরন পৌঁছেছে না ; কিন্তু অভিনুষ্ঠি বা অন্যদৃষ্টি চিরবাহী নয় । বক্তাবের বিদ্যে তত্কার পর হুষ্টি হয় । সেই নিম্নে অনুষ্ঠিও বিদ্যে । সাময়িক অবশ্যে অবিক উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই । আশা অবশ্য আছে ।

সাময়িক শব্দে বৃষ্টি কথা করে ; হুজুর শব্দও সময়ে অসাময়িক । কার্যেই বক্ত-কল্পে পুর্বাধার অধ্যয়নারও অবিক জোড়া ; কিন্তু শব্দের ভাষা, শাক্তি-সংজ্ঞিট-কুলট-পাতাটিও জীবন ব্যাপক অঙ্গগণন । তা সময়েই বহু, আর সাহিত্যেই বহু । গুণ-যোগে ‘শব্দপুর্ণি বহুত্ব’ হইলেও শব্দ-সংজ্ঞি নহিলে আর উঠে না ; কুল-বৃক্ষ-লতা-পাতা নহিলে পুষ্প ও ফল দুয়ের কিছুই হয় না । শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত-সংজ্ঞি চাই, কুলট মুহুরট লতাটি পাতাটিও চাই । পুস্তককার শব্দ যদি মন যায়, শাক্ত-সংজ্ঞি প্রভৃতি ঠায়ে মিলে ও অনুবংশন প্রমা । এম্ম নহিলে রাজার হাটের সকল না । এ বিদ্যে আর অবিক ইঙ্গিত অনাবশ্যক ।

আবারের সাহিত্যে কলের কেত ত আছেই । কলের কেতের ‘আশে-পাশে’ এক আঘট । কুলের গাছও আছে, তাহা দেখিতেছি ; কিন্তু কুলের মত একটা বস্তুর উজ্জান আঘা আঘিও বাশন করি নাই । সাহিত্যক্ষেত্রে শব্দের চাহেই এত দিন চলিয়াছে, শাক্ত-সংজ্ঞির উপর আঘা বড় একটা বৃষ্টি করি নাই । কলের গায়ে ‘শার’ দিতে আমরা বত তেঁটা এত দিন করিয়াছি, কুলের চারায় তত জল দিই নাই । আঘাসের কলের গাছ কলবান্ হউক, শতাব্দেক হুষ্টিত ও হুষ্টিত হউক ; কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহাও চাই,—আঘিয়ারি আঘেই চাহেন যে,—শাক্ত-সংজ্ঞির ‘বৃষ্টি’ হয়, হুষ্টি পাতাটি বহু পাইয়া যোগ্যকাল কুটে । আমরা তাই আঘ বড় আঘের, বহু ও বহুগণে—কিন্তু বিনাকল করে তলে,—বহুসাহিত্যের পৈতৃক যোগাঙ্গিত ভরানন হইতে অর্ধ কাটা বার ‘গড়তা’ ভূমি চিহ্নিত করিয়া আঘাসের এই কুল কুল-বাটী—বহুসাহিত্যের এই ‘মালক’—প্রতিষ্ঠিত করিতেছি ।

অবিক নয়, আঘ কাটা যায় আঘার আঘা করি । তাহি মগো যোগ্যকাল, যেখানে যেটি শাক্ত—কুলের চারা বলাইব, লতার গাছ পুতিব, শাক্ত-সংজ্ঞি ছড়াইব । কুল কুল, পাতা লতা, শাক্ত-সংজ্ঞি,—সকল বহুত্বের সকল বহুত্বই দুই চারিটা করিয়া চারা যোগি । তবে কোন কুলট কুলিবে—কোনট কুলিবে না, কোন বাটর সমাইবে, কোন কীটী অস্থিবে, কোন চারাটি বীজিবে—কোনট বীজিবে না, সেটি আঘরা কেমন এখন বলিতে পারি ? কেতের বীজ, কুলের কলম,—আ ঘনিমে বিধান কি ? তবে বীজ বাটে ‘উঠে’, কুল বাটে কুটে—তার ‘পা’ আঘরা গ্রাণ দিয়াও করিব, এখন কেমন এই বলিতে পারি । ইহার অপেক্ষা আর অবিক (সত্য বলিলে) কেই বা বলিতে পারেন ! •

একটা কথা এগ্রেই বলিতেছি, এখনও আঘার বলিতেছি,—শব্দ ও কলের কার্যের আঘাধের নয় । উক্ত ব্রহ্মের মত বড় ও বলিমান বহুসাহিত্যের বাক-কলমে বহুসাহিত্যে ঘাইতে হইবে । ‘মালক’ হইতে কেমন কুলট পাতাটি আঘা যোগাইব । ‘কলের প্রভাষা’ বহুসাহিত্যের বহি একতাই হয়,—আঘরা কুল কাশারী, অবিক আর কিছু বলিতে পারিব না,—নবদে অসমত এত আঘ মজা রাজনৈতিক হইয়া দিব । উক্ত অনুশাস কলের কুল বালিয়া বালিয়া একটা কাড় মালকের এক কোণে আঘার যোগিয়াছি ।

তবে হুষ্টি যোগ—‘মালক’র উদ্দেশ্য কি কি । বঙ্গবাসীর দেবদেবের ও বিগ্রাহককে শুলশময়র মেলো করা—মালকের এক উদ্দেশ্য ; আর এক উদ্দেশ্য,—সাহিত্যক্ষেত্রে সামাজ্য ; কিন্তু অভাবিক উদ্বিগ্ন নিয়মিত যোগাঙ্গি, ঠাধারের জোজননুও

‘জিনার টেবুল’ এছুর করা। যে দিন জানিব, ‘হাসক’র ব্যবসায়িত হিন্দু-গৃহের ‘সাঁতার’র আঁধার গাঁইয়ায়ে, সেই দিন সুখিব—
‘হাসক’ টি’কিল। শুধন আর ‘হাসক’ বাক্সে লোকের অসুখহাসকালী হইবে না।

এ 'বাগদেব'র বাণী ধারা নব করিয়া—আবরণ শুভ্র করিয়া হইয়াছেন এবং হইবেন আশা মিথ্যে, তাঁরা লক্ষ্যেই সাহসিক।
বসুন্ধর প্রকৃষ্ণ-ভীষ্মের হাতে ভীষ্মের কারকিতে 'বাগদ' মুদ্রিত—মুদ্রিত—হইবার ত কথা। তবুও যদি না হয়,
সে সোম মাসকেরও নয়, হালীও নয়; সে সোম—বাহাণমের রাহি।"

‘মালক’ সাহিত্য-পত্র হইলেও ইহাতে রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইতে ; প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন : “রাজনীতির আলোচনা যদিও আত্মনির্দেশের প্রধান লক্ষ্য নহে, তথাচ রাজনীতির সহিত আত্মনির্দেশের অপরিস্কার্য সম্বন্ধ। কারণ, সমীচিতে শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। স্বচ্ছন্দতা ও শান্তিতেই সাহিত্যের দৃষ্টি।”

প্রথম বর্ষের পত্রিকায় ঠাকুরবাসের অনেকগুলি গল্প-গদ্য রচনা—“কংগ্রেস,” “প্রয়াগ—চন্দ্রাহীন চক্ৰ,” “রথ-সাহিত্য ও বঙ্গসাম্রাজ্য,” “ভূমরা,” “প্রবাসীর পূর্বস্মৃতি” (কবিতা), “কান্তিকে কুমারীত্ব” প্রভৃতি স্থান পাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের “বিবাহ-রহস্য,” “বর্ণিতা”-রচনিতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “অদ্বৈত” উপন্যাস ২১ অধ্যায় পর্যন্ত, বিহারিলাল চক্রবর্তীর খণ্ড-কাব্য “সাপের আসনে” নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় ও বীন্দ্রকুমার রায়ের কবিতা প্রভৃতিও “মালকে”র শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা পত্রিকায় নবীনচন্দ্রের “নৈরাধ নিম্নৈঃ স্বপ্ন” নাটকের কিয়দংশ ও বিহারিলালের “সাপের আসনে”র ৪র্থ সর্গ প্রকাশিত হয়।

‘দালত’ প্রায় দুই বৎসর চলিয়া বিলুপ্ত হয়। ইহাকে অনাবাসেই একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক-পত্রিকায় সম্মান দেওয়া হাইতে পারে।

‘বঙ্গবাসী’: ভারতাসার চাকরি হইতে বিদায় লইয়া ঠাকুরদাস ১৯২৯ সালে ‘বঙ্গবাসী’র অল্পতম সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব হইতেই ‘বঙ্গবাসী’তে ও তথা হইতে প্রচারিত ‘জয়কৃষি’ মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ‘বঙ্গবাসী’র সহিত তিনি আড়াই বৎসর কাল যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার লিখিত বহুবিধ প্রবন্ধ ‘বঙ্গবাসী’ ও ‘জয়কৃষি’র পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়াছিল।

‘বঙ্গনিবাসী’: ১২২৭ সালে ‘বঙ্গনিবাসী’ নামে সাপ্তাহিক পত্র বাসুদেব দত্তের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। ঠাকুরদাস কিছু দিন ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় (ঐ ‘বঙ্গ-ভাবার লেখক’, পৃ. ৬২৮)।

পুথকাঁকারে অপ্রকাশিত রচনা : ঠাকুরসারের বহু স্থিতিবিত রচনা পুথাতন নাথায়গিকত্রেব্র—
‘প্রচার’, ‘নবজীবন’, ‘প্রবাহ’, ‘শাকিক সন্যাসোচক’, ‘মালক’, ‘নব্যভারত’, ‘সাহিত্য’, ‘ক্লমকুমি’,
‘অম্বনান’, ‘ভারতী’, ‘প্রাণী’ প্রভৃতির পুঠায় শাঘরে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহার অদিকাংশই
পুথকাঁকারে সূত্রিত হয় নাই ; আশ্রয় এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি :

‘নব্যভারত’: ১২২৪, বৈশাখ	সর্গীয়া শব্দসম্বলী
১২২৭, পৌষ	মস্তি-অভিষেক (আলোচনা)
১৩০১, জ্যৈষ্ঠ	নিমাই চরিত (সমালোচনা)
স্রাবণ	এক অপরিত্যক্ত কবি [বিহারিশাল চক্রবর্তী]

৭. এই অঙ্গকে ঠাট্টাঙ্গকে দিখিত তারকনাথের একখানি ইংরেজী পত্র ১০২৪ সালের কার্তিক-মাসে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইল।

ভাত্র, কাষ্টিক-পৌষ	বেঙ্গল স্যানিটারী স্কেপের বিল
১০০০, ভাত্র, কাষ্টিক	সাহিত্য ও শব্দচক্র মুখোপাধ্যায় (সমালোচনা)
অগ্র., পৌষ	শিশির বাত্মর গীতি-গ্রন্থ
১০০৪, জ্যৈষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ	শেলি
পৌষ	সামর্থ্যবানী
১০০৭, অগ্র., পৌষ	রাজনীতি ও স্তর রমেশচন্দ্র মিত্র
১০০৮, আষাঢ়	সাহিত্যের সাধারণ তত্ত্ব
ভাত্র	ভারতেশ্বরীর স্মারক (লর্ড কর্জন ও তবীর বাজিহ)
আশ্বিন	ভিক্টোরিয়ান হল
‘স্বপ্নজীবন’ :	(১) মহাত্মা মিত্রের কটন, (২) প্রেম ও পেট্রিফিকেশন্
১২২৫, পৌষ	সমালোচনীয় পত্রিকা
‘জগদ্বাস’ :	বিশ্বভূমিতে নারী-সভা ✓
১২২৬, বৈশাখ	অমূল্য-নিধি
মাঘ	পণ্ডিত অধ্যাপনাধ
১২২৭, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	লর্ড বেয়ার
ভাত্র	ভাষা-সংস্কৃত
অগ্রহাষণ	(১) রমণী সেক্সিয়েট, (২) সমালোচনা (পুস্তক ও নৃতন প্রকাশনা)
পৌষ, মাঘ	সৌন্দর্য-ভব
চৈত্র	বন্দর-বংশ (সচিত্র)
১০০০, বৈশাখ	বিবিধ বানস (সচিত্র)
জ্যৈষ্ঠ	ব্যাক (সচিত্র)
আষাঢ়	হরিণ (সচিত্র)
জ্যৈষ্ঠ	শ্রেষ্ঠীয় লড়াই ✓
ভাত্র	জ্ঞানের প্রমাণ
আশ্বিন, কাষ্টিক	‘কৃষ্ণকোষ কাব্য’ (সমালোচনা)
পৌষ	ম্যালেসিয়া-হঠ
ফাল্গুন	চিত্রস্বামী বন্দোবস্ত
চৈত্র	বপ-কল্প
‘সাহিত্য’ :	কবির রবার্ট ব্রাউনিং
১২২৮, জ্যৈষ্ঠ	রাজা দিগম্বর মিত্র, সি. এল. আই
১০০১, ভাত্র	‘নয়নো জগদ’ (নৃত ও সমালোচনা)
১০০৪, জ্যৈষ্ঠ	সাহিত্য-পত্র
জ্যৈষ্ঠ, কাষ্টিক	প্রেমবিদ্যাস গ্রন্থ
১০০৬, ফাল্গুন	

	১৩১৮, ভাদ্র	সুংগা-সুয়ারী
	১৩১৯, পৌষ	বহিমবাবু লক্ষ্মীণ শ্রুতি
	১৩২১, আষাঢ়	রচনা-গীতি
	শ্রাবণ	শ্রুতি-কবিতা
	অগ্রহায়ণ	কৃষ্ণ ও কবিতা
	ফাল্গুন	নাটক
	১৩২৩, আষাঢ়	কঠোর কাব্য
	শ্রাবণ	'পাক্ষিক সমালোচক'
	আশ্বিন	'পল'
	অগ্রহায়ণ	সমালোচনা-সোপান (ক্রমশঃ)
	১৩২৪, ঐশ্বিক	আমায় ছুই ছুইবতী গাভী
	অগ্রহায়ণ	নিধুবাবু
	১৩২৪, আষাঢ়	ভাসপাতি ও নবভাগ
'ভারতী' :	১৩০২, মাঘ	প্রজাপ্রবাস
	ফাল্গুন	সমাজ-সংসার
'প্রদীপ' :	১৩০৭, পৌষ	শব্দ
	১৩০৮, পৌষ	কংগ্রেস*
	মাঘ-ফাল্গুন, চৈত্র	হাস্য রসের রচনা
	১৩০৯, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	ঐ
'নারায়ণ' :	১৩২২, বৈশাখ	স্বর্গীয় বহিমচন্দ্র
'ভারতবর্ষ' :	১৩২৪, অগ্রহায়ণ	এক-সমালোচনা
'সারথি' :	১৩২৭, শ্রাবণ, ভাদ্র	বহুভাষা
	অগ্রহায়ণ	সাহিত্য সমালোচনা
	চৈত্র	সমালোচনা প্রসঙ্গ
'সচিত্র শিশির' :	১৩৩১, ২১ চৈত্র	সমালোচনা-সোপান
	১৩৩২, ১২ অগ্র.	কথা কাণে ধাঁটে
	১৩৩৩, ১৮ অগ্র.	সাহিত্য-সমালোচনার বৈজ্ঞানিক ভূমি
	১৭, ২৪ পৌষ	ব্যাকরণ
	১, ৮, ১৪, ২২ মাঘ	অদ্বৈত
	১৪ মাঘ	সাহিত্য-চিন্তা
	২৮ ফাল্গুন	নবেল

শিল্পের স্বরূপ

শ্রীকানাই সায়ম

বা স্থপতি সমূহা সমানঃ কৃৎঃ পরিবরমাতে ।

ভয়োরস্তঃ পিঙ্গলঃ বাসত্যানব্রনজোঃ ডিডাকশীতি ।

একই ব্লকে দুই স্থপতিগণ । একটি পাখি মধুর বা তিক্ত ফল ভোগ করে, অতীত চেয়ে বেগে ।

স্থপকর আর দুঃখকরের উপলব্ধি ঘটে তারই যে ফলভূক্ । অতএব সেই বোকে কী যে ভালো আর কী যে মন্দ, কোনটি তার লোভের সামগ্রী আর কোনটি তার ভোগ করাই ভালো । অথচ যেমন ভাবেই চেষ্টা করা থাক, ভালো আর মন্দ, হর্ষ আর বিবাদ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আলো অন্ধকার — অজ্ঞেয় ধামেই বাধ্য । অবিমিশ্রভাবে একটিকেই বেছে নেবার কোনো উপায় নেই ।

এ দিকে যে শুধু ব্রষ্টা সেই মুক্ত ও শান্ত, শাস্তকাল সেই তো স্থরী, আনন্দময় । ফল পে ভোগ করে না, ভোগ করে ফলভোক্তাকে । কানেই বিভিন্ন ফল, বিভিন্ন বাস, বিভিন্ন ক্ষণের বিভিন্ন উপচয় আর ক্ষয়, কিছুতে নেই তার কোনো আগন্তিকি । অত অততে, স্থখে দুঃখে, লাভে ক্ষতিতে, রয়ে পরামর্শে যে একান্ত ভেদ ছীবেব অমূলক কল্পনারায় সেই ভেদকে সত্য বলে সে তো গণনা করে না ; সেই ভেদের ভূমিতে উজ্জ্বলীন তার স্থিতি, পদ্মপরে স্রোতিবিন্দুরিত শিশিরবিন্দুরই মতো । অজ্ঞেয়ের সমস্ত আর অর্থও সমগ্রের উপলব্ধিতে বেধা যায়, নিখিলের সর্ব সত্তাই অবিরচনীয় আনন্দের ক্ষুদ্রণ ; অবিকৃত আনন্দের অর্থও একের সম্ভাব ।

উপনিষদের পরবর্তী শ্লোক-স্তুতিতে বলা হয়েছে, স্থবদুঃখাদি বশেষ টানা-পোড়েনে বোনা জটিলঘন বলে বিছড়িত এই পাখি সহসা উর্ধ্বে চেয়ে আবিষ্কার করে আপন মহিমার, আপন আলোকে প্রজ্বর, আনন্দিত, অবিচলিত, শান্ত ওই বিহঙ্গকে যে তার আগনারই স্বরূপ ; চেয়ে চেয়ে সত্তা থেকে অদিত হয়ে পড়ে তার কণিক বস উল্লাস আর অলীক বস যাতনা, ত্রেণ— পার্থিব স্থ পদে তো নিশিত দুঃখেরই সম্ভাবনা— চেয়ে দেখতে দেখতে আপন ভক্ত ও মহিমায় স্বল্পগেই হয় এ আবৃত, পায় চিরন্তন আশ্রয় ও নিঃশেষ আশ্রয়গির ।

মুক্ত উপনিষদের আকর্ষ এই রূপাখ্যান, ঘরঘরী এই বাক্যরম্ভা, স্বল্পগতি নিশিত শরের মতো বিস্ত হয়েছে যেখি নিখিল জীবন-রহস্যের অন্তরতর অন্তরে ।

ফলভূক্ বিহঙ্গ তো অস্ত কেউ নয়, যন প্রাণ মেহের আবরণ-স্তরে আবৃত এই মানবাত্মা । উর্ধ্বে শান্তিতে আলীন বিহঙ্গম আত্মারই আত্মা বা পরমায়া । যে পর্বত আছে মাহুর্ষ হর্ষ শোক, পূণ্য পাপ, আলো অন্ধকার, জ্ঞানভূতি ও মোহ, বাক্য আর না-থাকার খণ্ড ক্ষুদ্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জীবনে ক্ষণনির্ভর হয়ে— প্রত্যেকটি অস্থির কণ এই আছে এই নেই, আছে কি নেই জানবার সময় ও স্থযোগ নেই কোনো— যে পর্বত এই দায়িক ধগতে দায়ার অবীন হয়ে আছে, সে পর্বতই তার পরিচয় সাধু বা অসাধু, প্রাজ্ঞ বা অজ্ঞ, বনী বা দক্ষিত, স্থবুদ্ধি বা বাতুল, মাহুর্ষের তথা মহত্ত্বদাম্বলের নৈতিক ও মানসিক বিচার-বিবেচনার নির্ধারিত এমন অসংখ্য অভিধানে ।

এই নাহয় শিল্পী নয়, কবি নয়, স্বপ্নপ্ৰপঞ্চী কবি নয়। শিল্পী কবি বা কবির পদবীতে কখন হয় সে উত্তীর্ণ? এখন আপন মুক্ত শব্দ নিরাকৃত স্বরূপ থাকে তার দৃষ্টি বা চেতনার খোঁচের। দতকণ সেই স্বপ্নের ধর্মেই থাকে সে বিবৃত, যে ধর্মের স্বপ্নও মহাত্ম্য থেকে, অজ্ঞান ও মোহ থেকে জাগ করে। যে পবিত্র আপনাকে সে জানে আপন স্বরূপেরই জ্যোতি ও চেতনার, শান্তি ও সমতার, স্বভাবগত ও সর্বগত আনন্দের নিষ্কিন আধার বা প্রণালী—স্বপ্ন—উজ্জ্বল দ্যাব বা বাতায়ন—স্বপ্নে। যে ভাবে বা যে উপলক্ষেই হোক, অন্তরতম আশ্রয় সঙ্গে এই একাত্মতা যে ভাগ্যবান! যে পরিমাণে অর্জন করে সেই পরিমাণেই সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠে তার শিল্পশ্রম কবির বা কবির।

তখন তুচ্ছ স্থাপত্য আর শিলামূর্তিই অমৃত বা হলে উপচে ওঠে। যাহ্নবের হৃৎকর ভাবাই ছন্দের বেগে ও হৃৎকর পাখার চিহ্ন আর অতীত উল্লে' আর কল্পনার অধের গভীরে নিয়ে যায় এই যাহ্নবী চেতনাকে। তখন মৃত্যুতেও অমরতার উপলব্ধি ঘটে, স্বপ্নেও মৃত্যির দ্বার পাওয়া যায়, অস্থির বাসনা-বেদনার অন্তরে স্থির শান্তি ও গভীর হৃৎকর স্মিতহাস্য দেখা যায়—এক কথায়, সত্যের মূখ থেকে নাহা-জ্ঞানের অগ্নিস্থিতিতে যাহ্নব 'নব্বতি নব্বতি নব্বতি'।

সত্য কী বস্তু? অন্যথা বা হয়ে উঠেছি সেই সত্য। তর্ক দিয়ে বা নির্ণয় করতে চাই, ইন্দ্রিয় দিয়ে বা দেখি শুনি, সত্য তা নয়।

তর্কসহচরী ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা জানি তা জানি বাইরে থেকে আর অনিশ্চিত ভাবে। অহুতবে, অর্থাৎ যা ভব, বা হয়েছে, তারই অহুতরণে, আমরা অন্তরের নিখিকেই অহুত্রে পাই। আয়, নিফল চৈতন্তের অর্ধ ভাবরতায় স্বভাবতঃই বীণ হয়ে ওঠে যে প্রেম তাতে ঘুচে যায়—আমি আর তুমির ভেদ, এই স্বপ্ন আর পরস্পরের মাঝ, সত্যের সম্পর্কে সকল তর্ক আর সকল সংশয়।

এ প্রসংগে নিরর্থক, শিল্পী, কবি, কবি, কে কতখানি বাধা নীতির ধারণে। শিল্পী কবি বা কবির আদর্শ ও অস্তিত্ব স্মৃতি-দুর্নীতির উল্লে'। স্বপ্ন-স্বপ্ন স্বপ্ন-স্বপ্নের উৎপত্তি তথা স্মৃতি-দুর্নীতির বিচার, বিচ্ছেদের বোধ থেকেই এসেছে—মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের ভেদ, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার তিরতা, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বেহনবিচ্ছিন্ন অলীক ও অসংখ্য সীমা। সর্বব্যাপী একের জ্যোতির্বিভাসিত শাস্তাংকারে বা তার আত্মসমাজে এই ভেদ ও অনৈক্যের ঐকান্তিক সীমা বাহ সূত্র হয়ে। এক প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধিতেই যেমন কবির সত্য-আবিষ্কার যেমন শিল্পী বা কবিরও স্বপ্নের স্বপ্ন। এই দৃষ্টি আর এই উপলব্ধি বতকণ থাকে ততকণ সে সোকাচার শাস্তাচার সমাজবিধি প্রবৃত্তি সাংসারিক সকল নীতির উল্লে'; তার নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, সীমাবদ্ধ ব্যক্তির নেই, যে পরিচয়ে তাকে অজ্ঞ বাশায়ে বা অজ্ঞ সময়ে তিনি আর জানি সে তো তার স্বপ্ন নয়।

আরব্য স্বপ্ন বা ব্যস্ত নীতিবিহীন; যেখানে বন নেই, আশ্রয়সীমা নেই, সেখানে আমরা উত্তর হয় নি নীতির। যাহ্নবের আছে বন, যাহ্নবের আছে সমাজবদ্ধ জীবনবাস্তা, কাজেই যাহ্নবেরই আছে সামাজিক স্মৃতি বা দুর্নীতি। কিন্তু, শিল্পী বা কবি বা কবি যাহ্নবসেহকারী যাত্র; তাদের অন্তর্নিহিত শিল্পীসত্য বা কবিসত্য বিভক্ত চেতনামাত্র। অর্থাৎ, সে শুধু জ্যোতি, সর্বত্র প্রসারিত হয়ে সব-কিছুকে প্রকাশ করে। সে শুধু বায়, সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সব-কিছুকে জীবন সের ও নিবিল জীবনকে আহরণ করে। আকাশের আলো, বায়ু—তার কি আছে কোনো নীতির বালাই?

প্রশ্নের ক্ষুদ্র মনে না তবু— শিল্পী কবি কবি এদের কার্যিক বাচিক মানসিক কোনো প্রকারের কোনো চেষ্টা থেকেই কোনো অকলাগ বা পাণের হুচনা হয় না তবে কি ? না, তা হতে পারে না, যতকণ এখানে যে ব্যাপারে সে বর্ণার্থই শিল্পী, কবি, কবি। ঠাকুর শ্রীমানকৃষ্ণের কথা, যেখানে তার পা গড়ে না ততো যে শিল্প ; বহির্ভূত নীতিতে নয়, কিন্তু অন্তর্ভুক্তই হচ্ছে ছন্দোময় তার সত্য— আত্মা এই ছন্দ বাইরের দিক থেকে সংঘম বলে প্রতীয়মান হলেও ভিতরের দিকে মুক্তি ছাড়া অস্ত্র কিছু নয়।

গায়কের মুক্তি গানে, স্বর ও তালের চিরবিচিত্র ও চিরচঞ্চল সমন্বয়ে ; স্বর বা তালের অবহেলায় বা তা থেকে খলনে নয়। কবির মুক্তি ছন্দোবেগতরঙ্গিত বাক্যে ও বাহ্যনিবন্ধ প্রতিমা-পরম্পরায় ছন্দোবিচ্ছাদ কোলাহলে বা মৌনে নয়। শিল্পীর মুক্তি রূপের পূর্ণতায় ও সৌন্দর্যে ; অস্থলর অকার-দীনতায় নয়— অমৃতের আধার তো হতে পারে না বৃত্তিকার তাল বা তর তাত। প্রেমিকের মুক্তি সেবার ও আত্মোৎসর্গে ; অধমিকাবদ্ধ বিরাগে বা উদাসীন্যে নয়। সত্যাত্মী কবির মুক্তি বিশ্বভূতঃ চৈতন্যের প্রবাহে ও প্রগারে ; বা কিছু রান ও নিশ্চয় করে সেই আনন্দকে, সেই আলোককে, সেই শুদ্ধ দুর্নীতি— সোকাচার ও বেগাচার-লঙ্ঘনে কী যায় আসে যদি বর্ণার্থ জীবন্ত দ্বায়ে অস্থল।*

সামাজিক নীতি নিরতপরিবর্তনীয়, দেশ কাল জাতি ও পরিবেশের নিত্য পরিবর্তনে। নিত্যমুক্ত ও স্বভাবে অধিকৃত যারা তাদের যে নীতি সে তো বাইরের কোনো বিধিনিষেধ নয়, অংশ অন্তরায়াদি বিধান, অন্তরায়াদি ইচ্ছার দীপা ও শক্তির প্রয়োগ।

মানব-সাধারণের চিন্তে ও জীবনে শিল্পের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তবে কি কেবলই কল্যাণকর ? পূর্ণতাই আলোচনা থেকেই যদিও এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হওয়া উচিত তবু স্বনির্দিষ্টভাবেই বললে বোধ নেই—

সত্য ও সার্থক শিল্প— মন্দির, মূর্তি, চিত্র, কবিতা, গান— নীতিবিচারের বহির্ভূত বা উৎসাহিত। এতদ্বিধ রসরূপের স্রষ্টা বিশ্বজ্ঞতার মতোই উপস্থিত বিশ্বের সমুদয় মানসিক ও নৈতিক মূল্য বা মান সম্পর্কে বিবিক্ত ; সে-সবই রসমুগ্ধতার উপলব্ধি, লক্ষ্য নয়। আদিকবির মতোই এই রসমুগ্ধ কবিও বহুধাবিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে আপন চেতনা দিয়ে, আশ্বাসন করে অন্যকে অহুগে বা আনন্দে, এবং সেই স্বরূপের উদ্ভাস ও আনন্দের দিব্যভোগকেই সৃষ্টি করে, পরীক্ষা করে ও রসিকমাত্রেই সৃষ্টি স্রষ্টা চির ও চেতনার এতৎ করে নানা ছন্দে— ধ্যানী বৃন্দ ; রাসিকের তরঙ্গ ; রতনবস্ত্র তরঙ্গতরঙ্গী*

১ সাধু, কবি, পদ্যরসে এর যে নৈতিক আচারও স্রাবণই রক্ষা করেন সে কেবল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি কল্যাণই বশে।

২ আচারে তারাই বিশ্বদীপনের সৎ-কিছু জ্ঞান বাহ, চেনা বাহ। সে পদ্ধতিতে আসক্তি নেই কলমই মনোভা নেই। উপনিষদেই আছে—

যেন ব্রহ্ম ব্রহ্মঃ সত্যঃ শব্দান্ শব্দান্তঃ সৈব ব্রহ্মান্।

এতেসৈব বিশ্বানানি কিনিঃ পরিণিতন্তে।

ঠাকুর শ্রীমানকৃষ্ণের তাত্ত্বিক মতে সাধারণ দিক্শিখর্যের কথা অংশ করা যেতে পারে। বাচক স্বরূপ-স্বরূপকে বোঝানো নির্দিষ্ট কল্পনাময়ের উপলব্ধিতে তিনি সমর্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

অর্ধাচারী রসবিচারে বিদগ্ধ ও মজ্জিত গুরী ও কোণার্ক-মন্দিরে অধিবাসকর বহু বুদ্ধিকেই অচ্যুত বলালে মনে করায় তারতীর্য 'শিল্পমণ্ডি'র কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিবর্ণন।

পৃষ্ঠ শাটুল, অহণান্বেষে প্রচ্ছিন্ন-অনল বস্ত্রের মতো যে।

তখনকে উদ্ভাসিত করে আলোক। স্বর্ষের আলোক। কোথায় সে পড়ে না? কোথায় সে ঘেসে ওঠে না, হাসিয়ে তোলে না, এমনকি, স্তম্ভাক্ষিত কর্ণকে, মলিনকে? স্বরগকে উদ্ভাসিত করে আনন্দের চেতনা বা চেতনারই আনন্দ; সেও কিছুই পরিহার করে না; স্ব স্ব, পুণ্য পাশ, হৃৎ বিধা, এ-সব কোনো ঘষের অপেক্ষা রাখে না। এই চেতনার বা আনন্দের প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই মাছুষ শিল্পী বা কবি; আশক্তি বা বিরাগ তার পরধর্ম, সব-কিছুকে প্রকাশ করাই তার কাজ। সেই প্রকাশ স্নানীতি বা দুর্নীতির কোনো খবর রাখে না। স্রষ্টারূপ বা স্রষ্টারূপ যে জানে, যে দেখে সেই প্রকাশকে, সেই হয় মুক্ত; অন্তত বতকণ বেখে, বতকণ চেনে, ততকণ থাকে সে মুক্ত— আর, পরেও স্মৃতি থেকে যায়। এই মুক্তিতে যে অগরিশীল কলাগণ নিবিষ্ট নীতিশাস্ত্র ও সমাজব্যবহার তা স্বপ্নেরও অগোচর।

নিম্ন প্রকাশস্বরূপ, স্বরূপেরই প্রকাশ। প্রত্যেক রূপের অন্তরে তার স্বরূপ। আপন আপন স্বরূপেই বিদ্যুত আছে প্রতিটি রূপ। বস্তু ও মূর্ত মানবাত্মাকে সৌন্দর্যে আনন্দে চেতনার মুক্তি দেওয়াই সম্ভব। নিম্নের সব-কিছু রূপায়নের অর্থ ও পরিণাম।

বৈদিক কবি-পরিদৃষ্ট ময়ের বিদ্বাক্ষিত উদ্ভাসে সংগৃহীত-সংগৃহীত মানস অঙ্ককারে সহসা সত্যের দিশা দেখা গেছে। ময়হঠা কবিকে প্রণাম। সত্যপ্রকাশক ময়কেও প্রণাম। মুখের কথা আর এই ময় সম্বন্ধ নহে। সাধারণ কবিকল্পনা আর এই নাস্তিক ইন্দ্রের বা প্রতিমা সেও বিভিন্ন ভূমিতে।

সদৃশ নিম্ন সম্পর্কে যে সত্যের ইঙ্গিত আছে এই দৈববাণীতে, অগ্নি পর্বত মাহুৎ স্রষ্টার সম্পূর্ণ অবিগত যদি নাও হয়ে থাকে তা, আদর্শরূপে, লক্ষ্যরূপে, প্রবর্তার-রূপে নিতাই রয়েছে সম্মুখে। আদর্শ লক্ষ্যের হবে তখনই, শিল্পী ও সমাজ উত্তীর্ণ হবে লক্ষ্যে, নিম্ন লখন আর অবসর-বিনোদনের বা বিলাসের বা খাদ্য-পেয়ালের বা কোনো সাংসারিক প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় ও ঊণকরণ বলে গণ্য হবে না। নিম্নের অগ্নিই নিম্ন, এ কথাই কোনো অর্থ নেই ঠিকই। নিম্ন জীবনকে প্রকাশ করবে, আর জীবন সীমাবিহীন আনন্দ চৈতন্য ও সত্যকে প্রকাশ করবে— বিদ্যুতে বিদ্যুতেই সিদ্ধ।

আজ পর্বত মাহুৎের জীবনও সম্পূর্ণতা পাওনি, নিম্নও পায় নি; কিন্তু ব্যাপ্তিও সম্মুখে পড়ে রয়েছে ঐ। পড়ে রয়েছে? সে কি টেনেও নিয়ে যাচ্ছে না? আগাতত: কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এ কথা বলতেও যোগ নেই: পথে চলাই সেই তো তোমাঘ পাওয়া।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রচিত্রকলা। ত্রিমোহন গুপ্ত। সুরবতী লাইব্রেরি। মূল্য ছয় টাকা।

ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে এমন অনেক কবি সাহিত্যিক হয়েছেন যাদের সাহিত্যরচনার প্রতিভা ও চিত্ররচনার শক্তি দুইই ছিল। এঁদের সকলেই যে সাহিত্যে ও শিল্পকর্মে সমান অবিকারী ছিলেন, এমন নয়; সাহিত্য ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার এবং সমান ধন অর্জন করেছেন এমন কবি-শিল্পী যে ক্ষয়গ্রহণ করেন নি তাও নয়। ইংরেজ কবি ব্রেক এমনই এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতিভার অদ্বন্দ্ব কবি ও চিত্রকর সমাজে সমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

ইউরোপে সাহিত্য ও শিল্প, কাব্য ও চিত্রকলার মধ্যে একটা দূরত্ব প্রায় বরাবরই থেকে গেছে। সেইজন্মেই সে দেশে কবি-চিত্রকরের সংখ্যা চীন-জাপানের তুলনায় কম। চীন-জাপানের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কাব্য ও চিত্রকলার মধ্যে ব্যাধান আনতে যেহেতু, তাই সে দেশে কবি-চিত্রকরের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন নয়। চীনা আদর্শ অলুখারী আদ্যমের দেশে অবদানপ্রদাতক কবি-চিত্রকর বলতে বোঝা নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে পারতেন বা তিনি অনেক ছবি আঁকেছেন এতে বিমিত হবার কোনো কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে পথে চিত্রের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন সে পথ সত্যই নতুন রকমের, সাধারণ নির্ঘমের বাইরে।

ইউরোপের সাহিত্যজগতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কোনো কবি-চিত্রকর হয়েছেন কি না জানি না। কবি ব্রেক বা নাট্যকার স্কিনবার্গের সঙ্গে তুলনা ঠিক মেলে না। জীবনের শেষে ক্রান্ত লিওনার্দো দাভিঞ্চির রূপকথা বা হাইকেল এবেলোর সনেট-চর্চা অনেকটা একরকম। উভয় ক্ষেত্রেই দেখি, অসাধারণ প্রতিভার নতুন পথে শেখ অভিসার। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মিল দেখা যায় চীনা কবি-শিল্পীদের। এ মিল চিত্ররচনার বা আদর্শিক নয়, মিল এখানে দৃষ্টিভঙ্গির। উভয় ক্ষেত্রেই চিত্রের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সন্ধান। রবীন্দ্রচিত্রের অভাবনীতিতা ও অলৌকিকত্ব অনেক ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু কোথায় সেই অভিনব বা অলৌকিকত্ব তা এই শ্রেণীর গুণগ্রাহী গুরা তারা ম্পষ্ট করে নির্ণয় করতে পারেন নি। পরিবর্তে এমন কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রচিত্র থেকে তারা বেঝিয়েছেন যা কোনো কারণেই অলৌকিকত্ব দাবি করে না। রবীন্দ্রচিত্র সম্বন্ধে এমন অনেক বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী উক্তি একই লেখকের একই লেখার ভিন্ন ভিন্ন অংশে পাওয়া যায় যে, সেগুলি বিনা বিচারে গ্রহণ করা সহজ নয়, এবং বিচার করে বেধতে গেলে নানা প্রশ্ন বেধা বেধে। রবীন্দ্রচিত্রের রূপগ্রাহী সমালোচকদের মতের ও বিচারের অনৈক্য ঘটায় কারণ তাঁদের দৃষ্টি বা বিচারকমতার অভাব হয়তো নয়, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক ও সাময়িক অবস্থার প্রভাব তাঁদের মতামতকে সহজভাবে ব্যক্ত হতে দেখে নি।

রবীন্দ্রনাথ এখন সাহিত্যসাধনার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন এমন সময়ে জীবনের শেষ অর্ধে তাঁর চিত্রসাধনা শুরু হল। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ জনসমাজে এখন আত্মপ্রকাশ করলেন কবি রবীন্দ্রনাথের

রূপোদ্ভি তখন বিকে দিকে ছড়িয়েছে। তাই তাঁর অঙ্কিত চিত্র যখন ইউরোপের রসিকসমাজে প্রদর্শিত হল তখন কৌতূহলী স্তম্ভগ্রাহী দর্শক এবং তাঁদের প্রশংসাপূর্ণ অভিনন্দন পেতে বিমূঢ় হইল। কিন্তু সেইসব উচ্চ প্রশংসা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কিঞ্চিৎ সংকুচিত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একদিকে যেমন কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রশংসাবাক্যকে নিব্বিহিত করেছিল, তেমনি শুৎকাপীন শিল্পকৃতিসমূহের সাময়িক প্রভাবের পরিচয়ও কতকগুলি উক্তিভেদে পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের চিত্র যখন প্যারিস-বালিসে পৌঁছল তখন সে দেশে চিত্রকলা ভেঙ্গে চলেছে অনির্দিষ্ট পথে। অনেক ভাড়াগড়া, আদিকের অনেক বিচার-বিরোধের মধ্য দিয়ে এসে প্যারিস-বালিসের রসিকসমাজ কিছুটা ক্লান্ত। এই ভাড়াগড়া ওলটপালটের মধ্য দিয়ে শিল্পশাস্ত্রের অনেক আশ্রয়বাক্যকে তাঁরা ছেড়েছেন, চোখ মেলে নতুন কিছু খোঁজার তাঁদের আগ্রহ ছিল, উৎসাহ ছিল, প্রয়োজনও ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবির ব্যক্তিকেন্দ্রগত রূপ দেখে তাঁরা ধাবড়ে পান নি। বরং তাঁদের অনেকেই চকিতে রবীন্দ্রনাথকে নব্য চিত্রকরদের বলস্বত্ব করে নিলেন, এবং বলে উঠলেন, ‘আমরা প্যারিসে ইউরোপের চিত্রকররা যা অহুসস্থান করে পাই নি রবীন্দ্রনাথ তাই পেয়েছেন।’ রবীন্দ্রচিত্রের এত বড় স্বীকৃতি আমাদের পূর্বের কথা, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কী তাঁরা নতুন পেলেন সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ তাঁরা করেন নি। এই কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও এই উক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেন নি। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ‘সেটা কী?’ অর্থাৎ নতুনকটা কোথায়, কোথায় সেই গুণ যা ইউরোপ অহুসস্থান করে পায় নি। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথাসি সনালোচকের কাছ থেকে পান নি। তাঁরা কেবল বলেছেন, ‘চাপোর, ভূমি কি সে কথা বুঝতে পারবে?’ এর পর অন্তত পাঁচও কৌতূহল হয়, কী সেই অনির্বচনীয় গুণ যা তাঁরা ভাবার প্রকাশ করেন নি, এবং সে কোন্ তত্ত্ব যা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও অহুভবের বাইরে। উচ্চ প্রশংসা ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যমালা ধারা ছড়িয়েছিলেন তাঁদের আশেপাশে এমন করেকজন গুপী রসিক লোক ছিলেন যারা বুদ্ধির দীপ্তিতে রবীন্দ্রশিল্পপ্রতিভার অস্বতল পর্বত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁরা চোখ বুজে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছবি। মনের উপর অঙ্কিত বস্তুর প্রতিক্রিয়াকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাই এইসব চিত্রদ্যালোচকর সমালোচনার রবীন্দ্রচিত্রের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা নেই। ‘পরিবর্তে’ রবীন্দ্রচিত্ররসগতকে আবিষ্কারের তথ্য তাঁরা আমাদের অনিবেছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টাশক্তি, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা, হৃদয়-রূপের অচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে রচিত তাঁর রূপের স্রষ্টা— সে স্রষ্টা বাস্তব নয়, অথচ বস্তুর সত্যের রত সত্য, এমন এক বিশেষ গুণের আবিষ্কার তাঁরাই করতে সক্ষম হয়েছিলেন যারা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে চেপে খুলে যেখানে পেরেছিলেন।

বৈকল্পিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তিগুলিই আমাদের বেশে জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের শিল্প-রসিকরা এই উচ্ছ্বাসের প্রভাব এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রায়ই আমাদের চিত্র-রসিকবল ইউরোপীয় বিশেষভাবে ফরাসি উচ্চ প্রশংসারউচ্চতর কোলাহলে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের সত্যপরিচয় প্রায় লুপ্ত করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছবির মূল্য বিচার করার পূর্বে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মনে রাখা

দরকার যে কবি রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার আগ্রহ ও প্রেরণা রূপপ্রকাশের অবশ্য থেকে নয়, বস্তুরূপের কোনো অংশ বা অবস্থা অল্পকরণের চেষ্টা থেকেও নয়। ভাবাবেগ সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অব্যাহত। রবীন্দ্রচিত্র সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তি ব্যক্তিগত খেদাশ-খুশির কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে যেসব উক্তি ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলা’ পুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে তারই সাক্ষ্য আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত পাওব, রবীন্দ্রনাথের সচেতন মন চিত্রের ক্ষেত্রে কী অহুগজ্ঞান করেছিল। অঙ্কনের কোন স্তর থেকে চিত্ররচনার আনন্দ ভ্রাংগেছে। নৃত্যরূপে আলোচ্য পুস্তক থেকে নিম্নের চিত্র লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দুইটি এখানে পুনরাবৃত্তি উদ্ধৃত করছি :

শব্দ বুদ্ধত পায়ছি, লগুণটা আকারের যাবান্না।^১ ক্রমের কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, তাই নয়, চিত্রা নয়, রূপের সবাকরণ। পৃ ৩৭

কিছু তাঁর বিখ্যাত উক্তি

The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The Universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance, পৃ ১৪

আরও অনেক উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রেরণা যোক্ত্যবগত গুরুত্ব উপলব্ধি উক্তি দুটোই যথেষ্ট। চিত্রের জগতে প্রবেশ করার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এমন এক সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে সত্য তেমন প্রত্যক্ষভাবে ইতিপূর্বে তাঁর জ্ঞানের গোচর হয় নি।

চিত্রগত রবীন্দ্রনাথের কাছে নতুন আবিষ্কারের মত বিশ্বদরকার, অপ্রত্যাশিত। জগতের ‘আকারে’র দ্বারা, ভঙ্গির প্রকাশ ঠাঁকে এক অবচ্ছিন্ন (abstract) আনন্দে পৌঁছে গিল। রবীন্দ্রনাথ সেই অবচ্ছিন্ন জগৎকে নতুন করে সৃষ্টি করলেন রেখার বীথনে, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার শক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ অহুগজ্ঞান করে কিংলেন রেখা ও রূপের লব্ধ, রূপের অবচ্ছিন্ন সত্তা—বাস্তবের প্রতিবৃতি নয়।

যে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি আগ্রহ থেকেছে সে পর্যন্ত তাঁর কলমের মুখে রূপের ছন্দ অসুতপূর্ব আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এই নামহীন ভাবমূলক অসাধারণ আকার রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টি, এ বিষয়ে সংশয়ের সত্যই অবকাশ নেই। বতর্কণ রবীন্দ্রনাথ এই অবচ্ছিন্ন জগতের আকার ও ভঙ্গিকে জানেন আলোক অহুগজ্ঞান করেছেন ততর্কণ তাঁর আনন্দের লীলা নেই। ক্রান্তিহীনভাবে তিনি চিত্ররচনায় মগ্ন থেকেছেন। কিন্তু যখনই তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি বাস্তব রূপের কাছে দ্বার মেনেছে, যখনই তাঁর স্বপ্নের নৃত্য ভাবের দিকে ফিরেছে তখনই তাঁর ক্রান্তি এসেছে; অব্যাসের খেদোক্তি তখনই আমরা শুনি—‘যানি ছবি আঁকতে শিখি নি’ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার অসাধারণত্ব তাঁর চিত্রের তাঁর আকর্ষণ। অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তিনি স্নেহে পেয়েছেন অনেকগুলি চিত্রে, যে চিত্র ভাবের স্নেহে স্বপ্নের যে ভাষা নয়। সে ক্ষেত্রে আকর্ষণ তীব্র কিন্তু বাহ্যিক; কিন্তু বিদ্যাপ্রণয়। এই abstract স্তরই তাঁর চিত্রকে মহৎ দিয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব তাঁর আদ্যিক করণকৌশল, চিত্রের জ্যেষ্ঠতা—এসবের অল্পবিস্তর আলোচনা পূর্বে কেউ কেউ করেছেন। রবীন্দ্র-চিত্রকলার লেখক এ বিষয়ে আলোচনা এমন সর্বাঙ্গীণ করার চেষ্টা করেছেন যার তুলনা রবীন্দ্রচিত্রের পূর্ববর্তী কোনো আলোচনার পাওয়া যায় না।

লেখক ঠিকই বলেছেন, রবীন্দ্রচিত্রের আদ্যিক আলোচনা করতে গেলে বিষয়ের কথাও এসে পড়ে।

তবু প্রশ্ন থাকে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিবরণের গুণে আদিককে দেখছি, না, আদিকই বিবরণকে বাচিয়ে রেখেছে? সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ অধিকার ছিল, ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর যে ব্যুৎপত্তি ছিল, চিত্রের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সে গভীর পাতিভা ছিল না। কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূল সত্যকে তিনি দেখেছিলেন অনায়াসে, এবং সেই সহজ জ্ঞানকে ব্যবহার করেছিলেন নিঃসংকোচে। আলো-অন্ধকারের ব্যত্য-প্রতিঘাতে যেমন বস্তুগণ্য হুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে, তেমনি ছবিও পড়ে ওঠে আলো-ছায়া কালো-সাদার ব্যত্য-প্রতিঘাতে। বাস্তব রেখার উদ্ভাবন ক'রে এই আলো-ছায়ার চকল বস্তুগণকে নির্দিষ্ট ছন্দে বাঁধতে পেরেছে। এবং রেখার বাঁধনে বাঁধা বলেই আলো-ছায়া চিত্রের অগুণ্যকে ব্যত্যব জগৎ থেকে স্বতন্ত্র রেখে এক নূতন সত্তা দিয়েছে। এই রেখাছন্দ না থাকলে বস্তুগণ্যের সঙ্গে চিত্রগুণ্য একাকার হবে বৈত। স্বতন্ত্র করে চিত্রকে চিত্র বলে আর চেনা সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথ বস্তু-অভিবেশের এই মূল সত্যকে ধেনেছিলেন, তাই তাঁর চিত্র আলো-ছায়ায় স্পষ্ট; কালো-সাদার বাঁধন, কঠিন রেখার ছন্দ দেখানো অনবদ্য। ছবির আদিক বা করণকৌশলের নূতনত্ব আবিষ্কারের সাবাস্তবতার চেষ্ঠাও রবীন্দ্রনাথের ছবিতে দেখা যায় না। তাঁর করণকৌশলের এক উদ্দেশ্য, এক চেষ্ঠা— ছবিকে ছবির রাস্যে হুটিয়ে তোলা। কলমের খাঁচতে, হঠে তোবানো প্রাকৃত্যের ছোঁপে, আঙুলের ঘষায় ছবিকে কালো-সাদার রাস্যে হুটিয়ে তোলার চেষ্ঠা করেছেন। ছবির রাস্যে তাঁর রচিত রূপ সত্য হয়ে ওঠে এই তার লক্ষ্য। এবং বোধ হয় কখনোই তিনি এই সত্য থেকে জড় হন নি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রেরণার গতি ও লক্ষ্য যেমন এক্ষমিকে অভিব্যক্ত তাঁর করণকৌশল তেমনি সহজ ও সাধারণ।

লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন সীতিধর্মী, শব্দ বা অসংকারের লেশহীন, সরল, অথচ তার গতিবেগ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে চলেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাষা সহজ অনাড়ম্বর; কিন্তু তার গতিবেগ যেমন, লক্ষ্যও তেমনি নির্দিষ্ট। লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তার নানা দোষত্রুটি ধরা পড়ে তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাষা সে পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির রেখেছে সে পর্যন্ত তা ঐতিহীন মনে হয়, কিন্তু কিস্কিন্দার লক্ষ্যভ্রাত হবার সম্ভাবনাকে দেখা দেয় নানা ত্রুটি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার ইতিহাস, তাঁর চিত্রকলায় বিবর্তন, আদিক করণকৌশল ইত্যাদি সব দিক দিয়ে আলোচনার পর আমাদের জ্ঞানতে কোতুল হয রবীন্দ্রচিত্রের বস্তুত্ব। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়, তাঁর অবজিহ্ন রূপছন্দমূলক ছবির উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। রবীন্দ্রনাথের এই স্রষ্টার ছবির স্তম্ভপ্রায়ী অনেক আছেন কি না জানি না।

এর পর আমরা যেখি কতকগুলো আদর্শ জীবজন্তু, অকৃত ইয়ারত ইত্যাদি। ইউরোপীয় জিটিকরা বলেছেন, এরা জন্তু বটে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় এদের সাক্ষাৎ মেলে না, রাস্তার ঘুংঘুং এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সে' বই ষায়া পড়েছেন ওঁরা বুঝবেন, রবীন্দ্রনাথের এই জীবজন্তুরা নানা ভঙ্গিতে আমাদের দেখা দিয়েছে, কিন্তু অন্তরালে রয়েছে রহস্তময় 'সে', যাঁর যাঁরা এইসব জীবজন্তুর নড়াচড়া নির্দিষ্ট হয়েছে। 'সে' বইবানিতে যেমন উপলক্ষ্য অনেক, কিন্তু লক্ষ্য আমাদের অগোচরে দ্রুতের বহুতরূপে বিরাজ করেছে, তেমনি চিত্রের রহস্তময় অগুণ্য থেকে এসেছে রবীন্দ্রনাথের জীবজন্তুর বহু বিকট সৃষ্টি। ক্রমে ক্রমে এইসব জীবজন্তুর বিকট আকারের সঙ্গে তাল রেখে দেখা দিল বাস্তবের মূণভঙ্গি। এইসব সৃষ্টিভি

কি কোনো একটা বিশেষ ভাবপ্রকাশক বা বস্তুরূপকে আকারের নির্বিচার লোকে নিয়ে দ্বাধার ক্ষেত্রে যে লড়াই, তার ইতিহাস এগুলি। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, অবচেতন মনের অতি গভীরে অববদিত কামনের প্রকাশ এগুলি। যেমনই হোক, জ্ঞানের নির্বিচার সাধনা থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকবারি দূরে চলে এসেছেন, এ সময়ে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিবর্তনের শৈবিক কতকগুলি সূত্রচিত্র, অনেকগুলি নান্দ্যবের প্রতিরূপিত পাই যা নির্বিচার আকারও নয়, আবার বিকট ভয়ংকর প্রকৃতির অসুস্থও নয়। এগুলিতে তাঁর পূর্বকার রচনার মত মিষ্টত্বহীন তিক্তকষায়মিশ্রিত যে বিশেষ একপ্রকারের স্থাব তা নেই, পরিবর্তে মিষ্টতর, মনোরম স্বাভাবিক বাস্তব ভাবের আশ্রয়ে এদের আয়তনবিহীন সহজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখের পুষ্টি, টোটেব বক্রতাও একটা নাটকীয় ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচিত্রের গুণগ্রাহীরা এই জ্যোতির চিত্রকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বা তাঁর অলৌকিক সৃষ্টি বলে মনে করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তির উল্লেখ করে পূর্বেই দেখিয়েছি যে ভাবপ্রকাশ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। 'ভাব আমি নিজেই নিই অন্য ক্ষেত্রে' এ জাতীয় উক্তিও রবীন্দ্রনাথের আছে। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ নিজের ছবি লক্ষ্যে যা বলেছেন তা অসম্ভব সত্য নাও হতে পারে; কারণ, সেবিক লেখকের মুক্তি

Great art is an unconscious creation. পৃ ৬

কাজেই এ কথা হরতো বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথ নিজে না তেনেই গভীর ভাবসকল প্রকাশ করেছেন তাঁর ছবিতে। যদি আমরা স্বীকার করেও নিই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে অলৌকিক ভাবসকল প্রকাশ করেছেন তা হলেও গ্রন্থ থাকে, যে ভাব তাঁর চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা মনে করছি সেগুলি ভাবের তীব্রতা বা গভীরতার ক্ষেত্রে অলৌকিক, না, তার নানবীর পরিবেশ আমাদের আকর্ষণ করে? রবীন্দ্রচিত্রে সৃষ্টিশক্তি, উদ্ভাবনী প্রতিভা, এমনকি তাঁর রচিত চিত্রে ভাবের প্রকাশ ও সেক্ষেত্রে অলৌকিকত্ব মনে নিলেও সমস্তর সমাধান হয় না। সমস্তা এই, আমাদের সংসারী মন গ্রন্থ করে— চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ কি কবি রবীন্দ্রনাথের মতই অসাধারণ? রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা কি তাঁর কাব্যপ্রতিভার মতই গগনম্পর্শী? রবীন্দ্র-চিত্রকলার লেখক জীবনোত্তরম গুণ মহাপ্রদেয় মনে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নায় নেই। পুস্তকের মূহুর্তে অসুস্থচিত্তভাবে তিনি বলেছেন—

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অসুস্থতার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। অন্তর মতামতের মিলনা না করে আমরা নিজের মতটুকু সম্যকভাৱে কখনো তা থেকে আমি এ কথা বলতে পারি।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা বৈখানিতে লেখক পরম স্ফূর্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের অসাধারণত্ব লক্ষ্যে আলোচনা করেছেন। মনোরঞ্জনবাসু সর্বোচ্চক মন সৃষ্টিবাদীর নয়। প্রজ্ঞা-সম্মতই সঙ্গে, পরম ধৈর্যের সঙ্গে নানা তথ্য সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত মতামতকে সর্বসাধারণগ্রাহ্য সত্যের পরে স্থাপিত করতে ধ্যানাধ্যায় পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। এই জাতীয় আলোচনায় বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত অপরকে গিলিয়ে যেবার চোঁটা থাকে। আশ্চর্যের বিষয় যে, বৈখানির কোনো অংশে অসাধারণত্ববস্তুও লেখক সে চোঁটা করেন নি। লেখক সকল বিষয়েই গ্রামাণিক উক্তির বাগা নিজের মতামতের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি লেখক চীনা calligraphyর মূলতত্ত্ব লক্ষ্যে কতকগুলি উক্তির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। নিজের ছবি লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে calligraphy লক্ষ্যে চীনা

রসজ্ঞের উক্তি পাশাপাশি রাখলে দূত্বত্রির আশ্চর্য ঐক্য আশ্বাসের চরংকৃত করে। লক্ষ্য করা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণার উৎস উজ্জ্বল জ্ঞানের জগৎ।

ছবির ছন্দ মানে কী, বোঝাতেই প্রধানত চীনা calligraphyর উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ‘ছন্দ’ যেখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে তেমন ছবির কোনো দৃষ্টান্ত বইখানিতে নেই। বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক ছবির দৃষ্টান্তও যেমন নেই, তেমনই সে বিষয়ে লেখক তেমন বিশদ আলোচনাও করেন নি। রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি বইখানিতে উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে তিনি যা বলেছেন তার ভাবার্থ এই যে, ‘খানি কী করতে চেয়েছি আর কী করেছি নিজে খানি না’। যদিও রবীন্দ্রনাথ কী করতে চেয়েছেন তা তিনি অন্তর বলেছেন। কিন্তু এই সাময়িক উক্তি স্বীকার করে নেবার পরেও রবীন্দ্রনাথের abstract ছবি দেখে বলা যায়, কী তিনি চেয়েছিলেন আর কী তিনি করেছেন।

বইখানির শেষে এক অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্রচিত্র সম্বন্ধে নানা মত উদ্ধৃত করেছেন। ইউরোপীয় সমালোচক-দর্শকরা রবীন্দ্রচিত্র সম্বন্ধে যেসব উক্তি তুলেছেন তার বহু অংশই লেখক উদ্ধৃত করেন নি। বিশেষ রকমের এক দিকের উক্তিই তিনি উদ্ধৃত করেছেন। এই অসম্পূর্ণতার ভ্রাতৃ লেখককে সোধী করতে পারি না। ইউরোপের লোকে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ঠিক কী চোখে দেখেছিল, কত উচ্চ তাকে স্থান দিয়েছিল, এবং কী অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তারা বিশ্লেষণ করেছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা হওয়া দরকার। সাহিত্য বা শিল্পের আলোচনায় অত্রান্ত সত্য, অকাটা সূক্তির স্থাবির প্রায়ই বড় ভুল। সামান্য আঘাতে তথাকথিত অনেক অত্রান্ত সত্য চূর্ণ হয়, সূক্তির অকাটাতা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কাজেই সে দিক থেকে ভ্রাতৃদের সূক্তি তোলবার চেষ্টা করতে চাই না।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা বইখানি গ্রামাণিক গ্রন্থের মর্যাদা অর্জন করতে লক্ষ্য, এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

ঐবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

কে জানে কার মুখের ছবি কোথায় থেকে তেলে

ঠেকল অনাহত, আবার তুলির ভগায় এলে।

সাইকোএনালিসিস্-যোগে ইহার পরিচয়

পণ্ডিতেরা জানেন নাষ্ট, আবার জানা নয়।

—রবীন্দ্রনাথ